



হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

# আলোচনা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, বি, এল ।

সন ১৩২৫ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত

আলোচনা-কার্যালয় ।

১০৮ নং পকাননতলা রোড, হাওড়া ।

## ৩২৫ সালের সূচীপত্র

১। নববর্ষের অভ্যর্থনা	১	২৯। বসন্ত-চিত্রা	১০৪	৫২। পৌরাণিক পঞ্চ পুষ্প	
২। একেশ্বরবাদ	২	৩০। প্রণয় চিত্র	১০৮	(গল্প)	২৩৬
৩। সকাল ও একাল	৪	৩১। অভাগিনী (গল্প)	১১০	৬০। হৃদয় সখা (কবিতা)	২৪৩
৪। হরিনাম	৮	৩২। হরিনাম	১১৫	৬১। অভিমানীর	
৫। দেবত্ব	১৪	৩৩। মাতৃনামের জয়	১১৯	প্রতি (ঐ)	২৪৪
৬। শ্রীশ্রীলক্ষ্মণীয় মানস		৩৪। কমা (গল্প)	ঐ	৬২। চুখিমীর আশ্রয়	
পূজা	২২	৩৫। মুক্তি	১২৯	(গল্প)	ঐ
৭। বিজয়া	২৪	৩৬। বঙ্গসৈন্য-সম্বন্ধনা	১৩৯	৬৩। শান্তি না শান্তি	২৪৯
৮। পোস্তার রাজবংশ	২৭	৩৭। প্রাকৃত্য	১৪০	৬৪। সপনে (কবিতা)	২৫৩
৯। কবিকুঞ্জ	২৯	৩৮। অশ্রুতাপ (গল্প)	১৪৭	৬৫। মহুগুহ	২৫৭
১০। শ্রাদ্ধত্ব	৩০, ৪৮, ১০০	৩৯। অপেক্ষায়	১৫১	৬৬। সাকার দেবতা	২৫৯
১১। গীতার অন্তর্গত শাস্ত্রের		৪০। তুমিই	১৫২	৬৭। হরিনাম	২৬৪
সিদ্ধান্তের সমন্বয়	৩৩	৪১। বঙ্গের ভিক্ষুক	ঐ	৬৮। বাণী-বন্দনা	২৭৩
১২। প্রাচী ও পাশ্চাত্য		৪২। বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা	১৫৪	৬৯। সভ্যতার ক্রম-	
ছাত্রজীবন	৩৬	৪৩। আগমনী	১৫৬	বিকাশ	২৭৪
১৩। প্রণয় চিত্র	৪২	৪৪। ভাবের পূজা	১৫৮	৭০। সাদক কমলাকাণ্ড	২৭৯
১৪। কবিকুঞ্জ	৪৪	৪৫। কবিজীবনী	১৬৮	৭১। সঙ্গীত	২৮৫
১৫। আমার দেবতা (গল্প)	৫০	৪৬। প্রণয়ের কথা	১৭০	৭২। শ্রমণ	ঐ
১৬। স্বর্গীয় মহারাজ		৪৭। সুখাধেবণে (গ)	১৭৪, ২১০, ২২৩, ২৬৮	৭৩। নৈমধ্য-চরিত	২৮৭
রঞ্জিত সিংহ	৫৫			৭৪। প্রেমের স্মৃতি	ঐ
১৭। দেব-ত্ব	৫৬, ১৬১	৪৮। বিরহ-চিত্রা	১৮০	৭৫। কবিকুঞ্জ	২৯৪
১৮। বাসনা	৬২	৪৯। কবির গান	ঐ	৭৬। কই তুমি	২৯৫
১৯। অশ্রুদৃষ্টি	ঐ	৫০। প্রতিমা-বিসর্জন	১৮৫	৭৮। যতো ধর্মন্ততো জয়ঃ	২৯৭
২০। সম্পাদকীয় মন্তব্য	৬৪	৫১। সাধন-সঙ্গীত	১৮৫	৭৯। কাকা বাবু (গল্প)	৩০৫
২১। পুরুষোত্তম	৬৫	৫২। আমার সুখ (গল্প)	১৮৮	৮০। প্রাণ-শক্তি	৩১৫
২২। মানবের আদিম অবস্থা	৬৮	৫৩। গয়ার ইতিহাস ১৯২, ২৫৩		৮১। শঙ্কর মঠ	৩২০
২৩। জগদগুরু আর্বির্ভাব	৭৪	৫৪। গুরুমন্ত্র	১৯৬	৮২। ব্রহ্মচর্যা	৩২১
২৪। কবিকুঞ্জ	৮০	৫৫। সাধ না মিটিল	২০১	৮৩। গয়ার ইতিহাস	৩২৯
২৫। মালিক খুসরু	৮৩	৫৬। কবিকুঞ্জ	২০৮	৮৪। আমার সহ	৩৩৫
২৬। মেহের জয়	৮৮	৫৭। জিতগবানের		৮৫। নীরবে নীরবে	৩৩৯
২৭। সাধন-সঙ্গীত	৯৪	রাসলীলা	২১৭	৮৬। প্রাকৃত্য	৩৩৯
২৮। সেট কি ?	৯৭	৫৮। বৈবহত মন্ত্র	২৩০		





আলোচন।



কুমার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুর।  
পোস্তা রাজবাটা, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীকালীকায়ৈ নমঃ ।

# আলোচনা

“মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ।”

দ্বাবিংশ বর্ষ । ]

বৈশাখ, ১৩২৫ ।

[ প্রথম সংখ্যা ।

## নববর্ষের অভ্যর্থনা

( ১ )

আনন্দে ভাসিছে বিশ্ব, আশার আশ্বাসে তব,  
এস বর্ষ স্বর্গ হ'তে বরণ করিয়া ল'ব,

আজি এই মধু মাসে

সারা ধরা মুহূর্তে হাসে

অলক্ত-সিন্দুর-রেখা প্রকৃতি সতীর ভালে,  
পরা'য়ে দিয়াছে উষা আজি নব-কুতূহলে ।

( ২ )

বহিছে বুঝিবা বিশ্ব করুণার প্রবাহিনী,  
এনেছ কি বর্ষ তুমি বহিয়া এ তরঙ্গিনী ?

এনেছ কি সুধা-রাশি

মরতে দেবের হাসি

নন্দন-মন্দার-পুষ্প এনেছ কি তব সনে,  
ধরিত্রীরে উপহার দিতে প্রেম-সম্মিলনে ?

নিবেদন—জগদম্বর কৃপায় ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে “আলোচনা” দ্বাবিংশ বর্ষে প্রদার্পণ করিল। এই দারুণ দুদিনে, কালী-কাগজের এই দারুণ দুস্মৃতির দিনে কত মাসিক পত্রিকা অন্তিম হারাইয়াছে কিংবা “আলোচনা” আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে আজও টিক সমভাবে বাহির হইতেছে। ইহাতে কৃপাময়ী মায়ের কৃপা ও সফলতাই গ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকবর্ষের অনুকম্পা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পত্রিকা চালাইতে এখন অসম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও মায়ের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এবং গ্রাহকগণের সহানুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা আশায় বুক বাধিয়া আবার

কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্ষের দয়া সমভাবে থাকিলে আমরাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না। অনেকে পত্রিকার মূল্য বর্দ্ধিত করিতে সন্নিহিত হইলেও কিন্তু সাধারণের প্রতি চাহিয়া আমরা তাহাও করিলাম না। এক্ষণে আমাদের অশিক্ষিত পরিচালকস্বানীয় গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—তাহারা যেন এই দুঃসময়ে এতদূর অত্যন্ত একজন করিয়া গ্রাহক করিয়া দিয়া আমাদের সহায়তা করেন এবং ক্রমশঃ সকলের নামে ভিঃ শিঃ করিব, তাহা যেন সকলে যথাসময়ে গ্রহণ করেন। এইটুকু সহানুভূতি পাইলেই আমরা আশাভীত উপকৃত হইব। ইতি

কর্মকর্তা—প্রাপোচনা।

( ৩ )

তীর-ভূমি ছাপাইয়া ছুটেছে তটিনী-চয়,  
হাসিতেছে সারা বরা ফুলে-ফুলে ফুলময়,  
বরষ তোমার তরে  
আজি এ সুখমা করে

অমর-সঙ্গীত রবে মুখরিত সমীরণ,  
ফুটিয়াছে নানা পুষ্প মরি কিবা অতুলন ।

( ৪ )

ছড়া'য়ে “বিমল কান্তি” হাসিছে প্রকৃতি রাণী,  
আজ তব আরাহন গায় লক্ষ বিহঙ্গিনী,  
সুনীল-সরসী-জলে  
ফুটন্ত সরোজ দলে

ভ্রমিছে ভ্রমরা ঝঁধু আজি কত কুতূহলে,  
শুনা'তেছে প্রেমগান “পঙ্কজিনী” স্রুতি-মূলে ।

( ৫ )

বর্ষ ! তব অভিসারে প্রকৃতি-রূপসী-রাণী,  
সোহাগে প্রাণেশ আশে সাজায়েছে তনুখানি,  
নানা অর্ঘ্য উপাদান  
দিতে প্রেম-প্রতিদান  
রেখে'ছে যতনে তার বিশাল-হৃদয়-প'রে,  
তোমা'রে সঁপিবে বালা সলাজ আবেশ-তরে ।

( ৬ )

অমরার প্রান্ত হ'তে, শুনি তব আগমন,  
আনন্দ-উৎসবে দেহ বিশ্ববাসী নিমগন,  
আনন্দে আকুল করি  
এস বর্ষ মর্ত 'পরি  
হাসাইয়া ধরনী'রে, লয়ে স্বর্গ সুখমার,  
মুগ্ধ করি সারা বিশ্ব স্নেহ-প্রেম-আকাজ্জক্য ।

( ৭ )

রচেছে প্রকৃতি-রাণী কুমুদে'রি কুঞ্জবন,  
পাতিয়া রেখেছে তায় হরিতে'র আন্তরণ,

ফুল-সিংহাসন'পরে

নানা ফুল ধরে ধরে

সাজায়ে রূপসী রাণী বসে আছে তব তরে,  
বারেক চরণ তায় রাখ বর্ষ দয়া ক'রে ।

( ৮ )

বর্ষ ! তব আগমনে সবি হেরি মধুময়,  
গিয়াছে হৃদয় হ'তে আজি শোক-তাপ-ভয়,  
প্রভাতী, আঁধার নিশি  
মধুরে উজলি দিশি—  
এস বর্ষ সাথে ল'য়ে স্নেহ ও করুণা-প্রীতি,  
পুণ্য পরশে ত্রিদিব জিনিয়া হান্নক সারাটি ক্ষিতি ।  
শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় ।

## একেশ্বরবাদ ।

আর্যেরা আদিম অবস্থায় জড়োপাসক ছিলেন । তাহারা জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মেঘ, স্বর্ষ্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক নৈসর্গিক দৃশ্যে এক এক দেবতার রূপ কল্পনা করিয়া পূজাদির বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন । হিন্দুধর্মের তেত্রিশকোটি দেবতা প্রকৃতির অনন্তব্রজোপক । যে হিন্দু অনন্ত বিশ্বকে অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির বিকাশ বলিয়া ধারণা করেন তিনি অনন্তরূপ কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন না । কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বিবিধশক্তি সমুদ্ভূত হইলেও আমরা সমস্তই একেশ্বরে আরোপ করিয়া থাকি । মন আমিত্ব জ্ঞানে পূর্ণ । যখন সেই মনের সাহায্যে বিশ্বের আদি কারণ স্থির করিবার চেষ্টা করা যায়, তখন সেই মনের সাহায্যে সৃষ্টিস্থিতি সংহার-কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা

স্বভাবসিদ্ধ । সেজন্য আমরা দেখিতে পাই যে একেশ্বরবাদ আবহমানকাল প্রচলিত আছে এবং সকল ধর্মই মূলতঃ এক । কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা হয় মাত্র । সকল ধর্মেই এই কয়েকটি বিষয় পাওয়া যায় । \*  
যথা—

১। এক পরমেশ্বর আছেন ।

২। তিনি সকলের পূজ্য ।

৩। সদৃশ এবং বিশুদ্ধতা সেই পূজার প্রধান অঙ্গ ।

৪। পাপ করিলে অনুতাপ করা উচিত ।

৫। পরজীবনে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা আছে ।

ঈশ্বর সগুণ হউন বা নিগুণ হউন তাঁহাকে সাকার বা নিরাকার যে ভাবে ভাবনা করা হউক, তাঁহার যথার্থ রূপ নির্ণয় করা মানবের পক্ষে অসাধ্য । খ্রীষ্টকর, বুদ্ধ, মহম্মদ, কনফিউসিয়াস প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ মনের প্রকৃত্যাহুয়ারী ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার বিরাট মূর্তি বা মানব-মূর্তি কেবল কল্পনার ফল মাত্র । আগম, নিগম, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কোন ধর্ম-পুস্তকে তাঁহার স্বরূপ পাওয়া যায় না । তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত, আবার তিনিই সংসারে মায়াযোগে লীলাখেলা করিতেছেন—সতী, উমা, অম্বিকা, দুর্গা, চণ্ডী, চামুণ্ডা, পার্বতী, হৈমবতী, কিরাতী, কপাল-মালিনী এসকল সেই এক মায়ের নাম ভিন্ন অঙ্গ কিছুই নহে । ইহার দ্বারা আমরা অস্ত্র কিছু বুঝি

আর নাই বুঝি, বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের মিলন যে ভারতবর্ষেই প্রথমে সংসাধিত হইয়াছিল, তৎপক্ষে অসুখ্যাত্র সন্দেহ নাই, কল্পনা ও যুক্তি যাহ্মকে অনেক সময়ে বিভ্রত করে । সাকার নিরাকার নাম ভেদমাত্র । তিনি সাকাররূপে প্রতিপন্ন এবং নিরাকাররূপে উপলব্ধ, দেশভেদে সমাজভেদে বহু সংজ্ঞা হইলেও আসল কথা কেহ ভুলিয়া যায় না । বৃন্দাবন বলিলে মাধবীলতার কুঞ্জ, প্রমোদোত্তান, শারদ জ্যোৎস্না, মধুর মুরলীধবনী ও স্মন্দরী রমণী প্রভৃতি কত কি মনে হয় বটে, কিন্তু সেজন্য কেহ রাধাকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায় না । ভগবান খ্রীষ্টকরাচার্য্য বলিয়াছেন—

“ব্রহ্মেশং রমেশং মহেশং সুরেশং নিশিধেশ্বরং  
বা কদাচিত্তি ন জানামি চাক্ষুঃ সদাহং শরণ্যে  
গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী—”

সংসারী এক ভাবে তাঁহাকে দেখেন আর সন্ন্যাসী আর এক ভাবে তাঁহার অনুসরণ করেন কিন্তু সকল সৃষ্ট সামগ্রীর পরিণতি এক, এত যত্নের এই অমূল্য দেহের শেষ পরিণতি যুক্তিকা, জল ইত্যাদি সকল সামগ্রীরই শেষ সেইরূপ একে । স্বরূপ জ্ঞানের সাহায্যে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আকারভেদ নামভেদ যতই হউক না কেন মূল সেই এক । পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন আবার পঞ্চভূতেই অবসান । পঞ্চভূত শেষে একরূপে মিশিয়া যায়—খেত, পীত, নীল, লোহিত, হরিৎ, শ্রামল শেষে কৃষ্ণবর্ণে লয় হয় । তাই সাধক বলিয়াছেন—

নমস্তে নিত্যরূপায় বিশ্ববীজ সনাতন

\* Lord Herbert Cherbury.

নমঃ সৰ্ব্ব স্বৰূপায় প্রধান পুরুষায়নৈ  
বিশাল বিশ্বরূপন্তঃ কারণাক্ষ কারণম্  
নমস্তন্তু জগন্নাথ মম নাথ মম প্রভো  
স্বংহি কাশীধরো দেব বন্দ্যাবনবিহারক  
স্বং তারা ছিন্নমস্তাচ ভৈরবী ভৈরব স্তুধা  
পরমার্থদ তীর্থঙ্ক স্বং সিদ্ধি স্তীদ্ধিরেবচ  
তত্ত্বমস্তাদি লক্ষ্য স্বং স্বনমামি জগৎপ্রভো ।  
শ্রীজীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

## সেকাল ও একাল । ❀

( বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লাজ্জনা ও গৌরব )

“নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ।

বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি মনের আশা ॥”

বঙ্কিমীযুগের সহিত বর্তমান রবীন্দ্রীযুগের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা বঙ্গীয় প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থার দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় বড়ই ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলেন, বাঙ্গালী ভাষা সাহিত্যের কথায় তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেন না । তাই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমবাবু “বঙ্গসাহিত্যের আদর” শীর্ষক একটি মিঠেকড়া নজ্জা লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । তাহাতে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুর মুখে বাঙ্গালী গ্রন্থ লব্ধকে যে সমস্ত উক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা

\* রায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বাহাদুরের সভাপতিত্বে পাবনা টাউন হলে “বিশ্ববীরী মোহন হুডেট্টস্ লাইব্রেরীর ৩র্থ বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

দেখিয়া আমরা এখন লজ্জায় হেঁটমুণ্ড হই । বঙ্গ রমণীর হস্তে বাঙ্গালী গ্রন্থ দেখিয়া উচ্চ-শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিতেছেন—“ছাই ভস্ম • বাঙ্গালী গুলো পড় কেন ? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে । ওগুলো immoral, obscene, filthy” ইত্যাদি । বাঙ্গালী ভাষায় যে এক রাজ্য আর দুয়ো স্রোয়ো রানীর গল্প, বা নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান ব্যতীত উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস বা সংসাহিত্য ফুট হইতে পারে, এ ধারণা তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতদের ছিল না । আসল কথা বাঙ্গালী বই দেখিলে ইহারা শিহরিয়া উঠিতেন, উহা স্পর্শ করিলে তাঁহাদের নাকি ‘হাত ময়লা’ হইত । তারপর কোন বাঙ্গালী গ্রন্থ যে ইংরাজী বা অন্য কোন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদিত হইতে পারে, এ ধারণাও তাঁহাদের কল্পনায় আসিত না । ‘বাঙ্গালী বই ইংরাজীতে তর্জমা’ একথা তাঁহারা আশাঢ়ে গল্প মনে করিতেন । বঙ্কিম বাবুর জীবিতকালেই তাঁহার ‘বিষবৃক্ষের’ ইংরাজী অনুবাদ বাহির হইয়াছিল । একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী তৎকালে ‘বিষবৃক্ষকে’ ‘Poison tree’ নামক ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহাতে তাঁহার বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে কতটা অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বুঝিবার শক্তি তৎকালে তাঁহার বা তত্তুল্য শিক্ষিত ব্যক্তির ছিল না । ‘বাঙ্গালী সাহিত্যের আদরের’ একস্থানে বঙ্কিম বাবু উচ্চ শিক্ষিত বাবুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ;—“কি জান, বাঙ্গালী-বাঙ্গালী ওসব ছোট লোকে পড়ে,

ওসব আমাদের মাঝখানে চলন নাই। ওসব কি আমাদের শোভা পায় ?” কি সাংঘাতিক কথা! বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালা পড়িতে ঘৃণা বোধ করে, একথা আজিকার দিনে কেহ বলিলে তাহাকে অবশ্যই ‘বয়কট’ হইতে হইত। কিন্তু এমন দিন ছিল,—বেশী নয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে—যে এসব কথা, এমন সব ব্যাপার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। কেহ কেহ আবার ভাষ্যার অজুরোধে এক আধ খানা বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিতেন।

১২৭৯ সালে “বঙ্গদর্শনের” সূচনায় বঙ্গিম বাবু তৎকালের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া আমাদের বক্তব্যে মন দিব। তিনি লিখিয়াছিলেন ;—“যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদের বিশেষ দুঃস্থ। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায় তাঁহাদের রচনা পাঠে বিরূপ। ইংরাজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক-মাত্রেরই হয় ত বিদ্যা-বুদ্ধিহীন, লিপিকৌশল-শূন্য, নয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়ামাত্র ; ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আশ্রাব-

মাননার প্রয়োজন কি ? সহজে কাল চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানাক্রমে সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব ?

ইংরেজী ভক্তদিগের মত এইরূপ। সংস্কৃত পাণ্ডিত্যাভিমানীদের “ভাষায়” যে প্রজ্ঞা, তদ্বিষয়ে লিপি বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বিষয়ী লোক তাঁহাদের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়া-ছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি কেবল নন্দ্যাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্যবিদ্যালয়ের পণ্ডিত, ও প্রাপ্তবয়ঃ পৌরকন্ডা এবং কোন কোন নিকর্যা রসিকতা ব্যবসায়ী পুরুষের কাছে আদর পায়। কদাচিত্ দুই একজন কৃতবিদ্য মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরেজীতে। সাধারণের কার্য, মিটিং, লেকচার, এসে, প্রোসিডিংস, সম্মেলন ইংরেজীতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরেজী জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরেজীতে হয়, বোল আনা, কখন বার আনা, ইংরেজী। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখন বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখনই দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরেজীর কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদের

এখনও অনেক তরঙ্গ আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মতাদি ইংরেজীতে পণ্ডিত হইবে।”

পুথের বিষয় (অবশ্য আশ্চর্যের বিষয় নয়)

এই পর্য্যায়ান্তর বৎসরে হাওয়া অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। যেখ কাটিয়া গিয়া নব সূর্যালোকে দিম্বগুল উদ্ভাসিত হইয়াছে। অল্প-কূল বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বহিঃসংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষার ছরবহা আর তেমন নাই। সাহিত্যতাপসগণের একনিষ্ঠ সাধনার ও কালের অপ্রতিহত প্রভাবে বঙ্গভাষা আজ আর দীন, দীন, উপেক্ষিতা নহে। বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থকার ও সাময়িক পত্র-প্রচারকগণ আজ বিশেষভাবে সম্মানিত ও ভাগ্যধর বলিয়া সর্বদা সমাদৃত। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এখন তাঁহাদিগের গ্রন্থ বা পত্রিকা পাঠে বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধতা প্রকাশ করেন না, বরং সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতি-গতির পরিবর্তন হইয়াছে। এখন তাঁহারা মাতৃভাষার আদর করিতে শিখিয়াছেন। একদিন যে ভাষার পঠন-পাঠন ‘নর্দ্যাল স্কুলের ছাত্র হইতে নিষ্কর্ষা রসিকতা ব্যবসায়ী’র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ সেই ভাষার অনুশীলন ও চর্চায় হাইকোর্টের জজ, বিলাৎ ফেরৎ ব্যারিষ্টার প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ নিযুক্ত ইহা দেখিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দে আগ্রস্ত হয়? গত বৎসর কলিকাতার প্রাদেশিক সমিতিতে বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বঙ্গভাষায় ‘অভিভাষণ’ পাঠ করিয়াছেন। প্রচুর প্রিয়তম রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, আচার্য

প্রিয়তম জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মনীষিগণ মাতৃভাষাতে দর্শন, বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন। ইঁহারা ইঁ এখন সাহিত্যসম্মিলন ও সাহিত্য পরিষদের সভাপতিত্ব করিতেছেন। ইঁহাদের মাতৃভাষায় লিখিত ‘অভিভাষণ’ আজ বাঙ্গালীর কলক কালিমা অপসারিত করিয়া এক নূতন পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছে। আজ সাহিত্যের রাজ্যে বড় আনন্দের দিন, যে, বিলাত ফেরৎ বাঙ্গালী মাতৃভাষায় গ্রন্থ-রচনা, পত্রিকা-প্রচার, বক্তৃতা-দানক্রমে দেশহিতে ব্যাপৃত। বহি পড়ার জার একদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রের উপর ছিল বহিয়া বহিঃসংস্কৃত বায়ু দূঃখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে স্নেহিতে পাইতেন, শুধু ছাত্রগণ নহে, অভিভাষণগণের মধ্যেও পাঠ-পিপাসা জাগ্রত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কৃতবিদ্যগণ বর্তমানে অম্বা ইংরেজী ব্যবহার একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র, অভিভাষণ, প্রবন্ধ পাঠ, প্রস্তাব উপাধন, সমর্থন, মন্তব্য প্রকাশ প্রভৃতি সমুদয় কার্যই বঙ্গভাষায় হইতেছে। তা’ ছাড়া এখন ইংরেজীতে ডবল এম, এ, ডিগ্রী-ধারী মহাশয়গণও অসঙ্কোচে বঙ্গভাষায় কথা কহেন, ইংরেজীওয়ালার কাছে নিঃসঙ্কোচে বাঙ্গালায় চিঠিপত্রাদি লিখিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের সন্তান বা ‘প্রোটজ’এর কিছু মাত্র হানি হয় বলিয়া ইঁহারা মনে করেন না। বরং মায়ের ছেলের মায়ের ভাষা ব্যবহারে গৌরব ও মহত্ত্বই প্রকাশ পায়।

অল্পকালের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষার যে অমূল্য সম্পদ-দান করিয়াছেন, তাহাতে ভাষা শক্তি-শালিনী এবং সাহিত্য সমৃদ্ধিবান হইয়াছে। বিশ্বের সাহিত্যসভার আমাদের বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ “এশিয়ার মহাকবি” আখ্যায় পূজিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্যজাতি তাঁহার “গীতাঞ্জলির” ইংরেজী অনুবাদ পাঠে সানন্দচিত্তে তাঁহাকে সমুচ্চ সম্মান দান করিয়াছেন। মূল বঙ্গভাষার লিখিত “গীতাঞ্জলী”র আশ্বাদ পাইবার আশায় অধুনা পাশ্চাত্য নরনারী বঙ্গভাষা শিক্ষার জন্য উৎসুক ও তৎপর হইয়া পড়িয়াছেন। এখন নাকি ওদেশে বঙ্গভাষা পঠন-পাঠনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন ভাষাতত্ত্ব মনীষী মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতবর্ষে বঙ্গভাষা প্রচলিত হইবে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আজ পুত-সলিলা-ত্রিবেণী। সংস্কৃত ও ইংরেজীর সন্মিলনে নব্য বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও পরিগতি হইবে। ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সম্পদরাশি বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে সংগৃহীত ও সন্নিবিষ্ট হইয়া আজ বঙ্গ-সাহিত্যকে পূর্ণাবয়ব দান করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, শ্রেণী পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা এখন অবশ্য পাঠ্য। মাতৃভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষাদান সম্বন্ধে চারিদিকে আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। আশা হয়, এ আন্দোলন, একদিন সার্থক হইবে এবং সে শুভদিন অদূরবর্তী।

বঙ্গের বাহিরে এক বৃহত্তর বঙ্গ সৃষ্ট

হইয়া তত্তৎ প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্তৃক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গীকরণ হইতেছে। তাহার প্রমাণ ভাগলপুর ও বাকীপুর সাহিত্য-সন্মিলনের অনুষ্ঠান এবং সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠা। বৃন্দের, মহীশূর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এলাহাবাদে বাঙ্গালী পরিচালিত “ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস” “পাবলিশিং কার্যালয়”, “হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার-সমিতি” প্রভৃতি বঙ্গের গরিমা বৃদ্ধি করিয়াছে। বঙ্গের বাহিরে বঙ্গভাষায় পুস্তকাদির মুদ্রণ ও প্রকাশ কার্য বাস্তবিকই এ যুগের বাঙ্গালীভাষার মহিমাজ্ঞাপক।

শুনিয়াছি, ভারতের বাহিরে—আমেরিকায় বঙ্গভাষা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালী সেখানে সন্মানে শিক্ষক-পদে বরিত হইয়া মাতৃভাষার প্রচার ও অধ্যাপনা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে, বঙ্গভাষার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা।

এখন দেশবাসী সাহিত্য সাধনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্গভাষায় পত্রাদি লেখা পর্য্যন্ত অপমানজনক মনে করিতেন, কালের কি বিচিত্র মাহাত্ম্য তাহারাই আজ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশক। কলেজের অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আদালতের উকীল, দাওয়াই-খানার ডাক্তার, বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রভৃতি সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এখন সাহিত্য চর্চার একটা বিপুল ধুম পড়িয়া গিয়াছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।



উপসংহার। সকাল ও একালের বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থার ইহাই মোটামুটি চুলনা। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহার বিচার-ভার সুধী পাঠকগণের উপর রহিল।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

## হরিনাম

(১)

“হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমো,

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ,

গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন ॥”

চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবান শ্রীহরির মধুর আস্থানে—তাঁহারই আদেশ ও অনুগ্রহে আজ এ অধ্যম এই পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে—সাধু-ভক্তগণ-সেবিত এই পরম পবিত্র হরিসভায় যোগদান করিতে পারিয়াছে, ইহা এ অকিঞ্চনের পক্ষে ব্যাপ্যরূপেই অসম্ভব ও সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহার অপার কৃপায় আজ আমরা বিষয়কার্যের বিষম জঞ্জাল দূরে রাখিয়া, এই পুণ্যদ হরিসভা-মন্দিরে সমবেত হইতে পারিয়াছি, কোনও কথা বলিবার পূর্বে সন্ধ্যা-সেই শ্রীভগবান শ্রীহরির রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। তারপর সমাগত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, সাধু-ভক্ত সকলের পদে জাতি-বর্ণনির্দেশে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও অভিষাদন করিতেছি; তাঁহাদের শুভাশীর্বাদে

এ পাপী-পাষণ্ডের কঠোর প্রাণে হরি-ভক্তির মধুর বস্তা প্রবাহিত হউক।

আজ আমি দু’টি হরি-কথা শুনিবার ও বলিবার নিমিত্ত এ হরিসভায় উপনীত হইয়াছি। ভক্ত ব্যতীত ভগবানের কথা “কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে” তেমন করিয়া কেহ বুঝাইতে পারে না; আমি বাগ্মীও নহি, ভক্তও নহি, সুতরাং আমার এ হরি-কথা ভক্তগণের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করিবে, তেমন বিশ্বাস করিবার দুরাশা বা স্পর্দ্ধা আমার নাই। মিছারি টুকরা যেমন করিয়া খাও মিষ্ট লাগিবেই,—অমৃত অম্বরের হস্তে পড়িলেও তাহার মৃতসজীবনী শক্তি অন্তর্হিত হয় না, হরিনাম যেমন করিয়া লওয়া যায় বা যাহার মুখে শুনা যায়, তাহাতেই পুণ্য আছে—একটা স্বাক্ষর আছে; এ দোনের ইহাই একমাত্র ভরসা। সমবেত সাধু-ভক্তমণ্ডলী অধর্মের এ অনধিকার চর্চা ক্ষমা করিবেন। অথবা এ ক্ষমা প্রার্থনারই বা প্রয়োজন কি? যেহেতু—

“ত্বয়া হৃদীকেশ হৃদিস্থিতেন

যথা নিযুক্তোহাস্ততথা কেরামি।”

স্বয়ং ভগবান হৃদীকেশই হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের সকল করাইতেছেন। সুতরাং কৰ্ম্মমাত্রেরই আমাদের দোষগুণ কিছুই থাকিতে পারে না; দোষগুণ যদি কিছু থাকে সকলই সেই-আদর্শ পুরুষ শ্রীভগবান শ্রীহরির।

কিন্তু কথা শুধু মুখে বলিলেই তো হইবে না,—হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস—অচলা ভক্তি থাকিবে যে, তিনিই সব—তাঁহারই সব।

মদে ভক্তি-বিশ্বাস থাকে চাই,—যে ভক্তি-  
বিশ্বাসের বলে আমরা বলিতে পারি,—কে  
আমি ? কি আছে মোর বিনা ভগবান ?

তঁহারি শক্তি পেরে,

তঁারি পুত নাম পেরে,

তঁারি রচা ফুল-ফল,

ভুলসী ও গজাঙ্গল,

তঁাহারি রাজুল পদে করিব প্রদান ।

ভাল-মন্দ তঁারি সব, সকলি সমান ॥

কুহু আমি, দুর্বলহৃদয় আমি, পাতকী-  
পাবণ আমি, অবিবাসী আমি ; আমার সেরূপ  
দৃঢ় বিশ্বাস—অচলা ভক্তি কোথায় ?—তঁাহার  
পদে কর্তৃকল প্রদান করিয়া প্রাণে শান্তি  
পাইবার মত শক্তি-সাধনাই বা আমার  
কোথায় ? হায় ! কবে আমি প্রেম-ভক্তিমাথা  
মধুরম্বরে প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারিব,—

যাহার প্রসাদলব্ধ এ শরীর-মন,

করিহু তঁাহার পদে আত্মসমর্পণ ।

কবে আমি ভক্তিভরে গাইতে পারিব,—

“আমি জানি মম তুমি মাত্র সার ;

সকলি অসার যাহা কিছু আর ;

তোমারি পূজন, তোমারি ভজন

করি যেন আমি মরি হে ।”

(বিজয়-গীতিকা)

সে শুভদিন কি হইবে ?—তাহা কি  
পারিব ? এ অভাগার—এ পতিতের প্রতি কি  
পতিতপাবন শ্রীহরির সে দয়া হইবে ?

কুহু আমি—অণু আমি নাহিক মণল,

তঁাহারি করুণা মম ভরসা কেবল ।

আমার অন্তকার আলোচ্য বিষয় “হরি-

নাম” । কবি বলিয়াছেন,—

“কোটি কোটি ত্রুটি বীর উদ্দেশে ধেরায় ।

পঞ্চমুখে সদাশিব বীর গুণ পারি ॥

চারি বেদ বাহার ভণের অঙ্গ নাহি পারি ।

লক্ষী-সরস্বতী বাহার চরণ ধেরায় ॥

নারদ প্রহ্লাদ শুকদেব মহেশ্বর ।

বীর গুণ পার সদা আনন্দ হৃদয় ।” (অজাত)

এ অর্থ যে সে নাম কীর্তন—সে পুণ্য-

পবিত্রতাপূর্ণ হরিনামের আলোচনা করিতে  
সমর্থ হইবে ?

নারদাদি মুনিঋষিগণ আত্মীবন যে অমির  
মধুর নাম কীর্তন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন  
নাই, শুক, শনক ও কপিলাদি মহাপুরুষেরা  
যে নাম-সুধারস পানে আত্মহার্য্য হইয়াছিলেন,  
এ বিখের কত শত ভক্ত সাধক, সাধু-মহাজন  
যে নামে পবিত্র অঙ্গগল্য প্রবাহিত করিয়া  
শিরাছেন, কুহাদপি কুহু আমি,—আমার  
পক্ষে সে নাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে প্রয়াস  
পাওয়া পক্ষুর গিরিজাবার স্পৃহার ত্রায়  
অতীব দুষ্টতা মাত্র । কিন্তু মূঢ় মন বুঝে না,  
তাই তঁাহার নামের পসরা মাথায় বহিয়া সমা-  
গত সাধু-ভক্ত-মহাজনদিগের পবিত্র পদ-প্রান্তে  
দাঁড়াইতে সাহসী হইলাম । একমাত্র তরসা  
তঁাহার অপার করুণা । প্রার্থনা, তঁাহার  
ইচ্ছারই জর-হটক । আপনারা সকলে তঁাহার  
পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তঁাহার জয়গান করুন ।  
“নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাঙ্গগহিতায় চ  
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় শোভিন্দায় নমো নমঃ ॥”  
বলিয়া আমিও তঁাহার পদারবিন্দে প্রণাম  
করিতেছি । সকলেই ভক্তিতে লসম্বরে বলুন—

“তোমার হাতের গড়া এই স্বেচ্ছায়,  
স্বপ্নিগাম্য সব করে—জয় প্রেমের।” (আরতি)।  
অনলে সগিলে, কঠিনে কোমলে,  
সমলে বিমলে সকলেই ফুলি।  
অন্তরে বাহিরে, তুমি চারি ধারে,  
তাই ভক্তিতরে, ডাকি তোমা আমি।”

(বিজয়-গীতিকা)।

‘তোমাকে ভক্তিতরে ডাকি’ এরূপ বলিবার  
অস্বাভাবিকও তেজু আমার নাই! ‘ভক্তিতে  
ভগবান তুষ্ট’ একথা জানি। কিন্তু আমার যে  
ভাবাপ্ত নাই,—আমি যে সে ধনের বড়  
কাজি। আমার কি আছে?—কি দিয়া  
তোমার অর্জনা করিব? এ দোনের যে কিছুই  
নাই! করুণায়! তোমার অহেতুকী অপার  
করুণাই অধোনের একমাত্র ভরসা। জয়  
জগদীশ্বর! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(২)

‘হরিবোল! হরিবোল!’ মাঠে গোরা বাহ তুলি,  
খুলার সোণার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি;  
কি মধুর ব্রজলীলা করিতেছে অভিনয়,  
প্রেমের ভিখারী প্রেম অজস্র বিতরি।  
‘হরিবোল! হরিবোল!’—গাইতেছে নরনারী,  
‘হরিবোল! হরিবোল!’—গায় ভাগীরথী;  
‘হরিবোল! হরিবোল!’—গাইতেছে শতপাকী,  
‘হরিবোল! হরিবোল! গায় জলপতি॥’  
(কুরুক্ষেত্র)।

একদিন মল্লারায় এমনি মধুর হরিনামের  
ভাষা প্রবাহিত হইয়াছিল—প্রেমের বড় বহিরা-  
ছিল। সে সুপবিত্র নাম-প্রাবনে নদে হাবুড়  
হাইয়াছিল—হরিনামের সে মধুর স্বনিতে

বনমাণীর বনৌরব জন্মে কখনা আবার উল্লাস  
বহিয়াছিল! তখন বিষ্ণু ভরি উঠেছিল কি  
মধুর সোল—তথু হরিবোল! হরিবোল!  
সে অমৃত নিখারিণীর অসির মধুর শীতল প্রবাহে  
এ বিষ্ণু জুড়াইয়াছিল—খুশ হইয়াছিল; কত  
পাতকী-পাষাণ—কত জগা-মাথা তরুিয়াছিল!  
তারতের সে স্বর্গসুগ আর এখন নাই। এখন  
আর বন্ধের প্রতি গৃহে—গোষ্ঠে, মাঠে, মাঠে  
তেমন প্রেম-ভক্তিমাধা প্রাপ্পর্শী মধুর  
হরিধ্বনি শুনা যায় না, এখন আর ‘হরি’  
বলিতে কেহ তেমন করিয়া খুলার খড়াগড়ি  
দেয় না—মামরসে তাবারেশে তেমন করিয়া  
আর ভক্ত কুহা যায় না! হায়! কবে আবার  
তারতের সে শুভদিন ফিরিয়া আসিবে?—  
কবে আবার ‘হরি’ বলিতে ভক্তের নরনরল  
করিবে?—আবার কবে বন্ধের গৃহস্থ ডাকিয়া  
বলিবে, “যাঁদের ‘হরি’ বলিতে নরনর করে, তারা  
এসেছেরে তাই, তারা এসেছে!”

আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায় মধ্যে এক  
শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা হরিনামের নামে  
নাসিকা কুণ্ঠিত করেন, হরিনামীত প্রবণে  
নিজা-মুখের বাঘাত হইল বলিয়া হৃৎ প্রকাশ  
করেন, তাঁহারা মনে করেন, হরিনাম অশিক্ষিত  
বা অর্ধ শিক্ষিত অলস লোকের বিশ্রাম-  
ভবন, ভক্তের প্রাণখোলা হরিনামীত  
অশিক্ষিতের বিকট সঙ্গীত-আলাপন! আর  
ভাবে ভোলা ভক্তের ভাবনুভা, অসত্যের  
তাণ্ডব মর্দন! তাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের  
সংখ্যাধিক্য হরিনামের অন্তরে বড় একটা ষড়ি  
উঠে না! কলভ: হরিনাম বহি অশিক্ষিত—

অমৃত্যোর তাত্ত্ববৃত্ত্যোর আশার এবং হরিসঙ্গীত যদি ভাব-ভক্তিবিশীল অপ্রীতিকর কঠোর চীৎকারমাত্রই হয়, হরিসঙ্গীত হইতে যদি জগতের কোনরূপ কল্যাণই সংসাধিত না হয়, তবে তেমন হরিসঙ্গীত শিক্ষিত-অশিক্ষিত কাহারও যোগদান করা কর্তব্য নহে। বস্তুতঃ হরিসঙ্গীত তাহা নহে। হরিসঙ্গীত প্রেমভক্তির অনন্ত অমৃত নিখরিনিী—হরিসঙ্গীত স্বর্গীয় পীযুষ-কুন্ড; হরিসঙ্গীত সে অমৃত কুন্ডের দেববাহিত মৃতসঙ্গীতবী সুখ-প্রবাহ। এ অমৃত পানে পাপ-তাপ দূরে যার—বিশ্বপ্রাণীর প্রাণ জুড়ায়, মাটির মানুষ সোণার মানুষ হইয়া যায়। এই হরিনাম—‘হরিবোল! হরিবোল!’ মধুরধ্বনি শুনিয়াই একদিন নদীয়ার সোনার ঠাকুর জীগোরাক্ষদেব প্রেমভরে বলিয়াছিলেন—

“এই যে আমি মরেছিলাম।

হরিনাম শুনে প্রাণ পেলাম॥”

হরিনামে মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে, পাষণ-কঠিন পাষাণের প্রাণে ভগবন্তক্তির মধুর বহ্না প্রবাহিত হয়। সংসারাসক্ত—বিশ্বায়ত্তরক্ত জীব আমরা,—আমরা মরিয়াই আছি। জানি না কবে জীভগবানের দয়া হইবে, কবে আমরা হরিনামামৃত পানে আবার বাঁচিয়া উঠিব। এস, ভাই! পাপী-তাপী তোমরা সব ছুটিয়া এস, এস, আমরা সকলে মিলিয়া ঐ মহা-ভীর্ষের যাত্রী হই; এস, আমরা সকলে মিলিয়া পবিত্র হরিসঙ্গীত যোগদান করি,—‘হরিবোল! হরিবোল!’ বলিয়া যামব জয় সার্থক করি।

তু গাতুর উত্তর ই প্রত্যর করিয়া ‘হরি’ পর সিদ্ধ হইয়াছে। তু গাতুর অর্থ হরণ বা

সংহার। সংহার অর্থে প্রত্যাহরণ বা প্রত্যাহরণ; নিঃসারণের বিপরীত। ফিরাই ফিরাই। মৃতরাং যিনি প্রভা, তিনিই সংহারকর্তা। জীভগবান ত্রাণা, বিষ্ণু, শিব এই তিনজনকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্য সম্পাদন করেন, সুতরাং হরিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা; যিনি এই ত্রিশক্তিসম্পন্ন তিনিই হরি—তিনিই ভগবান, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ। তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত যে সঙ্গীত তাহাই হরিসঙ্গীত। ইহা আমার স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে, ইহা শাস্ত্রোক্তি। যথা—  
“ক্লমরূপেণ সংহর্তা বিখ্যাত্যমপি দিত্যশঃ।  
ভক্তানাং পালকো যোহি হরিতেন প্রকীর্তিতঃ।

আবার তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এমন লোকও অনেক আছেন, বাঁহাতা হরি পূজেন, হরি ভজেন; কিন্তু কৃষ্ণ মামেন না, কৃষ্ণ পূজেন না, কৃষ্ণ ভজেন না! অধিকন্তু কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলেই বিবেকে নাস্তাক্ষণ করেন; যেন দ্বিতীয় কেশ বা দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপু!

যখন হয় ধর্মের মানি অধর্ম-প্রভাব বাড়িয়া যায়, তখন বিশ্বপতি অবতাররূপে আসেন এ পৃথিবীতে নানি স্রুতে রক্ষিতেনর-বৃহৎ জনম তাঁর, জগতের হিতে প্রেমশিক্ষা দিতে যুগে যুগে অবতার।

যখন ধর্মের মানি ও অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন সাধুগণের পরিভ্রমণ এবং পাপাচারগণের নিবন করিয়া ধর্ম সংস্থাপনার আশ্রিত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। ইহা স্রুতে ভগবানের উক্তি। যথা:—

“যদ্যি যদাহি ধর্মস্তা রানির্ভবতি ভারত।

অজ্ঞানান মধর্মস্তা তদান্মানং হৃদ্যাবহম্ ॥

পরিজ্ঞাপার সাধুনাং বিনাশার চ দুষ্কৃতাম্,

ধর্ম সংস্থাপনার্থার সন্তবামি যুগে যুগে ॥” (গীতা)

শুভরাং ভগবানের কথা—লোক-শিক্ষার্থ

তাহার মানবরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার

কথা, অনিচ্ছাস করিব কেমন করিয়া ? ভগবান

গরদেহ ধারণ করিয়া এমন সব ক্রীড়া করেন,

যাহা শ্রমণে মানুষ ভগবৎ-প্রেমের বিভোর

হইয়া থাকে, যে কার্যো—যে লীলা দর্শনে

লোক সকলের মানবোচিত কর্তব্যবুদ্ধির

বিকাশ হয়, যে উচ্চ আদর্শ অবলম্বনে, মানুষ

দেখতা হইয়া যায়।

“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাপ্রিতঃ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রম্ভা

তৎ পরোত্তমং ॥”

আবার,—

“মম বস্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পাত্ৰ সর্কশঃ।”

(গীতা)

এই আদর্শ স্থাপনই শ্রীভগবানের মানব-

রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার প্রধানতম

কর্মণী। দৃষ্টান্তে বাহা হয়, উপদেশে তাহা

হয় না; এই দৃষ্টান্ত-বা আদর্শ প্রদর্শনই

ভগবানের মনুষ্যদেহ ধারণের একমাত্র নিদান।

তাহার ইচ্ছায়, তাহার অভিপ্রায়মাত্রই দুষ্কৃতের

বিনাশ সংসাবিত হইতে পারে; কিন্তু লোক-

শিক্ষার্থ আদর্শ মহাপুরুষের প্রয়োজন, তাঁই

ভিনি বরং এই আদর্শ মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ

হইয়া থাকেন। যুগাবতারের ইহাই নিদান।

শুভরাং ভগবানকে মানিলে তাহার

অবতারকে মানিতে হয়, পূজিতে হয়, বিশ্বাস

“যুগে যুগে বর্ণভেদো নামভেদোহস্ত বল্লভ।

তন্মোরক্ত তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

কৃষ্ণবর্ণঃ সত্যযুগে স্মৃতিত্রতেজগাবৃতঃ।

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহয়ং পীতহয়ং দ্বাপরে বিভূঃ ॥

কৃষ্ণবর্ণঃ কলৌ শ্রীমাং শ্বেজসাং রাশিরে বচ।

পরিপূর্ণতম ব্রহ্মা তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥”

রাম-কৃষ্ণাদি যুগাবতার। যুগে যুগে

ভগবান এই অবতারত্ব পরিগ্রহ করেন। ইহারা

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, ইহা অবিশ্বাস করিবার হেতু

কি ? ভগবান মানিলে—হরি পূজিলে তাহার

অবতার রাম-কৃষ্ণকই বা না মানিব—না

পূজিব কেন ? যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনন্ত

ধর্ম, সর্বভেদের স্বাবায়, সর্বমুক্তির সমাবেশ,

সকলের আশ্রয় ও সকলের আদি নররূপী

নারায়ণ, তিনিই কৃষ্ণ। যথা :—

“ব্রাহ্মণোবাচকঃ কোহয়ম্কারো নেমুবাচকঃ।

শিবস্ত বাচকঃ যশ্চ ন কারো ধর্ম এবচ ॥

মরনারায়ণোহর্থস্ত বিসর্গোবাচকঃ স্মৃতঃ ॥

সর্কেশাং তেজসাং রাশিঃ সর্কমুত্তিস্বরূপকঃ।

সর্কীধারঃ সর্কজাতন্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥

রাম ও কৃষ্ণ নামের অপার মহিমা—

অনন্ত শক্তি। এই রাম নাম কীর্তন করিয়াই

দম্ব্য রক্তাকর বাজ্যকি যুনি হইয়াছিলেন।

রাম নামে ভালে লীলা, তরে পাণ্ডী, পাণ্ডাণ

উদ্ধার হয়। তাই,—

যুযুর্কীর্ণ কর্ণ করে উদ্ধারণ,

লেখে কঠে বন্ধে ভালে হরেকুরাম।

রাম নামের এমনি গুণ—কৃষ্ণ নামের

এমনি অনন্ত প্রভাব যে, উহা শ্রবণে ও কীৰ্ত্তনে এমন পাতকী নাই যাহার মুক্তিলাভ না হয়। 'একবার রাম নামে যত পাপ করে, জীবের সাধা নাই তত পাপ করে।' নামের মাহাত্ম্য এমনি অপরিণীত। ইহাই ভক্ত কবির প্রাণ-কথা।—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥

ইহাই কবির ভারকল্পক নাম। কবির জীব একমাত্র এই নাম কীৰ্ত্তন করিয়াই মুক্তি লাভ করিতে পারে। নামের বল বড় বল, নামের শক্তি বড় শক্তি। কলিতে ভগবানের নাম-কীৰ্ত্তনের জ্ঞান এমন মহা যজ্ঞ আর নাই। হরি! কবে বজের ঘরে ঘরে এ মহা যজ্ঞের বজ্রা প্রবাহিত হইবে?

এখানে একটা গল্প মনে পড়িল। এক সিদ্ধ পুরুষের এক ভক্ত শিষ্য ছিল। এক দিন শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসিল,—'প্রভু! কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য কি?' গুরু বলিলেন,—'ঐ পূরীষ-গর্ভস্থ কৃষ্ণ-কীটকে জিজ্ঞাসা কর, সেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দান করিবে।' শিষ্য তাহাই করিল। কিন্তু যত্নে কৃষ্ণ-কীট কোথায় অন্বেষিত হইল, সে আর উহা খুঁজিয়া পাইল না। শিষ্য পুনরায় গুরুকে বলিল,—'ঠিক প্রভু কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য ত কিছুই বুঝিলাম না?' এবার গুরু বলিলেন,—'ঐ যে সত্ত্ব-প্রমত্ত কুহুর-শাবক দেখিতেছ, উহাকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ কুহুর-শাবক তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবে।' শিষ্য তাহাই করিল। কিন্তু 'কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য কি' একথা উচ্চারণ মাত্রই, সেই

কুহুর-শাবক জীবলীলা শেষ করিল। শিষ্য বড় বিবশ হইয়া গুরুকে বলিল,—'হিং! প্রভু! যে নাম শুধাইলে প্রাণের প্রাণ সংহার হয়, আমি এমন প্রাণিসংহারক কৃষ্ণনাম করিতে চাহি না।' গুরু বলিলেন,—'যাও বৎস! ঐ নবজাত চণ্ডাল-শিশুকে একবার তোমার প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা কর।' শিষ্য এবারও গেল, আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিল,—'বল চণ্ডাল-পুত্র! কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য কি?' হরি! হরি! হরি! এবারও তাহাই হইল! চক্ষুর নিমিষে চণ্ডাল-পুত্র মানবলীলা সংবরণ করিল। শিষ্য বড় ক্ষুব্ধ হইল; গুরুপদে যন্তক রাখিয়া বলিল,—'বল, দেব! কৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য কি?' এবার গুরুদেব বলিলেন,—'যাও বৎস! ঐ নবজাত ব্রাহ্মণ-নৃপতিনন্দনের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, সেই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে সমর্থ হইবে।' এবার আর শিষ্য গুরুকে ছাড়িল না। গুরুভক্ত শিষ্য গুরুসহ রাজবাটিতে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসিল,—'বল, রাজপুত্র! কৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য কি?' শিশু রাজপুত্র উত্তর করিল,—'হে কৃষ্ণ-ভক্ত মহাপুরুষ! তুমি আমার গুরু, তোমাকে নমস্কার। শ্রবণ করিয়া দেখ, সেই কৃষ্ণ-কীট, কুহুর-শাবক ও চণ্ডাল-পুত্র প্রকৃতির কৃষ্ণনাম শ্রবণে পাপজীবন পরিত্যাগের কথা। আমিই সেই কৃষ্ণ-কীট। প্রতি ক্ষণে তোমার নিকট কৃষ্ণ নাম শ্রবণে আমার এরূপ উর্দ্ধগতি লাভ হইয়াছে—এবার আমি ব্রাহ্মণ-রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে জন ক্ষণে ক্ষণে এরূপ কৃষ্ণনাম শ্রবণ বা কীৰ্ত্তন করে, সে পরিণামে

শরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করে । বুঝিলেন  
এখন কৃষ্ণ-নামের বাহাদুর্য্য কি ? মুহূর্ত্ত মধ্যে  
এক দিব্য রথ আসিয়া উপস্থিত হইল । সেই  
রথে গুরু, শিষ্য ও রাজপুত্র একত্র একই আসনে  
উপবিষ্ট হইয়া অর্গভাবে গমন করিলেন । কৃষ্ণ-  
নামের এমনি গুণ !—এমনি অনির্বচনীয়  
বাহাদুর্য্য !

গল্পটা একটু ক্রীপক-রাগ-রঞ্জিত হওয়া  
অসম্ভব নহে । জানহীন মনুষ্য পশুত্বা ।  
অপবিত্রকর জানই জ্ঞান ; বিষয়বুদ্ধি বা  
সাংসারিক লাভ-কতি গণনার নাম জ্ঞান নহে,  
উহা জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার উপায়  
বাক্য । সংসারের জীব জীভগবানের নামরূপ  
অমৃত-সাগরে স্নাত ও পবিত্রীকৃত হইলে,  
তাঁহার পশুত্ব দূর হইয়া ক্রমোন্নতি প্রভাবে  
প্রাণে ব্রহ্মত্বের উদয় হইয়া ব্রাহ্মণ্য লাভে  
মনের কুর্ভা দূর, শাস্তির রাজত্ব ও বৈকুণ্ঠগাত  
হইয়া থাকে ।

বিষয়াসক্ত মানব আমরা ; আমরাও ঐ  
কুনি-কীটের দ্বার নিয়ত বিষয়রূপ প্রবীণগর্ভে  
আকর্ষিত হইয়াছি । আমরাও ঐ কারুক  
কুহুরের দ্বারই হীন লালসার বশবর্তী হইয়া  
আজীবন ঘুরিতেছি ! ক্রোধ-চণ্ডাল ত  
আমাদের কঁকে চাপিয়াই আছে ; আমরা  
জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র বার্ধের বাঘাত  
ক্রোধানলে জলিয়া পুড়িয়া ঘুরিতেছি ।  
আজীবন পানীর সহবাসে আমরাও চণ্ডাল  
এক হইয়াছি । কৃষ্ণ-নামের পবিত্র বলরাম  
কর্ণে আমাদের বিষয়াসক্তি ছিন্ন, পশুত্ব  
দূরীকৃত ও চণ্ডাল বোঁটন হইয়া আমাদের

হৃদয় বিত্ত সাধিক ভাবে পূর্ণ হইবে ; তখন  
আমরা শাস্তির রাজত্ব ও বৈকুণ্ঠ লাভে কৃতার্থ  
হইবে ; আমাদের মনুষ্য-জন্ম সাধক হইবে ।  
কৃষ্ণ-ভক্ত কবি বলিয়াছিলেন,—

“তনু শুন ওহে নর বল হরি হরি ।

কৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দন কেশব হুরারী ॥

গোবিন্দ মাধব রায় জয় হরীকেশ ।

যে নাম শুনিলে নাহি থাকে পাপ লেশ ॥

কৃষ্ণ পাদপদ্ম বিন্দু সকলি অসার ।

কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাই ত্রিভুবনের সার ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ভাই ভরিয়া বদন ।

হৃদয় ভরিয়া ভক্ত কৃষ্ণের চরণ ॥

নামেতে কুরিবে ভবে নাহিক সংশয় ।

কুপার সঙ্গার বড় কৃষ্ণ দয়াময় ॥

(ক্রমশঃ)

ঐবরদাকান্ত কবিরায় ।

## দেবতত্ত্ব ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দেবতাগণ অনেকেই আপনাদের লোক  
অপেক্ষা নিম্নতর লোকে প্রকাশ হইতে পারেন ।  
নিম্নতর লোকের মূলীভূত পদার্থ তাহাদের  
দেহে লাগাইয়া উক্ত লোকের অধিবাসীদের  
দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন । ভুলোকে আশ্রিত  
হইলে ভুলোকের কঠিন পদার্থের আবরণে  
তাহাদের শাস্ত্র আবৃত করিয়া তাহারা প্রকাশ  
হইয়া থাকেন । তাহাদের দেহ তেজঃ-তত্ত্ব-  
প্রধান বলিয়া তাহারা এক সময়ে নানা স্থানে  
প্রকাশ হইতে পারেন । ইহাদের দেহ স্মার-  
কিক বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ দেওয়া যায় । যে

দেবতার যে মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করা হেতু সাধকের দেহেরও চতুঃপার্শ্বের বায়ুমণ্ডলে একপ্রকার স্পন্দন হইতে থাকে, সেই স্পন্দন সেই দেবতা যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানের স্পন্দনের অনুরূপ। এইরূপে সম অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া হেতু ইচ্ছাশক্তির বলে সেই দেবতার আকর্ষণ হইয়া থাকে, ইহাতে সেই দেবতার সাধক সমীপে আবির্ভাব হইবার খুব সম্ভাবনা হয়। এই অবস্থার সাধকের দ্বারা সেই দেবতার লোক পর্বত টেলিগ্রাফের তারের মত একটা সূত্র রেখা দ্বারা ( কেবল সূত্র এক এক অনু দ্বারা সাক্ষাৎ দীর্ঘ রেখার মত ) একটা সংযোগ হয়, এতদ্বারা দেবতার মনোভাব ( আশীর্বাদ আদি ) ও সাধকের মনোভাব ( প্রার্থনা ) আদ্য প্রদান হইয়া থাকে। এই উপায়ে সাধকের মনোভাব ও মনোবেদনা সেই পুর-লোকবর্তী দেবতার গোচর হয়, দেবতাও সাধককে ও সাধকের পার্শ্ববর্তী স্থানে অসুস্থ স্পন্দনে স্পন্দিত দেখিয়া নিজ শক্তি বিকাশের সুযোগ পাইয়া থাকেন। এই অসুস্থ ও বিপরীত স্পন্দন আদি কি উপায়ে কিরূপে পরিবর্তন করা যাইতে পারে, তাহা আমাদের শাস্ত্রকার-গণ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেন ও তাহারা গাংকুর প্রত্যেক করিয়া তদনুসারে নানা প্রকার মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

তন্ত্রের বীজ মন্ত্রাদির মত এইরূপে আমা-  
দের সহায়তা করিয়া থাকে, ইহা বিচক্ষণ  
বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি, মূর্খের কল্পনা নহে। বেদের  
মন্ত্রাদির উদাত্ত, অসুস্থ ও বরিষ এই তিন  
প্রকার ধর্মের সাহায্যে যথাক্রমে উচ্চারণ

করিতে আমাদের পক্ষে নানা কারণে অসম্ভব  
হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্রাদি  
আমাদের দেশ কালোচিত সুলভ ব্যবহা-  
সম্ভব নাই। মন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা  
করিবার স্থান ইহা নহে, অন্য সময়ে এ বিষয়ে  
লিখিবার সঙ্কল্প রহিল।

দেবতার। যারাবী—নানা প্রকার মূর্তি  
ইচ্ছামত ধারণ করিতে পারেন, একেবারে বাহ্য  
মূর্তি ধরিতে পারেন। তবে তাহাদের শাস্ত্রে  
মিগ্রহবস্ত্র বলা হইয়াছে, ইহার অর্থে ইহাদের  
একটি করিয়া বিশেষ রূপ আছে, ইহাই সেই  
দেবতার মূর্তি ও ঘোর এবং আরাধ্য। এই-  
রূপেই তিনি নিজ আবাসস্থানে আছেন।

ভুলোকে নানা স্থানে মন্দির আদি মধ্যে  
নানা প্রকার দেব মূর্তি গঠিত থাকি দেখা যায়।  
এই মূর্তি সকল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, দেবগণ  
যে রূপ মূর্তি ধরিয়া সাধকদের দেখা দিতেন,  
মুন্দরী ও খেচ্ছার ভূলোক, বর্গলোক প্রভৃতি  
স্থানে গমনশীল ঋষিগণ দেবতাদের আবাসস্থানে  
তাহাদের মূর্তিমান অবস্থার বিচরণ করিতে  
দেখিয়া তাহাদের মূর্তির বর্ণনা করিয়াছেন।  
দেবতাদের দর্শন করিতে হইলে তাহাদের মন্ত্র  
জপ, ধ্যান আদি করিতে হয়, এইরূপে তাহার  
সদয় হইয়া সাধককে দর্শন দেন, অথবা সাধক  
নিজ চৈতন্য শক্তিকে দেবতার অনুরূপ অবস্থার  
পরিণত করিয়া দেবতার দর্শন পাইবার যোগ্য  
শক্তিশালী হইয়া উঠেন। সাধন ব্যতীত অন্য  
উপায়েও দেবতা দর্শন করা যায়। আমাদের  
ভুলোকের পদার্থস্থল হইতে ক্রমে মূর্তি ও  
মন্ত্রের অবস্থার রহিয়াছে—এ বিষয় আমাদের



জান আছে। সর্বাঙ্গের কঠিন পদার্থ হুল, ভরল পদার্থ তাহা অপেক্ষা হুল, বাষ্পীয় অবস্থার পদার্থ আরও হুল, আমাদের দৃষ্টি শক্তি বলে কঠিন, ভরল এবং বাষ্পীয় অবস্থার কতক পদার্থ পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই, অতি হুল প্যাস আমরা দেখিতে পাই না, গ্যাসকে আরও হুল করিলে যে অবস্থা হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই না, তাহার পর আর এক অবস্থা আছে তাহাও আমরা দেখিতে পাই না—এই হই অবস্থার পদার্থকে ইংরাজীতে ইথিরিক ও সুপার ইথিরিক বলে, শায়ে ইং মরু ও ব্যোম-তত্ত্ব-বিত্ত অবস্থা। সুতরাং আমরা ভুলোকের জিনিষের অনেক দেখিতে পাই না। এই সকল দেখিতে হইলে আমাদের দৃষ্টি শক্তিকে বাড়াইতে হইবে, তাহার পরে আরও অধিক বাড়াইলে আমরা ভুলোকের সমস্ত বস্তু দেখিতে পাইব।

দৃষ্টিশক্তি আরও বাড়াইলে আমরা বর্গ-লোকের বস্তু দেখিতে পাইতে পারি। এই অবস্থার দেবতা দেখিবার জন্য আমাদের সাধনার আবশ্যকতা হয় না, আমরা ইচ্ছামত দেবতাদের দর্শন করিতে পারিব। এইরূপে দৃষ্টিশক্তি বাড়ান যাইতে পারে। পরাবিছা বা তত্ত্ববিজ্ঞান সমিতির অনেক সভ্যগণ এইরূপে দৃষ্টি-শক্তি বৃদ্ধি করিবার অনেক পুস্তক-তত্ত্ব লোক-সমাজে প্রচার করিতেছেন; দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা করিবার উপযোগী গ্রন্থাদিও উক্ত সমিতি প্রচার করিয়াছেন।

এই তত্ত্ব-বিজ্ঞান সমিতির প্রধান কার্যস্থান বাঙ্গালার সহরের নিকট আদিয়ার নামক

গ্রামে। তত্ত্ববিজ্ঞান সমিতির সভাপতি শ্রীমতী আনি বেণ্ডো থাকেন, কতকগুলি উন্নত ব্যক্তি এখানে মধ্যে মধ্যে থাকেন। জীবন্ত শ্রীমদ-এখানে অনেক সময়ে আসিয়া থাকেন। সাধকদের মধ্যে এক জন শ্রীযুক্ত লেড-বিটার সাহেব অনেক সময় এই স্থানে থাকেন। ইনি একজন দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন সাধক। হুলদেহে নানা স্থানে ও গ্রহলোকে যাত্রাভ্রমের ক্রমতা ইহার আছে। ইহার হুল দর্শন বিচিত্র ব্যাপারের অনেকগুলি পুস্তক আছে তাহা ঐ স্থানে কিনিতে পাওয়া যায়।

ঋষিদেব আদেশে জনৈক দেবতা আদি-য়াতে তত্ত্ববিজ্ঞান সমিতিতে এক সময় আসিয়া-ছিলেন। আধ্যাত্মিকতার পর নতুন মন্ত্র অধীনে আবার যে জাতি, জগতে হইবে সেই জাতি গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই জাতীর আবাসস্থান শান্তোক্ত সপ্তদ্বীপের মধ্যে যে দ্বীপ হইবে সেই দ্বীপ-স্থতির সূচনা হইতেছে এই বিষয় উক্ত লেড-বিটারকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, সাহেব তাহার প্রণীত ইনার লাইফ নামক গ্রন্থে এই বিষয় লিখিয়া-ছেন। এই দেবতা সাধন-মার্গে বিশেষ উচ্চ-শ্রেণীর ছিলেন না। আমাদের মানবদের পরম-হংস অবস্থা তাহার অবস্থা। তাহার শরীর জ্যোতির্ময়, ও বাপ দ্বারা গঠিত বলিয়া মনে হয়। এই বাপ নানা প্রকার বর্ণের। মানবদেহ যেমন অস্থি-মাংস রক্ত-হুল-রস, তাহার চতুর্দিকে জিহ্বাকার-বাণ-স্বাভাবিক হুল লিঙ্গদেহ, তৎপরে উক্তরূপ আরও উচ্চ হুলদেহ এবং ক্রম-অপেক্ষা বড় ও হুল-বাণ-

জড়িত কারণ-দেহ স্তম্ভদৃষ্টি সাহায্যে মানবদেহ এইরূপ দেবায়, এবং মানবদেহের কারণ-দেহ সাধনের উন্নতির সহিত বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে, এমন কি উচ্চ অবস্থায় সাধকের কারণ-দেহ এক মাইল ব্যাপিয়া থাকে। মানব-দেহের বলবৃদ্ধি কিন্তু মধ্যস্থিত সেই অস্থি-মাংস-পট্টিত সেই ক্ষুদ্র অংশটিতেই ক্রিয়াশীল থাকে। দেবতা-দেহ মানব-দেহ হইতে ভিন্ন প্রকারের, ইহাদের ক্রিয়াশীলতা আংশীয় দেহের প্রাপ্ত-ভাগেই থাকে, মধ্য স্থলে ইহাদের তত ক্রিয়া-শীলতা থাকে না। ইহাদের কারণ-দেহ মানব-দেহের কারণ-দেহ অপেক্ষা বড়। এই দেহ আবার মনের ভাবের দ্বারা কমবেশী হইয়া থাকে। দেবতাটির কারণ-দেহ এক মাইল ব্যাপী ছিল, কিন্তু উক্ত সংবাদ দিবার সময় তিনি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে তাহার মানসিক উত্তেজনা এত বেশী হইল যে তাহার শরীরের বর্ণাদির দীপ্তি আরও বেশী হইতে লাগিল ও তাহার কারণ-দেহ প্রায় পঞ্চাশ মাইলব্যাপী হইয়া পড়িল।

দেবজাতি সৃষ্টির ক্রমোন্নতির সর্বোচ্চস্থানে অবস্থিত। স্বাবর, উদ্ভিদ, জন্তু, মানব ও শেষ দেব-জাতি বলা যায়। এইরূপে দেখিতে গেলে আমরা দেবত্বকে দুইভাগে বিভাগ করিতে পারি। আজন্মদেব অর্থাৎ যে দেবতারা কখনও মানব-জন্ম গ্রহণ করেন নাই। মানবগণ পশু-জন্ম পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়া শেষে মানব-জন্ম লাভ করে। - কিন্তু অধিকাংশ দেবতাগণ এ নিয়মে দেবত্ব জন্মলাভের পূর্বে মানব-জন্ম লইয়া মানব থাকেন না। দেব-

জাতি মানবজাতি হইতে উন্নতি পথে উন্নত হইবে ইহা সৃষ্টির নিয়ম নহে।

তবে মানব জাতি আপন কর্মকালে দেবত্ব লাভ করিতে পারে। এইরূপে অনেকে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতির কার্য্যে উচ্চ পদ লাভ করিয়া গিয়াছেন শাস্ত্রে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের নাম সাধ্য দেব। সুরথ রাজা দেবী-আরাধনাকালে সাবর্ণি যুনির পদ পাইবেন। রাজা নহষ ইন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বলিরাজা এককালে ইন্দ্র প্রাপ্ত হইবেন। ইহারা তাহাদের দেবত্ব ভোগের পর পুনরায় মানুষ হইবেন বা অপর কোন উচ্চতর অবস্থায় চলিয়া যাইবেন। মানব জাতি ক্রমঃযুক্তি অবলম্বন করিয়া প্রজাপতি পর্য্যন্ত হইতে পারেন।

পরামিত্রা-সমিতির বঙ্গীয় শাখার সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন Philosophy of the Gods নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি উক্ত সমিতির কলিকাতার আফিস হইতে কিনিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে দেবতত্ত্বের বিষয় অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। দেবতা-দের কার্য্য সম্বন্ধে আমরা উক্ত পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

সৃষ্টির ক্রমোন্নতির কার্য্য বিপথে না যাইয়া যাহাতে ঠিক পথে চলিতে পারে তাহা দৃষ্টি রাখাই অনেক দেবতার প্রধান কার্য্য। জগতে জীব সকল শক্তিমান ও অনেক অংশে আপন কার্য্য সম্বন্ধে স্বাধীন। ইহাদের বুদ্ধির দোষে ইহারা এমন কর্ম্মের উৎপত্তি করে যাহাতে এই ক্রমোন্নতির গতির পারিঘটন বা ব্যাঘাত

যেট, এই সময়ে উপযুক্ত শক্তিপ্রয়োগে ক্রমোন্নতিমার্গকে বীর নির্দিষ্ট পতিতে চলিতে দেওয়া দেবতার সাহায্যে হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহাদের দ্বারা উক্তরূপে স্রোত ফিরান অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন উপরের কোন দেবতার অবতাররূপে প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইনি আসিয়া সকল বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া জগতের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়াদেন।

এই সময়ে অনেক দেবতাকে সাজোপাড়রূপে অবতারের সহায়তার জন্য জন্ম লইতে হয়। অনেক দেবতা উন্নত মানবমণ্ডলীকে সাধনমার্গে শিক্ষা দিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে থাকেন।

অসংখ্য দেবতামণ্ডলী প্রত্যেক গ্রহের অধিপতি দেবতার অধীনে অসংখ্য কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা এমন ঘটনা দেখিতে পাই না যাহার পশ্চাতে দেবতার হাত না রহিয়াছে। নদী বহিয়া যাইতেছে, বড় হইতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, সকলই দেবতার অন্তরালে থাকিয়া নিয়মমত সকল কার্য্য যাহাতে হয় তাহা দেখিতেছেন। দেবতার ইন্দ্রিয় সকলের চাঞ্চল্য। মানবদেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয় সকল বাহির হইতে যে শক্তি পাইয়া থাকে তাহা মানবের চৈতন্য পোষক করিবার কার্য্য দেবতাদের দ্বারা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে অগ্নিযুগমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাক্ষশক্তি হইলেন, বায়ু নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস হইলেন। সূর্য্য চক্ষুসমূহে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টি হইলেন। অধিদেবতা মানবদেহে কেশরূপে প্রবেশ করিলেন,

চন্দ্রদেব মস্তুরূপে মানবের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। যম অপান বায়ুরূপে নাভিতে আশ্রয় করিলেন। অপদেবতা শুক্ররূপে শিরে আশ্রয় করিলেন।

খনিজ ধাতু, উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি মধ্যে আকৃতি গঠনে সহায়তা করা দেবতাদের কার্য্য। ধাতু মধ্যে কেমন সুন্দর সুন্দর আকার, বর্ণ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। গের্ণি, শামুক প্রভৃতির চিত্র কিরূপ সুন্দর, পুষ্প পত্রাদির বর্ণ ও চিত্র ও আকারের কিরূপ সৌন্দর্য্য কেবা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকে। এই সকল গঠনে দেবহস্ত নিহুক্ত, ইহা স্বাভাবিক সৃষ্টি নহে। পুষ্পের অভ্যন্তরে মধু বাধিয়া তদ্বারা ভ্রমর আনিয়া সেই ভ্রমরের সাহায্যে পুষ্পের রেণু অল্প পুষ্প মধ্যে প্রেরণ করা, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি যে স্থানে থাকে সেই স্থানের লতা-পল্লবাদির ত্রায় চিত্র তাহাদের গাত্রে প্রকাশ করিয়া তাহাদের শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এই সকল দেবতাদের কার্য্য।

দেবতাদের অপর একটি গুরুতর কার্য্য করিতে হয়, এই কার্য্য অল্প তাহাদিগকে কর্ণ-বিধাতা বলা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত কর্ণ এবং (National) জাতীয় কর্ণের কল প্রদান করা ইহাদের দ্বারা হইয়া থাকে। প্রত্যেক লোকের জন্ম হইবার অব্যবহিত পূর্বে তাহাদের শুভাশুভ কর্ণের হিসাব করা হয়, এবং তদনুসারে সেই ব্যক্তির লিঙ্গশরীর দেবভাগন গঠন করিয়া দেন, এবং আত্ম যে জীবন পৃথিবীতে ভোগ করিবে সেই জীবনে পূর্ণ-জয়াজিত কর্ণ অর্থাৎ প্রারম্ভ কর্ণের কতটা

ভোগ হইবে তাহা স্থির করিয়া দেন, এবং যে দেশে ও বৈষ্ণব বংশে জন্ম হইলে তাহার নির্দ্ধারিত প্রারম্ভ ভোগের সুবিধা হইবে তাহা দেবভাগণ স্থির করিয়া থাকেন। আমাদের ভিতর একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে জন্মের পর ষষ্ঠ দিবসে বিধাতাপুরুষ কপালে জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল লিখিয়া দিয়া যান, এই বিশ্বাস ভুল, কারণ গর্ভে জন্ম লইবার পূর্বেই এই সকল বিষয় স্থির হইয়া যায়।

দেবভাদেব সহায়তায় লোকে একত্র মিলিত হয়, একত্র বাসের লোক দূর স্থানে চলিয়া গিয়া পৃথক হইয়া যায়, তাহাদের নিজ নিজ কর্ম-ভোগের জন্য এইরূপ করিতে হয়। কর্ম-সূত্রে বহুদূরবর্তী কোন লোকের সহিত মিলিত হইয়া কোন ঘটনা হইবে, দেবতার কৌশলে এক স্থানের লোককে অন্য স্থানে আনিয়া মিলাইয়া সেই কার্য ঘটাইবার সুযোগ করিয়া দেন দেবভাগণ মানবের পশ্চাতে সর্বদাই রহিয়াছেন, দেখিতেছেন মানব নিজ স্বাধীন ইচ্ছার বলে এমন কোন কার্য করিয়া না ফেলেন বাহাতে সেই মানবের প্রারম্ভ কর্মকল-ভোগের সুযোগ নষ্ট হইতে পারে, দৈবাৎ এরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়া পড়িলে অন্য কোন উপায়েও সেই ফল তাহার ভোগ করিয়া দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। কোন লোকের অপঘাত মৃত্যু পূর্বজন্মজনিত কর্মফলে ঘটিবে না, অথচ বহু লোকের এরূপ ভোগ থাকার একটি ট্রেণ সংঘর্ষ (collision) হইবার দেবভাগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং বাহাদের এরূপ অপঘাত মৃত্যু কপালে নির্দিষ্ট আছে তাহাদের

সেই ট্রেণে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু কার্যবশতঃ উক্ত সৌভাগ্যবান লোকটিরও সেই ট্রেণে যাইবার যোগ্য কার্য থাকার সেও ঐ ট্রেণে যাইবার অন্য বাহির হইল, তাহার অদৃষ্টে অপঘাত মৃত্যু না থাকায়, সে নিজ স্বাধীন ইচ্ছার বলে ঐ কাণ্ডে যোগ দিতে যাইলেও দেবভাগণ তাহাকে কোন গতিকে গাড়ী ফেল করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কাহারও অদৃষ্টে উক্তরূপ মৃত্যু থাকিলে তাহাকে কোন রকমে ঐরূপ গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন। আবার গাড়ীর কোন লোকের অদৃষ্টে মৃত্যু না থাকিলে দেবতার তাহাকে গাড়ী হইতে তুলিয়া রক্ষা করিবেন। সেই লোকটি মনে করিবে কি করিয়া যে সে রক্ষা পাইল তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না। একদা আমাদের ভারতবর্ষের কোন স্থানে অভিশয় ঝড় ও বজ্রপাত হইতেছিল। কতকগুলি পথিক একটা তর মন্দিরে আশ্রয় লয়। আকাশে ক্রমাগত বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছিল, কিন্তু কোন বজ্রপাতের শব্দ হইতেছিল না। লোকদের মধ্যে একজন বলিল আমাদের মধ্যে একজন পাপী আছে বাহার মন্দিরকে বজ্র পড়িবে, কিন্তু এতগুলি নিরপরাধী লোক সঙ্গে থাকার বজ্র পড়িতে পারিতেছে না, কাজেই আমাদের প্রত্যেকেই একে একে বাহিরে যাইয়া একবার করিয়া দাঁড়াইয়া দেখা দিউক, যে পাপী হইবে তাহার উপরই বজ্র পড়িবে। সকলের ইচ্ছাতে মত হইল, এক জন করিয়া দাঁড়াইয়া যাইয়া কিছুক্ষণ থাকে, অন্যের করিয়া আসে কিন্তু বাহার মন্দির

পড়িল না। অবশেষে তাহারা দেখিল একটি লোক ভয়ে কোণে লুকাইয়া রহিয়াছে,— কাঁপিতেছে ও অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, তাহারা সকলে তাহাকে টানিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ বজ্রপাতের শব্দ হইল, বজ্র লোকটির মাথায় পড়িল না। কিন্তু মন্দিরে পড়িয়া মন্দিরের সকল লোক কয়েকটীকে নষ্ট করিল। এইরূপে দেবতাগণ কার্য্য করিয়া থাকেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমাদের পূর্বে কত জন্ম হইয়া গিয়াছে। কত জন্মে কত কাজ করিয়াছি, তাহার স্থির করিয়া ফলভোগ করান অতি দুর্লভ কার্য্য, ইহাতে ভুল ভ্রান্তি ঘটিতেও পারে। একথা সত্য নহে। দেবগণের অরণশক্তি কখনও ভুল করে না। উচ্চ অবস্থায় দেবগণ চিত্তশুদ্ধ, লিপিকা প্রভৃতি নিয়মিত হিসাব রাখিয়া থাকেন, তাঁহাদের আদেশে দেবগণ কার্য্য করিতেছেন, এ ব্যাপারে ভ্রম ঘটে না। ব্যক্তিগত কর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যেরূপ দেখিলাম জাতিগত কর্ম্মও এইরূপ ফল দিয়া থাকে। আমরা ভারতের আর্ধ্যজাতি, আর্ধ্যাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছি, তাহার ফলে আমাদের পতন, আলোকজাতির হইতে ক্রাইত পর্য্যন্ত সকলেরই আক্রমণ আমাদের সহ্য করিতে হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নষ্ট করিবার জন্য ভারতে জন্ম লইলেন, দেবতাগণ ভুটিলেন, অনেক কৌশলে দুর্ভিক্ষের বৃদ্ধ ঘটিল ও সেই হইতে আর্ধ্যাদের বীজকুল ধ্বংস হইল। অত্যাচার সহ্য করিবার শক্তি নষ্ট হইল। স্পেন আমেরিকার

মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি শুলভ্য সাম্রাজ্য জয় করিল, অধিবাসীদের উপর কি না অত্যাচার করিল, তাহার ফল আমেরিকার হাতে স্পেন পাইল। সেই পেরু সেই মেক্সিকো হইতে এক নূতন জাতির উদ্ভব হইল, সেই জাতি স্পেনের আমেরিকার বাহা কিছু ছিল সকল ধ্বংস করিয়া দিল। আমাদের নারদদেব ঋষি হইতেছেন, তিনি ব্যক্তিগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মফল নাশ করিবার জন্যই বিবাদ লাগাইয়া থাকেন। নচেৎ এরূপ উচ্চ অবস্থার মূমি বগড়া বাধাইয়া আনন্দলাভ করিবার লোক কখনও হইতে পারেন না।

দেবগণ যেরূপ আকৃতি গঠনে সহায়তা করেন, আবার তাহার আকৃতি নষ্ট করিবার পক্ষেও সহায়তা করিয়া থাকেন। যমরাজ এ বিষয়ে একজন প্রধান দেবতা। লোকের আকার নষ্ট হইবার সময় হইলেই তাহার মুহূর্ত্তান ও মুহূর্ত্ত পর নিয়মিতরূপে জীবের পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ডদেহ ধ্বংস করা ইত্যাদি দেব-সহায়তায় হইয়া থাকে। ক্ষিতি (solid), অপ (liquid) এবং তেজ (gas) লইয়া যে দেহ তাহাকে ভাণ্ডদেহ বলে, মরিলে এই দেহ স্থানে ধ্বংস হয়। কিন্তু মরুৎ ও ব্যোম লইয়া আমাদের আর একটি দেহ আছে তাহাকে পিণ্ডদেহ বলে। এই দেহ আমরা দেখিতে পাই না, এই দেহও আমাদের স্থূল দেহের অন্তর্গত। এই দেহ ভাণ্ডদেহ নামের সহিত নষ্ট হয় না। এই দেহ লইয়া জীব মানবের অদৃশ্য হইয়া এই পৃথিবীতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। এই দেহ যতদিন থাকে ততদিন

প্রত্যেক অবস্থা। এই দেহ নাশ হইতে মৃত্যুর দিন হইতে অনেকস্থলে এক বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগে, সচরাচর এই জন্তই এক বর্ষ কাল ব্যাপিয়া মাসিক ও বাৎসরিক আদি পিণ্ডদানের ব্যবস্থা। এই সময় মানবের পক্ষে অতি কষ্টকর সময়, দেব-সাহায্যে এই সময় অনেক ফল হয় ।

আমরা দেখিলাম, দেবজাতি ব্যতীত মানব-সৃষ্টি ও মানব-জাতির ক্রমোন্নতির কার্য্য আদৌ চলিতে পারে না। বরং পশুজাতি উপরিতন মানবজাতির সহায়তা ব্যতীত অনেকটা উন্নতি লাভ করে ও শেষে মানবজন্ম পর্য্যন্ত মানবের বিনা সাহায্যে লাভ করিতে পারে, কিন্তু মানব দেবতার সাহায্য ব্যতীত এক পাও অগ্রসর হইতে অক্ষম। মানবের জন্মসময় তাহার প্রারম্ভ কৰ্ম্মার্জিত লিঙ্গ-শরীর গঠন-কার্য্যে দেবতার সাহায্য দরকার। এইজন্ত শাস্ত্র কথিত পঞ্চায়িবিজ্ঞা, এ সম্বন্ধে আমরা অল্প সময় আলোচনা করিব। জন্মের পর হইতে প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাৎ দেবতার সহায়-ছেন। জীবিকাকর্জন জন্ত চাষ আদিতে দেব হস্ত অর্জনকিতে কার্য্য করিতেছে। মানবের স্থবিধার জন্ত সময়ে জল দেওয়া, শীত আতপ আদি ঋতু পরিবর্তন করা, ঝড়বৃষ্টি করা, কৃষিতে নানা বিপদ বিঘ্ন দূর করা, নদনদীর দ্বারা জল দান করা, অগ্নি প্রজ্জ্বালন করা, আবহাওয়ার সাহায্য লাভ করাইরা দেওয়া, নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করাইরা দেওয়া, অনিষ্ট কার্য্যে নাশ ও ইষ্ট কার্য্যে উন্নতি হয় দেখান, পীড়া ইত্যাদি হইতে রক্ষা করা, জগতের অনিষ্টকারক অশুর আদি কুশক্তি সকলকে

বশীভূত রাখা, উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত বিবাহ আদি সম্বন্ধ ঘটান, ইত্যাদি মানবজীবনে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহাতে দেবগণের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব থাকে না। এক এক শ্রেণীর দেবতা-গণ এক এক প্রকার কার্য্য করিয়া আসিতে-ছেন। পৃথিবী যেমন সম্রাট, রাজা, জমিদার, কোটাল, গভর্ণর, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ দ্বারা বাহ্যিক ব্যাপারে শাসিত হয়, সেই মহাক্ষম আশ্রিত সংসার হইতে ব্রহ্মাণ্ড ও পৃথিবী আদি সমস্ত লোক সেইরূপ অব্যক্তমনসগোচর বিরাট সৃষ্টি-কর্ত্তার নিদেশে নানা শ্রেণীর দেবগণ দ্বারা অলক্ষিতে শাসিত হইতেছে। চক্ষুদ্বারা ইহা দেখিতে পার। আমরাও ইচ্ছা করিলে দেবতার যোগ্য চক্ষু লাভ করিতে পারি।

আমরা দেখিলাম, দেবতার আমাদের হিতের জন্ত কতই না খাটিতেছেন। কাজেই আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী। এই ঋণ আমাদের কথঞ্চিৎ পরিশোধের জন্ত সত্যতঃ আমাদের দেবতাদের নিকট কৃতজ্ঞ-ভাব মনে থাকা উচিত, এবং দেবঋণ পরিশোধ দেবতাদের পূজাও করা উচিত। দেবতাদের দেহ স্মরণ, আকাজ্ঞাও স্মরণ। তাঁহাদের কারণ-দেহ, এই দেহের পোষণ জন্ত আমাদেরকে দেবতা যত্নপূর্ব্বক নানাবিধ পবিত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্য অর্পণ করা কর্তব্য। তাহা দেবতাদের সম্পূর্ণভাবে ভোগে আনিতে হইলে ঐ দ্রব্য সকলকে কারণ-অবস্থায় পরিণত করিয়া দিতে হয়। অগ্নি এই কার্য্যে আমাদের সহায়তা করিয়া থাকে। আমরা যে দ্রব্য অগ্নিতে দিব তাহা ক্রমে স্মরণ হইতে কারণ-

অবস্থায় পরিণত হইবে ও দেবতাদের গ্রহণ-যোগ্য হইবে, এই জন্ত শাস্ত্রে হোম-কার্যের বিধান হইয়াছে। যথাবিধি হোম করিলে, দেবতাদের দ্বারা আমরা যে সকল উপকার পাইতেছি তাহা অরণ্য করিয়া কৃতজ্ঞতায় হৃদয় জ্বলিত্ত করিয়া দেবতাদের মন্ত উচ্চারণ করিয়া হোমের অগ্নিতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি অর্পণ করিলে তাঁহারা সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের চক্ষু নাই দেখিতে পাই না বলিয়া তাঁহারা আসেন না, উক্ত দ্রব্য তাঁহারা লইতেছেন না ইহা জ্ঞান করা একে-বারে ভুল।

মেকলে বাঙ্গালী জাতিকে ungrateful (অকৃতজ্ঞ) বলিয়াছিলেন বলিয়া আজ পর্যন্ত আমরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত আছি, আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ বলিয়া চতুর্দিকে ঢকা বাজাইতে সদাই উত্তত। কিন্তু তাই একবার প্রাণ খুলিয়া বল দেখি, এই যে দেববন্দ আমাদের জন্ত এত করিতেছেন, কখনও আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞহৃদয় হইয়াছি কি? আমাদের ভিতর এমন কর জন আমরা আছি, যিনি বলিতে পারেন যে একদিনও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আমি অন্ততঃ একবার বিত্তক গব্য যুত অগ্নিতে দেব উদ্দেশে অর্পণ করিয়া দেব-ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিয়াছি অথবা পরিশোধ করিবার জন্ত মনের ব্যাকুলতা পোষণ করিতেছি।

ঐকান্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ,বি,এল,  
এক, টি, এস।

## শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ীর মানস পূজা।

মূলাযোড়ধাপীঠে ত্রিভুবনজননী পঞ্চমুণ্ডাসনস্থ।  
স। দেবী ব্রহ্মরূপা প্রলয়খনযট। যুক্তকেশী হসন্তী।  
মেঘাকী কালিক। স্বঃ রিপুরুধিরমুখী মুণ্ডমালাং  
বহন্তী

যাচে শ্রামাকুমারো হরিহরবিধিভি বাঁধুনীয়াং  
পদং তৎ ॥

রাগিনী ভৈরবী।

নিশা অবশান হ'ল জাগ ব্রহ্মময়ি, শিবে,  
আর কত ঘুমাবে মা, মঙ্গল আরতি নেবে।  
কর মা, দন্তধাবন লহ দেবি আচমন,  
শুগন্ধি জলেতে স্নান করে তুমি খুসী হবে।  
রত্ন-সিংহাসনে বসে পুষ্পতেল মাখ কেশে,  
আতর চৈনিক বাসে পর তারে, দয়াক্ষেপে।  
এস এস হৃদে এস হৃদয়-আসনে বস,  
বাঁধ মাগো এলোকেশ পাণ্ড যে মা, পায়ের নেবে।  
জনমে যা কেঁদেছিছ অশ্রুজল পাণ্ড দিশু,  
হৃদয়ে পেতেছি অর্ঘ্য নিবেদি মা ভক্তিভাবে।  
লহ মাগো, আচমন দুধ কর বিমোচন,  
কেঁদে মরে দীন হীন দয়া মাগো, হবে কবে।  
মধুপর্ক বাটীতরা, পুনরাচমন তারা,  
করালবদনা ঘোরা তোমার মাগো নিতে হবে।  
সোনারি কলস জলে স্নান কর কুজুহলে,  
ধুগ হব তারা বলে প্রাণের জালা ঘুচে যাবে।  
রতন বসন পর, উত্তরীর অঙ্গে ধর,  
অচিরে মা শত্রু হর একান্ত আশ্রিত ভেবে।  
সীমন্তে সিন্দূর ধর অলঙ্কৃত মা, পায়ের পর,  
কজ্জল চখেতে পর, দেখে মন মুগ্ধ হবে।  
রতন সুপূর পর মঞ্জীর চরণে ধর,  
হাতে হীরার বালা পর গলে মুক্তাহার দেবে।

গলার নক্ষত্রমালা ভালে পর শশিকলা,  
অকৃত তোমারি লীলা কবে মা, এসয় হবে ।  
জ্বাফু'রের আভরণ রেখেছি করে বতন,  
নিবেদি যে মা, এখন ব্রহ্মময়ি ভূমি নেবে ।  
লহ দেবি করে অসি, কাট রিপুশিরোরাশি,  
দেখি থল থল হাসি বরাভর পুত্রে দেবে ।  
চন্দন কস্তুরী মাখ বৃকে যোর পদ রাখ,  
শান্ত হ'য়ে দাঁড়া মাগো, অভাগা যে জমা দেবে ।  
জবাপরাক্রিতা দ্রোণ, বিষপত্র সচন্দন,  
লহ মা রক্তচন্দন, পুষ্পাজলি নাও শিবে ।  
হাজার আট রত্নফুলে পূজি কৃপা পাব বলে,  
মানসে গো কুতূহলে অপার করুণা ভেবে ।  
চম্পক করকী বত নাও মাগো, অবিরত,  
অশ্রুজলে যে চর্চিত দয়া করে ভূমি নেবে ।  
ধূপ দীপ নে মা, তারা চাযুগা ভীষণাকার,  
নৈবেদ্য হৃদয়ে ভরা তোরে মাগো, নিতে হবে ।  
সমিধা শোধন করে' ঢেলে দি মা, পাত্র ভরে,  
পান কর মা, দয়া করে' এ অভাগা ধন্য হবে ।  
হীরক চবকে মধু পান কর হরবধু,  
দিব ভক্তি শুদ্ধি শুধু, পঞ্চতত্ত্ব পূজা নেবে ।  
সোনার গেলাস ভরা পানার্ঘ্যদ্রব লও তারা,  
ভূমি মা, দুর্গতিহরা কবে মা, দুর্গতি যাবে ।  
তাম্বুল অধরে ধর, ঠোঁট দুটি রাঙ্গা কর,  
তর্পণ যে অশ্রুধার রাঙ্গাপায়ে মিশে যাবে ।  
হীরে দিয়ে তৈরি করা ছাতার সোনার ঝারা,  
নিবেদি যে ভয়হরা চামর অর্পিত এবে ।  
দর্পণ সোণার পাখা নাও মাগো, দাঁও দেখা,  
দয়া করে নাশ ব্যাধা, কতদিনে হুখ যাবে ।  
মণিময় পাছকা দি, ভূমি যে অনন্ত-আদি,  
দয়াময়ী ভূমি যদি তবে কেন না তারিবে ।

সিন্দূর-করুণ নাও, হাতে মাগৌ, পাঁখা দাঁও,  
আমার অভয় দাঁও, ডাকি তোর দয়া ভেবে ।  
আজ্ঞাপর আবরণে মহাকাল সবভনে,  
পূজি মাগো, এতকণে ভূমি তার ধূসী হবে ।  
আবরণ মহাকাল পূজি দিয়ে পুষ্পফল,  
পুনঃ তোরে দি কমল রেখেছি যা দেব ভেবে ।  
সাক্ষোপাক সাবরণ পুনঃ পূজি শ্রীচরণ,  
পুনরায় ত্রিতর্পণ করে জালা ঘুচে যাবে ।  
সোনার থালার 'পরে ভাত খাও মা, দয়া করে,  
খেচরায় ফলাহারে আসব পানীয় শিবে ।  
ছাগ মেঘ পশুগণ বড়রিপু যে ভীষণ,  
লহ দেবি বলিদান চাযুগে, রুধির খাবে ।  
আজ্ঞাপর মহাকালি, দিব যে মা শিবাংলি,  
সমাংস রুধির বলি নিয়ে ভূমি বর দেবে ।  
এস শিবে, বিষমূলে উর্দ্ধমুখে কোলাহলে,  
রিপুরক্ত মাংস বলি খেলে ভূমি হুখ যাবে ।  
কালাগ্নিসদৃশরূপা বলি গুরু মহাতপা,  
শুভাশুভ ফল বল, অভাগা কি শাস্তি পাবে ।  
কপূর প্রদীপভাতি তোরে মা, করি আরতি,  
জয় কালি বলে স্তুতি, এ পাপী যে মুক্ত হবে ।  
হাজার আট দীপমালা নাও ভূমি হিমবালা,  
ঘুচাও মনের জালা ভূমি ছাড়া কে ঘুচাবে ।  
দ্বি-দুখ-আগুনেতে হোম করি ভক্তি-ঘুতে,  
মূল মন্ত্র আহুতিতে তার তোর তৃপ্তি হবে ।  
মূল মন্ত্র করি জপ ব্রহ্মময়ী মহাতপ,  
ঘোচায় যে মহাপাপ বিভব জীবনে ভবে ।  
প্রদক্ষিণ করে' নমি, পূজন না জানি আমি,  
গুরু মূল মন্ত্র ভূমি, ত্রিন এক একই ভাবে ।  
সাঁটাকে প্রণতি করি এসয়া হুও শকরি,  
ডাকি তোরে প্রাণতরি পূজা সাদ হ'ল এবে ।



করালবদনা কালী গোল লিঙ্গা মুণ্ডমালী,  
কড় মা বে বনমালী গোপীকান্ত ভাবি যবে ।  
দিগবরী দিগবরে আমারি কি রূপ ধরে,  
ধাক মাগো, মূলাছোড়ে অভাগার দুখ যাবে ।  
তোর ভক্তি কেবা জানে তব বেদে হার মানে,  
তাই মরি অভিমানে মায়ের ছেলে কোলে যাবে ।  
তোমার মহিমা যদি সারদা সহিত বিধি,  
লেখে যদি নিরবধি উভয়ে অক্ষয় হবে ।  
সাঁটান প্রণাম করি জয় জগদীশ্বরী,  
জাকি তোরে প্রাণ ভরি কমা কর দোষ শিবে ।  
মন্ত্রহীন ফ্রিয়াহীন আমি যে মা, ভক্তিহীন,  
মন যেন হয় লীন রাক্ষসে মিশে যাবে ।  
ইতঃপূর্বে মন্ত্র বলি আত্মসমর্পিত কালি,  
এখন দি মা, করতালি অসীম করুণা ভেবে ।  
নিখালা লইছ করে চাণালী পূজার তরে,  
যদি মা এসসা তারে, দাসে পূজা-ফল দেবে ।  
দক্ষিণা দক্ষিণাকালি রত্নবৃষ্টি নে মা, বলি,  
প্রাণটাও নাও কালি, কমা কর দাস ভেবে ।  
নিখালা মাথায় ধরি পাদোদক পান করি,  
পূজা শেষ মহেশ্বরী তোমারি রূপায় শিবে ।  
আজ্ঞাকর অনুষ্ঠান কোলে দি পান ভোজন,  
মধুর আসব পান করে' তোর দয়া গাবে ।  
বহুদীপে আলোকিত নটমঞ্চ হুশোভিত,  
নর্তকীরা করে গীত তোমারি মহিমা শিবে ।  
নটীদের বন্ধে লীনা বাজার মধুর বীণা,  
শোন মাগো ত্রিনয়না তাদের ভূমি মুক্তি দেবে ।  
বারম্বাৰা শত শত গান করে হৃদয়ীত,  
দেখ মা, কৌতুক কত আনন্দে নাচিছে সবে ।  
নাটকাতিনয় দেখ অভাগা পাইবে সুখ,  
রূপা করে দেখে দেখে "চতুঃপদ" এবে ।

মানসে করিহু পূজা কমা কর চতুর্ভুজা,  
উড়ানে তোর নাম ধবলা তোর ছেলে কাছে  
যাবে ।  
শান্তিস্তব পাঠ করে' উঠি মা, আসন ছেড়ে,  
মন আনন্দ করে' শান্তি শান্তি শান্তি রবে ।  
কুমার-রচিত গীতি মানসপূজন তত্তি,  
পাইবে যে জন নিতি তারে পূজার ফল দেবে ॥  
ওঁ তৎসৎ ।  
শ্রীশ্যামাকুমার ঠাকুর ।

## বিজয়া ।

রাজচন্দ্রপুন্দের আম কাঁঠালের ছায়ার ঘেরা  
পল্লীর একখানা কুঞ্জ কুটীরে বিজয়া একটা  
পূজার ফুলের মত পবিত্র হইয়া জন্মগ্রহণ  
করিয়াছিল । আশৈশব মাতৃহার্য শিশু পিতা  
রামচন্দ্রের কোড়ে নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া  
খেলিয়া বেড়াইত, আর বৃদ্ধ রামচন্দ্র তাহার  
আনন্দ-পুতলী কন্ডাটিকে সযত্নে বক্ষে চাপিয়া  
ধরিয়া সংসারের দুর্ভিক্ষহ জ্বালা হইতে রক্ষা  
পাইতে চেষ্টা করিত । বিজয়া যখন তাহার  
খন কৃকবর্ণ চুলগুলি এলাইয়া ছোট হাত  
দুটীতে করতালি দিয়া ইতঃস্তত বিচরণ করিত,  
তখন বৃদ্ধ তাহার প্রতি স্নেহে দৃষ্টি নিক্ষেপ  
করিয়া সংসারের কালকর্ণে মনযোগ করিত ।  
শৈশবে মাতৃহার্য হইয়া বিজয়া তাহার পিতার  
বক্ষে বাধা ওঁলিয়া মায়ের শোক ভুলিয়াছিল ।  
বৃদ্ধ রামচন্দ্রও এই বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র অবলম্বন  
কন্ডাটিকে পাইয়া সকল জ্বালা বন্ধনা ভুলিয়া,  
সংসারের কালকর্ণে মনোনিবেশ করিতে

পারিয়াছিল। এই বিজয়া একটা ছোট মেয়ে; কিন্তু সে তাহার পিতার সংসারে শোক-ভুলানো পানক্লে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যখন রাত্রি আসিত, বিজয়া ঘুমাইত, দরিদ্র বৃদ্ধ পিতা ঘরের দাওয়ার একখানি চেঁচা পাতিয়া গরুর দড়ি বুনিত; প্রভাত হইলে, সংসারের কাজকর্ম সারিয়া, কত্যাটিকে ঝাঙকাইয়া, বাজারে দড়িগুলি বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত। বিক্রয়-লব্ধ পয়সার দ্বারা দৈনন্দিন জিনিষপত্র কিনিয়া, আবার ঠিক সময়ে গৃহে ফিরিয়া কত্য়ার হাত ধরিয়া আদর-সোহাগ করিত। এইরূপে নানা দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া বৃদ্ধ কত্যাটি লইয়া তাহার দুঃখের দিন-গুলি কাটাইত।

যেভাবে হউক, বৃদ্ধের দিনগুলি যেমন ধীরে ধীরে কাটিতে লাগিল, বিজয়ার বয়েসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও তাহার সুন্দর গণ্ডকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বিজয়া এখন আর ছোট মেয়েটী নহে! যৌবন-শ্রী তাহার সমস্ত অঙ্গে ভগবান অবাচিতভাবে ঢালিয়া দিয়াছেন। রামচন্দ্র তাহার লক্ষ্মী-স্বরূপিনী কত্য়ার প্রতি চাহিয়া তাহার বিবাহের জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর ঘরের কত্যা, বিবাহ না হইলে জাত যায়। একি কম দায়! বৃদ্ধ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কুল পাইল না। বিজয়ার বিবাহের পাত্র সংগ্রহের জন্ত কত স্থানে অনু-সন্ধান করিল, কিন্তু দরিদ্রের কত্য়ার পাত্র কোথায় জুটিবে? বৃদ্ধ হতাশ হৃদয়ে ভাবিয়া পড়িল। পরিশেষে জাতি-ধর্মের প্রতি চাহিয়া তাহাকে এক অশীতিপর বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ

করিল। হায়! হিন্দু-সমাজ! তোমার কি কঠোর নিয়ম! বিধাতার নির্বন্ধ অনুসারে সেই বৃদ্ধের সহিত বিজয়ার শুভক্লে কি অন্ততক্লে বলিতে পারি না—বিবাহ হইয়া গেল। বিজয়া সেই দিনই তাহার পিতার নির্দোষিত স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিতে গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। আর বৃদ্ধ পিতা রামচন্দ্র তাহার হৃদপিণ্ড ছেদ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আদরিণী কত্যা কে বিদায় দিলেন।

হায়! এই বিদায় তাহার শেষ বিদায় হইল। কিছুদিন যাইতে না যাইতে বিজয়ার সংসার পুতুল খেলার মত ভাঙ্গিয়া গেল। অভাগিনীর অগোচরে সেই নির্দম কাল-চোর তাহার কঠর—স্বামীধনকে অপহরণ করিল। বিজয়া এই শোকাবহ ব্যাপারে কাঁদিল না। উঠিয়া সিঁথির সিন্দূর মুছিয়া, গড়া পরিয়া বিধবার বেশ ধারণ করিল। পরে স্বামীর সংসারাদি করিয়া তাঁহার স্মৃতি-মন্দিরের রক্ষার জন্ত সেখানেই পড়িয়া রহিল।

এই অচিন্ত্যনীয় সংবাদ যখন বিজয়ার বৃদ্ধ পিতার কর্ণগোচর হইল, তখন বৃদ্ধ সেই শূন্য ঘরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার করুণ-ক্রন্দনে সেখানকার সেই নিভরুতা ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর একদিন বিজয়াকে আনিবার জন্ত, তাহার শ্বশুর-গৃহে গমন করিল। কিন্তু বিজয়া আসিল না। পিতা ফিরিয়া আসিল; আর সেই বালিকা বিধবা তাহার স্বামীর ভিটায় একটা সামান্য আলো জ্বলিবে না বলিয়া আসিল না। এ যে বিধবার দেবতীর, মন্দির,

তাহার দেবতা যে এ ভীষণ মন্দির রক্ষার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাই বিধবা তাহার পিতার বক্ষে ফিরিয়া আসিল না। সেই শূণ্য ঘরে স্বামীর স্মৃতিমন্দিরে বিজয়ার দিনগুলি স্মারকরূপে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিন্তু হায়, সকল সময়ে দিনগুলি সুন্দর-রূপে কাটে না। সেই গ্রামে একজন জমীদার ছিলেন। ক্রমশে বিজয়া তাহার কু-নজরে পড়িল। গ্রামে একজন কুচরিত্রা নিচকুলোদ্ভবা বিধবা ছিল। জমীদার প্রথমে তাহাকে হুতীরূপে খাড়া করিল। কিন্তু বিধবা বিজয়া তাহার এই কুৎসিত প্রস্তাবে পদাঘাত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। তখন জমীদার অণু উপায় অবলম্বন করিলেন। সেদিন জ্যোৎস্না-রাত্রি। উজ্জ্বল অনন্ত আকাশ-গগায় জ্যোৎস্নার স্তরঙ্গলীলা খেলিতেছে—নিম্নে কলনাদিনী তটিনীর তরঙ্গলীলা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, ঠিক এমনি প্রকৃতির সেই নিরসা দরবারে পাণ্ডিত্য জমীদার বেখানে বিজয়া নির্ভয়ে ঘুমাইতেছিল, সেইখানে প্রবেশ করিল। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা আর লিখিতে পারিব না। হায়, পরদিবস বিজয়ার রক্তমাখা অট্টোত্তর দেহ দেখিয়া প্রতিবেশীরা নিকটবর্তী থানায় সংবাদ দিল। পুলিশ বিজয়ার রক্তাক্ত দেহ হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিল। তারপর অনেক অত্যাচারের পর পুলিশ জমীদারকে গ্রেপ্তার-পূর্বক চালান দিল। যথা সময়ে ধর্ম্মাধিকরণে জুরির বিচারে পাণ্ডা জমীদারের হুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল।

বিজয়াও ফিরিয়া আসিল। এদিকে বিজয়ার পুণ্য চরিত্রে দুই লোকে কলঙ্ক আরোপ করিয়া নানা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। সুতরাং বিজয়া সমাজচ্যুত হইল। বিজয়া কাদিতে কাদিতে, তাহার স্বামীর শেষ-চিহ্ন ধ্বংস করিয়া পিতার বক্ষে আসিয়া মুখ লুকাইল। কিন্তু তাহার সংস্পর্শে বৃদ্ধ পিতা রামচন্দ্রেরও শেষ বয়সে দুর্দশার একশেষ হইল। বিজয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পিতাও সমাজচ্যুত হইল। হায়, অভাগিনী বিধবা কন্যাকে গৃহে স্থান দিয়া ইহারও আর কোথাও স্থান হইল না। যাহার কোথাও স্থান নাই, মৃত্যু তাহার চির-বিশ্রামের স্থান। অভিমানে ক্ষোভে হৃৎখে অভাগিনী বঙ্গবিধবা একদিন উদ্বন্ধনে সংসারের সকল যন্ত্রণা ছুড়াইল। হায়, হিন্দু-সমাজ! তোমার এই মহত্ব!!

বিজয়া মরিয়া গেল। তথাপিও বৃদ্ধ রামচন্দ্রের সমাজে স্থান হইল না। বিজয়ার মৃত্যুর কিছুদিন পরে, একবার এই বৃদ্ধ রামচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, বলুন, আমরা এখন কোথায় যাই?” আমিও ইহার পক্ষ হইতে হিন্দু-সমাজপতিগণকে জিজ্ঞাসা করি “বিজয়া তো মরিয়া গেল। এখন ইহার কোথায় যাইবে?”

ঐ অমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## পোস্তার রাজবংশ।

সেকালের কলিকাতার অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি পোস্তার রাজবাটীর সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরাজ-বণিকগণের সৌভাগ্যস্বৰ্ণ্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিত হয় নাই, যখন পলাশীর যুদ্ধের প্রবল বহিঃবঙ্গ-গগনে ধূমায়িত হইতেছিল, যখন লর্ড ক্লাইব ইংরাজ-রাজত্বের সূচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই রাজবাটীর বিখ্যাত পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ধর অকাতরে প্রচুর অর্থসাহায্য দ্বারা লর্ড ক্লাইবের সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় ইনি যুদ্ধের বায়নিকসাহায্য নয় লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ক্রতজ্ঞ সরকার বাহাদুর তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিতে চাহিলেও তিনি তাঁহার স্বভাবশুলভ সৌজন্যতার বলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার উপর গভর্ণমেণ্টের প্রস্তুতি বিখ্যাস ছিল। ইনিই নবকৃষ্ণ-লর্ড ক্লাইবের নিকট পরিচয় করিয়া দিয়া তাঁহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। তখন নবকৃষ্ণ তাঁহার মুনসীর কার্য্য করিতেন; পরে ইনি রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজা নবকৃষ্ণরূপে শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

লক্ষ্মীকান্ত ধরের কোন পুত্র-সন্তানাদি ছিল না; একমাত্র কন্যা পার্শ্বতী দাসীই তাঁহার অতুল ঐশ্বৰ্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন।

ইনিই পুণ্যলোক প্রাচ্যঃসরসীর মহাত্মা মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের মাতা। মহারাজ সুখময় রায় ঐ রাজবংশের একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক; তাঁহার যশোরাশি বহুদিন হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে, কাননে কান্ডারে, নগরে পর্বতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। পার্শ্বতী দাসী একবার জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন রেল-আহাজ্ঞ কিছুই ছিল না, ভাল রাস্তারও সম্পূর্ণ অভাব, পথে দম্ভা-তরুরেরও প্রাচুর্য্য ছিল। কথিত আছে, মাতৃতন্ত্র সুখময় মাতার পুরী গমনের কষ্ট অপনোদনার্থ এক রহৎ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। সে বিপুল রাস্তা মাতৃতন্ত্রের উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে এখনও পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। উল্বেড়িয়া-হইতে পুরী পর্য্যন্ত ২৮০ মাইল বিস্তৃত এই রাস্তা এখনও বিগ্ৰহমান রহিয়াছে। বি, এন, আর ট্রেণে যিনি পুরী গিয়াছেন, তিনিই ইহা দেখিয়া থাকিবেন; রেল লাইনের কোথাও বামে, কোথাও দক্ষিণে থাকিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া এই রাস্তা চলিয়াছে। এই নদীবহুল দেশে তখনকার সময়ে পাছশালা, কূপ, সেতু প্রভৃতি পৃথিবীর আবশ্যকীয় জব্য সমন্বিত এই বিশাল পথ বাস্তবিকই বিশ্বের বিষয়। তাৎপলি-কুলতিলক বালেশ্বরের শর্গীর মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাদুর এই সকল কূপের অনেকগুলি সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা সুখময়ের দানশীলতার মুক্ত হইয়া দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, পরে হেষ্টিংসের সময়ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী-এবং পারস্যের শাহ ঐ

উপাধি মঞ্জুর করেন। ইনি ৪০০০ সৈন্তের অধ্যক্ষ হইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। ইং ১৮১১ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে মহারাজা সূর্যময়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল,—রাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বাবু বৈষ্ণনাথ রায়, বাবু শিবচন্দ্র রায় এবং বাবু নরসিংচন্দ্র রায়।

রাজা রামচন্দ্র ও মহারাজা উপাধি ও চার হাজার পদাতিক ও চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্তের অধ্যক্ষ হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে ইহার মৃত্যু হয়। রাজা রামচন্দ্রের পুত্র রাজনারায়ণ রায় এবং ব্রজেননারায়ণ রায়। রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়—ব্রজেননারায়ণের একমাত্র পুত্র।

মহারাজা সূর্যময়ের দ্বিতীয় পুত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অপুত্রক অবস্থায় ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন।

সূর্যময়ের তৃতীয় পুত্র রাজা বৈষ্ণনাথ রায় অশেষ গুণালঙ্কৃত ছিলেন; তাঁহার দানের কথা লোকবিখ্যাত। তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন; তাঁহার দুই পুত্র ছিল, কুমার রাজকৃষ্ণ এবং কুমার কালীকৃষ্ণ। কুমার রাজকৃষ্ণের দুই পুত্র,—কুমার জয়গোবিন্দ রায় ও কুমার শ্রীমদাস রায়। রাজা কালীকৃষ্ণের দুই পুত্র,—কুমার দৌলভচন্দ্র ও কুমার নাগরনাথ রায়।

মহারাজা সূর্যময়ের চতুর্থ পুত্র রাজা শিবচন্দ্র রায় অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

মহারাজা সূর্যময়ের পঞ্চম পুত্র রাজা নর-

সিংহ রায় বাহাদুর লর্ড আমহার্টের নিকট তাঁহার দানশীলতার জন্য রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি ৪ ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইহা একটা বিশেষ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার একমাত্র পুত্র কুমার রাজকুমার রায়।

কুমার রাজকুমার রায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার দ্ব্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাধাপ্রসাদ রায় বর্তমান ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দেবীপ্রসাদ রায় পরলোকগত, তাঁহারই পুত্র সুযোগ্য বংশধর কুমার হরিশ্রীপ্রসাদ রায় বাহাদুর এখন ঐ প্রাতঃ-স্মরণীয় রাজবাটীর কীর্তি ঘোষণা করিতেছেন।

আমরা এই রাজবাটীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, লোকহিতকর কার্যে এই বংশের কোন বংশধর পশ্চাৎপদ নহেন। হুঃখী লোকের তত্ত্বাশ্রয় দূর করিতে, বিপন্নকে উদ্ধার করিতে, সাধারণ হিতকর কার্যের প্রতিষ্ঠা ও সহায়তা করিতে বজের এই প্রাচীন রাজবংশ যেন চিরকালই যুক্তহস্ত। সরকার বাহাদুর অনেকবার অনেক রাজবংশধরকে ইহাদের বদান্ততার পরিচয়স্বরূপ রাজা, মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, এবং আমরা এখনও দেখিতে পাই যে, বিনা উপাধি প্রাপ্তিতেও কোন কোন বংশধর কেবল মাত্র বদান্ততা ও সৌজাত্যতার গুণে লোকের দ্বারা রাজোপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। বস্তুতঃ, লোকে ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে

স্বতঃই “রাজা” বলিয়া থাকে, তাঁহার অপেক্ষা “রাজা” আর কে আছে? তিনি যে হৃদয়ের রাজা। মধুরায় ত্রিকুণ এইরূপ রাজাই হইয়াছিলেন।

এই পুরাতন ঐতিহাসিক রাজবাটী এখনও বর্তমান। যেখানে অধিরাজা স্মৃতিময়ের পবিত্র পদধূলি বিরাজ করিত, সে পুণ্যময় রাজবাটী এখনও সগর্বে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর সেই রাজবাটীরই ভিতর সেই অতুলনীয় কীর্তি-কলাপে মণ্ডিত হইয়া এখনও যে উপযুক্ত বংশধর কুমার হরিপ্রসাদ রায়বাহাদুর বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই প্রতিকৃতি আমরা বর্তমান সংখ্যা “আলোচনা”র পাঠকগণকে উপহার দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। স্বপ্নের বিষয় ইনিও সেই পুরাতন রাজবংশের অতুলনীয় কীর্তি বজায় রাখিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। যে মহৎ গুণের জন্ত এই বংশ বহুকাল হইতে অরণীয় হইয়া আসিতেছে, সেই বদান্ততা কুমার হরিপ্রসাদেরও যথেষ্ট আছে, এবং নানা প্রকার লোকহিতকর কার্যে ইনি সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। কুমার হরিপ্রসাদ মিষ্টভাষী, নানা প্রকার সদৃশ-মণ্ডিত এবং অমায়িক প্রকৃতিসম্পন্ন যুবক। সাহিত্যাত্মী হইলে এবং সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে ইহার যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ভগবান ইহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন।

ত্রিভুজেন্দ্রনাথ সোম, বি-এল।

সহঃ সম্পাদক।

## কবি-কুঞ্জ

অনন্ত-সাগর।

নীল পর্যাধিতে ক্ষুদ্র ফণ-মালা  
এক একে উঠি; একে একে মিশে;  
মাঝেতে শুধুই মধু-কল-তানে  
মিলে সবে তারা ক্ষণ-স্থ আশে।  
অনন্ত সাগরে যত সব প্রাণী,  
পর পর পর ওই উর্ধ্ব-মত,  
লভিয়া জনম, ক্ষণকাল পরে,  
আবার ডুবিয়া যাইছে নিয়ত।  
তারাও আবার, জীবনের মাঝে,  
জুড়াইতে শ্রম পান করি' হায়!  
মোহন-মধুর মিলন-অমিয়  
এক অন্ত সনে মিশাইতে ধায়।  
শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম, এ, বি, এল।

কামনা।

হেরিতে তোমায় আকুল পরাণ  
দেখা ত হে তুমি দাও না,  
কোথা হে প্রাণেশ! কেমনে বা আছ  
দেখিতে তোমায় পাই না।  
হৃদয়ের স্রোত বহিছে সতত  
ধোয়াতে তোমার চরণ,  
একটি বার ত আসনা গো তুমি  
হে মোর প্রিয় দরশন!  
হৃদয়ের দ্বার করিয়ে উন্মুক্ত  
জীবন-উষার আলোকে,  
অশেষিহি কত জীবন জীবন!  
নেহারিতে ওগো তোমাকে।  
হৃদয়ের মম আকুল উচ্ছ্বাস  
তোমারি প্রেমেতে মজিতে,  
বারেকের তরে দয়া করে ওগো।  
চাহ না ত তুমি আসিতে।  
আকুল বেদনা নয়নের বারি  
তোমারি উদ্দেশে বহিবে;

দেখিব না কভু হে মোর প্রাণেশ !

নয়ন ফিরায়ে চাহিবে ॥

ঐবিপিনচন্দ্র চৌধুরী কবিকুসুম কাব্যানিধি।

মায়া'র বঁধন ।

হায় মায়া ! কি কঠোর বঁধন তোমার !

কেমনে বাড়াই পা উপায় নাই আর ।

দারাপুত্র পরিবার

ঘিরিয়াছে চারিধার,

যে দিকে নেহারি শুধু আমার আমার ।

হায় মায়া ! কি কঠোর বঁধন তোমার !

পরায়েছ পায় বেড়ী,

শক্তি নাই নড়ি-চড়ি,

মুক্তি নাই যত দিন জীবন-সংসার ।

হায় মায়া ! কি কঠোর বঁধন তোমার ।

প্রভাতে উঠিয়া যবে,

ছেলেরা অশ্রুট রবে,

“বাবা” শব্দে বাক্য-সুখা টালে অনিবার ;

তখন সংসার ভুলে,

ছেলে-পিলে কোলে ভুলে,

অকৌমল সুধাধরে চুমি বার বার ।

হায় মায়া কি কঠোর বঁধন তোমার !

কাজ করি' দিবাশেষে,

ফিরে বরে দেখি এসে,

পাখা করে আছে বসে প্রেয়সী আমার ;

নিজেরে ভুলিয়া আমি,

ভুলিয়া অগত-স্বামী,

তাবি শুধু বার-বার আমার আমার !

হায় মায়া কি কঠোর বঁধন তোমার !

ঐযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস ।

প্রাণোচ্ছ্বাস ।

(কেন) আবরি ও তনু অন্ধ পরশনে

মদিরা-অলস নয়নে চাহিয়া ।

রিত্ত করিয়া সোণার স্বপন

পুলকিত কর কেন এ হিয়া ?

নিরাশায় শ্রান্ত ক্ষুদ্র মুরছনা

তানিয়া স্বপন বাজে বেহুত্রে ;

অতীতের সুখ বার্ষ কামনা

লব লয়ে স্থতি ভেসে যায় দূরে ।

(তখন) মরণ-কল্লোল নাচিয়া নাচিয়া

চারিধারে মোর বেড়িয়া বেড়ায়,

ভব আলিঙ্গনে উঠি যে কাদিয়া

(যেন) মেঘের কোলেতে হাসিটি লুকার ।

সরলতা লোটে নত্ন আননে

লজ্জা, বৈজ্ঞে, সিন্ত করিয়া হিয়া

মুগ্ধ কলহার ললিত আলিঙ্গনে

রুদ্ধ ক্রেশে উঠ না ত চমকিয়া ।

(আজি) মরণ-কল্লোল ঘেরে চারিধারে

জানায় আসি শান্তির বারতা ;

(তার) পর্জ্বল শুনি খোঁজে কাহারে

মুখে মাখি স্থির কাতরতা ।

ঐবলাইলাল মুনসী ।

শ্রদ্ধতত্ত্ব ।

শ্রদ্ধ সত্য। নানা দেশের পণ্ডিতগণ সেই

সত্য বিদ্যায় লইতে আসিয়াছেন। কেহ

স্মার্ত, কেহ বৈদান্তিক, কেহ নৈয়ায়িক কেহ

বা বৈয়াকরণিক। চারিদিকে চারি প্রকার

বিচার হইতেছে। স্মার্তগণ একাদশী তত্ত্বের

বিচার প্রসঙ্গে একাদশীর দিন বিধবার জলগ্রহণ

করা যাইবে কি না এতৎ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্র-

বচনের অবতারণা করিতেছিলেন। নৈয়ায়িক-

গণ ঘটাব্যবহিত্ত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ক্রতি-

কঠোর পরিতোষসম্মত দুর্কোণ্য ভাষার জাল

রচনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে তাক লাগাইতে-  
ছিলেন। বৈয়াকরণিকেরা কোন একটি ধাতু  
পদ শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সে বিষয়ে নানা ব্যাকরণের  
নানা শূত্র উদ্ধৃত করিয়া বিচার পরিচয় দিতে-  
ছিলেন। আর বৈদ্যাস্তিকগণ আত্মা এক ও  
অবিভীর্ণ্য প্রতি দেহভেদে পৃথকভাবে বিকাশ  
পায় মাত্র—এই তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য শত  
শত স্তোত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাই যুক্তি  
সাহায্যে ব্যবস্থাপিত করিতেছেন। চারি-  
দিকেই মহা কোলাহল। কেহ কাহারও কথা  
শুনিতেননা, সকলেই নিজের নিজের কথাই  
বলিতেছেন। কথার উপর কথা চাপান  
হইতেছে, কাজেই তর্কের কোন শৃঙ্খলা বজায়  
থাকিতেছে না।

এমন সময়ে সেই বিচার সভার মধ্যস্থলে  
শ্রাদ্ধকর্তার প্রবীণ ভ্রাতৃ মাতুল মহাশয় আসিয়া  
উপস্থিত হইলেন। তিনি বড় লোক এবং  
এক জন ইংরাজী শিক্ষিত দেশ প্রখ্যাত ব্যক্তি।  
তিনি হাত জোড় করিয়া কহিলেন,—

“মহাশয়গণ, এ শ্রাদ্ধ সভার ও সমস্ত রূপা  
তর্ক বিতর্ক না করিয়া কোন একটি প্রয়োজনীয়  
বিষয়ের অবতারণা করিয়া বাহ-বিচারে প্রবৃত্ত  
হউন। শ্রোতৃবর্গ বাহাতে বুদ্ধিতে পাবেন,  
বুদ্ধিরা তৃপ্ত হইতে পাবেন, এমনভাবেই বিচার  
করুন। ইহা শ্রাদ্ধ সভার শ্রাদ্ধ কি? শ্রাদ্ধ  
দ্বারা কি করা? শ্রাদ্ধ মৃত ব্যক্তির বাস্তবিক  
কি উপকার লাভন করে? শ্রাদ্ধ পিতৃগণের  
কি রূপ তৃপ্তিপ্রদ—এই সকল বিষয়ই মীমাংসিত  
হউক। সরলভাবে বুঝাইতে হইবে, সকলেই  
শুনিবেন।

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, সেই ইংরাজী  
শিক্ষিত মাতুল মহাশয়ই প্রথম করিবেন।  
বৈদ্যাস্তিকগণ সেই প্রশ্নের উত্তর দিবেন।  
উত্তর যুক্তিবৃত্ত হইল কিনা তাহার বিচারক  
নৈয়ামিক হইবেন। স্বার্থ ও বৈয়াকরণিকগণ  
শ্রোতা রহিবেন। আবশ্যক মত তাহার  
বলিবেন।

প্রশ্নকর্তা কর্তৃক প্রথম প্রশ্ন উত্থিত হইল—  
“শ্রাদ্ধ কি?” বৈদ্যাস্তিকগণ মধ্যে এক জন  
মুখপাত্র-ধরণ উত্তর দিবার জন্য সম্মুখে  
বসিলেন। উত্তর আরম্ভ হইল।

“শ্রাদ্ধ দীর্ঘতে যন্মাং শ্রাদ্ধং তেন  
নিগম্যতে।” মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধপূর্বক  
অমৃতের শাস্ত্রীয় কর্মই শ্রাদ্ধ। ইহা পিতৃযজ্ঞ।  
এই শ্রাদ্ধ দেবতাগণের অমৃতের মত পিতৃ-  
গণের প্রিয় ভোজ্য। শ্রাদ্ধ পিতৃগণ যে ঠিক  
ভোজন করেন, তাহা নহে; দৃষ্টি করেন মাত্র।  
ঐ দৃষ্টি দ্বারা ই তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ ঘটে।

“ন বৈ দেবা অমৃতমমৃন্তি অমৃতং দৃষ্টেব  
তৃপ্যন্তি।” (ছান্দোগ্য)

দেবতারা অমৃত পান করেন না, দৃষ্টি  
করেন মাত্র। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্থলদেহ  
লইয়া ত গমন করেন না যে, সত্য সত্যই অন্ন  
ভোজন করিবেন। স্থলদেহ ও ইন্দ্রিয় যে সময়ে  
থাকে না—সে অবস্থার শরীরের নাম সূক্ষ্ম-  
দেহ বা লিঙ্গ শরীর। লিঙ্গ শরীর বায়বীয়,  
সে শরীরে মনই কেবল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি লইয়া  
বিরাজ করে। স্থলদেহের বাবতীয় সংস্কার  
লইয়া প্রেত মনই লিঙ্গদেহে সেই সংস্কার দ্বারা  
চালিত হয়। সংস্কার বশতঃই মৃতের পান-



তোজনেন্দ্রা জন্মে। আবার সেই সংস্কারবশতঃ গান-তোজনেন্দ্রার পরিপূরণে তৃপ্তি, অত্যা অতৃপ্তি ঘটে। সংস্কারাক্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা, তাহার পূরণ অপূরণ জনিত সুখ দুঃখের সহিত প্রকৃত সুখ দুঃখের অন্তত্ববাঞ্চে কোন পার্থক্য নাই। ইন্দ্রিয়ও বিষয় সংযোগে উদ্ভূত বাহ্য ভোগ আর খাঁটি মানস ভোগে বাস্তবিক প্রভেদ নাই। বস্তুদর্শন জনিত লাভালাভ স্বপ্নে থাকে না, তাই মিথ্যা; জাগরণের মত উহা যদি স্থায়ী হইত, তবে স্বপ্নও জাগরণের মতই স্পৃহনীয় হইত।

মাতুল মহাশয়।—সংস্কার কাহাকে বলে ?

বৈদ্যাঙ্ক।—দেহীর জীবদশায় যে বাসনা-গুলি তৃপ্ত বা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, লিঙ্গদেহে তাহাই অনুপ্রতিত হয়। কাষ্যাক্ষয়ারী বাসনা-গুলি দেহীর চিত্তে চিহ্নিতবৎ অবস্থিতি করে, উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইলেই উদ্ভূত হইয়া থাকে—ইহাই সংস্কার। সংস্কারমূলকই স্মৃতি। সংস্কারের অপর নাম ভাবনা। দেহী যাহা যাহা করিয়া যায়, যে যে ইচ্ছা পূর্ণ বা অপূর্ণ করিয়া যায়, সেই সব মৃত্যুর পরও সংস্কাররূপে গমন করে। লিঙ্গদেহে দেহী সম্পূর্ণ পরাধীন। মূলদেহের মূল সংস্কার লিঙ্গদেহে মূল সংস্কার। মূলদেহের সংস্কার অত্যা করা পরাধীন মৃতের পক্ষে অসম্ভব। কৃতকর্ম অনুযায়ী যে জাতীয় অদৃষ্ট বা কর্মফল দেহী লইয়া যায়, তাহার বশে অবশ্য জীব সুখদুঃখ ভোগ করে। মূলদেহে যে যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ জনিত বুদ্ধিবৃত্তি, বিশেষ—জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল; লিঙ্গদেহে সেই সেই জ্ঞানেরই কার্য

হইবে।

তবেই দেখুন, মৃত্যুর পর মূল দেহাত্মক সংস্কারের গুণে মৃতের ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রেশ জন্মে। যাহারা জন্মবার জন্ত লালায়িত থাকে, তাহারা দেহাধেশ্বণাৰ্ণ নানাদিকে ভ্রমণ করে; কাজেই উজ্জ্বলিত ক্ষুধা তৃষ্ণা (অবশ্য সংস্কারমূলক মানসিক) হয়। আমরা শ্রাদ্ধ দ্বারা সেই ক্ষুধাতৃষ্ণার পূরণ করি। দেহের জন্ত মৃত ব্যক্তিকে যখন অপেক্ষা করিতে হয়, তখন তাহারা আকাশস্থ নিরালস্য বায়ুভুক হইয়া অবস্থিতি করে। অন্তরীক্ষে বায়ুর সহিত বায়বীয় দেহসম্পন্ন জীবগণ ঘুরিয়া বেড়ায়। ভূতযোনি বলিয়া আমরা যাহা-দিগের নামে ভয় পাই—ইহারা সে ভূতযোনি নহে। ভূতযোনি পৃথক, তাহার বিনাশ গয়াধামে পিণ্ড দ্বারা হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগ্রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়—কলিকাতা

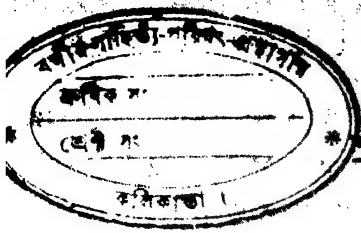
১৮৮১নং হারিসন রোডে চাট্‌জো কোম্পানীর দ্বারা উক্ত ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদীয় খাঁটি ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে, আমরা তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে গমন করিতে অনুরোধ করি। ইহাদের ঔষধ সমস্তই অকৃত্রিম এবং লাভফলপ্রদ। এই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ সকলে ভদ্র এবং সুশিক্ষিত। ইহাদের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা আমরা বিশেষরূপে জানি।



## আলোচনা ।



স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর ।



\* মালোচনা, দ্বিবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৫৬ সাল।

## গীতার তত্ত্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সমন্বয়।

সৃষ্টি এবং জয়, আত্মা এবং পরমাত্মাতে  
স্বল্প স্থাপন করিতে পারে, এমন সমগ্র জ্ঞান  
প্রাপ্ত হওয়া জ্ঞানার্জনের পরাকাষ্ঠা। কেবল  
'সৃষ্টি' শব্দ এতদূর ব্যাপক যে জড়-চেতন, যাহা  
কিছু আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত,  
সকলেরই সমাবেশ ইহাতে হইয়া যায়।  
সামান্য তৃণ হইতে একাধিক পর্বত পর্যন্ত, ক্ষুদ্র  
পিপীলিকা হইতে বিশালকার হস্তী পর্যন্ত,  
ভারকা হইতে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সকলেই সৃষ্টির  
অন্তর্গত। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম বস্তুর সর্বাঙ্গীন  
জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যখন মানুষের পক্ষে অসম্ভব,  
তখন এই সারা বিশ্বের যথার্থ জ্ঞান মানব  
কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে? পরন্তু  
ইহা প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রয়াস করাই যথেষ্ট  
জ্ঞানের সার্থকতা। কারণ ঈশ্বর জ্ঞানময়  
এবং যথেষ্ট ঈশ্বরেরই অংশ। যথেষ্ট কেন,  
যেখানে যেখানে জ্ঞানের অংশ (ইহা বস্তুই  
অন্তর্ভুক্ত না কেন) পাওয়া যায়, সেখানে  
সেখানে ঈশ্বরাত্মার অস্তিত্ব আছে বুঝা উচিত।  
অতএব আপনাদের জ্ঞানোত্তরের কারণ অথবা

আকর, জ্ঞানরূপী জগদীশ্বরের নিদর্শনের জন্য,  
উহাতে আপনার আত্মার সর্বের জন্য চেষ্টা  
করিয়া মানুষের সর্বাঙ্গোৎসাহ মনোবৃত্তি।

সৃষ্টি-স্থিতি-আদির নিরন্তর বৃদ্ধি এবং  
উহার দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্বের জ্ঞান  
জনপটলের উপর অর্জিত করিবার মানসে  
জ্ঞানার্জন করা তিন আর কোন সাধনা নাই।  
প্রকৃতির নিয়মে জ্ঞানবানদিগের সর্বাদেশ একই  
রকম সত্যতার অমূল্য হয়। জ্ঞান এবং  
সত্য প্রায় পরস্পরোপযোগী শব্দ। কারণ ইহা  
কথিত হইয়া থাকে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে  
সত্যের অমূল্য হওয়াই জ্ঞানের অমূল্য।  
যেটি কথা এই যে, সত্যের উপলব্ধিই জ্ঞান-  
প্রাপ্তি। যে সত্যের কোন নিয়মের সহিত  
স্বল্প আছে, সেই সত্যের অমূল্য হওয়ায়  
অর্থ ততটুকু জ্ঞানের অমূল্য করা। যদি  
কোন লোকের স্বল্প প্রাকৃতিক নিয়মের সত্য-  
তার জ্ঞান হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে  
যে তাহার পক্ষে কিছু আশ্চর্য আর থাকি-  
য়াই। অতএব সে লোক অসত্যের আশ্রয়

দরাইয়া—যায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া— মুক্ত হইয়া গিয়াছে; সে জ্ঞানময় ঈশ্বরের সদৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে; সে স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের জ্ঞান-প্রদীপ্ত য়ুনিয়টিগণ এইরূপ সত্যের অমুসন্ধানে সদাসর্বদা নিরত থাকিতেন। তাঁহারা জ্ঞানের বহু অংশ স্বায়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। যাহার ফলে সত্য-জ্ঞানের অংশ যত অধিক উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি তত অধিক ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানীদিগের গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের জ্ঞানাংশের অন্তরূপই সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এই সকল জ্ঞানাধেয়ীদিগের জ্ঞান-প্রাপ্তির মার্গ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ইহার কারণ রুচি, স্বভাব এবং সংস্কারের বিচিত্রতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাকে যে মার্গ ভাল লাগিয়াছিল, তিনি সেই মার্গে নিজ অভিষ্ট-সিদ্ধির উদ্যোগ করিয়াছিলেন। একের অপেক্ষা অধিক শাস্ত্র রচনা হইবার ইহাই কারণ; তত্রাচ শাস্ত্র যতই হউক না কেন, উদ্দেশ্য সকলের একই ছিল। উহা কি?— সত্যের উপলব্ধি বা সত্য-জ্ঞান প্রাপ্তি। কারণ জন্মের সার্বিকতা এবং পরমপুরুষার্থের সিদ্ধির ভিত্তি ইহার উপর র্ত্ত, ইহাই সেকালে বুঝা যাইত; এবং উহাই একালে বুঝা যাওয়া উচিত।

ইহাই আমাদের যত্নদর্শন এবং উপনিষদের সাধা বিষয়। উহাতে সত্যের অমুসন্ধান, সত্যের নিদর্শন এবং সত্য প্রাপ্তির সাধনার বর্ণনা ভিন্ন

ভিন্ন প্রণালীতে দেওয়া আছে। প্রাণিশাস্ত্র, শরীরশাস্ত্র, বনস্পতিশাস্ত্র, মানসশাস্ত্র প্রভৃতি যতপ্রকার আধুনিক শাস্ত্র আছে, উহাদের যদিও প্রধান সাধা বিষয় উহা নহে, তত্রাচ উহারাও সত্যের অমুসন্ধান এবং উপলব্ধির সাধন প্রভৃতিরই বর্ণনা করে। সত্য সর্বদা অব্যভিচারী। দেশ, কাল এবং পাত্রভেদে উহাতে ভেদ হইতে পারে না। সেইজন্য ইউরোপ, আমেরিকা, চীন এবং জাপানের চিন্তাশীল বিদ্বান ব্যক্তিগণও সত্যের অমুসন্ধান কবিত্তে করিতে সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে সকল সিদ্ধান্তে ভারতের দার্শনিক পণ্ডিত এবং অন্যান্য বিষয়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত উপনীত হইয়াছিলেন। সত্য যদি অব্যভিচারী না হইত—জ্ঞানের যদি একই রূপ না হইত—তাহা হইলে এমন আশ্চর্যজনক সংযোগ ঘটিত না। ভারতীয় পণ্ডিতদিগের ইহাই সিদ্ধান্ত যে আকাশ অনন্ত; ইহা ধ্রুব সত্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সত্য-সাধক বিদ্বানগণও ঠিক এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন।

পদার্থের বাহ্যরূতি বিভিন্ন হইলেও উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহতির নিয়ম একই রকমের সত্য-সূত্রে অমুসৃত। ইহা হইতে বিজ্ঞানার্থ্য সার জগদীশজ্ঞ বস্তু যে বনস্পতি শাস্ত্র সন্ধানিনী অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তাহাতে কখনও প্রাণিশাস্ত্রের সীমার ভিতর, কখনও শরীরশাস্ত্রের সীমার ভিতর এবং কখনও মানসশাস্ত্রের সীমার ভিতর পৌঁছিয়াছিলেন। তখন উনি জানিতে

পারিলেন এবং পরীক্ষার দ্বারা জগৎকে জানাইলেন যে সকলের মূলে একই সত্য নিহিত আছে ; সকলের নিয়মন এবং সংহরণ একই প্রকার নিয়মের দ্বারা হইয়া থাকে ; যেখানে ইচ্ছা তুমি অনুসন্ধান কর, সত্য জ্ঞান সর্বস্থানে একই রকমের পাওয়া যাইবে ।

শ্রীমদ্ভগবৎগীতাতে যে জ্ঞানের নিরূপণ আছে—তাহা শ্রীকৃষ্ণ কৃত হউক বা বাসুদেব কৃত হউক বা অন্য কোন লোকের কৃত হউক ; উহার নিরূপণ কর্ত্তা পূর্ণজ্ঞানী না হউন, তিনি একজন যে বিশিষ্ট জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, তাহাতে অগ্রমাত্র সন্দেহ নাই । সত্যজ্ঞানের আশোকের দ্বারা তাঁহার হৃদয়রোজ সম্পূর্ণরূপে বিকসিত ছিল । জ্ঞানপ্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন মার্গ তিনি ভেদপক্ষেই অবগত ছিলেন । কারণ তিনি গীতাতে তৎকালীন জ্ঞাত ঐ সকল মার্গের নির্দেশ করিয়াছেন এবং স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে মার্গ ভিন্ন হইলেও সাধ্য সকলকার এক । মার্গভেদ কেবল অধিকারভেদ নৃচক । অর্জুনকে গীতাকার নিকট কৰ্ম্মের অধিকারী বুদ্ধিমান ছিলেন । সেইজন্যই অর্জুন যাহাতে সেই মার্গ দ্বারা আপনার ইষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন, তিনি প্রোঞ্চল ভাষায় তাহাই উপদেশ দিয়াছিলেন । কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য মার্গেরও উল্লেখ করিয়াছেন । উহার কারণ এই যে সত্যজ্ঞান প্রাপ্তি—যাহাকে এক কথায় মুক্তি বা মোক্ষ বলা যাইতে পারে অন্য মার্গের সাহায্যেও হইতে পারে । কিন্তু উপস্থিত অবসর এবং পাত্র বিশেষের পিচ্ছর করিয়া অর্জুনকে

তিনি অন্য মার্গ অবলম্বন করান যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই । তিনি সম্যক বুঝিয়াছিলেন যে অর্জুনের পক্ষে কৰ্ম্মযোগ নামক মার্গ সাধ্য সিদ্ধির জন্য প্রশস্ত ।

উপনিষদ মীমাংসা, বেদান্ত এবং যোগ-শাস্ত্রের আনোচনা এবং গীতা নিরূপিত সিদ্ধান্তের দ্বারা ঐ সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের তুলনা করিলে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে সাধ্য সকলকারই এক । নূনাধিক মাত্রার সত্যজ্ঞানের উপলব্ধি সকলেতেই এক প্রকার । যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে ঐ সকল শাস্ত্রার্থিত প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত গীতার সিদ্ধান্তের সহিত এত সামঞ্জস্য হইত না । পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের দ্বারা রচিত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল মিলাইয়া দেখিলে এই কথা অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় । ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দ্বারাও এই সকল শাস্ত্রকারগণ অনেকাংশে ঐ সকল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন । যে সকল মীমাংসা গীতার এবং অগ্গাভ ভারতীয় শাস্ত্রের গোচরের বস্তু । যদি সত্য সর্বস্থানে এবং সর্ব সময়ে অব্যাহত না হইত, তাহা হইলে এমন সম্ভব কখনও অসম্ভব হইত না ।

ষড়দর্শন, উপনিষদ এবং পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে এবং গীতার সিদ্ধান্তে যে কোন কোন স্থানে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তাহারও বিশিষ্ট কারণ আছে । জ্ঞানের উল্লোম সকলেতে এক রকম হয় না । জ্ঞানান্বেষণের উন্নতি অনুসারে সত্যের অনুসন্ধান মনুষ্য কৃতকার্য হইয়া থাকে । এমন অবস্থায় যেখানে সেখানে

ভেদভাব হইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। কাহার সিদ্ধান্তে কতটুকু এবং কোন কোন স্থানে ভ্রম অথবা প্রমাদ আছে, ইহা বলিয়া দেওয়া বিজ্ঞানচর্চায় কঠিন। খুব সম্ভবতঃ এই সকল শাস্ত্র মন্ত্ৰস্তোর ভিন্ন ভিন্ন ক্রটি, অসঙ্গ, শিক্ষা এবং সংস্কার অনুসারে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অতএব যে সকল ভেদ ভ্রম বিরোধভাস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা বাস্তবিকই অধিকারী ভেদ সূচক মাত্র।

গীতাতে প্রায়ই সকল শাস্ত্র-জ্ঞানের সমন্বয় দেখিয়া ইহাই বলিতে হয় যে জ্ঞানার্থে যিদিগের পশ্চীমজনের জ্ঞান উৎসাহের অধিক উপযোগী গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। তৎকালীন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, —সর্বশাস্ত্রান পরিভাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সমুদায়ের নিকট এই অকিঞ্চিতকর সাক্ষ্যেরও গনির্ভর্য প্রার্থনা—অন্ধজ্ঞানং পরিভাজ্য গীতাজ্ঞানং অমাপুহি।

ও শান্তি ও শান্তি ও শান্তি।

শ্রীকালিচরণ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব  
এম্-এ (প্রভ.)।

## প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্রজীবন।

ছাত্রজীবনই মনুষ্যজীবনের ভিত্তিস্বরূপ। ছাত্র-জীবন সেরূপভাবে গঠিত ও পরিচালিত হইবে, যাহা বড় উন্নয়ন হইবে। ছাত্রজীবন মানব-জীবনের এক মূল্যবান অধ্যায়। এই অধ্যায় যতদূর সম্ভব উন্নত হইবে, প্রকৃত মনুষ্য হওয়া যায়। ভবিষ্যৎ-জীবনের সুখ-দুঃখ এই অধ্যায়ের উপরেই নির্ভর করে।

শুধু তাই নয়, ছাত্রজীবনের সুগঠন ও পরিচালনার উপরেই দেশের এবং মানব-জাতির মঙ্গল-অমঙ্গল, উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। ছাত্রেরাই দেশের আশা-ভরসা-স্থল—ভবিষ্যতে তাহাদিগকেই দেশের নেতৃত্ব ও অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং ছাত্রজীবন বড় দায়িত্বপূর্ণ। সুখনিদ্রায় অতি-বাহিত করিবার জ্ঞাত ছাত্রজীবন নহে। কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের জ্ঞাত ছাত্রজীবন।

মনুষ্যস্বভাব লাভ করা মানুষ মাত্রেই উদ্দেশ্য। এই মনুষ্যস্বভাব বিকশিত করিবার জ্ঞাত দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয়। ছাত্র-জীবনে এই মনুষ্যস্বভাবের পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হয়। বলিতে গেলে, ছাত্রজীবনেই এক রকম জীবনের গতি নিরূপিত হইয়া যায়।

যে দেশে যে পরিমাণে ছাত্রজীবন সুগঠিত করে, সেই দেশ সেই পরিমাণে উন্নত হয়। জাপানের উন্নতির কারণ অনেকাংশে ইহাই।

এক দেশের পক্ষে এক সময়ে যাহা উপযোগী, অল্পদেশের পক্ষে অল্প সময়ে তাহা উপযোগী নাও হইতে পারে। ইহা বুঝিতে না পারাই যত বিরোধের কারণ। ইহা বুঝিলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়।

প্রাচ্য বলিতে অবশ্য ভারতের কথাই আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে ধরিব। কারণ চীন-জাপান প্রভৃতি দেশের জ্ঞান আমাদের খুব অল্পই আছে। আর পাশ্চাত্য বলিতেও আমরা ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য কোন দেশের বিষয় এক রকম কিছুই জানি না। সুতরাং, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিতে ভারত ও ইংলণ্ডই

আমরা বিশেষভাবে ধরিব।

এখনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্রজীবনের বিশিষ্টতা, দোষগুণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কি, দেখা যাক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্র-জীবনের তুলনা করিলে আমাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়। সকল জিনিসের পক্ষেই ইহা খাটে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছাত্রজীবন তুলনা করিলে আমাদের নিজ দোষ গুণ দেখিতে পাইব এবং পরস্পরের নিকট কি কি শিক্ষণীয় আছে বুঝিতে পারিব। আমাদের দোষ-গুণ আমরা নিজে বুঝিতে পারি না, কিন্তু অন্যে তাহা বেশ বুঝিতে পারে। নিজের অবস্থা অন্যের তুলনায় অনেকটা বুঝা যায়। ইহা অল্প লাভ নয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রথমেই বেশ একটি স্পষ্ট বিভিন্নতার উপগন্ধ হয়। সর্ব-বিষয়ে প্রাচ্য অন্তর্মুখ এবং পাশ্চাত্য বহির্মুখ। ধর্মজগতে প্রাচ্যের এবং কর্মজগতে পাশ্চাত্যের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। সমস্ত দেশেই দেশের চিন্তা ও কর্মসূচ্যসমূহ ছাত্রজীবন গঠিত ও পরিচালিত হয়; তাই, প্রাচ্য-ছাত্র অন্তর্মুখ এবং পাশ্চাত্য-ছাত্র বহির্মুখ। প্রাচ্য-ছাত্র জীবন ধর্মজগতের এবং পাশ্চাত্য-ছাত্রজীবন পার্থিব সাফল্যজগতের উপযোগী করিয়া গঠিত হয়। এখন যে সেরূপ না হয়, তাহা নয়। তবে, বিংশশতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যে সংঘর্ষ হইয়াছে—তাহার ফলে প্রাচ্য অনেকটা পাশ্চাত্যের মত আদর্শলাভ করিয়াছে, কিন্তু সর্বোচ্চ নয়, এখনও চিরন্তন ধর্মের ক্ষুদ্র-পক্ষ প্রাচ্যের অন্তরে অন্তরে বহিতহে।

প্রাচ্য-ছাত্র পাশ্চাত্য-ছাত্রের আদর্শ-লাভ করিতে বসিয়াও, এখনও তাহার ধর্মের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

সব দিকেই দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য-ছাত্র পার্থিব বিষয়েই উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। প্রাচ্য-ছাত্র যেক্রম ধর্মের প্রভাব অসুভব করে, পাশ্চাত্য-ছাত্র সেইরূপ বিশেষভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাব অসুভব করে। প্রাচ্য ধর্ম-পরায়ণ ও যোদ্ধাকামী এবং পাশ্চাত্য রাজনীতি পরায়ণ ও পার্থিব উন্নতিকামী। অধিকাংশ পাশ্চাত্য ছাত্রের বড় বড় রাজনৈতিক এবং দেশের নেতা হওয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য প্রদেশ বেভাবে অনুপ্রাণিত, তাহার ছাত্রও যে তদনুরূপ হইবে তাহাতে বৈচিত্র্য কি? আর প্রাচ্য ধর্মসুযোগী, তাহার ছাত্রও ধর্মবীর হইবার জন্য বহুগুণ হইতে সাধনা করিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে বহু ধর্মবীরের জন্মও হইয়াছে। আর, পাশ্চাত্যে বহু শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিকের অভাব হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, দেশের উদ্দেশ্য ও ধর্মের অনুযায়ী ছাত্রজীবন গঠিত হয়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্যের ষাট-প্রতিষাতে প্রাচ্যে এক নব আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহার ফলে, প্রাচ্য ছাত্রেরও দেশের নেতা এবং বড় বড় রাজনৈতিক হইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্যের চিরন্তন ধর্ম-ভাব, এখনও পূর্ণমাত্রায় বিত্তমান।

ধর্মই জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু। ভারতীয় ছাত্র এখনও এই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া আছে। ভারতীয় ছাত্রজীবন পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে এখনও যুগ-যুগান্তের নিজস্ব ধর্মভাব হারা নাই।



পাশ্চাত্য-বিধানের অনুরূপ। ভারতে অনেক বিদ্যালয় প্রকৃতি স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে, ভারতীয় ছাত্রজীবন পাশ্চাত্য-শ্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্যের ন্যায় এদেশের ছাত্রেরাও ক্রমশঃ বিপ্লববাদী, রাজনৈতিক প্রকৃতি হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ছাত্রজীবন অনুকরণ করিতে বাইরা প্রাচ্য-ছাত্র তাহাদের দোষের অনুকরণই বেশী করিয়াছে। গুণটা বড় বেশী ধরে নাই। আধুনিক প্রাচ্য-ছাত্র আর পূর্বের ন্যায় বিনয়ী, নিরহঙ্কারী, ধর্ম্মাহুতাগী ও সংযত ব্রহ্মচারী নয়। আজকাল আর প্রাচ্যের ছাত্র পবিত্রতার প্রতি-বৃত্তি বলিয়া দেশবাসীর প্রশংসা হয় না। মধুর সামগান ও বন্দনাগীতি আর প্রাচ্য-ছাত্রের মণ হইতে নিঃসৃত হয় না। আর দেশবাসী তাহাকে দেব-খালক বলিয়া ভক্তি করে না। অতীতের সেই মহান, গৌরবময় ভারতীয় ছাত্রজীবন আজ অন্তিমিত। আর সেই দেবদত্তময় ছাত্র-জীবন প্রাচ্য-ছাত্রের মনে পড়ে না। কখনও কখনও সেই পবিত্র ছবি স্বপ্নের ন্যায় মনের ভিতর ভাসিয়া উঠে যাত্র। পাশ্চাত্য-ছাত্রের গুণ ছাড়িয়া দোষ অনুকরণ বাতীত ইহার কারণ আর কিছুই নয়। প্রাচ্য-ছাত্র আপ-নার শ্রেষ্ঠ সেই ধর্ম্মভাব ভুলিয়া গিয়া, সংযম ও ত্যাগ, বিনয় ও নিকাম বিদ্যাল্য লাভ ছাড়িয়া—পাশ্চাত্য-ছাত্রের বাহু-সৌষ্ঠব, বিলাস-বাসনার, বিদ্যার রুখা অভিমানে আকৃষ্ট হইয়াছে। অতঃপর সকল পাশ্চাত্য-ছাত্রের পক্ষে একথা বলা যায় না; কিন্তু পাশ্চাত্য ছাত্রজীবনে এই সকল যথেষ্টাচার ও ধোকাই বড় বেশী

দেখা যায়। পাশ্চাত্য-ছাত্র বিপ্লব ও হঠ-কারিতায় যে অগ্রণী তাহা বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। উত্তেজনা, দেশবাপী আন্দোলন ও বিদ্যার বাহ্যিকতা লাভ পাশ্চাত্য-ছাত্রের কাম্যবস্ত। বিনয়, সংযম ও ত্যাগকে পদ-দলিত করিয়া কেবল বিদ্যাল্যভাই যেন তাহাদের শ্রেষ্ঠ আকাজিক বস্ত। কিন্তু মূঢ় আমরা, তাই ভুলিয়া যাই যে, “বিদ্যা বিনয়ং দদাতি।” অবশ্য পাশ্চাত্যের সকল ছাত্রকে অবিনয়ী, যথেষ্টাচারী প্রকৃতি বলা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি; সমস্ত পাশ্চাত্য-ছাত্রকে এই অপবাদ দিলে অবিচার করা হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে এই উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেষ্টাচার বিশেষরূপে দেখা যায়। প্রাচ্য ছাত্রজীবনে ঐসব খুব কমই ঘটে। পাশ্চাত্যের প্রবল সংস্কারের পূর্বের প্রাচ্য ছাত্রজীবনে ঐ বিদেশীয় ভাব একেবারেই ছিল না। সুতরাং আজকাল ভারতে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, তাহার জন্য পাশ্চাত্য-শিক্ষাই দায়ী।

আধুনিক ভারতীয় ছাত্র যদিও পাশ্চাত্য-ভাবে ক্রমশঃ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে, তথাপি তাহারা নিজের চিরন্তন, ধর্ম্মভাব একেবারে বিসর্জন দেয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত ভারতীয় ছাত্র এখনও চরিত্র ও ধর্ম্মবলে জগতের অগ্র ভাত্যর ছাত্রের অধঃস্থানীয়। আজকাল ভারতের অধিকাংশ ছাত্র পাশ্চাত্য-ছাত্রের ভায় বিদ্যার দোড় দেখাইয়া বশকী হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু নিম্নত্রে বিদ্যাল্যভ করিয়া বহু মহৎগুণে জগতবাসীর ঐতি ও প্রভা আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু ভারতীয়

ছাত্র জীবনেও যে অবনতির কীট প্রবেশ করে নাই, এমনও বলা যায় না। ভারতীয় ছাত্র কেবল মানসিক শক্তির পরিচালনা করিয়া শারীরিক সামর্থ্যে হীন হইয়া পড়িতেছে;—“শরীরমাগ্নং থলু ধর্মসাধনম্”—এই মন্ত্রের প্রচার যে ভারত একদিন করিয়াছিল, আজ সেই ভারতই উহা অদৃষ্টের পরিহাসে নিস্কৃত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া জগতের শিক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের কেবল পুঁথিগত বিদ্যালয়ভূমি হইতেছে, কিন্তু লব্ধবিদ্যা কাজে লাগিতেছে না এবং উহা হইতে দেশের কোনও প্রকৃত উপকার বড় একটা হইতেছে না। তারপর, পাশ্চাত্য-ছাত্রের গুণ ছাড়িয়া দোষ অশুভকর করিতে যাইয়া প্রাচ্য-ছাত্র অবিনয়ী, যথেষ্ট-চারী, অহঙ্কারী ও বিপ্লবপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে; চরিত্রের ভিত্তি ও ধর্মের বন্ধন শাখল হইয়া যাইতেছে। ধর্মবল হারাইলে প্রাচ্য-ছাত্রের অস্তিত্বও বোধ হয় লোপ পাইবে। আমরা চাই যে, ছাত্রগণ বিনয়ী, নিরহঙ্কারী হউক,—কিন্তু আমরা চাই না যে, তাহারা নিজেই “গোবেচারী ভাল-মানুষ” হউক। সুখের বিষয়, দেশে জাগরণের দিন আসিয়াছে, প্রাচ্যের স্বাভাবিক আদর্শমুখারী বিদ্যালয়, দেশে স্থাপিত হইতেছে। ইহা একটা শুভ লক্ষণ! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্রজীবনের বথার্থ সম্মিলনে যে পূর্ণ ছাত্রজীবন গঠিত হইবে, তাহা অতি সুন্দর ও জগতের প্রকৃত হিতকারী হইবে।

পাশ্চাত্য-ছাত্রের দোষের কথাই আমরা বড় বেশী বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের নিকট কি প্রাচ্য-ছাত্রের কিছুই শিখিব্য নয়? আর, প্রাচ্যের নিকটও কি পাশ্চাত্য-ছাত্রের কিছুই শিক্ষণীয় নাই?

দোষ-গুণ উভয়েরই আছে; জগতে কেহ সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে—তবে ইহার কম-বেশী আছে। প্রকৃত ছাত্র আকৃতি ও প্রকৃতিভেদেও সর্বত্রই এক এবং পাশ্চাত্য-ছাত্রদের মধ্যেও ধর্মবীর আছে—তবে প্রাচ্যের তুলনায় বড় কম। কিন্তু পাশ্চাত্য-ছাত্রের কর্মবীরের তুলনায় প্রাচ্য হীনপ্রভ। পাশ্চাত্যদেশে ছাত্রদের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত কর্মী যুবক দেখা যায় যাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের প্রবল আত্মনির্ভরতা, নির্ভীকতা, পরোপকারেচ্ছা ও সজীবনা দৈর্ঘ্য তাহাদিগকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, তাহাদের মধ্যেই বীরত্ব ও যুগ্মত্ব ক্রীড়া করিতেছে; তাহারা ইমানুষের মত মানুষ। জীবন—তাহারাই প্রকৃতরূপে উপভোগ করিতেছে। যুগ্মজ্ঞান গ্রহণ করা তাহাদের সাধক।

আর আমরা কি হইয়াছি? শরীরে দুর্বল আমরা—কি করিতে পারি? যেজন্য জগৎ-বাসীর নিকট আমরা দৈবতা বলিয়া পরিচিত হইতাম—সেই চরিত্র ও ধর্মবল আমরা হারা-ইতে বসিয়াছি। আমাদের জীবন আলস্পন্দনহীন—বৈচিত্র্যবিহীন।

পাশ্চাত্য আল এই বিষয়ে প্রাচ্য হইতে কত উচ্চে তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহার মূলে দুইটি কারণ বর্তমান! সে দুইটি বেশ স্পষ্ট।

পাশ্চাত্য প্রবল রকোঙে সজীব; আর প্রাচ্য তাহার গৌরবময় ও শ্রেষ্ঠ সহগুণ—বাহাকে যুগযুগান্ত হইতে অবলম্বন করিয়া জগতের পূজা পাইয়া আসিতেছে,—সেই ভাবে বিসর্জন দিয়া, প্রাচ্য আজ আপনাকে তত্ত্বমাঙে নিমজ্জিত করিতে বসিয়াছে। তামসিকতা পক্ষাঘাতের জ্বর প্রাচ্যকে গ্রাণহীন, নিম্পন্দ করিয়া তুলিতেছে। প্রাচ্য-ছাত্রের সেই গৌরবময় অতীতের আর কিছুই নাই। রকোঙের চিরপূজারী পাশ্চাত্য—আজও সজীব, আজও তাহারা জীবনকে উপভোগ করিতেছে। কিন্তু উহার অবশুস্তাবী উচ্ছ্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে;—কর্মজোতে ধর্ম ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্যে যেন একটা কিসের অভাব অনুভূত হইতেছে। বোধ হয় প্রাচ্যের নিকট পাশ্চাত্যের ধর্ম-শিক্ষার্থে দীক্ষার্থণ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যের প্রবল কর্মজোত ও প্রাচ্যের চিরন্তন ধর্মজোত যখন মিলিত হইয়া এক জীবনী শক্তিময় প্রয়াগ-ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিবে—তখনই জগতের উন্নতি অতি সহজ-সাধ্য হইয়া আসিবে; তখনই জগতের ছাত্র ও গুরুজীবন পূর্ণতালাভ করিবে। তখনই বৃথিবীতে প্রকৃত ছাত্রের এক বিরাট দল দেখা দিবে। বেশ দেখা যাইতেছে যে, প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয়ের নিকটই পরম্পরের বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। কাহাকেও অবহেলা করান যায় না। তবে উভয়ের দোষ-গুণের মধ্যে ভিন্ন-বৈধি আছে।

পাশ্চাত্য-ছাত্রজীবনে আর একটা বিশিষ্টতা

দেখা যায়। সেখানে অধিকাংশ ছাত্রই আজীবন ছাত্রজীবন অবলম্বন করিয়া কোন এক অন্তিমিত বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য ধৈর্যের সহিত পরিশ্রম করিয়া থাকে। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের লেখাপড়ার শেষ হয় না। তাহারা চিরকাল ছাত্র—আজীবন বিদ্যার্থী। কিন্তু আজ কাল ভারতে ঠিক ইহার বিপরীত দেখা যায়। এখানে অধিকাংশ ছাত্রেরই বিদ্যালয়ের পড়া শেষ লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রজীবন শেষ হয় এবং কয়েক বৎসর পরেই অনেকে সংসারী হইয়া পড়ে; সমস্ত লক্ষ-বিদ্যা অক্ষিপের কেরাণীগিরিতে পর্য্যবসিত হয়। কষ্ট-শ্রমার্জিত বিদ্যা—কেবল অর্থকরী ব্যবসাদারের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বহু পরিশ্রমের ফল এই বিদ্যার একপভাবে অপব্যবহার হয়। কিন্তু উপায় নাই। ভারতবাসী যতদিন না আবার পূর্বের মত অনায়াসে উদ্যোগের সংস্থান করিতে পারিবে—ততদিন ঐরূপ ঐকান্তিক বিদ্যার্জন ও ছাত্রজীবন এদেশে দেখা যাইবে না। অতীতে, প্রাচ্যে একরূপ গৌরবময় ছাত্রজীবনের অভাব ছিল না। আজকালও যে এদেশে ঐরূপ ছাত্র নাই—তানয়; তবে, প্রাচ্যের তুলনায় সাগরের জল-বিন্দু বৎ বলিলেও অত্যাধিক হয় না।

আজকাল আমরা সামান্য একটু ইংরেজী বুলি ও লেখাপড়া শিখিলেই বড় বিদ্যাভিমানী হইয়া পড়ি। কোনরূপ দৈহিক পরিশ্রম করিলে মনে করি মানহানী হইল। রেল বাওয়া আসার সময় নিজের ছোট পুঁটলিটি

লইতে লজ্জা বোধ করি; বাজার হইতে পাঁচ সের চাল আনিতে “লোকে কি বলিবে” ভাবিয়া বিচলিত হই। আরও কত কি !

কিন্তু পাশ্চাত্য ছাত্র ঠিক ইহার বিপরীত। পূর্ণোক্ত কাজ করিতে তাহারা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ তো করেই না, বরং ঐরূপ কাজ করিতে পারিলে আনন্দিত হয়। তাহারা মোট বহিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। বাঙ্গালার আদর্শ-ছাত্র, পূজনীয় স্বর্গীয় বিখ্যাসাগর মহাশয় আমাদেরকে ঐটি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন।

পাশ্চাত্য ছাত্রের এই নিরভিমান পরিশ্রম আমাদের শিক্ষণীয়। প্রাচ্যের অতীত যুগে ঐরূপ ছাত্রের অভাব ছিল না। ঐরূপ পরিশ্রম করিতে তাহারা একটুও লজ্জা বোধ করিত না। তাহারা বিতর্কী এবং দেশ-সেবক উভয়ই ছিল। আতুর ও বিপন্ন নরনারী তাহাদের মুখ চাহিয়া থাকিত। তাহাদের নিকট “জর্জনো জন্মভূমিঞ্চ স্বর্গাদপি পরীক্ষ্যমী” ছিল। দেশের সেবায় আপনাকে রুতাপ মনে করিত। অতীতের প্রাচ্য ছাত্র-জীবনের এই সুমহান আদর্শ লাভ করিয়া পাশ্চাত্য ছাত্র আজ জগৎ-পূজ্য। আমাদের মধ্যেও ঐ উচ্চতাব ধীরে ধীরে আবার প্রবেশ করিতেছে। প্রাচ্য ছাত্র আবার নিরভিমান দেশ-সেবক হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্যই আজ আমাদের এই বিষয়ে শিক্ষাগুরু। আমাদের অতীতের সেই উচ্চ আদর্শ—সেই বিশ্বত ছাত্রজীবনের গৌরব-গাথা পাশ্চাত্যই মনে পড়াইয়া দিতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছাত্রজীবনে বহু বিভিন্নতা—

বহু বিরোধী ভাব দেখা যায়। মনে হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জগতের বিশ্বয়ের বিষয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—বহু জ্ঞান গরিমাময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—সম্পূর্ণ বিরোধ-ভাবাপন্ন। বিধাতার সৃষ্টি কি বৈচিত্র্যময়! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই গভীর বিভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া ‘নোবেল’-পুরস্কার-প্রাপ্ত রাডার্ড কিপ্লিং (Rudyard Kipling) সাহেব বলিয়াছিলেন যে,—

East is East, and West is West,

And the twain can never meet.

প্রাচ্য প্রাচ্যই এবং পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই; দুইটীতে কখন মিল হইতে পারে না। প্রাচ্যের গৌরবোজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথকে ‘নোবেল’-পুরস্কার দিয়া পাশ্চাত্য তাহার ঐ উক্তি বিফল করিয়াছে। জগৎ দেখিল যে, অস্ত্র বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মিলন হোক বা না হোক, সাহিত্য-ক্ষেত্রে হইতে পারে। জগৎ দেখিল যে, দুই সম্পূর্ণ বিরোধভাবও সময় আসিলে মিলিতে পারে। জগৎ-সভ্যতার লীলা-স্থল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—ধর্ম ও কর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তীতে গৌরবাধিত প্রাচ্য পাশ্চাত্য, যে দিন গঙ্গা-যমুনার তায় মিলিত হইবে, সেদিন বহুদূর দূর হইবে—বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইবে। জগৎ সে দিন এক বিচিত্ররূপ ধারণ করিবে; মানব-সভ্যতা সেদিন পূর্ণাঙ্গ হইয়া মহাসাগরাভিমুখে ছুটিয়া যাইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার এই দুই বিশাল স্রোত-ধ্বনি, যেদিন মিলিত হইবে, সেদিন জগতে এক নব আদর্শের সৃষ্টি হইবে। সৃষ্টির প্রারম্ভ

হইতে জগৎ যে মিলনের দিকে  
ভাষা লাভ করিয়া যত্ন হইবে। সেই দিনই  
বিধাতার আশ্রয় বিধানের চরম সাধিত  
হইবে। অদূরবর্তী সেই সমুদ্ভূত গৌরব-  
দীপ্তিময় মহামিলন কবে জগৎ দেখিবে! \*

শ্রীনীহার রায় ।

## প্রণয়-চিত্র । ❀

“দুর্গেশ-নন্দিনী”র মূখ্য উদ্দেশ্য কতকগুলি  
প্রণয়-চিত্র-প্রদর্শন। সেই চিত্রাবলীর মধ্যে  
চারিটি চিত্র সহজেই আমাদের নয়নাকর্ষণ  
করে—(১) আয়েষা, (২) তিলোত্তমা, (৩)  
বীরেন্দ্র সিংহ এবং (৪) ওসমান। আমরা পর  
পর এই চিত্রগুলির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে  
চেষ্টা করিব।

১। আয়েষা—আয়েষার প্রণয় অনন্ত—  
অসীম। শত্রু-মিত্র, আত্ম-পর, স্বপ্না—বিধর্মী,  
বিক্রোতা-বিক্রিত প্রভৃতি যে সব বৈধ ভাব  
অসংখ্য সীমা-বেষ্টনের দ্বারা মানব-সংসারকে  
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আয়েষার প্রণয়  
সে সকলের অতীত। বীরেন্দ্র সিংহ তাহার  
কে? শত্রু, পর, বিধর্মী, বিজিত। কিন্তু  
তবুও তাহার প্রণয় বীরেন্দ্র সিংহোন্মুখী।

আয়েষার প্রণয় স্থির ও গভীর। স্বল্প-

\* ২৩শে চৈত্র, ১৩২২, গোহাটী ‘ছাত্রসম্মিলনীর’  
সাপ্তাহিক অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি চক্রবর্তী  
বেদান্ততীর্থ, বেদান্তমত, এম্. এ. মহাশয়ের সভাপতিত্বে  
পঠিত।

\* ইংরেজী ১৯১১ সালে রিশন কলেজ ডিবেটিং ক্লাবে  
লেখক কর্তৃক “দুর্গেশনন্দিনীর চরিত্র সমালোচনা” শীর্ষক  
অধিক পঠিত হয়, তাহা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল।

সলিলা তটিনী স্বভাবতঃই চঞ্চলা ও কল্লোলময়ী  
বলিয়া কি ঐ অতলস্পর্শ পরোনিধিও সেইরূপ  
হইবে? কখনই নহে। তাই আয়েষার প্রণয়-  
পারাবারে চাঞ্চল্য নাই, হাস-বুদ্ধি নাই,  
কোলাহল নাই। তবে মনোবৃত্তিসমূহের স্ব  
স্ব প্রকাশিকা ভাষা আছে, তাই আয়েষার, ঐ  
অনন্ত প্রণয়েরও ভাষা আছে। সে ভাষা  
তাহার নীরবাক্ষধারা ও অনন্তভাবময়ী  
নিশ্চকতা—কেবল মাত্র কতকগুলি সমস্ত-গ্রথিত  
শব্দগুচ্ছ নহে। যেখানে ভাব অনন্ত, সেখানে  
ভাষা শব্দময়ী হইতে পারে না, কেননা কথা  
যতই অবয়ব প্রসারণ করুক না কেন উহা  
কখনও অনন্ত ভাবের অনন্তত্ব পাইতে পারে  
না। বস্তুতঃ এক বিন্দু অশ্রুতে যত ভাব  
আছে, একখানি পুস্তকে তত ভাব পাওয়া  
যায় না—এক মুহূর্ত নিশ্চকতার যতটুকু হৃদয়-  
ভাব প্রকাশিত হয়, এক প্রহর সুদীর্ঘ ভাষণে  
ততটুকু হয় না। আয়েষা কারাগারে জগৎ-  
সিংহের সম্মুখে একবার কয়েক বিন্দু নীরবাক্ষ-  
পাত করিলেন—জগৎসিংহ বুঝিলেন যে, সে  
কণিক ব্রোদনে কি ভাব আছে—বুঝিলেন  
সেটা আয়েষার ঐ অনন্ত প্রণয়-ভাব। তার  
পর আবার জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার  
মিলন ঘটাইয়া আয়েষা নীরবে একবার  
কাদিলেন—আমরা বুঝিলাম, সেটা তাহার  
ঐ অনন্ত প্রণয়ভাব।

আয়েষার প্রণয় ত্যাগোচ্ছল—নির্মল।

ইহাতে ঘৃণিত, পুতিগন্ধময়, কাম-কলুষ নাই—  
সেই দেব-হৃদয়, সৌরভময়, আত্ম-বিসর্জন  
যাহার পবিত্র হোমায়িতে পূত হইয়া কলঙ্ক

মানুষ দেবতার পদে সমাক্রম হইতে পারে। আয়েষা স্বপ্রণয়-প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করিয়া জগৎসিংহকে প্রণয় দান করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি জগৎসিংহের আশা করেন না। কথাটা যথার্থ। কিরূপেই বা করিবেন? জগৎসিংহ যে রাজপুত—তিনি যে যবনী—প্রতিবন্ধকতা যে পর্ত্ত-প্রমাণ; এ সমস্ত তিনি ভালরূপেই জানিতেন এবং জানিয়া শুনিয়াও জগৎসিংহকেই ভাল-বাসিয়াছিলেন। এইখানে আয়েষাকে ঘোর বিজন বেষ্টিতা কাঁসার মধ্যবর্ত্তিনী এক কুমুদিনী বলিয়া বোধ হয়। কুমুদিনীকে সুধাকর অনাদর করিয়া তারকাকেই প্রেম-সুখা ঢালিয়া দেয়। তারকাই তাহার প্রেমিকা—কুমুদিনী নহে। কিন্তু কুমুদিনী এরূপ অনাদৃত হইয়া নীলচন্দ্রাবাস হইতে বহুদূরে থাকিয়াও সুধাকর পানে চাহিয়া থাকে। সুধাকর ফুল্লরজনীতে তারকাজীড়ারত হইয়া হাসিলে সেও হাসে, আবার সুধাকর সুর্যের প্রচণ্ড তেজে হতভেজ স্নান হইলে সেও স্নান হয়। আয়েষাকে জগৎসিংহ প্রণয় দান করেন নাই, তিলোত্তমাকেই প্রণয় দান করিয়াছিলেন। এইরূপে জগৎসিংহের প্রণয়ে বঞ্চিত হইয়া কত দূরে আছেন কিন্তু তবুও তিনি জগৎসিংহের সুর্যে পরম সুখিনী—জগৎসিংহের দুঃখে পরম দুঃখিনী, তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের বিবাহের পর আয়েষা মনে মনে ভাবিলেন,—“ইহাকে লইয়া তিনি সুখী হইবেন তা।” এই কথা কয়টিতে আয়েষার নিঃস্বার্থ প্রণয় যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও হয়

নাই। আয়েষা কাহার সুর্যের লজ্জা ভাবিতেছেন? জগৎসিংহের সুর্যের লজ্জা নয়। আয়েষা জগৎসিংহের সুর্যের সহিত নিজের সুর্যকে যে এক করিয়া ফেলিয়াছেন! তাই জগৎসিংহের সুর্য ব্যতীত নিজের সুর্য ভাবিতেও পারেন না। বস্তুতঃ আয়েষার এ প্রণয় এই স্বার্থহীন মত্ত-মৌব-সংসারে বিরল-দৃষ্ট বা অদৃষ্ট বলিলেও অতুক্তি হয় না। ইহা অসীমিয় (transcendental)—অপারিধি; এই ইঞ্জিয়-রাজ্যে, এই পৃথিবীতে এরূপ প্রণয় কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই আমাদের সময়ের সময়ের ভ্রম হয়—আয়েষা বুঝি মানবী নয়,—দেবী, বুঝি তিনি আমাদের কল্পনাক্ষেত্রে একটি চারুকল্পিতা মানস-প্রতিমা।

কিন্তু বাস্তবিক আয়েষা তাহা নহে। তিনি দেবী হইয়াও দেবী হইতে পারেন নাই—আমাদের এই ধরাধাম-বর্ত্তিনী কোনও এক মানবী। তাহার এই মানবত্বের বিকাশ এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তাহার জীবনাভিনয়ের শেষ দৃষ্টে। তিনি জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার বিবাহের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সেই ঘন-নীলবসনারত উজ্জ্বল উদার আকাশ-তলে, সেই সুবিস্তৃত ঘনাক্ষারময়ী রজনীতে সেই বিশাল-নীলবন্ধ পরিধা সমীপে নির্জন বাতায়নে তিনি একাকী বসিয়া আছেন। এমন সময়ে এক-খানি কুম্ভাভ্যন্তর তাহার হৃদয়-গগনের এক প্রান্তে উদ্ভিত হইয়া সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি নারীজেনোচিত দুর্বল পৃথিবীতে

দেখিতে লাগিলেন—দেখিলেন সমস্ত বৃহর্জগৎ  
 যেমন এক বিপুল অন্ধকার কবলিত সেইরূপ  
 তাঁহার অন্তর্জগৎও এক বিশাল বিষাদকালিমা-  
 ঞ্চ—দেখিলেন এই নিবিড় তমঃ ভেদ করিয়া  
 ক্ষীণমাত্রও আলোক-সঞ্চারের আশা নাই—  
 তাবিলেন এই অন্ধকার চিরস্থায়ী হইবে।  
 ক্রমশঃ সেই মেঘ তাহার কৃষ্ণদের ঘোরতা  
 বর্ধন করিতে লাগিল। আয়েষা তাঁহার  
 স্বভাবসিদ্ধ গাত্ৰীয়া-দীরতা হারাইয়া ফেলিয়া  
 ভীতিচঞ্চলা হইয়া উঠিলেন—মুক্তির উপায়  
 খুঁজিতে লাগিলেন। বেশী দূর যাইতে হইল  
 না। মুক্তির উপায় তাঁহার নিজেরই অন্তরিতে  
 তাঁহার সেই বহুমূল্য বিষধর হীরকাদ্রুরী।  
 আয়েষা সেই গরলাদ্রুরী পানে জীবন পরি-  
 ত্যাগে উদ্বৃত্ত হইলেন। আয়েষার মানবত্ব  
 এইখানে। এইখানেই আয়েষা আত্ম-বিসর্জন-  
 পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইতে পারেন নাই।  
 এইখানেই তাঁহার সেই পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রণয়ে  
 সূচ্যপ্রসিদ্ধিও একটা স্বার্থ-কালিমার ফোটা  
 দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই  
 এ কালিমা-বিন্দু বিধৌত হইল। আয়েষা  
 সর্বভূতপ্রভব পরমেশ্বরের প্রিয়শিষ্যা। সুতরাং  
 তাঁহার এই হৃদয়-দৈন্ত কতক্ষণ থাকিতে  
 পারে? শীঘ্রই আত্ম-জ্ঞানের দিব্য জ্যোতির  
 দ্বারা হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সেই বিষা-  
 দের কৃষ্ণ মেঘ অচিরেই অপসারিত হইল।  
 তিনি সেই বিষাদ্রুরী পরিধা-জলে নিক্ষেপ  
 করিলেন। তাঁহার সেই সহজ-সুন্দর চিত্তে  
 সামান্য নান্দীজনোচিত দৌর্বল্যের জন্ম তিনি  
 নিজেকে নিজেই ভৎসনা করিয়া বলিলেন—

“এই জন্মই কি জগদীশ্বর আমাকে নারীজন্ম  
 দিয়াছেন!” (ক্রমশঃ)

শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম, এ বি, এল।

## কবি-কুঞ্জ।

### ত্যাগী বিশ্বপতি।

একি হেরি বিশ্বরাজ, কেন হেন ভিক্ষুসাজ,  
 কেন আজি ছিন্ন সুলি করে,  
 রাজবেশ পরিহরি : কেন ওহে ত্রিপুরারী,  
 করিতেছ ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে।  
 থাকিতে স্ববর্ণ জল, কর্ণেতে ধুস্তর ফুল,  
 মাখিয়াছ ভয়রাশি গায়,  
 সর্বদেহী তব প্রজা, তুমি সকলের রাজা,  
 তবে কেন ভূত পাছে ধায়।  
 আছে তব স্বর্ণহার, তবে কেন ফণীহার,  
 নীলকণ্ঠ কণ্ঠে তব দোলে,  
 অমৃত করিয়া দান, গরল করিছ পান,  
 এই কিণো ছিল তব ভালে!  
 থাকিতে সুরমা স্থান, আশানেতে বাসস্থান,  
 নির্মাণ করিছ পশুপতি,  
 অছুত তোমার লীলা, দয়াময় একি খেলা  
 করিতেছ বিধে, বিশ্বপতি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী, কবিনিধি।

## দৈন্ত্য।

(১)।

ঐশ্বর্য্য হইতে নামিয়ে এনেছ

ডাকিয়ে দৈন্ত্যেরে করিতে বরণ,  
 করিয়াছ দীনহীন পথের কাড়াল

হে দয়াল, হে দীন-শরণ!

(২)

পদে দলি তুচ্ছ বিভব-জঞ্জাল  
ছিন্ন করি দিছ আসক্তি-বন্ধন ;  
আধার হইতে আনিছ আলোকে  
অনলে দহিয়া ভোগ-নিকेतন ।

(৩)

অনন্ত লালসার বার্ষ্য অকিঞ্চন  
ক্লদ হৃদি সদা ছিল যে যুড়ি,  
নিফল বাসনা গরল সম  
শূন্য বক্ষে হায় অলিত পুড়ি !

(৪)

গরব-উন্নত ছিল যে শিশু  
বিশাল ধরাকে দেখিত সরা ;  
তুলি দিছ তায় নিজ হাতে ধরি  
শত দৈত্য, শত কলঙ্ক-পন্নরা ।

(৫)

ধন-মান-জ্ঞান-গরব-শূন্য  
যে বক্ষে তব ছিল না স্থান ;  
দিয়েছে দীনতা, চিনিয়ে তোমায়  
বহিছে সে মরু-বুকে তঁকতি-বাণ ।

(৬)

অস্তর ছিঁড়িয়ে শোণিত-ধারায়  
বহিছে সদা প্রেম-অক্ষধার ;  
যুছি গেছে ভোগ-আসক্তি-কালিমা  
জাগিছে পরাণে বিভূতি তোমার ।

(৭)

সর্বস্ব হরিয়ে দেখা'য়েছ হরি !  
স্বপ্না-পূরিত অলকা-মাধুরী ;  
নবীন আলোকে মধুর পুলকে  
বাজিছে মরমে প্রেমের বাঁশরী ।

(৮)

কাচ বিনিময়ে লভিলে কাঞ্চন  
কে ডরে দৈত্যেরে আর ?  
নখর বৈভবে পদে দলি' প্রভু  
দীন হৃদি যুড়ি থাক' অনিবার ।

(৯)

ডাকিয়ে আনিছি, ডাকিতে জানিনা  
এ হৃদয়-গৃহ দৈত্যের আধার ;  
অশ্রুশ্লে ধু'য়ে ভিক্ষা ক্ষুদ্র দিব  
হে দয়াল, হে সর্বস্ব আমার !  
কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত বোধ কবিরত্ন ।

মাতৃ-আবাহন ।

আম মা আমার আদরিণী  
দাঁড়া হৃদি শতদলে ।  
তোর তরেই যে রয়েছি বলে  
মা তোর অভয় চরণ পাব বলে ॥  
হবে না কি এ দৌনে দয়া  
চাসু কিগো পাষাণী হতে ।  
পিতা তোমার পাষণ বলে  
তাই ভয় করি মা নানা মতে ॥  
যদি না আসিস মাগে আছিস তো  
চির অস্তরেতে ।  
ভবু করিস খেলা কতই রকম  
মা প্রতার কোলের ছেলের মন ভূলাতে ॥  
আমি ভুলবো না মা, তোর এ খেলায়  
ধব্বো চেপে চরণ দুটি ।  
পূজো আমার নিতেই হবে  
নৈলে ছেলে যে তোর কাঁদবে লুটি ॥



পাগল মায়ের            পাগল ছেলে  
সবই তখন পাগল হবে ।  
ভোর তরে যে            পাগল তারা  
( তখন ) সে এই মরু হতে বিদায় লবে ॥  
ঈরামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যবিনোদ ।

### মহত্ব ।

ববে প্রাণপণে বুঝি' মোগলের সনে  
ভূপতিত হিমু পাণিপথ রণাঙ্গনে  
আনীত হইলা বিপক্ষবিরে বন্ধ  
হস্তপদ, মোগলের সেনাপতি ক্রুদ্ধ  
শার্দূলের প্রায় লেলিহান চাহনিতে  
দেখিতে লাগিলা সমুৎস্রকে চারিভিতে  
আকবরের লাগি' । তৎপর লভি' আর  
দরশন জুর হাসি অধরের ধার  
কহিলা বইরাম ধাঁ "বৎস আকবর !  
জীবনে তোমার এই প্রথম সময় !  
শৃঙ্গলাবদ্ধ কামের তব পদতলে  
হস্ত কর পূত বিধর্মীর রক্তজলে ।"  
ধীরে চতুর্দশবর্ষীয় বীর কহে  
"বন্দীগাজে অজ্ঞাঘাত বুদ্ধরীতি নহে ॥"

ঈমনীবীষোহন রায় ।

### দর্শন ।

চরুণ তোমার কি দিবে পূজিব,  
এ জগতে যাহা সকলি তোমারি ।  
সাগর, দুধর, অটবী, নিঝর,  
বিতব, রতন, সকলি তোমারি ॥

নিখিল জগৎ তোমারি প্রতিমা,  
তোমারি স্বরূপ অনন্ত নীলিমা,  
অনল, অনিল, জল, নভোনীল,  
বন্দিছে নিয়ত চরণ তোমারি ॥  
জনকের স্নেহে রাজিছ, মা, তুমি,  
জননী হইয়া সন্তানে চুমি,  
শিশুর হাসিতে, দিবসে, নিশীথে,  
বিমল স্নেহমা তোমারি ॥

যখনি যদিকে ফিরাই নয়ন  
নিয়ত জননী দাও দরশন,  
নিদাঘে, বসন্তে, শরতে, হেমন্তে,  
কুসুম মাঝারে মহিমা তোমারি ।  
যদিও রাজিছ বিশ্ব নিখিলে,  
অরুণে, তপনে, গ্রহে, তারাদলে,  
তোমারি উপমা, স্নেহমানে দিব মা,  
তুনিই কেবল তুলনা তোমারি ॥  
অবোধ আমরা ভেবে হই সারা  
দেখিনা তোমাতে কখনো,—  
আদর করিয়া, সদয়া হইয়া  
ডাকিছ নিয়ত "আয় আয়" করি ।  
ঐশ্রীচন্দ্র দাশ গুপ্ত ।

### আশীর্ব্বাদ ।

( ১ )

তুমি খুঁকি হেসে হেসে  
গেছ কোন দূরদেশে  
আমরা মরতে আছি কাদিতে কেবল  
তুমি সবে ভালবাস  
সবে কাদে কোথা আছ ?  
কিছুই বুঝিনা খুঁকি পরাণ বিকল ।

( ২ )

“দাদা ! দে খুকীরে আনি”

বলি কঁাদে খোকা ননী

তাহারা করেনা খেলা তুমি নাহি এ’লে

কঁাদে মা কঁাদিছে দাদা

কেহ নাই দিতে বাধা

তুমি নাহি এলে খুকী প্রবোধি’ কি বলে

( ৩ )

তুমি যদি পার আসি

শর কোলে পুনঃ বসি’

বিরহ-অনলে কর শান্তি বরিষণ

হাসি’ পরিজননে তোম

খোকাদের ভাঙ্গ রোষ

তাহাদের সাথে হয়ে ক্রীড়ায় মগন ।

( ৪ )

আসিবারে এ ধরায়

মন যদি নাহি চায়

অলি মোরা হুঃখে তুমি আসিও না ভবে

হেথা যথা স্নেহগুণে

বৈধেছিলে জনে জনে

তেমতি স্নেহেতে বাঁধ তথাকার সবে ।

( ৫ )

যাঁর হুঃখ কথা অরি

আমরা সবারে ছাড়ি

অ-উদ্দেশ্যে তথা তুমি করেছ গমন

আমি আশীর্বাদ করি

প্রাণপণে চেষ্টা করি

তুমি তাঁর হুঃখ হর দেবীর মতন ।

( ৬ )

বিরহ-কাতর মন

কঁাদে যদি পরিজন

কহিব হয়েছ তুমি স্বপ্নের দেবী

কঁাদে যদি ননী খোকা

কহিব “তোমরা বোকা

কাদ কেন ? খুকী দেবী দরিত্রেরে সেবি ।”

( ৭ )

আবার আসিবে কবে

সুখাইবে তারা যবে

কহিব “আসিবে খুকী তরায় আবার

তোমরা নিজের প্রাণ

তার মত করি দান

যাইবে মুছাতে হুঃখ যবে অনাধার ।”

( ৮ )

অবসরে যদি পার

আসি খুকী বার বার

জননীয়ে দিয়ে যে’ও আশ্বাস সান্ত্বনা

কল্পনা হইয়া আসি

আমার হৃদয়ে বসি

হৃদি-বীণা বাজাইয়া গেও গীত নানা ।

( ৯ )

রচি কবিতার হার

দিব সদা উপহার

ঘুচাইতে আত্মীয়ের মনের যাতনা ।

কর্তব্য-সাধন-পথে

যদি কোন বাধা ঘটে

হুঃখেতে হুঃখিত হয়ে হেথা আসিও না

মোদের ভুগিতে দীও নরক বাতনা

কর্তব্য করিয়া হেলা হেথা আসিও না

আসিও না দাদা ভব করিতেছে যান ।

ঐদয়ানন্দ চৌধুরী ।

## শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

অত্যন্ত শিশুগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ নাই। শাস্ত্রীয় দাহও নাই। শিশুদের বর্তমান দেহের পরই কোন মায়া জন্মে না, বর্তমান জন্মে তাহারা কোনরূপ পাপপুণ্যও লইয়া যায় না, কাজেই তাহারা অতিবাহিক দেহ বা বায়বীয় দেহ প্রাপ্ত হয় না। ঐ শিশুগণ মৃত্যু হইবামাত্রই একেবারে শস্তাদির সহিত সংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহাদের দেহ-গ্রহণের জন্ম অন্তরীক্ষে থাকিয়া অপেক্ষা করিতে হয় না। বর্তমান জন্মে পারলৌকিক পুণ্য ও উৎকট পাপ করিয়া যায় না, কাজেই ভোগদেহ লাভ করে না। লিঙ্গদেহে সঙ্কল্পমূলক মানসিক সূক্ষ্মত্বঃ—তাহার নাম স্বর্গ-নরকভোগ—তাহা শিশুদের একেবারে সম্ভবই নহে। ভোগদেহে নরক ও স্বর্গ ভোগ করিতে হয়।

প্রথম অতিবাহিক দেহ। স্মৃতি শাস্ত্রের মতে দশপিণ্ড দ্বারা এই অতিবাহিক দেহের নাশ ঘটে। তার পর লিঙ্গদেহ। লিঙ্গদেহে যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করিতে পায় না, স্বর্গ-নরকভোগ যাহাদিগকে করিতে হয়, তাহারা এই ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। যাহারা লিঙ্গদেহের পর ভোগদেহ পাইয়া তার পর স্বীয় কৰ্মরূপ অণু দেহ প্রাপ্ত হয়। আবার কাহারো বা ভোগদেহ না পাইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পাপ-পুণ্যবিশিষ্ট জীবগণ ভোগ-দেহ প্রাপ্ত হয় না।

আর শ্রাদ্ধ দ্বারা স্বাম্বরূপ দেহধারণের

স্বযোগ ও সুবিধাও দেওয়া হয়। যাহারা নিজের ক্রমতায় আকাঙ্ক্ষিত সকলপ্রকার প্রাৰ্থনীয় বস্তুই লাভ করে, তাহারা সম্ভব দত্ত অন্নজলাদি আদরপূর্বকই গ্রহণ করেন। নরকস্থ পাপীজনও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হন। রোগী ঔষধ খাইতে না পারিলে আমরা বলপূর্বক তাহার দেহ ছিদ্র করিয়া ঔষধ দিয়া থাকি, তদ্রূপে রোগীর রোগের উপশমও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। তদ্রূপ যে জীব নিজ স্মৃতিগুণে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় না, আমরা মন্ত্র সাহায্যে, ইচ্ছা-শক্তির বলে ও যোগপ্রক্রিয়া গুণে সে বস্তু দিতেছি—এরূপ একটি সংস্কার দিতে পারিব, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

শ্রাদ্ধ পারলৌকিক আত্মার উপকারার্থ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা বিশেষ।

মাতুল।—লিঙ্গশরীর কি খাঁটি বায়বীয় ? আর সে লিঙ্গশরীরে চলাচল হয় কিরূপ ?

বৈদামন্তিক।—লিঙ্গশরীর বায়বীয়—এ কারণে গুরুত্ব তার নাই। জল, তেজ ও পার্থিব অংশ অতি সামান্য মাত্রায় আছে কিনা এ বিষয়ে মতবৈধ আছে। মোট কথা স্থূল দেহের তুলনায় লিঙ্গদেহে যে পার্থিব অংশ নাই, ইহা বলা যাইতে পারে। লিঙ্গদেহের অপার্থিব আখ্যা। পার্থিব দেহের তুলনায় ইহার গুরুত্ব নাই। তবে পাপ-পুণ্যময়ী বাসনা, স্থূলদেহে অত্যন্ত সংস্কার—বাহ্য দেহী লইয়া যায়, তাহা এক প্রকার তার স্বরূপ বর্তমান থাকে। এই পাপপুণ্য-বাসনা বা সংস্কার বেহীকে যথেষ্ট গতির অধিকারী করে

না, প্রকৃত-স্বাভাব্য দেহ নহে। তবে গম্ভীৰ্য্য হানি, যেখানে বাওয়ার বাধা নাই—সেখানে পার্শ্বিক দেহ অপেক্ষা বায়বীয় দেহে সঘর চলাচল হইতে পারে এই মাত্র। দাঁড়াইল, শ্রীকৃষ্ণের কার্য তিনটি। প্রথম, আকাজ্জা পূরণ দ্বারা পারলৌকিক জীবের তৃপ্তি দেওয়া। দ্বিতীয়, বাহ্যরূপ দেহধারণের আবহুলা কর। তৃতীয়, অতীষ্ট লোকে গমনের সহায়তা করা।

মাতুল।—বৃত্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে আইসেন কি ?

বৈদান্তিক।—আমি অসম্ভব নহে। ভক্তির টানে ভগবানই আসেন। যোগ-সাহায্যে, মন্ত্রশক্তির বলে ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সম্ভব সমুদ্রে ভোজ্য পেয় রাখিয়া বৃত্ত পিতামাতাকে আকর্ষণ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। অনর্থক কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আনয়ন করা উচিত নহে। ইচ্ছাশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও তড়িৎশক্তি বলে অন্তরীকস্থ পিতৃ-গণ বায়ুগতিতে শ্রীকৃষ্ণে আগমন করেন কিনা, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য আমরা দিতে পারিব না। আর যদি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে নাই আগমন করেন, তথাপিও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা দূরস্থ বৃত্ত আশ্রয় সংস্কারমূলক তৃপ্তির কোনই বাধা হয় না।

মাতুল।—যুক্ত ব্যক্তির জ্ঞানে কোন উপকার আছে ?

বৈদান্তিক।—বেদান্ত মতে নির্বাণমুক্তি যাহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্যক বাসনার ক্ষয়, মনের নাশ হইয়াই গিয়াছে। তাঁহারা অমণ্ড পরমাত্মার সহিত একক প্রাপ্ত

হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞান ফলদায়ক নহে। তবে কে এইরূপ নির্বাণ-মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, জানাত সম্ভব নহে। আর কোটি কোটি পার্শ্বিক ব্যক্তির মধ্যেই একজন নির্বাণ-মুক্তির অধিকারী কি না, নিশ্চয় নাই। বংশে এইরূপ একজন মুক্তিলাভ করিলে উর্দ্ধতম সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার হইয়া যায়।

মাতুল।—শ্রীকৃষ্ণ কতকাল পর্যন্ত যত্নের উপকারক ?

বৈদান্তিক।—যুক্ত ও নিপুণ ব্যক্তিও সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে আত্মশ্রীকৃষ্ণ, মাসিক শ্রীকৃষ্ণ, সপ্তাহিক শ্রীকৃষ্ণ উপকারক। তবে সপ্তাহিকরণের পরে কেহ কেহ মধ্যেই জন্মিয়া যায়। তথাপি যাহারা ভোগদেহে বর্গনয়ক-ভোগ করেন, শিশুলোকে পিতৃদেবতারূপে বাস করেন অথবা কোন অপরিহার্য্য কারণে জন্মিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য বার্ষিক শ্রীকৃষ্ণও আবশ্যিক। কে জন্মিবে, কে না জন্মিবে—সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জানা যায় না বলিয়া বার্ষিক শ্রীকৃষ্ণ করিয়া যাওয়াই উচিত। প্রকৃত শক্তিহীন হলে মাত্র তিল, আতপতল ও গামছা প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াও বার্ষিক শ্রীকৃষ্ণ করিয়া যাওয়াই ভাল। সামর্থ্য হলে খরচ না করা অস্তায়।

মাতুল।—শ্রীকৃষ্ণ কয় প্রকার ?

বৈদান্তিক।—এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রকৃত অধিকার আমার নাই। এ সকল কথা স্মৃতি শাস্ত্রের। স্মৃতি পণ্ডিত মহাশয় এইবার উত্তর দিব।

তখন একজন সর্কাপেক্ষা প্রাচীন যাত্রী পণ্ডিত যথালয় উত্তর দিবার অস্ত্র সমুখে আসিয়া বলিলেন ।

যাত্রী।—শ্রীকৃষ্ণ সবেকে কি যুক্তি—তাহার আলোচনা আমাদের নৈবাস্যভিত্তি গ্রহে নাই । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কয় প্রকার, শ্রীকৃষ্ণের অধিকারী কে, শ্রীকৃষ্ণ কেইন দিন কর্তব্য, শ্রীকৃষ্ণে কি কি দ্রব্য আবশ্যক, শ্রীকৃষ্ণের প্রণালী কি প্রকার, শ্রীকৃষ্ণের যন্ত্র কি—এই সকল কথারই সন্নিবেশ আলোচনা আছে ।

যাত্রী।—শ্রীকৃষ্ণ কয় প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকার শ্রীকৃষ্ণের অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দিন ।

যাত্রী।—প্রধানতঃ আত্ম শ্রীকৃষ্ণ, মাসিক শ্রীকৃষ্ণ, বাৎসরিক শ্রীকৃষ্ণ, সপ্তাহিক শ্রীকৃষ্ণ, দৈনিক শ্রীকৃষ্ণ, আত্মীয়দায়িক শ্রীকৃষ্ণ, পার্শ্ব শ্রীকৃষ্ণ, দৈব শ্রীকৃষ্ণ, কাম্য শ্রীকৃষ্ণ, নিত্য শ্রীকৃষ্ণ । এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রীকৃষ্ণ আছে, তাহার নাম আর করিলাম না । যথা পৈষ্ঠিক শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি ।

পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ও কাম্য । মৎস্ত পুরাণে নিত্য, কাম্য ও নৈমিত্তিক এই তিন প্রকার শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে ।

প্রতিদিন যে শ্রীকৃষ্ণ করা যায়, তাহা নিত্য । অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ অমুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য । অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ও গর্ভাধান প্রভৃতি মঙ্গলকার্যে যে শ্রীকৃষ্ণ কৃত হয়, তাহাই বুদ্ধি বা আত্মীয়দায়িক শ্রীকৃষ্ণ । বিবাহাদি আত্মীয়দায়িক অমুষ্ঠিত বলিয়া আত্মীয়দায়িক অপরা নাম । পরী উপলক্ষে যে শ্রীকৃষ্ণ হয়, তাহা পার্শ্ব-শ্রীকৃষ্ণ । প্রত্যেক বর্ষে যাত্রাতিথিতে একজনের উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণকে দৈবিক বা

সাধারণ শ্রীকৃষ্ণ বলে । একজনের উদ্দেশ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ করা যায়, তাহা একোচ্চিষ্ট । বার্ষিক শ্রীকৃষ্ণও একোচ্চিষ্ট । দেবতার উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ দৈব ।

( আগামী বারে সমাপ্য ) ।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ।

কাঁঠালপাড়া ।

## আমার দেবতা ।

( ১ )

বেলা দশটা বাজিয়াছে,—শিক্ষক শরৎবাবু জুলে বাইবে বলিয়া গৃহের বাহির হইয়াছেন—এমন সময় জ্যোতিষদেবী আসিয়া বলিল,—“প্রাণটা বড় জ্বালাতন হ’ল । নিশ্চিনেই—আমি আর পারব না তা’ স্পষ্টই বলছি !”

শরৎবাবু বলিলেন—“কি করবো শান্তি ! বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ ! আমার এমন সাধি নেই যে, তোমার এর চেয়ে ভালভাবে রাখি ? লাম্বা ৩৫০ টাকা মাহিনায় আর কত হবে ?

“আর বলো না ! তোমার ওসব কথা শুনে ত আমার পেট ভরবে না ?—আমার বাপের বাড়ী কি ভাত কাপড় নেই ?”

“কেন, কোন দিন কি উপোস ছিলে ?”

“পেট ভরে খেলেই হ’ল ?—যদি ভাল একখান কাপড়, একখানা সোণার গহনা পর্তে না পেলুম, তা’হলে জীবনে মুখ কি ?”

“দেখতে পাচ্ছ ত শান্তি ! জিনিষ-পত্র সব চম্ভা হয়েচে—”

“নেও-খাম—আমি নিশ্চই বলছি—‘তুমি অভাবে পড়েছ, অতাব নিয়ে থাক! আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও! এত জালাও প্রাণে নয়?’”

“তুমি গেলে বুড়ো মায়ের কি হলে? আমিও সারাদিন বাড়ী থাকিনে! কে তাঁকে সময় মত ভাত-জল দিবে?”

“আমি দিব? আমার দেখছি তোমরা দাসী পেয়েছ? আচ্ছা কালই আমি বাপের বাড়ী চলে যাবো; ধীরে রেখো দেখি!”—বলিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে শান্তি তথা হঠতে চলিয়া গেল। শরত বাবু মনে মনে বলিলেন—“ধনি-নন্দিনীকে বিবাহ করিয়া বড়ই অশ্রয় করিয়াছি!”

( ২ )

শরতের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। শরতের জ্ঞী ধনী নন্দিনী! সে স্বামীগৃহে আসিয়া স্থায়ী হইতে পারে নাই! সে আশ্র-সুখাশ্রমণী—আপনার দেহ পরিপাট্য ও বেশ-বিক্রাসে সম্রাট ব্যতিবাস্ত। সে দীন-স্বামী-গৃহে স্থায়ী হইতে পারিবে কেন? স্বামীর জীব কুঁড়ে ঘরের মধ্যে শান্তির প্রাণটা সে ঝাঁঝ করিতে লাগিল। কোথায় সে ইন্দ্রপুরী-বিনিমিত অট্টালিকা—আর কোথায় এই ধূলিবাণিপূর্ণ জীব অপরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, কক্ষির বেড়া দেওয়া—তাতে না আছে সৌন্দর্য্য না আছে আলো! পিতৃগৃহের সেই প্রাসাদভূল্য অট্টালিকা, পিতামাতার আদর স্নেহ! সেই সব কথা শান্তির মনে আগিয়া উঠায় তাহার বেন লজ্জার অরিয়। যাইতে

ইচ্ছা হইতেছিল। সে মনে মনে স্থির করিল, একবার বাপের বাড়ী যাইতে পারিলে আর এ বনদেশে, জীব ঘরে আনিবে না। ছিন্ন-ভেদেও কি ভদ্রলোকের বৌ-কি বাস করিতে পারে?

পরদিন শান্তি পিত্রালয়ে যাইবার প্রস্তুত হইল। শান্তির বৃন্দা শান্তী ঠাকুরানী বলিলেন,—“বোমা! তুমি বাপের বাড়ী গেলে এদিকে কে দেখবে? আমিও বারান্দা পড়েছি!”

শান্তি বড়ার দিয়া উঠিল—“আর কারো বুঝি চোখ নেই!”—শান্তি মুখ ভার করিয়া পাকীতে গিয়া বসিল। অদূরে শরৎ বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, শান্তি তাহাকে একটি কথাও কহিল না। শরতের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। স্বামীর চোখে জল দেখিয়া শান্তির বড় আনন্দ হইল। সে মনে মনে বলিল—“বামন হয়েচাঁদ ধ্বংসে সাধ হয়েছিল, এখন ফলভোগ কর।” বেমহারাগণ পাকী উঠাইল।

শরৎ বলিল—“শান্তি! চলিলে?”

“বাবু না ত কি? কি স্বর্গস্থখেই রেখেছ?”

জ্ঞী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। শরৎ অশ্র-জল মুছিয়া মাতার ঘরে ঢুকিল। মাতা বলিলেন—“বাবা! নৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে কেন?”

শরৎ বলিল—“মা! আমি পাঠিয়ে দেই নাই; সে আপনি চলে গেল!”

( ৩ )

শান্তি পিত্রালয়ে আসিয়া নিজের চুপ-কটের কথা তিন ভাগে রঞ্জিত করিয়া মায়ের নিকট বর্ণনা করিল। শান্তির মাতা সব কথা

কনিয়া বলিলেন—“অভাগী, তোর কপালে  
সুখ নেই। এমন শান্ত-নিরীহ জানাই, তারে  
তুই গরীব বলে অগ্রাহ্য করে বাপের বাড়ী চলে  
এলি। বলি তোর বাপের বাড়ীর ভাত  
ক’দিনের জন্য ? দিনান্তে একবেলা খাস না  
খাস স্বামীর ঘরে থাকবি—স্বামীর সংসার  
করবি। তা’ না বাপের বাড়ী চলে এলি ?  
স্বামী যে কি ধন চিন্তিলি নে ? স্বামী রক্ত, আতুর,  
মাতাল, গরীব, বাই হোক, মেয়ে মানুষের  
ভিনিই দেবতা ! যা, এখনও সময় আছে—  
জামায়ের পারে ঘরে ক্ষমা চা’পে !—দেখ, ও-  
বাড়ীর বিজয়ের জী দিনান্তে একবেলা খেতে  
পায় না, তবু সে বিজয়কে কত ভালবাসে—  
ভক্তি-প্রদা করে। বোট যেন লক্ষী, স্বামীই  
তার সব !—স্বামীর কষ্ট হবে বলে সে বাপের  
বাড়ী পর্যন্ত যায় না ! তুই এমন অভাগী ? যা,  
এখন কিরে যা’ !”

মায়ের উগদেশে শান্তি কানিয়া ত্রহয়  
পিতার নিকট গেল ! পিতা বলিলেন—  
“কানিস্ নে যা ! তোমার আর সে কাঙালের  
ঘরে পাঠাব না।”

অক্ষমুখী শান্তির অশ্রুজল ধামিল।

বৈকালে শান্তি বিজয়ের বাড়ীতে বেড়া  
হঁতে গেল ! বিজয়ের জী সরলা বলিল—  
“ঠাকুর কি ! এ তোমার বড় অজ্ঞায় ! স্বামী  
দেবতা, তাঁকে তুমি আদর যত্ন না করে অব-  
হেলা করে ফেলে এসেছ ? ছিঃ !”

“আসব না—সেখানে উপোস থাকব  
নাকি ?—আর সে ঘরে কি মানুষ থাকতে  
পারে ? খড়ের ছাউনী—ককির বেড়া দেওয়া

—এলো হলো !”

“তোমার দাদার এ ঘরটী বড় সুন্দর নাকি ?  
আমি এতে থাকি কেমন করে—আর তুমি  
উপবাস থাক ? এ কথা বলছো কেন ? তোমার  
স্বামী ৩৫ টাকা বেতন পান, তোমার দু’বেলা  
দু’মুঠো ভাত দেন না কি ?”

শান্তি নীরব।

ঠাকুর কি। স্বামীর ভালবাসার চেয়ে  
সতী জীর সংসারে আকর্ষিত বস্তু আর কি  
আছে ? স্বামী দেবতা, তিনি যেভাবে রাখবেন  
সতী জী সেইভাবে থাকবে। স্বামীর হৃৎ-  
ছঃখে চির-সন্ধিমী হবে।”

“যে ভাবে রাখবে সেই ভাবে থাকব ?  
কেন—কিসের জন্য ?

“তিনি তোমার স্বামী, তুমি তাঁর দাসী !”

“দাসী ! কিসের দাসী ?—বাবা টাকা দিয়ে  
একটা গোলাম কিনে দিয়েছেন,—আমি তার  
দাসী ?”

ঠাকুর কি। “আমি তোমায় আর বেশী কি  
বলবো ? জেনে রেখো ভাই, স্বামীকে দৃণ্য  
করা অধোগতি।—তুমি স্বামীর দাসী কিনা,  
স্বামী তোমার দেবতা কিনা, একদিন তা  
বুঝতে পারবে ? এমন সময় আসবে, যখন  
কেবল অনুশোচনা দ্বারা হৃদয়ের কলক ঘোত  
বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না !”

“আচ্ছা বো ! তোমার একটা কথা বলি ?”

“কি ? বল !”

“এই অনন্ত সুখময় জগতে সুখ-পিপাস  
মানব সুখ না চাহিবে কেন ?”

“কেন—তুমি কিসে অক্ষমী”

“কিসে নয় ? ভাড়া কুঁড়ে ঘরে বাস, পরণে মোটা কাপড়, পেটে মোটা ভাত । এ-ও আবার সুখ ?

ঠাকুর কি ! মেয়েলোকের স্বামী-ভক্তি, স্বামী-সেবাই যে অনন্ত সুখ ! যে জীলোক দিনান্তে শাকার বেয়ে স্বামী-পদ-পূজা করিতে পারে ; তার মত সৌভাগ্যবতী আর কে আছে ঠাকুর কি ?

“বো ! তুমি দেখছি ভারি পতিব্রতা ! আমি তো এরকম পারব না । আজীবন সুখে ছিলুম—সুখই চাই—হুঃখকে বরণ করিতে পারব না । তবে আজ যাই, এ বিষয়ে আর একদিন বলব !”—শান্তি চলিয়া গেল ।

( ৪ )

ধনি-নন্দিনী শান্তি এখন একজন বিবি হইয়া দাঁড়াইয়াছে । খাইবার সময় তাহার ঘরে ভাত দিয়া আসিতে হয়, আঁচাইবার জল দিতে হয়, বিছানা পাতিয়া দিতে হয় !—এক কথায়,—সে পিত্রালয়ের সুখ-অমরাবতীর আনন্দময় নন্দন-কাননের অতুল সুখ অস্ত্রভব করিতে লাগিল । কিন্তু সুখের দিন শীঘ্রই ফুরাইয়া যায় ! শান্তিরও সে সুখের দিন শীঘ্রই অবসান হইল ! একদিন শান্তির পিতা স্নেহের কড়া, ধন-সম্পদ সকলই তাজিয়া, সুসমস্ত বাটী-খানি বিরাট হাহাকায়ে ভাসাইয়া কোথায় এক অচেনা দেশে চলিয়া গেলেন । শান্তি চারিদিকে অন্ধকার দেখিল !

শান্তির নিদারুণ-বদ্বয় হৃদয় নিশ্চেষ্ট হইতে লাগিল । সে আজ সংসারে বড় একা ! এত বড় সংসারে তাহাকে আদর-স্নেহ করি-

বার কেহই নাই ! অননী শান্তিকে মেয়েতে পারে না, ভাতারা শান্তিকে তেমন আদর-স্নেহ করে না, আর ভাত-বধূরা ? শান্তি ত তাদের চোখের বালি । শান্তিই সকলের অশান্তি । মাতা, ভাতা, ভাত-জামাদের স্নেহহীন আচরণে শান্তি বড় মর্মান্বিত !—আজ সে সকলের কাছে উপেক্ষিতা—লাঞ্ছিতা ! এ সময় তাকে আদর-স্নেহ করিবার কেহই নাই । শান্তি ভাবিল—‘একজন ছিল তাঁকে আদর-স্নেহ করিবার ! কিন্তু সে তাঁহাকে উপেক্ষা করে—তাঁহার স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা দূরে ঠেলিয়া, আশ্র-অহঙ্কারে পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছে । মনে পড়ে তাঁহার সেই বিবাদমগ্নিত মুখখানি—সেই স্নেহপূরিত করুণ দৃষ্টি, সেই স্নান আখির প্রতপ্ত অঙ্গ ! হয়, হয় সেই আরাধ্য দেবতাকে সে নির্দয়্যার অবজ্ঞাতরে দূরে—অতি দূরে ঠেলিয়া আসিয়াছে !

শান্তির আশ্রয় পরিবর্তন ঘটিল । যে মোহে সে এতদিন আচ্ছন্ন থাকিয়া হিন্দু-জীর কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছিল—আজ তাহার সে মোহ ঘুচিল । স্বামী যে কি ধন সে এখন বেশ চিনিতে পারিল । সে বেশ বুঝিল—স্বামী বাস্তবিক জীলোকের দেবতা, কার্যমনোবাক্যে স্বামীর পদ-সেবা করাই জীলোকের ধর্ম । স্বামী ভাল হউন, মন্দ হউন, তিনিই জীর পরমধর্ম ; স্বামী-গৃহে হুঃখে থাকিলেও জীলোকের সেই স্বর্গসুখ ।

“ওকি ঠাকুর কি ! কাঁদছে যে ? কেন, কি হয়েছে ?” অন্ধ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শান্তি বলিল,—“বো ! কেন আমি স্বামী-গৃহ ছেড়ে এলেন !



এখানে আর যে থাকতে পারিনে ?”

“তা’ত আমি আগেই বলেছিলাম, বাপের ঘরে হাজার সুখ হলেও সে সুখই নয় ? পরের সুখ চেয়ে থাকতে হয়। দেখ, রামচন্দ্র বনে গেলেন, সীতাদেবী রাজভোগ ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে বন-বাসিনী হলেন। আর সেদিন নন্দময়জীর কথা ত শুনেছ। একখানা কাপড় তাই স্বামী-স্ত্রী দু’জনে ভাগ করে পরেছিলেন।”

“বোঁ! এখন আমি বেশ বুঝতে পেরেছি—তিনি আমার দেবতা,—আমি তাঁর দাসী।

“ঠাকুর কি! ভূমি যে তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ এতে আমি খুশি হই হই। তোমার স্বামীকে আস্তে চিঠি লিখে দেই—কেমন ?”

“না বোঁ! চিঠি লিখে দরকার নাই—আমি নিজেই গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ব। তিনি দেবতা—অবশ্যই দাসীর অপরাধ ক্ষমা করবেন।”

“সেই ভাল ঠাকুর কি! তাই যাও।”

( ৫ )

এরিকে শান্তিহারী শরৎ বাবু দিন দিন অশান্তির ভীত হতাশনে বিদগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার দেহের সে লাবণ্য-প্রভা মলিন হইয়া গিয়াছে, সে সুপুট দেহখানি শুক কুশ হইয়া গিয়াছে।—নিদ্রাকণ নিদ্রা তপনতাপে স্থলর তরুটি ক্ষুধিত ও মলিন হইয়া গিয়াছে। কাজে-কর্মে আহারে-বিহারে সকল বিষয়েই শরৎ এখন উদাসীন।

একদা বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে শরৎের মনে কত কথাই উদয় হইতেছিল।—এই ক সংসার। সংসারে জী, পুত্র, ভাই, বন্ধু

কে কাহার? কেবল নিশার স্বপন।—শান্তি! তাহার কে? সে শান্তিকে কত ভালবাসিত, কত আদর-স্নেহ করিত, তবুও শান্তি তাহার হইল না। সংসারে কে কাহার?

এমন সময় ধীর পদবিক্ষেপে এক অব-গুণ্ঠনবতী আসিয়া শরৎ বাবুকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। শরৎ বিষয় বিস্মারিত-নেত্রে চাহিয়া বলিল,—“একি! শান্তি যে? ভাল আছ ত শান্তি?”

আহা! কঠিন কি স্নেহ-সজল। শান্তি দেখিল—স্বামীর চক্ষুচুটী গভীর স্নেহে তাহার দিকে চাহিয়া আছে; বুঝি তার প্রতি স্বামীর বিশ্বমাত্র রাগ নাই। শান্তির চোখ হইতে বর বর করিয়া অশ্রুতাপ-অশ্রুজল বরিয়া পড়িল। শান্তি ভাবিল,—“দেবতা আর কোথায় থাকে—কোন বর্গে? এ যে তার সাক্ষাৎ ইষ্ট দেবতা।” শান্তির হৃদয় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে ছই হাতে স্বামীর পদযুগল ধরিয়া বলিল,—“দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি জানুহীনা।” শান্তির অশ্রুজলে শরতের পদ-যুগল সিক্ত হইতেছিল। শরৎ বলিল,—“শান্তি! আমি এখনও তোমার সেই দরিদ্র স্বামীই আছি। আমার সে শক্তি নাই যে, তোমায় সোণা-দানা, দিয়ে বিব করি রাখি। শান্তি বলিল—আর আমার সোণাদানা, টাকা-কড়ি, ভোগবিলাসের সাধ নাই। আমি এখন বেশ বুঝতে পেরেছি আপনিই আমার সুখ! আপনিই আমার সর্ব্ব্ব। আপনিই “আমার দেবতা”।

শরৎ পদবিব্রুজিতা শান্তিকে তাহার কল্পিত বন্ধের কাছে টানিয়া লইল।

ত্রিযোপেক্ষবোহন বিখ্যাস।

## মহারাজা রণজিৎ সিংহ ।

জগতে কত লোক আছে—কিছুকাল থাকে এবং তাহার পরে কোথা চলিয়া যায়, কে তাহার সংখ্যা করে? কিন্তু যাহার আসায় আনন্দ, অবস্থানে আনুভূতি এবং প্রয়াণে মানব-হৃদয়ে একটা বিবাদের ছায়াপাত হয়; লোকে হাস্য হাস্য করে, এ জগতে তাহার জন্মই সার্থক ।

নশীপুরের বনামগুপ্ত বদান্তর মহারাজা রণজিৎসিংহ হঠাৎ এ ধরাধাম হইতে মহা-প্রস্থান করিয়াছেন; যাইবার কোন লক্ষণ পূর্বে সূচিত হয় নাই, মহারাজ কোন পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই—তাঁহার অনুস্থসংবাদ ঘুণাকারেও কেহ জানিত না, মহারাজ লাট-ভবন হইতে আসিলেন; কর্মবীর জগতের শেষ কর্তব্যকর্ম সমাধা করিয়া রজনীতে সামান্য অনুস্থতা বোধ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, প্রাতঃ-কালে আর উঠিলেন না, আত্মীয় স্বজন বহুবাক্য পক্ষীপুত্র কাহারও সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইল না; কাহাকেও কোন কথাও বলিলেন না, নিজেই নিজের ভাবে বিভোর হইয়া যথার্থই মহাপুরুষের জ্ঞান মায়ার আবরণ ছিন্ন করিয়া অনন্তের ক্ষোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমরা সেদিন ইন্টেন্ডারসিটি ইন্সটিটিউটে পোস্তা রাজবাটীর কুমার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুরের সর্ধর্কনা-মতায় তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাতি হইয়াছিলাম; তার পর আট দশ দিন পরে শুনিলাম—মহারাজ আর নাই। এখনও মনে পড়ে, তাঁহার সেই হাসি হাসি মুখ, সেই অমায়িকতা অঙ্কিত সাদর সজাষণ।

অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াও মহারাজ কিছুমাত্র অহঙ্কারী ছিলেন না; সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেন, সকলকে সমান চক্ষে দেখিতেন,—ইহা মহা-রাজা রণজিৎ সিংহের অমায়িক চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। সে দিন পোস্তা রাজকুমার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুরের সর্ধর্কনা সজাষণ তিনি যেরূপ দীনভাবে মিলিত হইয়া সকলকে আপায়িত করিয়াছিলেন—সেরূপ দীনতা, নিরহঙ্কারীতা আমরা আর কোন মহারাজের চরিত্রে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মহারাজ এ দরিদ্র সাহিত্যিকের মহা সহায় ছিলেন; কোন বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া কখন বিকল-মনোরথ হইতে হয় নাই, মৎপ্রণীত যাবতীয় পুস্তক পাঠে প্রচুর আনন্দলাভ করিয়া কত সাহায্য করিয়াছেন, তিনি অযাচিতভাবে বহু প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। হাস্য! এমন দরিদ্র সাহিত্যসেবীর চিরবন্ধ এ জগতে আর মিলবে না, তাই তাঁহার মহাপ্রয়াণে আমরা যেন একটা বিশেষ সুখদ হারাইলাম বলিয়া মনে হয়। তিনি নিজের চরিত্রের অনুরূপ করিয়া সকলকে শিক্ষা দিতে ভালবাসিতেন; কুমার হরিপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন—আপনার স্বভাব অতি অমায়িক, আপনি আপনার মহৎ বংশের মান রাখিতে পারিবেন, তার পর তিনি পোস্তা রাজবংশের মহারাজ সুখময় হইতে আরম্ভ করিয়া কত কীর্তিকাহিনী প্রকাশ করেন—যাহা সাধারণ লোকে জানিত না; আপনাকে দীন করিয়া পরকে বড় করিতে কেবল মহারাজা নশীপুরই জানিতেন, এই মহাবংশে অশঙ্কিত হার

জন্ম শুধু আমরা কেন বাহারা তাঁহার সহিত  
কণেকমাত্র আলাপ করিয়াছেন—তাঁহারাই  
শোকে মুহমান, হার হার করিয়া বলিতেছে—  
বাহা গেল, ঠিক তেমনটা আর হইবে না।

মহারাজের পারিবারিক জীবনও বেশ সুখ-  
কর ছিল। সাধা পত্নী মহারানী কমলকুমারী  
ও পিতৃপন্ডিতবর্তী চারিটা পুত্রের গুণে তিনি  
সংসারে অতুল সুখে সুখী হইয়াছিলেন, দ্ব্যেষ্ঠ  
পুত্র রাজা জীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ  
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ উপাধিপ্রাপ্ত  
হইয়া এতাবৎ কাল স্বর্গীয় গুণময় পিতার  
সাংসারিক সকল বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছেন।  
তাঁহার দ্বারা পিতৃকীর্তি যে সম্যক্রূপে বজায়  
ধাক্কিবে, আমরা সে ভরসা খুব করিতে পারি।  
বৃত্তাকালে মহারাজের বয়স হইয়াছিল ৫০  
বৎসর, তিনি রাজা উদয়সিংহ বাহাদুরের  
বংশধর বাহার নামের রাভা এখন কলিকাতায়  
রাজা উদয়সিংহ স্ট্রীট নামে বিখ্যাত রহিয়াছে।  
পল্লভীর বৃদ্ধের সময় রাজা দেবী সিংহ লর্ড  
ক্লাইবকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া মহারাজা  
উপাধি প্রাপ্ত হন; উহারই প্রাপ্তপুত্র রাজা  
উদয়সিংহ—ইনি সাতিশর ধার্মিক এবং  
বদান্ত ছিলেন। ইহার ভ্রাতা রাজা কার্টি-  
চন্দ্র সিংহের পুত্র আমাদের রাজা রণজিৎ সিংহ  
বাহাদুর, ইনি ১৯১০ সালে মহারাজা উপাধিতে  
ভূষিত হন এবং পর বৎসর এই রাজবংশ  
গভর্নমেন্ট কর্তৃক পুরুষাঙ্কুরে “রাজা বাহাদুর”  
উপাধি-সম্মানে সম্মানিত হন,—এ বিষয়  
আমরা বর্ধমানের “আলোচনার” প্রকাশ  
করিয়াছি। মহারাজা রণজিৎসিংহ বঙ্গদেশের

আদর্শ জমীদার ছিলেন; তাহার গুণের কথা  
লিখিয়া শেষ করা যার না।

সেও, কীর্ত্তিমান! কীর্ত্তিগুণে চড়িয়া আমার  
অমরত্ব ভোগ কর, আমরা তোমার পবিত্র  
স্মৃতিটুকু বৃদ্ধ করিয়া চির শান্তি অমরত্ব  
করি।

সম্পাদক।

## দেব-তত্ত্ব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আত্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা  
দেখিতে পাই আমি বলিয়া এক ব্যক্তি  
রহিয়াছে, আমার বুদ্ধি বৃত্তি, জ্ঞান, চৈতন্য,  
জীবন আছে ও আর আছে আমার দেহ।  
আবার, হাত পা, মূখ, চোক, নাক, কাণ, মাথা  
বুক, পেট প্রভৃতি দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম  
আছে। এক একটা স্থানের এক একটা নাম  
হইলেও সেই স্থানের ভিত্তর অস্ত অস্ত নামেরও  
পদার্থ রহিয়াছে। যেমন দেহের যে স্থানকে  
হাত বলা যায়—তাঁহার ভিত্তর চর্ম, লোমকূপ,  
সেশী, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, অস্থি, যজ্ঞা প্রভৃতি  
ভিন্ন নামের অনেক উপকরণ আছে, হাত  
বলিলে, এই সকলের সমষ্টিকে বুঝায়।—  
যোটের উপর আমাতে ছুই প্রকারের জিনিষ  
গণণ্য হইতেছে, এক প্রকার যাহা না  
ধাক্কিলে এই দেহের আমিত্ব থাকে না,  
তাঁহাকে জীবন, চৈতন্য, জ্ঞান বাহা হউক বলুন,  
অপরটি এই চৌদ্দ পোয়া দেহ, এই দেহ উপরি

উক্ত চৈতন্য বা জীবনের দ্বারা চালিত হইতেছে ।

এই ভাবে আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমাদের প্রথমে বুদ্ধিতে হইবে—সৃষ্টির ভিতর সমুদয় এক ধরণের হওয়াই শাস্ত্রের উক্তি বলিয়া আমাদের জ্ঞান ব্রহ্মেরও দুই অংশ থাকিতে হইবে । এক অংশ ব্রহ্মের দেহ, অপর অংশ ব্রহ্মের জীবন, চৈতন্য বা শক্তি । শাস্ত্র সকলও ইহার বিপরীত বলেন না । আমাদের দেহ আমরা দেখিতেছি চৌদ্ধ পোয়া, ব্রহ্মের দেহ কিন্তু বিরাট, অর্থাৎ অতি বৃহৎ, তাঁহার দেহ অপেক্ষা বড় দেহ কাহারও নাই এবং থাকিতে পারে না, যে দেহের আদি নাই, অর্থাৎ এই স্থান হইতে ব্রহ্মের দেহ আরম্ভ হইয়াছে, এরূপ কেহ বলিতে পারে না, কাহারও দেখিবার ক্ষমতা আছে ধরিয়া লইলেও সেই ব্রহ্ম দেহের আদি কেহ পাইবেন না, সে দেহের অন্ত বা শেষ নাই, কাজেই বুঝা যাইতেছে, সেই দেহ নাই—এমন কোন স্থান নাই, সুতরাং সেই দেহ সর্বব্যাপী বলিয়া বুদ্ধিতে হইতেছে । বায়ু যেমন সর্বব্যাপী—তেমনি সেই পুঁদহ, বাটী, পর্কট, বন, সাগর, মহাসাগর, শূণ্য, অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রশোভিত আকাশ-মণ্ডল সর্বত্রই তাঁহার দেহ ব্যাপিয়া রহিয়াছে । অথচ ইহার বিশেষ একটা আকার নাই ও সূক্ষ্মতা হেতু এই দেহ দেখা যায় না ।

যদি বলেন যে, ব্রহ্মের দেহ সর্বত্র ব্যাপিত একথা কেন স্বীকার করিব ; তাহার উত্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্ম যে অনন্ত, অনাদি, infinite একথা বধন সকল ধর্মেরই বলিতেছে, তখন এ

স্বতন্ত্রে বিচার চলে না, কেবল infinite, অনাদি, অনন্ত প্রভৃতি ব্রহ্মের বাচক বিশেষণগুলির অর্থ ভাবিলেই এইরূপ স্বীকার করিয়া লইতে হয় । যিনি সকলের উপর, তাহার উপর কেহ নাই, তাহার কখনও ক্ষয় থাকিতে পারে না, কাজেই তাহাকে অক্ষয় বলা হইয়াছে, তাহার দেহ যতপি কোন স্থানে না থাকে—তবে তাহাকে অনন্ত বলা যায় কি প্রকারে, সেইখানেই ত তাহার দেহের অন্ত অর্থাৎ শেষ সীমা বুঝা যাইবে, তাহা হইলে, তিনি অসীম হইলেন না ?

আমরা গণিত জ্যোতিষ (astronomy) শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যে স্থানকে আমরা গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ বলিয়া দেখিয়া থাকি, সেই স্থান অসীম, সেই স্থানের ভিতর আমাদের সূর্য্য অপেক্ষাও বৃহৎ বৃহৎ সূর্য্য আছেন ও কত (solar system) ব্রহ্মাণ্ড আছে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না । যতই অধিকদূরদর্শী দূরবীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার হইতেছে, ততই নূতন নূতন গ্রহ সূর্য্য, দূরবর্তী নক্ষত্র প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে । ইহা হইতে এই আকাশকেই বৈজ্ঞানিকগণ এমন একস্থান বলিতেছেন—যাহার সীমা নির্ণয় করা যায় না । এবং এই স্থানের কোথায় আদি, কোথায় শেষ—তাহা জানিবার উপায় নাই বলিতেছেন । তাহারাই আবার বলিতেছেন, এই স্থান মধ্যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত অনেক ব্রহ্মাণ্ডও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি গণগাতীত সংখ্যায় রহিয়াছে ।

এই সকল বৈজ্ঞানিকদের কথায় প্রভিষ্ট

আমাদের শ্রীমত্যাগবত, দেবীভাগবত, সাবিত সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের উক্তি সকল একত্র করিলে আমরা বেশ নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, গ্রহ-নক্ষত্র-যুগিত যে অসীম আকাশ আমরা দেখিয়া থাকি, উহা সেই শাস্ত্রকথিত কারণ-সমুদ্র। কারণ উক্ত শাস্ত্র সকলে কথিত আছে যে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে অসংখ্য এক্রপ ব্রহ্মাণ্ড,জলমধ্যে মাছের কঁালের মত ভাসিতেছে, বয়ঃ বায়ুকণা, যাহা সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছে, তাহা কেহ গণিয়া শেষ করিতে পারে তবুও এই সকল কারণ-সমুদ্রে ভাসমান ব্রহ্মাণ্ডের কেহ সংখ্যা করিতে পারে না। কাজেই যে আকাশকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক Infinite space বলিয়াছেন, তাহাকেই আমরা শাস্ত্রোক্ত কারণ-সমুদ্র বলিতেছি, ইহাতে কাহারও ভিন্ন মতের কারণ থাকিতে পারে না।

তবে কারণ-সমুদ্রকেও আমরা অনন্ত বলিয়া জানিলাম। ব্রহ্মকেও অনন্ত বলিতেছি, দুইটি অনন্ত অসীম পদার্থ থাকিতে পারে না, তাহা হইলে দুইটি সীমাবৃত্ত, সান্ত, অর্থাৎ বাহার অন্ত অর্থাৎ শেষ আছে—এইরূপ হইয়া পড়ে। কাজেই কারণ-সমুদ্রই ব্রহ্মের দেহ বলিয়া আমাদের ধারণা করিতে হইতেছে। দুইটি এক না হইলে দুইটিই অনন্ত অসীম হইতে পারে না। ইংরাজি বিজ্ঞান-শাস্ত্রই এই Infinite space, অর্থাৎ যে স্থানে সূর্য্য নক্ষত্রাদি বিরাট করিতেছে, সেই আকাশকে কোইলন্ নামক এক পদার্থে পূর্ণ বলিতেছেন। ইংরাজিতে যাহাকে বস্তু অর্থাৎ matter বলে, তাহা কোন বস্তু পদার্থের বিকৃতি বা পরিবর্তিত অবস্থা মাত্র

বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের মত, Koilon সেই অবিকৃত অবস্থা, অর্থাৎ ম্যাটারের মূল উৎপত্তির কারণ, Koilonকে ঐশ্বরিক শক্তিতে পরিবর্তিত করিয়া ম্যাটার হয়। ম্যাটার মূল পদার্থের বিকৃতি, কোইলন্ অবিকৃত আদি।

শাস্ত্রমতে কারণ-সমুদ্র মহৎ নামক অবিকৃত প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ। এই মহৎকে কোন কোন স্থানে প্রধানও নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে যেহা যায় যে, বৈজ্ঞানিকদের ম্যাটারকে আমরা প্রকৃতির বিকৃতি বলি, ইহাই পক্ষীকৃত পঞ্চভূতটি ম্যাটার বা বস্তু। আর কোইলন্ সেই অবিকৃত প্রকৃতি, বা মহৎ অথবা প্রধান। আবার প্রকৃতিও পুরুষ মিলিয়া তবে ব্রহ্ম। ব্রহ্মে প্রকৃতি-পুরুষের মিশ্রিত সাম্যাবস্থা, কাজেই এই অবিকৃত প্রকৃতি পূর্ণ অনন্ত, অসীম কারণ-সমুদ্রই ব্রহ্মের দেহ ইহা বুঝা যাইতেছে।

আমাদের দেহ যেমন জীবন, চৈতন্ত, সংজ্ঞা নামক এক প্রকার শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে, সেইরূপ ব্রহ্মের এই বিরাট অনন্ত দেহরূপ কারণ-সমুদ্র যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়, যে শক্তি এই দেহের জীবন, সেই বিরাট চৈতন্ত, সেই Spirit of Infinite Lifeকে শাস্ত্রে পুরুষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাকেই তত্ত্ব শিবতত্ত্ব, এবং ঐ বিরাট দেহকেই শক্তি-তত্ত্ব বলা হইয়াছে। দেহের সহিত আমাদের চৈতন্তের বা জীবনের যেমন পৃথক করিবার উপায় নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের দেহ ও ব্রহ্মচৈতন্তও পৃথক করিবার নহে, কেবল আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য কল্পনা করা হইল মাত্র। আমাদের জীবন বা চৈতন্ত যেমন আমাদের পদ প্রাপ্ত

হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত সর্বস্থানে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ ব্রহ্ম চৈতন্য ব্রহ্মদেহের সর্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অন্ধ যানবে যেমন দৃষ্টিহীনতাবশতঃ পড়িয়া যাইবার ভয়ে চলিতে পারে না, চলিতে সাহস করে না, খঞ্জের চলচ্ছক্তি না থাকা বশতঃ দৃষ্টিশক্তিবশতঃ চলিলে বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেও শক্তির অভাবে চলিতে পারে না, কিন্তু যতপি খঞ্জকে অন্ধের নক্কে চাপাইয়া দেওয়া যায়, তবে উহার বশ যাইতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতি অবস্থায় অজ্ঞ-বশতঃ তাহাতে কোন ক্রিয়ার শক্তি থাকে না, আর পুরুষ অবস্থায় দেহ ব্যতীত ক্রিয়ার কোন ক্ষমতা চৈতন্যেরও থাকে না। কাজেই সাধকগণ পুরুষ প্রকৃতি-মিলিত ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, একটি ছাড়া অপরটির কল্পনা পর্যন্ত করিতে হয় না।

মহানির্বাণে ব্রহ্মসাধন ও আত্ম কালিকা সাধন একই ব্রহ্মের সাধন বলিয়া তত্ত্বকার উক্ত-রূপ যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সর্বত্রই matter এবং force এই দুইটি শক্তির বিভ্রমাদ্বে দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে ম্যাটার বা বড় বস্তু দেখিতে পাই, সেইখানেই force রহিয়াছে, force আছে বলিয়া বস্তুটির পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল একত্র হইয়া একটি বিশেষ রূপ ধরিয়া রহিয়াছে। এই দুইটিকে অন্ন ও প্রাণ বলিয়া উপনিষদে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অন্ন অর্থে matter, আর প্রাণ অর্থে force এই দুইটি শক্তি পৃথক অবস্থায় দেখা যায় না।

আমরা জিওগ্রাফি অর্থাৎ ভূগোলশাস্ত্র

আজকাল সকলেই পড়িয়াছি। ইহা হইতে বুঝিয়াছি—আমাদের পৃথিবীর আকার গোল, পৃথিবীতে জল ও স্থল আছে, জলের রহং ভাগের নাম মহাসাগর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগের নাম সমুদ্র, হ্রদ, নদী, তড়াগ ইত্যাদি। স্থলের সেইরূপ রহং ভাগের নাম মহাদেশ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগের নাম দেশ, প্রেসিডেন্সি, ডিভিজন, জেলা, থানা, গ্রাম ইত্যাদি। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি থানা, কয়েকটি থানা লইয়া একটি জেলা, কতকগুলি জেলায় এক ডিভিজন, কয়েক ডিভিজনে এক প্রেসিডেন্সি, অনেক প্রেসিডেন্সি লইয়া এক দেশ হয়।

কারণ-সমুদ্ররূপ এই ব্রহ্ম দেহের ভিতরও আমরা একরূপ নানা প্রকার বিভাগ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, যে স্থান ব্রহ্মাণ্ডাদিতে পূর্ণ, ও যে স্থান খালি অর্থাৎ কোন ব্রহ্মাণ্ড আদি যে স্থানে নাই, আমাদের পৃথিবীর জল ও স্থল নামক রহং বিভাগের অনুরূপ এই বিভাগ। পৃথিবীতে যেমন এক এক গ্রামা বিভাগ সেইরূপ কারণ-সমুদ্রে এক এক ব্রহ্মাণ্ড, সাতটি ব্রহ্মাণ্ড একত্র করিয়া একটি বিভাগ আছে, তাহার নাম জগৎ; এই জগৎ বলিলে সাতটি ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। আমরা চলিত ভাষায় আমাদের পৃথিবীকে জগৎ বলিয়া থাকি, এ সে জগৎ নহে! এই জগৎকে আমরা ভারতবর্ষের গ্রাম সমষ্টি লইয়া থানা-বিভাগের মত বলিতে পারি। এক সহস্র জগৎ লইয়া একটি বিভাগ হয়। এই বিভাগের নাম বিশ্ব। ভারতবর্ষে কয়েকটি থানা লইয়া জেলা হয়, ইহা তদনুরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে

পারে। এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বিঘ একত্র করিয়া একটি মহাবিঘ নামক বিভাগ হয়। এই বিভাগকে আমাদের দেশের জেলার সমষ্টি লইয়া ডিভিজন নামক বিভাগের সহিত তুলনা করা যায়। আমাদের চলিত ভাষায় বিঘ শব্দে আমরা পৃথিবীকেই বুঝিয়া থাকি, বিশ্বের প্রকৃত অর্থ এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি হইতেছে। দুই শত মহাবিঘ লইয়া এক লোক হয়। ভূলোক, ভূবলোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি স্থলে লোকের গেরূপ অর্গ, এই বিভাগীয় লোকের সে অর্থ নহে। এক মহাশত লোক একত্র করিয়া একটি মহালোক নামক বিভাগ হয়। আমাদের দেশের কয়েকটি ডিভিজন লইয়া এক প্রেসিডেন্সি বিভাগের সামিল বলা যাইতে পারে। এক শত পদ্ম মহালোক মিলিত করিয়া একটি সংসার হয়। আমাদের চলিত কথায় আমাদের পরিবারবর্গ লইয়া একটি সংসার হয় আমরা বলি। এই অর্থে আমরা কাহাকেও সংসারী, কাহাকেও সংসারভাগী বলিয়া থাকি। মহালোক লইয়া সংসার নামক যে বিভাগ হয়, তাহা কত বিপুল একবার সকলে অনুমান করিয়া দেখুন। এই সংসার নামক বিভাগটিকে আমাদের পৃথিবী মধ্যস্থিত কন্টিনেন্ট অর্থাৎ মহাদেশের অন্তর্গত এক একটি দেশ নামক বিভাগ বলা যাইতে পারে।

কারণ-সমুদ্রে কত কন্টিনেন্ট আছে—তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। আমরা ক্ষুদ্র মানব আমরা একটি মাত্র কন্ট্রি বা দেশ অর্থাৎ সংসার নামক বিভাগের বিবরণ জানিতে পারিরাছি, ইহাই আমাদের অতিশয় স্পর্ধার

কথা বলিতে হইবে। এই সংসারের উপর অপর কোন বিভাগ আছে কিনা তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। কারণ-সমুদ্র ব্রহ্মের দেহ বলিলে এই সংসার নামক বিভাগকে ব্রহ্মের দেহের হস্ত-পদ-মস্তক-বন্ধরূপ দেহবিভাগের এক বিভাগ বা এক অঙ্গ বলা যাইতে পারে। মানুষের হস্ত নামক বিভাগের মধ্যে যেরূপ অস্থি, মজ্জা, স্নায়ুশ্রেণী, শিরা প্রভৃতি উপবিভাগ আছে বলিয়াছি, সেইরূপ সংসার নামক বিভাগের মধ্যস্থিত মহালোক, লোক, মহাবিঘ, বিঘ, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি বিভাগগুলিকে ধারণা করা যাইতে পারে।

সংসার নামক বিভাগ ও তদন্তর্গত উপ-বিভাগগুলি প্রত্যেকই সেই সেই উপবিভাগ ও বিভাগের অধিপতি দেবতার পূর্ণ দেহ হইতেছে। সংসারের অধিপতি মহাবিশ্ব, তাঁহার দেহ সংসারের সীমা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। মহালোকের অধিপতি মহেশ্বর ইহার দেহ মহালোক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। একটি লোকের অধিপতি পরমেশ্বর, ইহার দেহ এক লোকের সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। একটি মহা বিশ্বের অধিপতির নাম পরেশ্বর, তাঁহার দেহ মহাবিশ্বময়-ব্যাপী। বিশ্বের অধিপতি হর, হর বিশ্বটী ব্যাপিয়া তাঁহাতে রহিয়াছেন, জগতের অধিপতি হরি, তিনি এক জগৎ অর্থাৎ সাতটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শরীর লইয়া বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ঈশ্বর, তাঁহার শরীর ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছে। এই পৃথিবী, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, শুক্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহও মধ্যবর্তী শূন্যস্থান ব্যাপিয়া ঈশ্বরের শরীর

ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান।

ব্রহ্মের কারণ-সমুদ্ররূপ অনন্তদেহের মধ্যে এই সকল অধিপতি দেবতাদের দেহ রহিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহাদের ব্রহ্মের দেহের এক একটা বিভাগ বা অঙ্গ ও তাহার ভিতরের উপবিভাগ বা অস্থিপেশী আদি উপাদান বলিয়া কল্পনা করিতে পারি। কোন মানবের তৃষ্টির অল্প তাহার দেহের সেবা করা অল্পতম উপায়। উপযুক্ত আহার দ্বারা রসনার তৃপ্তি করা, উদর পূরণ করা, মৰ্দন দ্বারা করচরণের সেবা করা ইত্যাদি দ্বারা মানবের তৃপ্তি করা যায়, অর্থাৎ কোন এক অঙ্গের তৃপ্তিতেই দেহীর তৃপ্তি হইয়া থাকে সুতরাং আমরা যতপি এক সংসার নামক বিভাগের অধিপতি দেবতা মহাবিকুর পূজাদির দ্বারা তৃপ্তি করিতে পারি; তাহা হইলে সেই ব্রহ্মের এক অঙ্গের তৃপ্তি করিয়া এই একাঙ্গ মাত্রের তৃপ্তিতে ব্রহ্মেরই তৃপ্তি হইয়া থাকে, এই-রূপে অধিপতি দেবতার পূজা ব্রহ্মেরই পূজা। এই কারণে দেবপূজা ব্রহ্মেরই পূজা। এই দেবগণ ব্রহ্মের অঙ্গরূপে অঙ্গের ভিতর রহিয়াছেন। আমাদের দেহের এক এক অংশের যেমন এক এক পৃথক্ নাম আছে, ব্রহ্মের দেহের এক এক অংশের সেইরূপ পৃথক্ নাম কল্পনা করিয়া সেই নামীয় অংশের ভিতর আবার অস্থিমজ্জা স্নায়ুপেশী প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামীয় পদার্থের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার দেহ-রূপ ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব রহিয়াছে। অস্থি মজ্জা স্নায়ুপেশী শিরা প্রভৃতি যেমন হাতের অন্তর্গত বলিয়া হাত নামক এক সাধারণের নামের ভিতর রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মদেহের হস্ত নামক

এক অঙ্গ ইহাকে মহাবিকুর বলিলে ইহার ভিতর-মহেশ্বর, পরমেশ্বর, হর, হরি, ঈশ্বর প্রভৃতি দেবভাগণ হাতের ভিতরস্থিত অস্থি মজ্জা, শিরা স্নায়ুপেশী ধমনীর দ্বারা বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেহীর তৃপ্তিতে দেহের সর্বদেব আদি তৃপ্তি, সেইরূপ ব্রহ্মের তৃপ্তিতে সর্বদেব আদি জীবের তৃপ্তি। আবার কোন অঙ্গবিশেষের তৃপ্তিতে দেহীর যেরূপ তৃপ্তি হয়, সেইরূপ কোন অধিপতি দেবতার পূজায় ব্রহ্মেরই পূজা হইবে না ত কাহার পূজা হইবে ?

এইরূপে আমরা দেখিলাম দেবগণ আমাদের পূজা হইতেছেন। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, আমাদের অপেক্ষা উন্নত জীব বলিয়া ও উহার আশ্রয়ের অঙ্গ হিতকর কার্যে সারাজীবন নিযুক্ত রহিয়াছেন বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পূজা পাইবার যোগ্য হইতেছেন।

অধিপতি দেবগণ ব্রহ্মের দেহের ভিতর তাহার দেহের অঙ্গ বা উপাদান স্বরূপে সেই দেহের ভিতর ওতঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন, এবং ব্রহ্মের শক্তি আপনাদের দেহের মধ্যে দিয়া আপনার নিজ শাসিত ব্রহ্মাণ্ড আদির সমষ্টিতে ও তদন্তর্গত জীবদেহে পোষিত করিতেছেন। এই দেবদেহ ব্রহ্মের দেহের ভিতরের দেহ বলিয়া দেবদেহকে স্বমেষসঙ্গী বলিয়া স্তবজ্ঞতি করাও অথবা কথা হয় না। ব্রহ্ম পূর্ণ, তাহার দেহও পূর্ণ, দেহের প্রত্যেক অংশই পূর্ণ, এই অংশ ভাবে দেবদেহ সকলও পূর্ণ। আমরা আমাদের পৃথিবীর মানবকে গুরু বলিয়া পূজা করি, তাহাতে এই কারণেই ব্রহ্মপূজা করা হয়।



চলিত কথায় দেবগণকে অমর বলা হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের মরণ নাই। কিন্তু ইহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হইলে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ত্রস্তার এক দিনের পরিমাণ পাইয়াছি, সেইরূপ ৩৬০ দিনে ত্রস্তার এক বৎসর হয়, ঐরূপ বৎসরের শত বৎসর ত্রস্তার পরিমাণ শাস্ত্রেই বলে। মহাবিশ্বের আয়ুর কাল আমরা এই প্রবন্ধেই পূর্বে বলিয়াছি। তবে এই আয়ুষ্কাল গত হইলে উহাদের দেহ আমাদের দেহের মত নষ্ট হইবে না। দেবগণ আপনাদের নির্দিষ্ট কাল গতে অগ্রস্থানে অগ্র কার্যে নিযুক্ত হইবেন। ত্রস্তার পদ লইয়া সৃষ্টির কার্য করিতেছিলেন তাহা শেষ হইলে আর অগ্র কোন লোকে সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত নাও থাকিতে পারেন। অগ্রত্রে অগ্র কার্য করিতে বাইলে তাঁহার ত্রস্তা নাম আর থাকিবে না, কাজেই একভাবে তাঁহার মূহা হওয়া বলা বাইতে পারে। দেবগণের সকলেরই আয়ুষ্কাল পরিমিত আছে; কিন্তু তাহা আমাদের মত মানবদের পক্ষে এত অধিক কাল যে আমরা চলিতভাবে উহাদের অমর বলিয়া থাকি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল।

## বাসনা।

প্রস্তো।

আমি ভুলব এবার সপিন জনে  
কর বিশ্ব রূপে হয়ে আপন হারা।  
‘রাসি’ তোমার হৃদয় বাস্ত্রে  
ভাবব গুনে জীবিত তারা।

পাগল হ’রে তোমার গানে  
জানাব দুখ, ওগো দুখহরা।  
শেষ নিবেদন দাসের এখন,  
অন্তে করো না চরণ ছাড়া।

শ্রীবলাইলাল মুনসী।

## অন্তদৃষ্টি।

রক্তাদি সপ্তধাতু গঠিত মানবের উৎপত্তির কোলেই বিপত্তি ও বিলয়ের অবস্থা অর্থাৎ জন্মই বিপন্নভূতর প্রদর্শক। ত্রেহ কখন এই তিনটি হইতে বিমুক্ত অবস্থার মানব হইতে পারে না। এই অবশ্যজ্ঞাবী জন্মমূর্ত্তার মধ্যস্থলে মানব জীবন একটা সসীম দিনের অসীম কর্তব্য চিন্তা ও মহৎ ভাবনিচয়কে আশ্রয় করে। প্রথমে জন্মগ্রহণের পর কর্তব্য ও জ্ঞানোন্নিয়গণের ক্রমবিকাশ ঘটয়া মাহুযকে বাল্য হইতে ক্রমে বার্দ্ধক্যের সহিত—কর্তব্য হইতে কর্ত্বের সহিত মিলিত করে। সেই স্থলে সে জরার সহিত আলিঙ্গন করিলে আবার ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি, ক্রমসঙ্কোচভাব ধরিয়া তাহাকে স্রাবার বালক করিয়া ভুলে। এই ত মানবের অসার জীবনের অসার কার্য। এই অসারতার মধ্যে দুইটা পথ আছে, একটি বাহ্যদৃষ্টি অপর অন্তদৃষ্টি। বাহ্যদৃষ্টি এই অসার ভাবকে এক আকারে রাখিয়া দেয়। জন্ম হইতে মাহুয বাহ্য দেখে, বাহ্য জ্ঞানে, বাহ্য করে, সে চিরদিন সেইভাবে

বিষয় থাকে। সুতরাং সে মানব হইলেনও, তাহাকে পশুপক্ষী কীটাদি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না, কেন না মানুষের মনুষ্যত্ব দেখে, রক্তে বা আত্মতত্ত্বের ময়,—শুণে এবং আত্ম ও পরতত্ত্ব মিশ্রণে। কেন এরূপ হয় ? এ 'কেন'র উত্তর একটু গভীরতামূলক।

এই বাহ্যদৃষ্টির মধ্যে বাহ্য দৃষ্টাই বর্তমান থাকে। দৃষ্টির ভিতরে যে বিদ্যুৎগতি একটা শক্তি থাকে, তাহা তাহার থাকে না। সুতরাং সে উপরের ছায়ামাত্র দেখে বা প্রতিধ্বনি শুনে। বাহ্যভাবে হৃদয়কে যুদ্ধ করিতে পারে না। এই শক্তিই মানুষকে অন্তর্দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করে। তাহা তাবগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। এইটি থাকিলেই সে বস্তুসকল বা কার্যনিচয়কে সাধারণ অপেক্ষা অগ্রভাবে দেখিতে পারে। দেখিলেই সেই আকাঙ্ক্ষার মধ্য হইতে গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি হয় ও তখন বাহ্য কার্যে সে একবারেই উন্নত হয় না—ইহা বুঝা যায়। সে বা' দেখে, বা' শুনে, বা' যায়, একাগ্রচিত্তে তাহাদের ভাব সংগ্রহ করে। ইহাকেই ভাবুক বলে। উন্মাদ হইতেই ভাবুকতার বৃদ্ধি হয়, ক্রমে অভ্যাস বলে সে বাহিরের সবই এমন কি নিজেকেও হারাইয়া ফেলে। মানব রাজ্যে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বুদ্ধ, চৈতন্য নানক, যীশু প্রভৃতি ধর্ম্মার্থোদী বীরগণ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, একলব্য প্রভৃতি কশ্মিরগণ এই উন্মাদের বলেই ভাবুকপ্রধান, বীরপ্রধান হইয়া তাবরাজ্যে অতুল বশঃপ্রী লাভ করিয়া গিয়াছেন। শত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, মানব হইয়া দেব সিংহাসনে স্থান পাইয়াছেন।

এই যে অধুনা বিজ্ঞানরাজ্যে বাণীয়ার ময়, ভাঙিত যন্ত্র, আকাশ যন্ত্র, আয়নের যন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়াছে, দিব্যরাজ্যিকে এক করিতেছে, জলহুলকে সমান রাখিতেছে, তাহার—মূলে উন্মাদ অর্থাৎ আপনহারী জীবনে সাধনের প্রবল ইচ্ছা, বার্ষশূন্য হৃদয়ের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা—সার্বজনীন সঙ্কল্পের পূর্ণ সাধনা। এই উন্মাদজ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সঙ্কল্পের মূলে প্রতিভার প্রকাশ ও সংযোজন আবশ্যক। তাহা হইলেই মানব শিক্ষাশিখরে উঠিয়া, কীর্তিবংশী-বাদনে বিশ্বের বরগীয় স্রবণীয় হইতে পারে। অতএব এই উন্মাদ মানুষকে বাহ্যদৃষ্টি হইতে অন্তর্দৃষ্টিতে লইয়া যায়। তখন তিনি মহৎ হইতে মহত্তর ভাব মিচয়ে নিবদ্ধ থাকিয়া উন্নততাব প্রদর্শন করেন, তাহাকেই শিক্ষা বা জ্ঞান তন্ময়তা বলে। এই তন্ময়তার বাহ্য-কাণ্ড মানবজীবনে স্থগতস্থ মিশ্রণ ব্যাপার। ইহার বলেই সে ক্রমে স্থূলত্ব ত্যাগে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ভাবে অমুপ্রাণিত হইয়া অতুল গৌরব বা অমূল্য শাস্তির উপর আধিপত্য করিতে পারে। সিদ্ধির তরঙ্গ বিক্ষুব্ধতা যে বাহ্যতাব তাহা ত্যাগ করিলে, তবে তাহার পবিত্র 'রত্ন' ভাব সকল চক্ষু ও অন্তরে প্রতি-বিম্বিত হইয়া সকলকে দেবতাবে আগ্রত করে। ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া ভিতরের তত্ত্ব দেখিলে, অথবা সামান্য তরুপত্রের গঠন বর্ণ ত্যাগে তাহার সৃষ্টিবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইলে, তাহাদের বিরট মূর্তির আভাস পাইয়া মানুষ মানুষ হয়। এ মহত্ত্বের মূলে দৃষ্টি ও উন্মাদ-জনিত তন্ময়তা। সে দৃষ্টি বড়ই সুখাবহ—

পতীর উন্নাদ বাতীত তাহা আসে না; মক্কতুমির উপর ধারাবিন্দু আসিতে আসিতে বিলীন হইয়া যায়। অতএব যে জন্মর ভাবনিবহে উন্নত হয় না, তাহা জন্মই নয়, সে দৃষ্টি দৃষ্টিই নয়। তাহাতে ধর্ম, কর্ম, কর্তব্য, সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য জায় কিছুই থাকে না; থাকে সাধারণ ভাব—জীবরাজ্যের একত্ব মাত্র অর্থাৎ সে পতপক্ষীর সহিত এক হইয়া সমানভাবে বাল করে। সে ভাবে আমি মানুষ—কিন্তু মানুষ তাহাকে মানুষ বলে না। সে দেখে শুনে চলে যায় শোয় পুত্রকলত্রকে খাওয়ায় ঐ সকলের গুণাগুণের অপেক্ষা করে না। জীবন লইয়া জীবন্তবৎ নররাজ্যের কলঙ্ক লইয়া ভ্রমণ করে। তাহার দ্বারা জীবরাজ্যও সম্রাসিত হয়। নিজের নিজের বুদ্ধি ও কর্মগুণে অশান্ত জীবনকে ক্রমে অশান্তির আগুনে নিক্ষেপ করে, চন্দন ভ্রমে বিঘের জলে কাপ দেয়। বিশেষভাবে ছুটিয়া সিদ্ধিলাভের লক্ষ সাধন-মন্দিরে গমন করে না বা করিতে পারে না। সুতরাং সে বা তাহার কার্যগুলি অরম্য, অতোগা, অদৃশ্য ও অগ্রাহ্য। তাহার চণচ্ছক্তি, বাক্শক্তি, ক্রতিশক্তি দৃষ্টিশক্তি চিন্তাশক্তি থাকিলেও সে খল্ল মুক বধির অন্ধ ও জড়। সে স্বধা-কলের আশায় বৃক্ষে উঠিয়া রঙের ঘোরে অবাচ্চ মাকাল ফল লাভ করে; কণক ভ্রমে হরিদ্রা-বস্ত্র সংগ্রহ করে। প্রকৃত দৃষ্টির অভাবে কু দৃষ্টিকে আশ্রয় করে। আপাততঃ এ লাভে এ সংগ্রহে সে সন্তুষ্ট হইলেও তাহাদের কার্য পরম্পরাধি ক্রমে সে অশান্তির কোলে মগ্ন হয়, আর শীঘ্র উঠিতে পারে না।

অতএব দৃষ্টিই মানুষকে বড় ও ছোট করিয়া থাকে। সংশ্লিষ্টকার সহিত ক্রমে স্রুষ্টি লাভ করিলে সুসংস্কার সম্পন্ন মানুষই দেবতা হইতে পারে। আবার অসং শ্লিষ্টকার সহিত কুদৃষ্টির যোগে, দেবতাও মানুষ বা ক্রমে পিশাচ হইয়া উঠে।

শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্র সেন।

## সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিবেদন।—আমরা অস্ত্রান্ত পত্রিকার মত “আলোচনায়” মূল্য বর্ধিত না করিয়া পূর্ব-বৎ ১৪০ টাকাই রাখিলাম, অথচ এই ভয়ানক মহাযজ্ঞের দিনে, কাগজের এই দারুণ দ্রুতিক্ষের দিনে আমরা পত্রিকাখানিকে সাধাযত সৌষ্ঠব-যিত করিতে যত্নের ক্রটি করিতেছি না, এক্ষণে গ্রাহকপত্রের নিকট সবিনয় নিবেদন,—তাঁহার অমুগ্রহ পূর্বক স্ব স্ব ধৈর্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমরা ক্রমশঃ সকলের নামে ভিঃ পিঃ করিতেছি, অমুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সময় স্থান।—ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহার্থ পুনরায় সময়-বণ তুলিবার লক্ষ্য সেদিন লাট-ভবনে মহাসভার আহ্বান হইয়াছিল। সেইদিনই নাকি সভাস্থলে নয় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এ সময় রাজ্যের সাহায্যার্থ বধাসাধ্য সকলের এই “সময়-বণ” ক্রয় করা উচিত। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে—ইহাতে লাভ বাতীত লোক-সান নাই। প্রজামাত্রেই এই দুর্দিনে সাহায্য করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন।

## পুরুষোত্তম

প্রাণে বড় সাধ—তোমায় একবার দেখিব।  
কিছু করিব না—বলিব না—চাহিব না, শুধু  
একবার দেখিব। আগে ভাবিতাম তোমায়  
দেখিতে পাইলে কত কি করিব, কত কাদিব,  
কত কি বলিব, এখন বুঝিয়াছি, যতক্ষণ কিছু  
করিবার, বলিবার, চাহিবার থাকে, ততক্ষণ  
তোমায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাকে  
দেখিলে চক্ষু আর কিছু দেখিতে চায় না,  
যাহাকে পাইলে ইন্দ্রিয় আপনার ইন্দ্রিয়ত্ব  
হারাইয়া ফেলে, সেই যে তুমি। যে ধামে  
বাইলে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, তাহাই  
যে তোমার ধাম। তাই কিছু চাহিব না, শুধু  
বাইব—দেখিব। আর ফিরিব না।

সাধ আছে কিন্তু শক্তি কই জগন্নাথ! ঋতি  
যে হৃদয় কন্দরে গভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছে  
“নাশমান্না বলহীনেন লভ্য।” বলহীন, জীবন-  
হীন, জড়মোহাচ্ছন্ন জড়ীভূত প্রাণ লইয়া কি  
তোমার ধামে যাওয়া যায়—তোমায় দেখা  
যায়? যেখানে গেলে জীব অগ্রিমধ্যস্থ কাঠ-  
খণ্ডের মত তোমার স্বাক্ষর লাভ করে—  
সেখানে যাওয়া কি সর্বাঙ্গ বুদ্ধি, অসুদার হৃদয়,

অপ্রশস্ত প্রাণ, সংশয়াকুল অপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান,  
মোহমুগ্ধ জীবের শক্তিসাধা? সুতরাং আমার  
পুরুষোত্তম দর্শনের সাধ বুদ্ধি চিরদিন ফলশূন্য  
থাকিবে। বুদ্ধি পদ্য পর্বত লজ্জনের বাস-  
নার মত আমার এ বাসনা অনন্তকাল আমার  
হতাশের তীব্র আলাময় বৃত্তিক দংশনে আকুল  
করিয়া রাখিবে। দীন শক্তিহীনের ভাগ্যে  
বুদ্ধি পুরুষোত্তম দর্শন ঘটিবে না।

কেন ঘটিবে না? আমার প্রাণ—আমার  
প্রাণের প্রাণ—তাহাকে আমি দেখিব—এ  
আশা আমার মিটিবে না? কিসে আমি  
দুর্কল? যাহার বলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিধৃত,  
যাহার ইচ্ছায় কোটা বিশ্ব পরিস্ফুট, স্থিত—  
যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত দেবতাসংঘ সৃষ্টি-  
ধর—তাহারই বলে আমিও সৃষ্ট—তাহারই  
ক্রোড়ে আমিও অবস্থিত, তাহারই চরণপ্রসঙ্গে  
আমিও আশ্রিত;—তাহারই বলে আমি তাহা-  
কেই দেখিতে চাহিতেছি—এ আশা আমার  
মিটিবে না? যিনি বিশ্বের প্রাণ, তিনি আমা-  
রও প্রাণ, যিনি বিশ্বের আত্মা—তিনি আমারও  
আত্মা,—তাহাকে বুকে ধরিয়া আমি তাহাকে

দেখিল না ! বিশ্বগুরো ! তুমি যে আমারও গুরু ! তবে কেন তোমার আমি দেখিতে পাইব না জগন্নাথ !

তা' এ ভাবের আশা-নিরাশার জোয়ার ভাটার যখন জীব ওলোট-পালোট খাইতে থাকে, তখন কাম্য বস্তুর কোন লীলা বা স্মৃতি-উদ্বোধক কোন কিছু যেখানে থাকে, সেই-খানেই সে জীবের প্রাণ স্বতঃ প্রধাবিত হয় । যে যাহাকে চায়, সে তাহার স্মৃতি বিজড়িত প্রতি পদার্থকে বুকে ধরিয়া রাখিতে চাহে । একদিন সহসা সঙ্কল্প করিলাম, পুরীধামে পুরুষোত্তম দর্শনে এখনি যাত্রা করিব ।

Singlo line নাগপুরী রেল ধরিয়া ট্রেন ছুটিয়াছে । একধা নামক Single line এর উপর দিয়া নাগপুরী ( কুণ্ডলিনী ) রেল পথে চিন্তার ট্রেন দ্রুত ধাবিত হইতেছে । যায়গায় যায়গায় গাড়ি থামে, আবার সেই Single line ধরিয়া জলদগন্তীর “গুরু” “গুরু” ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতে থাকে । আবার থামে—আবার ছোটে । এইরূপে অনেক প্রদেশ অতিক্রম করিলাম । অন্ধকার রাত্রি । বাহিরে ছুরঙ্গ অন্ধকার, কিছু দেখা যাইতেছিল না । চিন্তা-গাড়ীর ভিতরে আশার একটা স্মৃণ আলোক গাড়ীকে আলোকময় করিয়া রাখিয়াছিল । এ গাড়িতে চড়িলে প্রায়ই নিজা আসে । কিন্তু সে নিয়ম আমার পক্ষে খাটে নাই । অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, নিজার কবল চিরদিনের অন্ত পরাভূত করিতে চলিয়াছি । এখন আবার নিজা ! যদি কেহ একধা লাইন চিন্তাগাড়ি চড়িয়া পুরুষোত্তম

দর্শনে যাত্রা করেন, তবে এই নিজাটুকুকে সাবধান ।

যতদূর যাই, অন্ধকারে বাহু জগৎ ততই বিলুপ্ত হইতে থাকে, গাড়ির অভ্যন্তরস্থ আলোকে মাত্র আপনার সঙ্গী প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে থাকি । আর কত দূরে—কত দূরে তুমি জগন্নাথ, গাড়ির এইরূপ একটা একটা দমকে আপনার আমিষট্টা ছুটিয়া যাইতে থাকে । “আমিষ” যত যায় “বোধ” তত নির্মূল শাস্ত স্নিগ্ধতর হইতে থাকে । বাহিরে অন্ধকার যত বাড়িতে লাগিল, দিম্বগুল তত শব্দ-শূন্য হইতে লাগিল, গাড়ির “গুরু” “গুরু” ধ্বনিও তত গভীরতর হইতে লাগিল । নব জাগরণ ! প্রতি প্রভাতেই জাগরণ অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু পুরী-বাজীর জাগরণ, নূতন নবীনতম

আমি “পুরীতে” । প্রভাত হইয়াছে । অন্তর-বাহু এক আলোকে পরিচ্ছাদিত । “গাড়ি কখন থামিয়া গিয়াছে । “বাচো যত্র নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”—আমি সেইখানে । গাড়ির সে “গুরু” “গুরু” ধ্বনি নাই—সে গতি নাই—সে আলোক-অন্ধকারের ভেদ নাই । সব অন্তর । আমি অন্তরময়—অন্তঃ-করণময়—বিশ্ব প্রপঞ্চ অন্তঃকরণময় । সব অন্তরে অবস্থিত । সেই মাটি, সেই জল, সেই অগ্নি—বায়ু—আকাশ,—পুরীর মধ্যেও সেই সব—অন্তরে অন্তরময়—অন্তঃকরণময়—চৈতন্যময় ! পুরীতে—অন্তরে—প্রবেশ করিতে লাগিলাম ।

আনন্দধাম । আনন্দের হাট । অসংখ্য দেবতা-মণ্ডপ—মুক্তি-মণ্ডপ—দেবভাসংঘে মুক্ত

পুরুষে পূর্ণ। আনন্দের নীরব নিধর সমুদ্র। সব অন্তরে। এত দিন “ছিলাম” সত্য, কিন্তু এমন “ধাকা” কখনও অনুভব করি নাই। চৈতন্য ছিল বটে, কিন্তু এমন চিন্ময় বিকাশ দেখি নাই। আনন্দের স্বপ্ন ভোগ করিয়া-ছিলাম, আনন্দ এমন—তা জানিতাম না।

কিন্তু মণি-মণ্ডপে রত্ন-বেদীতে ও কি দেখিলাম। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ! ও যে চির দিনের পরিচিত, একান্ত—একান্ত আমার—আমার প্রাণ—আমার আত্মা। ও যে তুমি—আমার গতি—ভর্তা—প্রভু—সাক্ষী—স্বরূপ, আমার আত্মার আত্মা। আমি নাই—অগচ্চ আমার। ও কি রূপ! চক্ষু নাই দর্শনময়, হস্ত নাই সর্বাগ্রাহী, পদ নাই সর্বগ, ও যে আত্মা—পুরুষোত্তম—মা।

সর্বৈন্দ্রিয় গুণাভ্যাসং সর্বৈন্দ্রিয় বিবর্জিতম্।  
অসক্তং সর্বভূতচৈব নিগুণং গুণ ভোক্তৃচ ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্য রহিয়াছে ইন্দ্রিয় নাই! অথবা সর্বত্র সর্বৈন্দ্রিয়ময়। সৎ চিং আনন্দ ত্রৈধর্ম্মময়, অধর্ম্মী, নিগুণ, অগচ্চ গুণ ভোক্তা—মা। দক্ষিণে অনন্ত ব্যাপ্ত সৎ, মধ্যে চৈতন্য—উত্তরে আনন্দ।

এখানে আসিলে আর আমি থাকি না—তোমারময় হই। এই তোমার ধাম মা। এই আমার ধাম। হেথা পূজা নাই—প্রণাম নাই—পূজ্য পূজক, সেবা সেবক—নমিত নম-কৃত ভেদ আর নাই। শুধু আনন্দ ভোগ। শুধু প্রাণভর্য বুকতর্য আত্মভর্য দর্শন। আত্ম-হার্য আত্মদর্শন আত্মলাভ! তার্য ত এখানে নাই—বর্ণন্য কি করিব।

এত আপনার—এত আমায়র তুমি—কেমন করিয়া এতদিন না দেখিয়াছিলাম। মা—জগবন্ধ—জগন্নাথ! “জন্মানাম্য যতঃ” বলিয়া “ব্রহ্ম সূত্রে” যে আদিকারণকে ভাবার আঁকিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—সেই—সেই পুরুষোত্তম!

অপানি পানো যবন গ্রহীতা  
পশাতিচক্ষুঃ সং শূন্যোত্যাকর্ণঃ  
স চেস্তি বিশ্বম্ নহি তস্য চেস্তা  
তমাহরাদাং পুরুষঃ প্রধানং।

জড়জগতে পুণ্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষে পুরীধামে তোমার এই স্বরূপেরই দারুণময় মূর্তি করিয়া রাখিয়াছে। সৎ, চিং, আনন্দ, বলদেব, হুভদ্রা ও জগন্নাথ রূপে ত্রিমূর্তিতে বিরাজিত, ইন্দ্রিয়াদির আভাস আছে—ইন্দ্রিয় নাই—ইহাই তৌমার এ মূর্তিত্রয়ের বিশেষত্ব। আর মন্দিরে পূজা নাই—প্রণাম নাই—শুধু ভোগ, শুধু আনন্দের হাট—শুধু দর্শন। আত্মহার্য আত্মভর্য আত্মদর্শন। যিনি তোমার জন্মে এপ্রকারে মূর্তি সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি মহাপুরুষ। জগন্নাথ-মা—তোমার আমর্য না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকি? আচ্ছা—সত্যই কি আমরা তোমার কখন দেখিতে পাই না? যে না থাকিলে আমরা থাকি না, যে না থাকিলে দেখা হয় না—না দেখাইলে দেখা হয় না, না শুনাইলে শুনা হয় না—না চালাইলে চলা হয় না—সত্যই কি সেই তোমাকে আমরা না দেখিয়া, না পাইয়া জীবরূপে অবস্থান করি? তা' ত নয় মা! তোমার আমর্য নিত্য

দেখি। নিত্য প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী তুমি—প্রতি  
নিখাসের সাক্ষী তুমি, প্রতি ভোগের ভোক্তা  
তুমি। সর্বত্র—অন্তরে বাহিরে—তোমার  
না দেখিলে—জীব থাকে না, তুমি না দেখি-  
লেও জীব থাকে না। আমরা দেখিয়াও দেখি  
না—নিত্য অবজ্ঞায়, উপেক্ষায়, অনাদরে  
তোমার গ্রাহ্য করি না—পাশ কাটাওয়া চলিয়া  
যাই—পায়ে পা ঠেকিলেও ফিরিয়া দেখি না!  
ইহাই জীবধর্ম। তুমি প্রভো—ঈশ্বর—পুরু-  
ষোত্তম—আমাদের এ অনাদর উপেক্ষা করিয়া,  
আমাদের ভালবাস! তবু আমরা তোমার  
জীবনের মধু। তোমার এ স্নেহের কথা যেন  
কখনও না ভুলি।

মা—সখা—গুরো পুরুষোত্তম! ধীর হ্রি—  
শান্ত—গভীর—উদার—নিশ্চল—নির্ভীক—  
ডুবাওয়া লও—মিলাইয়া লও—আতঙ্গা ঘুচাইয়া  
লও—এ ক্ষুদ্র আনন্দময় আমাকে রাখিও না—  
তুমি থাক—তুমি থাক—শুধু তুমি থাক।  
আপনি আপনাকে দেখ। জয় মা! তুমি  
পুরুষোত্তম। তোমাকে তুমিই দেখিতে পায়—  
অধমে তোমার পায় না। তোমার স্রবণে  
অধম উত্তম হয়—তোমার কথা হৃদয়ে ফুটিলে  
আমাদের মত পুরুষাধমও বুদ্ধি পুরুষোত্তম হয়,  
তাই তোমার একার ওই মহা নাম পুরুষোত্তম।

সমানতন! নূতনভাবে কেমন করিয়া  
তোমার ডাকিব? কেমন করিয়া তোমার  
পূজা করিব—কেমন করিয়া তোমার প্রণাম  
করিব। আনন্দ—তোমার আনন্দের জন্যই  
ত জগৎপ্রেমক আমাদের প্রিয়—তোমার  
ভোগের জন্যই আমাদের জগৎভোগ। জগতের

জন্ত আমরা জগৎকে ভালবাসি না—তোমার  
তৃপ্তির জন্যই ত আমরা জগৎমোহে। বাহ্য কিছু  
বলি সে তোমাকেই ডাকি—বাহ্য কিছু ভাল-  
বাসি সেত তুমি আমার অন্তরে থাকিয়া ভালবাস  
বলিয়া। আকুল তরঙ্গভঙ্গময় মায়্য সমুদ্রের  
তটে সপ্রকাশ হে জগদানন্দ—এ সমুদ্রের প্রতি  
তরঙ্গ ত তোমারই আনন্দ ভোগের জন্য  
উদ্বেলিত; প্রতি তরঙ্গ ত' তোমারই চরণে  
নিত্য প্রণত। কু স্নু—সুখ হৃৎ—আলোক  
অন্ধকার—চেতন জড় সবই তোমার আনন্দ  
ভোগ। এ আনন্দের হাটে পচা, গলা, দুর্গন্ধ,  
যাহা কিছু তাহাও যে তোমার আনন্দ প্রসাদ!  
তাই' ত আমরা নির্ভীকাবে যে বাহ্য পাই—  
তাহা অন্তের মুখে তুলিয়া দিই। ভোগ চাকা-  
চাকিই যে তোমার এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনন্দ  
ক্রেড়া। হে আনন্দময়ী—হে সচ্চিদানন্দ—হে  
আনন্দ—আমাদের আনন্দে মাতাইয়া দাও।  
আমাদের চক্ষের অশ্রুধারাও যে আনন্দধারা,  
ইহা যেন আমরা বুঝিতে পারি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মা।

## মানবের আদিম অবস্থা।

‘মানবের আদিম অবস্থা’—কথাটা মুখে বলা  
বা কাগজে লেখা সহজ, কিন্তু উহাকে চিন্তার  
মধ্যে ফেলিলে আর সহজে বুঝিয়া পাওয়া যায়  
না। সময়ে সময়ে, এই দেখা যায়, বলিতে  
যাও, ডুবিয়া যাইবে—আবার ওখানে উঠিবে,  
আবার ডুবিবে। তরঙ্গের বাত—প্রতিধ্বতে  
দূর্ভিক্ষের ভীষণ আবর্তে, প্রবাহের একটানা

বহনে সে যে কখন কোথায় কি তাবে থাকে, কি তাব বা কর্মবৈচিত্র্যে ভাবকের চিত্তকে সন্দেহে দোলায়মান করে, অতীতের অন্ধকার-ময় চিত্রগুলি বর্তমানের আলোকে রঞ্জিত হইলেও কি এক রকম ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকে, তাহা ঠিক বোঝা যায় না, কাজেই চিত্তের প্রশস্ততা, কর্মের সফলতা দেখা বড়ই কঠিন হয়।

ব্রহ্মা হইতে স্বয়ংস্ব মনু ও শতরূপার উৎপত্তি ও তাঁহাদের সংমিলনে যা হার জন্ম—সেই মানব বা মনুষ্য পদবাচ্য। এই পৌরাণিক চিরন্তন কাহিনী অথবা ডারউইনের theory ছাড়িয়া দিলে মনে করিতে হয় যে, সৃষ্টিকর্তার অনির্বচনীয় অচিন্ত্য শক্তি, চিন্তা বা কল্পনার ক্রিয়া বিশেষেই মানবের জন্ম। ইহা জীবসৃষ্টির সর্বোচ্চ পঠন প্রণালী, সর্বোচ্চ চিন্তার বিকাশ—সর্বোচ্চ শিল্পের পরিচয়। পুরুত-কায় হস্তী ও তিমি, মহাবিক্রমশালী সিংহ ও ব্যাঘ্র দেখিয়া মনে হয়, বুঝি অনন্ত কৌশল ও শক্তি এই সমস্ত জীবেরই পূর্ণভাবে প্ৰদর্শিত হইয়াছে—আবার যখন দেখা যায় একটি সামান্য মানুষ সামান্য ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা এত বড় জন্তুদিগকে চালিত করিতেছে, আজ্ঞা-ধীন করিতেছে, নাসিকার দড়ি দিয়া নাচাইতেছে, তখন মানব ও ঐ সকল পশুর মধ্যে, বিশ্বশিল্পী যে কি অদ্বিতীয় শিকাগুরু প্রকাশ করিয়া উহাদের পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার অমন্ত শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। শুধু এ পার্থক্যে যে কিছু পক্ষপাত আছে, ইহা সন্দেহের নয়,—তিনি সকলের

প্রতি সমান দৃষ্টি, তাঁহার করুণায় ধারাবাহিক সমভাবে সমপরিমাণে সকলের উপর নিয়ত বর্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই, অন্নতা নাই, আধিক্য নাই। জীবরাণ্যে একটু প্রবেশাধিকার হইলেই তাহার উপলব্ধি হয়। মানব তাঁহার প্রিয়তম নয়, পুরীষকৃষিও তাঁহার নিকট ঘৃণিত নয়। ইহা তাঁহার লীলা বা সৃষ্টিবৈচিত্র্য। তিনি যে অনন্ত গুণসম্পন্ন স্রষ্টা তাহা সৃষ্টজীবের চক্ষে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য যখন সেই বিশ্বপিতার একটি অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হইতে মঙ্গলের একটি অজস্র নিঃসৃত গলিত স্তর হইতে, মানবের সৃষ্টি তখনই, সেই মুহূর্ত্তেই মানব যে এই উন্নতি বিধায়িনী শক্তি সত্ত্বৈশ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে অর্থাৎ বর্ধিত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে তাহা নয়, পরন্তু তাহা স্রষ্টারও অভিপ্রেত নয়। যদি তাহা হইত, অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মানব যদি বর্তমান উন্নত অবস্থাপ্রাপ্ত হইত—তাহা হইলে পরমেশ্বরের সৃষ্টি যে কর্ম এবং তাঁহার যে অনন্ত কৌশল,—সৃষ্টিচাতুর্য—তাহা থাকিত না। তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার অনন্ত শক্তিতে মানবকে সৃষ্টির সময়ই—তাঁহার সৃষ্টিকাগারেই একেবারে মহত্তম করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা কিরূপে করিতে পারিবেন? সৃষ্টি যে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছার ফল! তাঁহার জন্তই তাঁহার এই কর্মশালার সৃষ্টি। দেখা যায়, পশুপক্ষী প্রভৃতি নিকট প্রাণীসকল জন্মের পরক্ষণ হইতেই নিজ নিজ সংস্কার বলেই হউক অথবা কোন অপ্রত্যক্ষ ঐশীশক্তিকেই হউক কি এক বিদ্যাজ্ঞিতে আপন আপন



জাতীয় স্বভাব অনুযায়ী শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির ক্রমোন্নতিতে পূর্ণশক্তি লাভ করে। ইহা এক ভাবের সৃষ্টি,—ইহার উন্নতি অবনতি নাই,—শাস্তি শাস্তি নাই,—উদ্বেগ বা আশা নৈরাশ্য নাই, যাহা আছে—তাহা একভাবে গঠন—এক জীবনের আত্মরক্তি,—এক আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। ইহার মূল কারণ ঐ সকল জীব জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব।

এ গঠন, এ আত্মরক্তি, এ অভিব্যক্তি মানবের নিজস্ব নয়, ইহা সেই ভূমি পুরুষের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার প্রকৃতি—শাস্তির পূর্ণ নিকেতন—কৌড়ার নির্ভুল প্রণালী। তিনি সচ্চিদানন্দ, অব্যয়, অক্ষয় মহাপুরুষ, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট মানব অংশরূপ তাহা নহে বা হইতে পারে না; জন্ম মাত্রেই সে মাংসপিণ্ড স্পন্দহীন উত্থানশক্তি শূন্য, কেবল হস্তপদের নড়ন ও ক্ষুৎপিপাসা বা শারীরিক ক্রিয়া বৈকল্যের জন্ত মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন বা স্বাভাবিক হাসি; এই সকলই তাহার আদিম সম্পত্তি, কিন্তু অস্পষ্ট,—কেন না, তখন তাহা জ্ঞান ও শিক্ষাহীন! সে হাসি কান্নার মধ্যে কি পদার্থ বা শক্তি আছে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ক্রমে বয়সের সহিত জ্ঞান ও শিক্ষা তাহাকে এক অভিনব স্বাভাব্য আনিয়া ফেলে। ইহাই তাহার দীর্ঘাবস্থার মর্ত্যজীবনের প্রথম কর্ম—পরমেশ্বরের কর্মশালার প্রথম নিদর্শন। যেমন অন্ধার প্রথমে একটু অরিন্দন হইলে আর তাহার পূর্ণায়িত্ব আশঙ্কিত থাকে না, ক্রমে নিজেই সমস্ত ধরিয়া ধরি হইয়া যায়—নিজস্ব

হারাইয়া ফেলে—কাঁচ কাঞ্চন হয়, সেইরূপ ঐ প্রথম কর্ম পরিশুদ্ধ হইয়া, ক্রমে তাহাকে কর্ম হইতে কর্মান্তরে আনিতে আনিতে নিজস্ব হারাইয়া এক অনন্ত কর্মে আনিয়া ফেলে—ইহা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকার্যের চরম লক্ষ্য এবং জ্ঞান ও শিক্ষায় মনোবুদ্ধির অদ্বুত শক্তির প্রদর্শন। এরূপ কৌশল না থাকিলে তিনি মানবকে সকলের প্রধান করিতে পারিতেন না। তবে এই প্রধানত্ব জায়তঃ তাঁহার ইচ্ছায় নহে, সৃষ্টির পারম্পর্য্য কার্য্যকারিতা, কেন না তিনি পক্ষপাতপরিশূন্য মহাপুরুষ, তাঁহার নিকট এটি ভাল, এটি মন্দ নাই। তিনি বিশ্বপিতা, পুত্রভাবে সকলেই তাঁহার সমান আদরের, সমান যত্নের, কেবল কর্মগুণে জীবের সোপান পরম্পরায় উন্নতি ও অবনতি! অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্মগুণে জীব মানব হইয়া এত জ্ঞানী হয় নাই, এত শিক্ষিত বা চিন্তাশীল হয় নাই। সৃষ্টির যে সময়ে তাহার জন্ম, তখন সে সব কিছুই ছিল না—একটি জীব ছিল মাত্র, তাহাও কি ভাবের তাহা বোঝা যায় না। সেই জীবের সঙ্গে জীব-স্রষ্টার অচিন্ত্য শক্তি, অনন্ত পবিত্র আকাঙ্ক্ষা, সার্বজনীন ইচ্ছা জ্ঞানরূপে শিক্ষার সহিত প্রযুক্ত হওয়ায়, তাহার ক্রমোন্নতি ঘটয়াছে, ইহাই মানবের মানবত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং পূর্ণত্ব, তবে সৃষ্টিকর্তার পক্ষে তাহা যে কি, তাঁহার এই অনন্ত বিশ্ব মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্টতম তাহা তিনিই জানেন, তবে আমাদের দৃষ্ট জীবরাজ্যের কথা ধরিয়া আমাদের এ সকল কথার অবতারণা।

যদি বিচার পরস্পর ইহা প্রব লভ্য হয়, তবে আদিম অবস্থায় মানবের ছিল কি ? এই জড় পিও দেখে অজ্ঞ প্রত্যক্ষ, আর কয়েকটি অদৃষ্ট পদার্থ,—জন্মের সহিতই তাহাদের পরিণতি—ভাষা, চিন্তা ও ভাব । তবে ভাষা প্রথম,—প্রথম ভাষার সহিত আত্মরক্তি ঘটিলে তবে চিন্তা ও ভাব । প্রথম হইতে ভাষার সঙ্গেই এই দুইটি লুক্কায়িত থাকে মাত্র । চিন্তায় ভাবের উন্মেষ, ভাবে প্রেম, প্রেমে আপনই হারান ।

এখন দেখা যাইতেছে যে, মানবের আদিম আবস্থায় ছিল, 'সে' আর তাহার "ভাষা" । সে ভাষারও ভাষা তাহার, এই পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে তাহার বাস করিত । এখন পর্য্যন্ত তাহাই আছে, কেহ কখন কাহাকেও ছাড়িতে পারে না,—মানুষ আছে ভাষা নাই, বা ভাষা আছে মানুষ নাই—ইহা উন্মত্তের প্রলাপ,—মঙ্গলময়ী সৃষ্টিচিন্তায় ইহা থাকে না । এই ভাষা অবশ্যই আধুনিক মানবের সঙ্গে আকাশভূমি প্রভেদ । তাহা বলিয়া কি আদিম মানুষ বা ভাষা নগণ্য ? তাহার নগণ্য হইলে, এখনকার বিশ্ববিখ্যাত মানব ও ভাষা অবশ্যই নগণ্য । কেন না আদি ক্রমশঃ মধ্য ও অন্তে উপস্থিত হয় । আদি ছাড়িলে মধ্য বা অন্তর সত্তা থাকিতে পারে না । সুতরাং সৃষ্টিও থাকিতে পারে না । এই ক্রমোন্নতির শক্তি, সৃষ্ট জীব বলিয়া শুধু যে মানুষের তাহা নয়,— তাহা হইলে সৃষ্ট অপর জীবেরও এ অধিকার থাকিত । ইহা স্রষ্টার অদ্বুত খেলা, সৃষ্টির অনন্ত কৌশল, কর্ণ্যও মঙ্গল । এই শক্তি

না পাইলে মানব বর্তমান মানব শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিত না,—পশুপক্ষীর ভার এক গণ্ডীর মধ্যেই বাস করিত ।

এরূপ বিচারক্ষেত্রে মানব অনন্ত সিদ্ধির এক টানা উন্নতাবনত তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া,—কর্ণের নৌকায় বাণিজ্যের জন্ত নানা স্থানে যাইতেছে,—নানা ধন রত্ন উপার্জন করিতেছে, জলে ডুবিয়া মুক্তা তুলিতেছে,—আকাশে উঠিয়া নক্ষত্র ধরিতেছে—পর্বত ফাটাইয়া পৃথিবী খুঁজিয়া বহুমূল্য সম্পত্তি লাভ করিতেছে । ইহাই তাহার কর্ম—ইহাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না । ইহাকে ধরিয়াই সে, স্মৃতিকাগারের সেই লাল মাথা গাত্র হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রম বিকাশ, বিবেকশক্তির ক্রম সাহায্যে, এতদূরে আসিয়া সামান্য শারীরিক শক্তি লইয়া মহান হইতে মহত্তর কাণ্ড সাধন করিতেছে ;—প্রাণিরাজ্যে নিজে মহত্তম হইয়াছে । আজ জলধি পার,—কাল পর্বত উল্লভবন, পরশ্বঃ শৃঙ্গে ভ্রমণ ও বিদ্যাদায়ির সহিত ক্রীড়া প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যসকল,—যাহা স্বপ্নরাজ্যের কথা—যাহা প্রহেলিকার ছড়া—তাহা হস্তমুষ্টিতে ধরিয়া অদ্বুত ভাবে দেখাইতেছে,—বর্গের আলোক মর্ত্তে আনিতেছে, মর্ত্তের বাসুকাকণকে ছায়া-পথ দিয়া কোন এক মনোময়নের অতীত স্থানে তুলিয়া দিতেছে । এ শক্তি কার ? ইহা সেই অচিন্ত্য শক্তি মহিমময় পুরুষের শক্তি ও সেই শক্তিজাত মঙ্গল । সেই জন্ত মানব সব পাইয়া সকলকে সব দিতেছে, সর্ব্বের জনশোষণ ও মেঘরূপে বারিবর্ষণ এই বাতাবিক শক্তি ইহার

## প্রতিফলন।

দাঁও মানব, দাঁও, কয়, আরও কত করিবে। যে বাঁচিবে সেই দেখিবে; তবে অতীতকাহিনী আদিমকালের একটি ক্ষুদ্র হইতে তুমি যে ক্ষুদ্রতর ছিলে তাহা ভুলিও না, ভুলিলে এ মহান শব্দ হইতে বঞ্চিত হইবে— আপনাকে ভুলিতে হইবে। এরূপ ব্যাভিচার ঘটাইয়া তুমি যে উন্নত হইবে, তাহা সৃষ্টির বিধান পত নহে, ধর্ম রাজ্যের পৌরোপরি নিয়ম নহে, কেন না তাহা তোমার স্রষ্টার ইচ্ছা প্রসূত হয় নাই। তোমার আদিম অবস্থা বড়ই ভয়াবহ ছিল। সেই অতীত যুগ এখন তোমার চক্ষে গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু তোমার চক্ষেই পড়িয়াছে, বর্তমানের সৌন্দর্য্য চাকচিক্যে তুমিই ভুলিয়াছ। কিন্তু তুমি জানিও যে, বহুযুগ হইলেও, পরিখাবেষ্টিত দুর্গভাস্তরস্থ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে শুষ্ক থাকিলেও, তোমার স্রষ্টা পালক ও চালকের চক্ষে তাহা সতত প্রতিভাত আছে। তাহার একটি অজুলিতাড়নে তুমি স্বাভাবিক ভাবে নাচিতেছ— খেলিতেছ—কত কি করিতেছ। তিনি নথ-দর্পণে তোমার সেই অতীত ও এই বর্তমান দেখিয়া আবার দূর ভবিষ্যতের আলোখে তোমার চিত্রের দিকে তাকাইয়া হাসিতেছেন।

আমিও হাসিতেছেন—তাঁহার অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে, তোমার আবাসভূতা এই পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর বৃহৎপতি, শনি,নেপচুন প্রভৃতি গ্রহযন্তীর দেহ, অবস্থা ও গতি এবং তাঁহাদের বা অস্ত কোন প্রকার অপ্রকাশিত লোকের সংঘ তোমা

অপেক্ষা বৃহত্তর জীবের অতি দৃষ্টি করিয়া তোমাকে তোমার পাগলত্ব বুঝাইতে। এখন তাব দেখি তোমার কি বাচালতা—কি আত্মগরিমা। এক হইতে দশসহস্র তাহা হইতে শত বা সহস্র স্বর্ক রাবণের কথা, দুই হাত হইতে বিংশতি হস্ত,— তাহা হইতে সহস্র হস্ত কার্তবীর্য্যার্জুন কাহিনী শুনিয়াছ। আবার পুরাণে সহস্রযুগ ব্রহ্মাকে দেখাইয়া, চতুর্মুখ ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ শুনিয়াছ,— আত্মশক্তিতে প্রত্যঙ্গশীল অর্জুনকে বিবেচকের বিখরূপ প্রদর্শন একবার চিন্তার তলে আনি দেখি। বাস্তবিক অনন্ত আকাশ অনন্ত সিদ্ধুর জায় বৃহত্তম সূর্য্যের তাপালোকের জায় তুমি ভাবনার কুল পাইবে না। তখন তুমি বুঝিবে তুমি কি বা কে? তোমার এই অভ্যুদয়ের পূর্বে অর্থাৎ আদিম অবস্থায় তুমি কি বা কে ছিলে? বিজ্ঞানের দিকে ঐ দেখ একটি নক্ষত্র পড়িয়া পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। আবার ও ধারে তাকাও ঐ নক্ষত্রটি তোমার পরিদৃষ্ট শতসূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তম। আবার ক্ষুদ্রতর অস্থির দিকে তাকাও, এক সূচ্যপ্রসূত জলবিন্দুতে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বাস। তবে বোঝ, তোমার আদিম বর্তমানত্ব ও ভবিষ্যৎ ক্রীড়ার মধ্যে আমিষ, তোমাকে লইয়া কখন কোথায় কি ভাবে বাস করিয়া আসিতেছে—করিতেছে ও করিবে।

সে রহস্য তুমি জান না। আধ্যাত্মিক ভাবে ঐশীশক্তি বুঝিলে তবে বুঝিবে। এখন সেই পরম পুরুষের আকাশ পাতালব্যাপী তুর্য্য মেঘমঞ্জে বাজিয়া তোমার কর্ণে চক্ষে তোমার আদিম হইতে ভবিষ্যৎ শীলভরদ আনিবে

তখন তুমি তোমার আদিম ও বর্তমানের ধূলা-  
খেলা; ভবিষ্যতের পুতুলের নাচ বুঝিতে  
পারিবে। নতুবা তুমি মনে করিবে, আমি  
বরাবর এইরূপই আছি ও থাকিব। তুমি তা'  
নও,—তুমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের  
জীব। কবি-বাক্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া  
অতীত ভবিষ্যৎকে ছাড়িয়া, 'সময়ের সার  
বর্তমান' ভাব ভাব, কিন্তু এই ত্রিকালের সহ  
কর্মরঞ্জুতে তুমি বদ্ধ, তাহা তোমার অদৃষ্ট  
বলিয়াই তোমার দ্বন্দ্বের প্রতিফলিত হয় না।  
ঐ দেখ আকাশে রবি চন্দ্র গ্রহ তারা মেঘ প্রভি,  
ঐ দেখ অনন্ত শূন্যে বায়ুর অবাধ প্রবহন  
ইত্যাদি দেখিয়া বা বুঝিয়া—বুঝ, তুমি ত্রিকালে  
লয়, জীবরূপে তুমি এক দিনের বা এক জন্মের  
সম্পত্তি নও, কত অতীত হইতে আসিয়া  
শিক্ষা ও সংস্কার বলে বর্তমানে তুমি বার।  
পরে আবার সেই শিক্ষাদিক্যের পরিণতি  
দেখিবে,—দেখিবে কখন,—যেমন করিবে  
তেমনি হইবে। আদিম অবস্থায় তুমি যা—  
এমন অশুদ্ধরূপ, পরে আবার ভিন্নরূপ ধরিবে।  
অগু হইতে ঘাস—তাহা হইতে বাঁশের উৎপত্তি,  
আবার কত আছে বা হইবে। ইহাই বিশ্বের  
খণ্ড ভাবে তোমার কর্ম-প্রবণতার ফল—  
আদিম অবস্থার পূর্ণ না হয়,—আংশিক  
পরিণামক। অতএব মানব! বর্তমানে  
আত্মহারা হইও না, আদিম অবস্থা-ভাব দেখ,  
তুমি কি ছিলে কি হইয়া গিয়াছ।

তোমার এই আদিম অবস্থার ক্রমোন্নতিতে  
বর্তমানতা আনিবে,—তাহা দেখিলে, সমাজকে  
সেই ভাবে আন,—সেই ভাবে দেখ, সেই

ভাবে কর্ম কর, তবে বুঝিবে, তুমি ব্যবহারিক  
ভাবে যথার্থই নিজেকে বাড়াইতেছ, নতুবা  
তোমার কাজ হইল কই, কেবল নিজে খাইলে,  
পরিবারবর্গকে দেখিলে—ইহা ত তোমার শ্রুতির  
ইচ্ছা নয়। সুতরাং সে ইচ্ছা হইতে তোমার  
জন্মও নয়—তোমার সন্তোষাত্ত্ব নষ্ট বা পুট  
নয়। তবে তুমি ভ্রান্তির কোলে থাকিয়া  
রঞ্জুতে সর্প বা কাচে মণি দেখিতেছ মাত্র।  
ও দেখা ও ভাবা ভুলিয়া যাও, মাকাল ফলের  
কাণ্ডি ভ্রান্তি বা মরীচিকায় পিপাসা বাড়ায়  
মনে কর। স্থির দৃষ্টিযোগে আপনাকে  
ভাবিয়া, তোমার জাতীয় সমাজকে আপনার  
ভাব, নিজের মঙ্গলামঙ্গল সমাজে চালিয়া দাও,  
দেখিবে পাষণ্ড প্রব হইবে—আত্মতত্ত্ব বা  
আত্মপ্রত্যয় যথার্থ হইবে। বংশ-পুরুষের  
অতীতের স্মরণে বর্তমান ভবিষ্যৎ সুখসুখের  
আত্মদ-গ্রহণে উন্নত হইবে। তখন তোমার  
খাদি তত্ত্ব, আমিত্ব যতই অল্প থাকুক সকলে  
বলিবে তুমি মহৎ—কর্তব্যশীল ও জ্ঞান-  
পথাবলম্বী। দেখ তোমার জাতীয় সমাজ  
কি গতিতে ডুবিতে চলিয়াছে। ইহার সংস্কার  
অর্থ্যাৎ বিষয়-বিশেষের রাহিত্য ও স্থাপন একান্ত  
প্রয়োজন হইয়াছে—তবে উহা উঠিবে। কিন্তু  
সে উঠান তোমার একা হইবে না। বিভিন্ন  
দলের সকলে বা প্রধান প্রধান একত্র হইয়া,  
একপ্রাণতা, ধর্মপ্রবণতা ও কর্ম-সাফল্য প্রভৃতির  
আশ্রয়ে একত্র গ্রহণ কর। একই ত ছিলে  
পৃথক হইয়াছ। তখন দেখিবে পৃথকত্ব ডুবি-  
য়াছে—সমাজ উঠিয়াছে তাহার হস্তে একত্বের  
মালা; তখন সে মালা পরিয়া তুমি বা তোমরা

বস্ত্র হইবে। তাই বলি আদিম হারাইওনা, অহঙ্কার বাড়িবে, আমিহ বুচিবে। আদিমের স্মৃতি বর্তমানে স্থিতি পাইলে, বর্তমান ত সুখের হয়ই, পরন্তু দূর তমোময় ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানালোক মালায় সাজিয়া নিকটে থাকে, তখনই লোকে দূরদর্শী বা ভবিষ্যৎ বস্ত্র হইয়া পড়ে। তাই তোমার আদিম অবস্থাকে ভালবাসিতে বলি। তোমার কর্ম-জীবনের অধ্যায়ের পর অধ্যায় যাইতেছে—এই যাওয়া আসার সঙ্গেই কোন দিন অদৃশ হইবে, অতএব ইহাই তোমার কর্ম। তুমি না করিলে অপরে করিবে কেন? এমতে জগৎ ক্রমে কর্মহীনতায় অসার হইয়া পড়িবে,—বিশ্বকর্মার কর্মশালা বন্ধ হইবে। সেই জন্তই ভগবান এই কথা বলিয়া কর্মশূণ্য কম্পিত অজ্ঞানকে বুঝাইতেছেন,—

নিরতং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্ঞানয়োহকর্মণঃ।

শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধোদকর্মণঃ ॥

গীতা ৩য় অঃ ৮।

এই বুঝানতেই অজ্ঞানের কর্মে মতি ও জয় লাভ হইল। তাই বলি মানব! তোমার আদিম অবস্থা ভাবিয়া বর্তমান অবস্থা ভাব—কর্ম কর—তাহা হইলেই আশ্চর্য্যের সহিত অতিশয় বনিষ্ট সম্বন্ধ সমাজের চিত্তা আসিবে—জয়ীও হইবে।

শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্র সেন।

## জগদ্গুরুর আবির্ভাব

ও

প্রাচ্যতারা সমিতি।

ভুলোকের মানব-জাতির নৈতিক ও

সামাজিক ব্যাপারের শৃঙ্খলা জন্ত যেমন এক জন দেবতা পৃথক্ ভাবে ভারপ্রাপ্ত জগৎ শাসন করিতেছেন, সেইরূপ জগতের সমুদয় ধর্ম ও সাধন প্রণালীর তত্ত্বাবধারণ জন্ত এক জন পৃথক্ দেবতা নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই দেবতাগণ মানব-জাতি হইতে সাধন-পথে উন্নতিপ্রাপ্ত ও যুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে দেবতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহারা দেবজাতির মধ্যে ভ্রমলাভ করেন না।

এই দুইটা পদের নাম মনু ও জগদ্গুরু। যিনি নৈতিক ও সামাজিক শাসনে নিযুক্ত তিনি মনু বলিয়া আখ্যাত। সম্প্রতি বৈবস্বত মনুর অধিকার। যিনি ধর্ম ও সাধন কার্যের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছেন তাহাকে জগৎগুরু আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি যিনি এই জগদ্গুরুর পদে অধিষ্ঠিত তাহার নাম মৈত্রেয়।

মৈত্রেয় ঋষি পরাশরের শিষ্য ছিলেন। পরাশর ইহাকে শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই বিষ্ণুপুরাণ নামে প্রচারিত। ইনি মিত্রাদেবীর গর্ভজাত পুত্র, এই জন্ত ইহার নাম মৈত্রেয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রভাস-বন্ধের পর যখন শ্রীকৃষ্ণ দেহভাগ করিবার জন্ত যোগ আশ্রয় করিয়া বৃকোপরি বসিয়াছিলেন তখন ইনি বদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তৎকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে কিছু বলিয়াছিলেন। উদ্ধব তৎকালে দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয় ঋষির মিলন ও কথোপকথন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তৎকালে

উভয়ের মধ্যে কি কথা হয় তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, পুরাণকার তাহা কিছুই প্রকাশ করেন নাই।

এই ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরে যমুনা-তীরে বিদূরের সহিত উদ্ধবের সাক্ষাৎ হয়, উদ্ধব বিদূরকে ঈশ্বরের পৃথিবীত্যাগের ব্যাপার সম্বন্ধে বলিয়া শেষে বিদূরের প্রাণে আত্মজ্ঞান লাভকর বিদূরকে হরিদ্বারে মৈত্রেয়স্বামীর নিকট যাইতে উপদেশ দিলেন ও বলিলেন যে দেহ-ত্যাগ কালে ভগবান ঈশ্বর উক্ত মৈত্রেয়স্বামীর কাছে সাধন সম্বন্ধে পূর্ববন্ধনের জ্ঞান ভাষা দিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রভাস হইতে হরিদ্বার গমন করিয়াছেন ও তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সেই স্থানে যাইয়া তাঁহার শরণাগত হও।

ভগবান বেদবাস মৈত্রেয়ের পূর্বে জগদগুরুর পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তিনি এই সময় হইতে এই গুরুভার আপন পিতরে শিষ্য ও সখার উপর স্থাপন করিয়া আপনায় কার্য্য করিবার জ্ঞান মনোযোগ দিলেন ও আরও আড়াই হাজার বৎসর পরে আমরা তাঁহাকে গৌতম বুদ্ধরূপে জন্ম লইয়া পরানির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চলোকে উচ্চ অবস্থায় চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাই।

জগদগুরুর ভার গ্রহণ করিয়া অবিধি ইনি হিমালয়ের উপর বাস করিতেছেন। ইহার যে শরীর এখনও আছে তাহা বদ্বিও আমাদের দেহের মত স্থূল শরীর নহে, তজ্জাত সেই শরীর আমরা স্থূল দেহ লইয়া স্থূল চক্ষে দেখিতে পারি ও সেই দেহ স্পর্শযোগ্য। এই দেহ

অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর কাল এই অবস্থায় রহিয়াছে। এইরূপে দেহরক্ষা করিবার বিধি আমাদের যোগশাস্ত্রে রহিয়াছে, ইহাকে যোগাগ্নি প্রজ্জ্বলিত দেহ বলে। ইংরাজিতে Dream of Ravan ( রাবণের স্বপ্ন ) নামক একটি প্রাচীন যোগের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেখা যায়।

৩বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কলিকাতার সীতারাম ঘোষা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিবার সময় একবার কেহ তাঁহাকে বিষ বাণ্ডুয়াইয়া ছিলেন, সেই সময় অর্জুনদাস বাবাজী নামক এক জন সাধু তাঁহার নিকট ছিলেন, ইনি যোগবলে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দিয়া ছিলেন,। তৎকালে ইনি বলিয়াছিলেন, আমি ৫৪ প্রকার কল্প-সাধন জানি, এই সকল সাধনের বলে মানবদেহ অমর হইয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক এই সকল বিদ্যা পুরাকালে প্রচলিত ছিল, এখনও অধিকারী ব্যক্তিদের এই বিদ্যা শিখিবার লোকের অভাব হয় না, এই অবস্থায় গুপ্তভাবে রহিয়াছে।

জগদগুরু হিমালয়ে থাকিয়া জগতের ধর্মসকলের উপর দৃষ্টি রাখিতেছেন, আবশ্যক হইলে নিজে জন্ম লইয়া বা কোন পবিত্র দেহে আবিষ্ট হইয়া সাধনের গুঢ় রহস্য সকল প্রকাশ করিয়া কত তৃষাভূর সাধকের তৃষ্ণাভূর করিতেছেন। আমরা শুনিতেছি তিনি অক্ষিসং-রূপে গ্রীকদের মধ্যে একবার প্রকাশ হইয়া ছিলেন। জোরোস্টারের রূপ ধরিয়া পারস্ত দেশে প্রকাশ হইয়া পার্শ্বদের ধর্ম সুস্বীকৃত করিয়াছেন। তিনিই সূর্যাসী জিজসু নামক

নাকির দেহে চারি বৎসরের জন্তু আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি যিশু খৃষ্টরূপে খ্রিষ্টীয়ান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

এবারেও তিনি সত্বর পৃথিবীতে নরদেহে বিচরণ করিবেন তাঁহার বোষণা চারি দিক হইতে শুনা যাইতেছে। পরাবিত্তা-সমিতি এ সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব সকল প্রচার করিতেছেন, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিষ্টীয়ান কেহই এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত নহে। সকল মতে ভাবী-অবতার আসিবার কাল নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আসিয়াছে বলিয়া এ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিপিত হইতেছে।

জনৈক ভক্ত মুসলমান উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন তাহাতে নাকি তিনি ভাবী অবতার আসিবার কাল ১৯৫১ সালে বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। খ্রিষ্টীয়ান মিসনারিদের “ভাবীরাজা” নামে একখানি পুস্তিকা বাজারে বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। তবে তাহাতে সময়ের বিশেষ নির্দেশ দেখা গেল না। থিয়জফিষ্টগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেছেন। ক্রীমতী বসন্ত, ত্রিকালদর্শী লেডবিটার সাহেব প্রভৃতি থিয়জফির কর্ণধারগণ রাশি রাশি পুস্তিকা, পত্রিকা প্রভৃতিতে ভাবী অবতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার বলেন যে, ভাবী অবতার নীজই আসিবেন ও আমরা তাঁহাকে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইব। এই অবতার জগদগুরু নিজের অবতরণ, এবং ইহার উদ্দেশ্য পূর্ণ পূর্ণ বারের মত কোন নূতন ধর্ম স্থাপন নহে।

যিনি যে ধর্মে আছেন তাঁহার সেই ধর্মে ভক্তি ও মতিগতি দৃঢ় করিয়া দেওয়া ও প্রকৃত ধর্মে যে মতভেদ নাই ও ইহাতে বর্তমান যে সকল অনাবশ্যকীয় আবরণ সকল পড়িয়া সাধককে আসল পরিতে দিতেছে না তাহা ক্ষয়ক্ষয় করিয়া দেওয়া এইবার জগদগুরু আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে জগতে ধর্মভাবের কখনও কম কখনও বেশী হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন যেমন ধর্মের প্রাণি হইতে থাকে ও অপ্রের বেগ বেশী হয় তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া ধর্ম স্থাপন করিয়া থাকি। আমরা দেখিতেছি যখন যখন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই তাঁহাদের বিরোধী দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে সকলে অবতার বলিয়া নীকার করে না,—তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্ত নড়বস্ত্রও হইয়াছিল। বুদ্ধদেবেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছিল। পৃথকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব গভীর মর্মেবেদনার বলিয়াছিলেন এ পবিত্র প্রেম সাড়ে তিন জন ব্যতীত আর কেহই গ্রহণ করিল না। তাঁহার বিরোধীদের অনেক পরে একদা শ্রীরামাবনে তিনি ভবিষ্যৎকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন দিয়াছিলেন, তখন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহিত কথোপকথনে বুঝিয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহার উপযুক্ত আদর না করা বশতঃই তিনি মর্মেবেদনায় লোকনয়নের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন।

জগদগুরুর আবির্ভাব হইলে এইরূপ বিরুদ্ধ দল থাকিবেন সম্ভব নাই। অনেকেই তাঁহার অঙ্গুগামী হইবে ও তাঁহাকে ভক্তি ও আদর করিবেন, আবার অনেকেই তাঁহার কুৎসা নিন্দা করিবেন, এমন কি তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেও ক্রটি করিবে না, কার্যাত: সম্ভব না হইলেও, সঙ্কল্প, শক্তিবলে ও মৌখিক গালি গালাজ করিয়া তাঁহার নিজেদের নাম বাজাইতে চেষ্টা করিবেন। ৬-বিজয়রূক্ষ গোস্বামী মহাশয়কে ছইবার বিষয় ঝাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জীবন-চরিতে দেখা যায়। আমাদের সময়েই আমরা ঐরূপ ঘটিতে শুনিলাম।

পর্যাবস্থা-সমিতির কর্ণধারগণ মহাত্মাদের রূপায় জগদগুরুর দর্শন-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই এই মহাত্মাদের ও মহাত্মারূপ বিশাল শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ জগতে আসিলে যাহাতে উপযুক্ত অভ্যর্থনা, আদর ও যত্ন হয় এবং বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি সকল বল প্রকাশ করিতে না পারে এইরূপ ইচ্ছা স্বভাবত: মনে জাগিয়া উঠায় ১৯১১ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে তাহার প্রাচ্য-তারা সমিতি (Order of the Star in the East) নামক সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

এই সমিতিতে সভ্য হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে সভ্য হইতে হইলে কোন পরস্যা ধরচ করিতে হয় না, কিছু টাকা দিতে হয় না। ইহাতে জী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলের সমান অধিকার। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পার্শি সকলেরই

যোগ দিবার অধিকার আছে। সকলকেই এই মহাপুরুষের ভাবী আগমন জন্য আনন্দকীর্তি শিলাভা করিয়া নিজেকে প্রস্তুত হইবার জন্য হুঁসোং দেওয়া হয়।

যাঁহার বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত যে সমস্ত জগতে জগদগুরু আসিবেন, এবং সেই আশায় জগদগুরু আসিলে তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন, ও তাঁহার চরণ আশ্রয় করিবার যোগ্য হইতে পারিবেন এই ভাবে এখন হইতে জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত তাঁহারই এই সমিতির সভ্য হইতে পারেন। যিনি জগদগুরু আসিলে তাঁহার চরণাশ্রয়ে গড় হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে দিনের সকল কার্যই এই মহাপুরুষের নাম মনে রাখিয়া করিতে হইবে, অর্থাৎ কার্যে কঁকি, জুয়াচুরি, অলসতা থাকিতে পাইবে না। ৮-অদ্বৈত আচার্য যেমন প্রতাহ নারায়ণে তুলসী দ্বিগ্না কাতরে তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবীতে আসিয়া লোকের অধর্মভাব দূর করিবার জন্য দৈনিক কাতর প্রার্থনা করিতেন, আমাদের সেইরূপ প্রতাহ কোন নির্দিষ্ট সময় যাহাতে জগদগুরু সমস্ত আসেন এই জন্য ব্যাকুল ভাবে যত্নগণ হউক না কেন মনের সহিত আহ্বান করিতে হইবে। মৈত্রের স্বয়ং পুরাণে পরম কারুণিক বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধদের গ্রন্থে জগদগুরুর নাম বোধ সম্ব। তাঁহারাই এই মৈত্রয়কে বোধিসত্ত্ব বলেন, এবং করুণা ইহার একটি বিশেষ গুণ বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার অজ্ঞাত গুণ বে নাই তাহা নহে,



এইরূপে মহাপুরুষের সকল প্রকার সমুদ্রগই পূর্ণ যাত্রার বর্তমান, তবে করুণা সকলের অপেক্ষা একটু যেন বিশেষ ভাবে প্রকাশ। এইরূপ মহাত্মার রূপালাতে ইচ্ছুক হইতে হইলে আমাদের কুসুম অপেক্ষা মুহু (মুহুনি কুসুমাদপি) হইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে লোকালয়ে থাকিতে হইবে বলিয়াও অর্থনাশ করার কাল আসিতেছে বলিয়া বজ্রাদপি কঠোরানি হইয়া তৃণাদপি স্থলীচেন, অর্থাৎ সকল কার্যাই অতি দীর্ঘ ভাবে নিজের আমিত্ব বা আত্মভীরিতা ত্যাগ পূর্বক করিতে হইবে। ইংরাজিতে এই অবস্থা তিনটিকে Gentleness, Steadfastness and Devotion এই তিন গুণ বলা হইয়াছে।

মহাপুরুষের আশ্রয় পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে আমাদের নূতন কর্মফল সঞ্চয় করা বন্ধ করিয়া পূর্ব কর্ম সকল বাহাতে ক্ষয় হইতে থাকে তাহার চেষ্টা করিতে থাকা উচিত। সংসারে থাকিয়া কর্মও করিতে হইবে অগচ্ছ কর্মের ফলের জন্য দায়ী হইব না, এ কি করিয়া সম্ভব, তাহার উত্তরে আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, কর্মফলের ইচ্ছা না করিয়া কর্ম করিলেই সে কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। অতএব আমরা যখন জগদগুরুর রূপালাত ইচ্ছা করিতেছি তখন আমরা যে কর্ম করিব তাহা তাহার কর্ম করিতেছি, তুমি যেমন করিয়া দৈহিক কর্ম করাইবে সেইরূপেই করিব, আমার কর্ম করা লোকে তোমার হইতে করিতেছি বুঝিবে, এইভাবে বাহাতে আমরা কর্ম করিতে পারি—তাহার জন্য প্রত্যহ

প্রাতে তাহার নিকট প্রার্থনা করিয়া দৈনিক কার্য আরম্ভ করিব। এখন হইতে আমাদের অভ্যাস করিতে হইবে যেখানে একটু মহত্ব দেখিব সেইখানেই মাথা নোয়াইব। নচেৎ সেই অতি বড় মহাপুরুষের নিকট মাথা নোয়াইবার সুযোগ নাও ঘটিতে পারে। শুধু মাথা নোয়াইলে হইবে না। তাহাদের কার্যাদির সহ যতটা পারি মিশিয়া নিজ কার্য করিতে চেষ্টা করিব। পরম দয়ালের, অর্থাৎ যাহাতে দয়া-ওণের পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে তাহার শিষ্য হইবার উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে হইলে কাহারও সহিত মতভেদ লইয়া বিরুদ্ধবাদী হইয়া তাহা হুক কষ্ট দিলে চলিবে না, সেস্থলে তাহার মন্তব্যটুকুর নিকট আমার ঠিক মাথা নোয়ান হইবে না।

উপরের দুইটি প্যারাতে যে ছয়টি গুণ অভ্যাস করা আমাদের প্রয়োজন বলিয়া এই ছয়টি গুণ দৈনিক জীবনে সাধামত প্রকাশ হইবার সুযোগ দিয়া জীবন যাপন করিবে, অর্থাৎ সাদা কথায় আমি এই ছয়টি নিয়ম পালন করিতে প্রস্তুত আছি বলিয়া নিজের নাম ঠিকানা লিখিয়া সভার হেড, আফিস আড্ডার মাঝাজে পাঠাইলেই তাহাকে সভা গণা করা হইবে ও নিয়োগ-পত্র পাইবেন ও জগদগুরু সখদীয় গ্রন্থাদির বিবরণ তিনি জানিতে পারিবেন। কলিকাতার ৭নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট, এস. কে. প্রসাদ মহাশয় এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন।

এই সমিতির নাম প্রাচ্যভারত সমিতি দিবার অর্থ এই যে, পঞ্চকোণবিশিষ্ট নক্ষত্র

এই সমিতির চিত্র হইতেছে। প্রায় এক কোটি আশী লক্ষ বর্ষ পূর্বে আমাদের এই মানব-জাতির অতি হীন অবস্থা ছিল, তখন শুক্র-লোকস্থিত মানবগণ অতি উচ্চে উঠিয়াছেন, সেখানকার অনেক সিদ্ধযুক্ত পুরুষগণ যেহা-ক্রমে সৌরমণ্ডলের বাবতীয় গ্রহলোকে অবস্থে যাতায়াত করিতে পারিতেন। এই শুক্র-লোকের সিদ্ধমণ্ডলীর মধ্যে চারিজন মহাপুরুষ আপনাদের অপেক্ষা অল্প উন্নত পাঁচিশ জন যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া এই সময়ে পৃথিবীতে আসেন। এই চারি জনকে শাস্ত্রে চারি কুমার বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় (ইহাদের মধ্যে নেতার নাম মহারাজ শনৎকুমার। ইহার আসিয়াই যোগবলে নিজ নিজ শরীর ধারণ করিয়া আমাদের উন্নতির জন্ত খাটিতে লাগিলেন। ইহাদের কার্য অনেকদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন সিদ্ধ ও যুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিজ ভ্রাতা অর্থাৎ পৃথিবীবাসী মানবদের জন্ত খাটিতেছেন। কাজেই ইহার সকলে অত্র লোকে কার্য করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ শনৎকুমার এখনও এই পৃথিবীতেই রহিয়াছেন। ইনি মৌলিক ধাতুর তিন শ্রেণী, বৌগিক ধাতুর দানাবদ্ধ অবস্থার এক শ্রেণী, উদ্ভিদ শ্রেণী, জন্ত শ্রেণী ও মানব শ্রেণীর ক্রমশঃ উন্নতির কার্য পরিচালনা করিবার সর্বোপরিস্থিত কর্তৃপক্ষ। ইহার অধীনে উক্ত সপ্তশ্রেণী দেবযোনি দেব-জাতিরও উন্নতি করিবার ভার রহিয়াছে। এখনও সমুদয় দীক্ষা মহারাজ শনৎকুমারের নামে দেওয়া হয়। মহারাজ শনৎকুমারের

অধীনে মনু ও জগদগুরু কাজ করিতেছেন। পাঁচকোণ তারা মহারাজ শনৎকুমারের চিত্র।

এই সমিতি ভারতবর্ষে ১৯১১ সালের জানুয়ারি মাসে স্থাপিত হইবার পর ১৯১২ সালের ২৮শে ডিসেম্বরের এক অধিবেশনে ভয়ানক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে তাহা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। গত ২৮শে জুনের কলিকাতার বেঙ্গল বিশ্বকলিক্যাল সোসাইটির বরে এক অধিবেশনে জগদগুরুর প্রতিমূর্তি আমাদের দেখান হইয়াছিল। ঐ যুক্ত হীরেজনাথ দত্ত বোদান্তরঙ্গ এম, এ, বি-এল, মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রতিমূর্তিখানি কটোয়ান্না। ইটালি দেশের সমিতির জনৈক সভ্য কর্তৃক জগদগুরুর তৈল চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এই চিত্র আঁকিবার পূর্বে জগদগুরুর প্রতিমূর্তি মানস অঙ্কিত করিয়া, ঐ সভ্যটির (যিনি চিত্র-বিজ্ঞান নিপুণ হয়েন) মানসপটে প্রতিবিম্বিত করিয়া তাহার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। ঐ মহারাজ জগদগুরুকে হিমালয়ে যাইয়া দেখিয়াছেন, তাহার বলেন চিত্রটি অবিকল আসলের অনুরূপ হইয়াছে তবে আসল মুখে যেমন একটা করুণার ভাব, একটা মিষ্টতা ছুটিয়া উঠিতেছে দেখা যায়, সে ভাব এ চিত্রে দেখা যায় না। এই তৈল-চিত্রের ফটো আমরা দেখিয়া ধন্য হইলাম।

সমিতির শাখায় জগৎ জুড়িয়া গিয়াছে, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপের সকল দেশ, অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড সর্বদেশের সর্বপ্রধান স্থানেই সমিতির শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান পার্শ্বাশ্রিত্যমানদের

অথো সভা, সংখ্যা বারহাজার হইবে। ত্রিমতী  
আনিবেশান্ত এই সমিতির রক্ষক বা প্রোটেক্টর।  
জ্যে, কৃষ্ণবর্ত্তি নামক একজন মাস্ত্রাজি ব্রাহ্মণ  
ইহার হেড বা সভাপতি। ইহাদের হেড  
আফিস দি থিয়লজিক্যাল সোসাইটী, আডিয়ার,  
মাস্ত্রাজ।

বৌদ্ধদের প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহে দেখা যায়  
যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন, “আমি চতুর্থ বুদ্ধ,  
আমার পূর্বে তিন জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন।  
আমার পরে যিনি বুদ্ধ হইবেন, তাঁহার নাম  
মৈত্রেয় বুদ্ধ, আমার যেমন শত শত শিষ্য,  
তাঁহার এইরূপ সহস্র সহস্র শিষ্য হইবেন।  
তিনি আদিত্যে মধু, মধ্যে মধু ও অন্তে মধু  
এইরূপ মধুময় উপদেশ প্রচার করিবেন।”

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিয়াছিলেন  
“এরপর একজন আসিবেন, তাঁহার উত্তর-  
পশ্চিম অঞ্চলে জন্ম হইবে, তাঁহার দয়া আশা  
অপেক্ষা বেশী প্রকাশ হইবে; তিনি খুঁড়ী, বুড়ী  
মাঝরাশিবেন না; তবে তাঁহাব কাছে যাহারা  
বাদ পড়িবে, তাহাদের বহুজন্ম আর হইবে না,  
বুদ্ধিতে হইবে।”

ঐকান্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল।

## আমিত্বের বিসর্জন।

যখন রঞ্জিত করে পূর্ণ আকাশ

আভা রক্তিমার,

যখন সন্ধ্যায় হৃৎ সঙ্গমিত

আলোক আধার.

যখন উদ্ভাসিত করে বিশ্ব সাগর

ইন্দু পূর্ণিমার,

যখন অমানিশার আধার করে

ভীতির সঞ্চার,

যখন আকাশ ঘিরে ঘনিজে আসে

মেঘ বরষার,

যখন মেঘুর মগয় করে তৃপ্ত

হৃদয় সবার,

যখন কুসুম নিকর বিতরণ

সৌগন্ধ সস্তার,

যখন দিগন্ত ধ্বনে পঞ্চম তানে

বসন্ত সঞ্চার,

যখন সঙ্গীতের মুচ্ছনায় পূর্ণ

হৃদয় মারার,

যখন নীলাধরে ব্যক্ত হয় কার

মহিমা অপার,

যখন পর্বতমূলে বড়ায়মান

হই একবার,

যখন অনন্ত সিদ্ধির কর্ণে পশে

কল্লোল-কঙ্কার,

যখন স্বতঃই যেন মুছে যায়

আমিত্ব আমার,

যখন কণেকের তরে যাই ভুলি

সব আপনার।

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

## সুখা ।

হৃদি-বনে বীর, ফুটে অনিবার,

ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-কুল ;

এ-ময় জনতে, ভুলনা দিতে—

কে আছে তাঁহার ভুল ?

সেইজন হেথা প্রত্যক্ষ দেবতা,

স্বর্গ তাঁহার হৃদয় !

তাঁর কাছে গেলে, সদা সুখা মিলে,

সে যে সুখার নিলয় !

ঐযোগস্বমোহন বিশ্বাস

## কোথা তুমি ?

নিবিড় ভিমিরাত্ত বারিধি ভীষণ  
সংস্কৃত ঝটিকাঘাতে কল্লোল আকুল  
ফেনিল উচ্ছ্বাসে ছুটে করিয়া গর্জন  
প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণি, বালুময় কুল ।  
সে গহন ধ্বাস্ত্র মাঝে আমি দৃষ্টিহীন  
পথহারা, লক্ষ্যহারা, জ্ঞানবুদ্ধি হারা,  
বুঝিতেছি প্রাণপণে শুধু নিশিদিন  
উন্নত তরঙ্গ সনে হয়ে আত্মহারা ।  
যাত-প্রতিঘাতে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত  
জীবন যন্ত্রণাতরা শরীর বিকল  
নয়ন নিস্ত্রভ-জ্যোতিঃ—তল অক্ষপ্লুত  
যদন নৈরাশ্র-রান—উদ্বেগ বিকল ।  
অশান্তির বাড়বাগ্নি দহিছে সতত  
বিস্তারিয়া শত জিহবা অনন্ত দাহনে  
তারকার যত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা শত  
উষ্ণিতেছে নিবিতেছে হৃদয়-গগনে ।

পললাশী হিঙ্গ্র প্রাণী কুড়ীরের প্রায়  
আসিছে আসিতে সদা হুঁই রিণুগণ  
উন্নত পরাণ ভুবিছে অভলে হার,  
যশ-মান-রস শুধু করিতে অর্জন ।  
নিষ্ঠুর বাধির বিবে তত্ব অজ্ঞরিত  
রুগ, ক্রিষ্ট শীর্ণ চির অর্জুত প্রায়  
শোক তীব্র ভুবানলে হৃদয় নিম্নত  
অগ্নিয়া পুড়িয়া বেগে ছারখারে বার ।  
দ্বারা পুত্র ভগিনী ভ্রাতা জনক-জমনী  
প্রসারিয়ে শত বাহু মোহিনী দ্বারয়ে  
বাঁধিয়া ফেলিতে মোরে দ্বারাবী অবনী  
ভ্রমিতেছি করি শুধু আমার আমার ।  
এক দিন দিয়ে দেখা এত দীর্ঘ দিন  
কোণায় রাহলে প্রু তাজি অভাগার  
কতই দিবস হল বরষেতে লীন  
তথাপি আমার কিগে হল না উপায় ?  
সকাতরে ডাকি আমি মরণ আতুর  
আর না বাহিতে পারি যাতনার ভার  
রেখনা কবলে আর সংসার-রাহর  
দেহ স্থান পদছায়ে তনয়ে তোয়ার ।  
ডাকিতেছি দীন স্বরে কোথা তুমি বলে  
যায় নাকি তব কাছে এ দীন ক্রন্দন  
বুঝবা ডাকার মত ডাকি নাই বলে'  
ভুলিয়া রয়েছ তুমি সন্তানে আপন ?  
পিতার আদরে হুঁই কৃতর সন্তান  
যদিও ভুলিয়া থাকে পিতারে আপন  
স্নেহময় ততাকাকী পিতার পরাণ  
সন্তানে ভুলিয়া হির থাকে কি কখন ?  
ঐশিতিকঠ রায় ।

## স্বপ্ন পথে ।

( বিজ্ঞাপতি পদাঙ্কানুসরণে )

রাতকো মন্দিরে একলা আছিহু

তুতিয়া নিশ্চ কি কোর ।

চকিতহি জহু কামিনী রোদন

পশিল অরণে যোর ॥

হাস্যরি পরাণ আকুল ভেল ।

চমকি উঠরে খিড়কী সকাশ

পেখইতে হাম গেল ॥

অধর উপরি চান্দ কি উজোরি

নিরুয় নিরুয় ধরা ।

বিমল প্রকৃতি ধোয়ানে মগনা

ধুজ্জটি শকর পারা ॥

সহসা অদূরে হেরহু যাইতে

অপরূপ বর নারী ।

যাহু'রু গতিমে অপরূপ ছন্দ,

ভাববে গীত বিধারি ॥

নহুঞা-বলনী বিহমঙ্গি খোরি,

যাবহি হেবন মোয় ।

হরিণী হীন হিম ধাম সে জহু

সুখা বরিষণ হোয় ॥

নয়ন পলব মুদিয়া যায়ল

দেখলু যব সে হাম ।

পুন কৈ চাহহু পেখহু পুরবে

ভাহু ভেল পরকাশ ॥

ঐকালিচরণ চট্টোপাধ্যায়,

এম-এ ( প্রিন্ট ) বিভাগব ।

## অবস্থান ।

বিখ আছে শুক হ'য়ে শুনি তব মুরলির ভাষ ।

মোহেতে আচ্ছন্ন জীব শুনি তব মোহময় গান ।

সকলেতে সমভাবে আছ তুমি বর্তমান প্রভু,

অকমোরা তাই তোমা হেরিয়াও হেরিনাক করু ।

ঐষিপিনচন্দ্র চৌধুরী কাব্যনিধি ।

## ব্রজেশ্বরীর উদ্দেশে ।

( ব্রজেশ্বরীর উক্তি )

করুণ বড় যুথখানি তার

আমার পানে চেয়ে থাকে ।

বল্লে দুটো হাসির কথা

লাঞ্জে বদন ঢেকে রাখে ॥

শ্রান্ত ওঠে বিলাস তার

পাগল করা চকিত হাসি ।

সলিল বুকে ফোটায় তার

কুসুম-ভরা জ্যোৎস্না রাশি ॥

ব্যথিত হ'লে আমার হৃদে

(তারে) বিষাদ-রেণু ছায় সে কণে ।

ডাকলে তারে, বাশীর পানে

লুকিয়ে হাসে কুলের প্রাণে ॥

কাদলে পরে তাহার তরে

ভুলায় মোরে মূহুর-গানে ।

সে যে আঁচলে লুকিয়ে রাখে

কণ্ঠের এই মাঝখানে ॥

ঐবলাইলাল মুদ্রা ।

## মালিক খুসরু।

হিন্দুদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন এরূপ মুসলমান নরপতির নাম করিতে হইলে, যোগল সম্রাট আকবর শাহেরই নাম করিতে হয়। কিন্তু আকবর-শাহ বাতীত আরও একজন মুসলমান রাজা ছিলেন, যিনি হিন্দু-ধর্মের বলবিধানকল্পে এমন কতকগুলি কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহা আকবর শাহের সহানুভূতিকেও কিয়দংশে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। এই হিন্দু-বদ্ধ মুসলমান-রাজ্যের নাম মালিক খুসরু। \* ইনি খিলজি বংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এত অল্প দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন যে, ইতিহাসে তাঁহাকে রাজপর্বাণের মধ্যেই গণ্য করা হয় না।

মালিক খুসরুর প্রকৃত নাম হাসন। ইনি কুতব-উদ্দীন খিলজির এক জন পরোয়ারী বংশীয় ক্রীতদাস ছিলেন। নিজের বুদ্ধিবলে, ইনি সুলতান কুতব-উদ্দীনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও তাঁহার সমস্ত চাকর্য্যের সহায়ক হইয়া উঠেন; এবং ক্রমে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া শেষে সুলতানের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। বিপুলবাচিনীর আধিপত্য লাভ করিয়া, ইনি এরূপ পরাক্রমশালী ও রাজ্যমধ্যে এরূপ সর্ব্বোৎকর্ষ হইয়া উঠেন যে, তাঁহার অঙ্গুলীহেলন মাঝে শাসন-সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য নিক্ষেপ হইত।

\* পর্যটক ইবন বতুতা ইহাকে খুসরু বী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

খুসরু যেমন হুজুর তৈমুরি সাহসী বোঝাও ছিলেন। ১৩১২ খৃঃ অব্দে তিনি সম্রাটখানী মালিক প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং তাঁহার এক বৎসর অবস্থান পূর্ব্বক সমগ্র দেশ লুণ্ঠন করিয়া, বিপুল ধনরত্ন সমভিবাগারে দিল্লীতে প্রভাগমন করেন। কথিত আছে, “দৌলত ধনসম্পত্তি: প্রভুত্বমবিবেকিতা। একৈকমগাঃ নর্ধার কিমুদ্র চতুষ্টয়ম্।” দৌলত, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব এবং অবিবেকিতা, ইহাদের প্রত্যেকটাই অনর্থের মূল; একাধারে ইহাদের লকলঙলির একত্র সমাবেশ হইলে ত কোনও কথাই নাই। খুসরুর ইতিপূর্ব্বে যৌন ও প্রভুত্ব ছিল; এখন তৎসঙ্গে মালব-লুণ্ঠন করিয়া ধনসম্পত্তিরও সংযোগ ঘটিল। সুতরাং তিনি আর তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; রাজালাভ আশায় লুণ্ঠ হইয়া তিনি আর অতীষ্ট সিদ্ধি করিবার মানসে, নানারূপ চক্রান্তকাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে তিনি কতিপয় প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপন করিয়া, তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি রাজস্বকারে বাজেয়াপ্ত পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে দরবার হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। এই সকল সম্রাট রাজপুরুষদিগের চূর্ণদণ্ড দেখিয়া সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থ হিতাকাজী আশ্র-সন্ধান-জানী আমীর ওমরাহগণ স্বেচ্ছায় রাজ-দরবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরদেশে গমন করিয়া য য মানস্কলা করিকে লুণ্ঠিলেন। খুসরুর প্রতিদ্বন্দ্বী হইল; তিনি বীর আত্মীয় বজনগণকে প্রধান প্রধান

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দরবারগৃহ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে রাজ-দরবার নিৰ্ভীক হইলে, খুসরু রাজহত্যার মনোনিবেশ করিলেন। একদিন সুযোগ বুঝিয়া জুলতানকে জানাইলেন যে, বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে। তখনকার সময়ে এইরূপ রীতি ছিল যে, কোনও হিন্দু মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইলে, জুলতান তাঁহাদিগকে রাজপ্লাসদে আনয়ন করিয়া তাঁহার পৌরব বৃদ্ধি করিতেন। খুসরুর কথা শুনিয়া জুলতান জুতব-উদ্দীন এই সকল মুসলমান-ধৰ্ম্ম গ্রহণেজ্জু হিন্দুগণকে দরবার-গৃহে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। চক্ৰী খুসরু বলিলেন যে, ইহারা লজ্জার দিবাভাগে দরবার-গৃহে আগমন করিতে অনিচ্ছুক; ইহাদিগকে রাত্রে দরবারে হাজির হইবার জন্ত আদেশ করা হউক। খুসরুর উপর জুলতানের অগাধ বিশ্বাস; সুতরাং তিনি কোনরূপ বিধা না করিয়া খুসরুর কথাসুস্থপই আদেশ প্রদান করিষেন। (১)

খুসরুর দুঃখভিত্তিক অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পত্নী ও তাঁহার উপর জুলতানের অগাধ বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়া, কেহই কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা

করিতে সাহসী হন নাই। জুলতান জুতব-উদ্দীনের শিক্ষাগুরু কাজি জিয়াউদ্দীন জুতবকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। জুতবের পতন সন্নিহিত দেখিয়া তিনি আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না; জুলতানের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা আহুপূর্বিক বিবৃত করিলেন। সকল ব্যাপার খুসিয়া প্রকাশ করিলে কি হইবে; শাস্ত্রে কথিত আছে,—

“দীপনিকীর্ণগন্ধং চ স্তম্বাকামরুদ্রতীম্।

ন দ্বিস্তম্ভিন ন শ্বস্তিন ন পশুস্তি গতায়ুঃ॥”

অস্তিমকাল উপস্থিত হইলে লোকে স্তম্বাকা প্রবণ করে না। জুলতান প্রথমতঃ গুরু জিয়াউদ্দীনের কথা বিশ্বাসই করিলেন না; পরে অনেক অতুরোধের পর এ বিষয় অমুসন্ধান করিতে সম্মত হইলেন মাত্র।

অচতুর খুসরু সকল দিকে নজর রাখিয়া ছিলেন। তিনি জুলতানের মনে সন্দেহ শিথিল করিয়া দিবার মানসে, জীবনে রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া বারাকনার জায় অকৃতজ্ঞ করতঃ জুলতানের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে প্রবৃত্ত হইলেন। জুলতান হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। খুসরুর কৌতুকে প্রীত হইয়া “প্রিয়ে, তোমার শত অপরাধ থাকিলেও তোমার ঐ হৃদ হাসিতে আমি সকলই বিস্মৃত হইতে পারি” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সাদরে খুসরুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজির সমস্ত উপদেশ বাক্য মন হইতে একেবারে মুছিয়া কেলিলেন।

জুলতানের এই সরল ব্যবহারেও খুসরু নিশ্চিত হইতে পারিলেন না; বিস্ময়ে কাঁপা-

(১) ইহা বিখ্যাত পঞ্চটক ইবন-বতুতা লিখিত বিবরণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আরবি বিরোজনাবি ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে,—খুসরু তাঁহার কতিপয় পার্শ্ববাসকে ভোজ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, প্লাসাদের বহিঃ-প্রকোটে উৎসবসমিমে আদৰ্শন করিবার জন্ত জুলতানের অনুমতি আৰ্শন করিলেন।

হানির আশঙ্কা করিয়া। তিনি সেই রাতেই হত্যাভাণ্ড সমাধা করিতে সচেষ্ট হইলেন।

খুসরু তাঁহার ভারতীয় সৈন্তগণের মধ্য হইতে কয়েকটি শৌর্য ও বীর্য্যসম্পন্ন সৈন্য বাছাই করিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে মুসলমানধর্ম গ্রহণেচ্ছু হিন্দু বলিয়া রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই সৈন্তগণের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা খাঁ-উ-খামানও বর্তমান ছিলেন।

প্রায়কাল, মুসতান সামাজ্য দুই একজন রক্ষী পরিবৃত্ত হইয়া ছাদের উপর শয়ন করিয়াছিলেন, এমন সময় খুসরুর সৈন্তগণ সমস্তে চতুর্দশে প্রাসাদের চতুর্দ্বার অতিক্রম করিয়া পঞ্চম দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজি খাঁ নামক এক ব্যক্তি এই পঞ্চম দ্বারের রক্ষী ছিলেন। ইনি সন্দেহবশে এই সকল সৈন্তের গতিরোধ করিলেন। সৈন্তগণ সহসা তাহাদের গতি প্রতিহত হইতে দেখিয়া, ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়াই দ্বার-রক্ষী কাজি খাঁর শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারে একটা কোলাহলও উত্থিত হইল। (২)

(২) পর্যটক ইবন-বতুতা এইরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। 'তারিখ-কিরোজ সাহি' ইতিহাস গ্রন্থের বিবরণ ভিন্নরূপ। ইহাতে কথিত আছে,—মুসতান কূতব-উদ্দৌলার লিফাৎক কাজি কিরাতুদ্দীন এই বতবরের কথা জানিতে পারিয়া উহার প্রতিকার কামনার প্রাসাদান্তিমুখে ধাবিত হন। দ্বারে খুসরুর পিতৃব্য মন্সুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মন্সুরের সহিত তিনি সবে মাত্র কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় পলাতান হইতে জাহরস নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডে পুরী মধ্যে বেলাগোণ উপস্থিত হয়।

কোলাহল মুসতানের কর্ণধোতর বহির্ভুক্ত, তিনি খুসরুকে উহার কারণ জানিতে প্ররোচিত করেন। খুসরু অতঃপর তাঁহার কামনা করিয়া বাহিরের দ্বারদেশে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন এবং মুসতানকে বলিলেন যে, সে সকল মুসলমানধর্ম গ্রহণেচ্ছু হিন্দুর আজ রাজ প্রাসাদে আসিবার অসুযোগ ছিল, কাজি খাঁ তাহাদের গতিরোধ করায় পোলমালা উত্থিত হইয়াছে। মুসতানের কিন্তু কেমন সন্দেহ হইল। তিনি আর দ্বিধা থাকিতে না পারিয়া, ভয়-ব্যাভুল চিত্তে অন্তঃপুরান্তিমুখে ধাবিত হইতে উত্তত হইলে খুসরু খাঁ কিপ্র-গতিতে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া গতিরোধ করেন। ইহার পর যত্নবশেই খুসরুর সৈন্তগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মুসতানের শিরশ্ছেদ করে।

রাজহত্যা করিয়াই খুসরু ক্ষান্ত হইলেন না, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দীনের বিধবা মহিষী ও অল্প বয়স্ক রাজকুমারগণকে একে একে নিধন করিলেন। পুরজনগণের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিতেও ক্রটি করিলেন না। কূতবউদ্দৌলার বিধবা মহিষীকে তিনি নিজের অকণারিনী করিয়া লইলেন এবং অপর পুরনারীগণকে পরোরারীদিগের অন্তঃ-পুরভুক্ত করিয়া দিলেন।

সেই রাতেই খুসরু রাছোর, আমির ও ওয়রাহগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কেহই এ ব্যাপার অবগত ছিল না। সকলে দরবার-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, খালিক খুসরু সিংহাসনাধিষ্ঠ হইয়া অবস্থিত



করিতেছেন। তখন ঘটনা তাঁহাদের বৃত্তিতে থাকি রহিল না। কাহারও আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও, তবু সকলে খুস্কুরে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে অস্বীকার করিয়া ব'ব হামে প্রত্যাহার করিলেন।

খুস্কুর পরদিন প্রাতঃকালে নাসিরউদ্দীন মামুদার করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (খৃঃ অঃ ১৩২১) ; এবং আমির ওমরাহ প্রভৃতি সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রেরণ পূর্বক সর্বত্র ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন। তিনি নিজের নামে 'কুতবা' পাঠ করান এবং জীর নামে যুদ্ধা প্রচলন করিতে প্রয়াস পান। \*

সিংহাসনারোহণ করিয়াই তিনি দিল্লীর মসজিদের ব্যবহারী কোরাণ পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া আসনরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যমধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। মোল্লাগণ একত্রে রাজসকাশে বহু অশুন্য-বিমর সহকারে আবেদন-পত্র পেশ করিতে লাগিল। খুস্কুর এ সকল ক্রক্ষেপ করিলেন না, উপরন্তু প্রতি মসজিদে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দিলেন। ঐ আদেশ প্রতিপালিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে

সাম্রাজ্য মধ্যে ভীষণ বিজ্রোহের বহিঃপ্রকাশ উঠিল। প্রতি মসজিদে বধোপযুক্ত সৈন্তের সাহায্যে দেবমূর্তি সংস্থাপিত হইলেও, প্রধান জুম্মা মসজিদে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে এরূপ ভয়ানক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল যে, খুস্কুরকে অনেক বলক্ষয় করিতে হইয়াছিল। ক্রমাগতের চারি দিন দাঙ্গা করিবার পর তিনি স্বকাৰ্য্য সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

খুস্কুর একটা প্রধান গুণ ছিল, তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইতেন, সহজে সে কার্য্য হইতে পশ্চাদ্গম্য হইতেন না। দিল্লী সহরে হিন্দু-ধর্মের প্রাধিক্ত স্থাপক করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এ কার্য্যে যে তাঁহার পতন অবশ্য-জ্ঞাবী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন, তথাপি কোনও প্রতিবন্ধকই তাঁহাকে স্বকাৰ্য্য-সাধনে বিরত করিতে পারে নাই। তিনি দেশবিদেশ হইতে বিদ্বান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনাইয়া রাজ-তত্ত্বাবধানেন মসজিদে মসজিদে শাস্ত্রালোচনার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গোহত্যা নিবারণার্থ রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন। সিংহাসনারোহণের পর এক বাসের মধ্যে দিল্লী হইতে মুসলমান প্রাধিক্ত প্রায় তিরোহিত হইয়া আসিল।

অনেকে অনুমান করেন, খুস্কুর হিন্দু ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি হিন্দু-ধর্মের প্রাধিক্ত স্বকার্য্য জন্ত এত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইতি-হাসে লিখিত আছে—খুস্কুর ওজরাটের অধিবাসী পরোয়ারী বংশ-সম্বৃত। পরোয়ারীরা হিন্দু কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। কেহ কেহ ইবাদিসকে হিন্দু গ্রামে ক্ষতিহিত

\* তারিখ-কিরোজগাহি পুস্তকে লিখিত আছে যে, কাজি জিরাজুদ্দীনের পরিবারবর্গ পুকেই পলায়ন করিয়াছিল। খুস্কুর তাঁহাদের পরিভ্রমণ গৃহ ও ধনসম্পত্তি তাঁহার রাজস্বকে গ্রহণ করেন। জাভা বা খান্না ও মাতুল রায় রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হন। কনভাশালী ব্যক্তিকে বশক-ভুক্ত করিবার জন্ত আইন-উল-মুক মুলতানীকে আলাব-উল-মুলতান-উল-মুককে বেতনাদী ও জনা থাকে অবশ্যসাধ্য কর্তব্য প্রদান করেন। রাজ-হত্যাকারী কাহার থাকে পুকে আবাদমতক মণি মূল্যের বৃত্তি করিয়াছিলেন।

করেন বটে, কিন্তু ইহারা যে গো-মাংস ভক্ষণ করিতেন, এরূপ বিবরণও পাওয়া যায়। গো-মাংস ভক্ষণকারীদিগকে হিন্দুনায়ে অভিহিত করা কখনই সমীচীন নহে; উপরন্তু পরোয়ারী-গণকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, খুসরু কুতব-উদ্দীনের ক্রীতদাস হইয়া যে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়েরও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। \* কেবল তাহাই নহে, তিনি নিজেকে যে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন, কোনও কোনও ইতিহাস গ্রন্থে এরূপও দেখা গিয়াছে। † জাতিতেই হউক, অথবা দীক্ষিত হইয়াই হউক, মুসলমান হইয়া, মুসলমান প্রাধান্ত সময়ে হিন্দুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা, কেবল সহানুভূতি নহে, দিল্লীর শায় রাজধানীতে মসজিদে মসজিদে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা কম সাহসের পরিচায়ক নহে। এই অসমসাহসিক কার্যই খুসরুর পতনের একমাত্র কারণ।

খুসরু সর্বসম্মত চারি মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই চারি মাসের মধ্যেই দিল্লী মুসলমানগণ এতদূর শঙ্কাকুল হইয়া উঠেন যে, খুসরুর কবল হইতে সাম্রাজ্য উদ্ধারকরে

তাহারা পরাজয়ের শাসনকর্তা গিয়াস-উদ্দীন তোপলকের শরণাপন্ন হন। এতদবস্থায় গিয়াস-উদ্দীন দিল্লী আক্রমণ করেন। খুসরু পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে এক সমাধি-মন্দিরে লুকাইত হইলেন এবং সে স্থানে তিন দিন অনাহারে থাকিয়া, চতুর্থ দিবসে স্মৃৎসরু কাতর হইয়া স্বীয় অসুসীম বিক্রয় করিয়া আহার্য সংগ্রহ করিয়া মানসে তথা হইতে বহির্গত হইলে, গিয়াস উদ্দীনের পুত্র ফকীর উদ্দীন জুনা খাঁ হস্তে বন্দী হন। গিয়াস-উদ্দীন তাহার প্রতি রাজ্য প্রায় ব্যবহার করেন এবং কুতবের হত্যাশ্রমেই তাহার শিরচ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। গিয়াস-উদ্দীনের পুত্র ফকীর উদ্দীন এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ খুসরুকে অতি নৃশংস ও অত্যাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অশ্রু খুসরু সিংহাসন অধিকারকালে কতকগুলি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সাধিত করিয়া কুতবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ কুতবতার নিদর্শন পাঠান রাজত্বে বিরল নহে। পাঠান রাজগণের মধ্যে অধিকাংশ নৃপতি এরূপ কুতবতার পরিচয় প্রদানে সিংহাসন অধিকার করেন। সুতরাং খুসরুর অপরাধ সে সকল নৃপতিগণের তুলনায় এমন কিছু বেশী হয় নাই যে, তাহাকে অতি নৃশংস বলিয়া বর্ণনা করা বাইতে পারে। খুসরু মুসলমান হইয়াও কেন যে এরূপ মুসলমানগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। কোন ইতিহাসে এ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। কোনও কোনও মুসলমান ঐতিহাসিক

\* "Mubarak had a great favourite named Malik Khusru, a low caste Hindu who had embraced Mahammadanism.

Hara Prasad Sastri.

" \* \* \* allowed a low-born Hindu convert Khusru Khan, to mismanage state-affairs "

Vincent A. Smith.

† "While outwardly professing Islam, Khusru desecrated Kuram by using it as a seat \* \* \*."—(W. W. Hunter).

বলেন,—আলাউদ্দীন খিলজি হিন্দুগণের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, খুস্কর অত্যাচার তাহারই প্রতিফল মাত্র ।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ যুগোপাধ্যায় ।

## স্নেহের জয় ।

হেতবপুরের বিপ্রদাস ভট্টাচার্য্যের একমাত্র সন্তান গোপালচন্দ্র যখন পিতার নিকট ব্যাকরণ শেষ করিয়া মুকুবোধ পড়িতে আরম্ভ করিল, সেই সময় একদিন তাহার প্রতিবেশী-পুত্র নন্দলাল ঘোষ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া একখানি সুন্দর পুস্তক হস্তে করিয়া গোপালকে বলিল “গোপাল দাদা, দেখ আমি এবার স্কুলে পড়িয়া কেমন সুন্দর বইখানি উপহার পাইয়াছি ।

নন্দলালের সৌভাগ্য গোপালচন্দ্রের আগে লক্ষ্য হইল না । সে পিতাকে রোদন-স্বরে বলিল “বাবা, তোমার কাছে আমি আর পড়ুব না । আমার স্কুলে ভর্তি করে দাও ।”

বিপ্রদাসের ধারণা ছিল, ইংরাজী পড়িলে মাষ্টর সাহেব হইয়া যায়, এবং পরে সাহেবদের মত পিতামাতাকে গ্রাহ্য করে না । কিন্তু তাহার জী দয়াময়ীর একান্ত অহুরোধে এবং পুত্রের আগ্রহাভিনয়ে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গোপালকে গ্রামস্থ স্কুলে ভর্তি করিতে হইল ।

বিপ্রদাস ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, গ্রামস্থ এবং ভঁর গ্রামের কয়েক ঘর শিল্পের বাড়ী নিত্য-সেবা ও ক্রিয়াকর্ম করিয়া, এবং কয়েক বিঘা জমী নিজে চাষ করিয়া কঠোরভাবে তাহার ক্ষুদ্র সন্দেহচিহ্ন চমিয়া বাইত । সংসারে জী ও সপ্তম

বর্ষীয় পুত্র গোপাল বাতীত অল্প কোন লোক ছিল না । দয়াদয়ী তাহার দ্বিতীয় পক্ষের জী । বৃদ্ধ বয়সে দয়াময়ী তাঁহাকে পুত্র-বৃথ দর্শন করাইয়া স্বামীর বড়ই স্নানজরে পড়িয়াছিলেন । একে ত দ্বিতীয় পক্ষের জী তাহার উপর পুত্র-রস প্রসব করিয়া অবধি ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন । কাজেকাজেই তাহার পুত্রকে স্কুলে দিবার অহুরোধ, ব্রাহ্মণ উড়াইয়া দিতে পারিলেন না । কিন্তু তথাপি তিনি জীকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, “গোপালকে ত স্কুলে দিলাম । কিন্তু শেষে না পড়াইতে হয় ।”

গোপাল মেধাৱী বালক, একে একে ছাত্রবৃত্তি, মাইনর, প্রবেশিকা পরীক্ষা উচ্চ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল । এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রদাসের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল । এই কয়েক বৎসর মধ্যে তাহার জমী জায়গা সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে । উপস্থিত তাহার বাস্তবিকতাটা মাত্র সঞ্চল । কলিকাতা বড়বাজারের বিখ্যাত আড়ৎদার ননালাল ঘোষ তাহার প্রধান শিষ্য, তাহারই সাহায্যে গোপালকে এতদূর পড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন । গোপাল তাহার বাড়ীতে থাকিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া দেশে আসিয়াছে ।

(২)

বৈশাখ মাস, দাক্ষিণ গ্রীষ্মে লোকের প্রাণ অস্থির । বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে । রৌদ্রে চারিদিক কম্বু কম্বু করিতেছে । প্রাণি যাজেই শীতল স্থানে আগ্রহ লইয়া বিশ্রাম করিতেছে । গোপাল আঁধার প্রাতে তাহার

কোক-সহপাঠীর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে  
বিরাজেন। বিপ্রদাস আনাতে কোন দূর  
প্রায়ে পূজা করিতে পিরাজেন। তিনি এখনও  
কিরেন নাই। দয়াময়ী একাকিনী আহাঙ্গাদি  
প্রভৃতির পর গৃহের মধ্যে একখানি মাহুর  
বিছাইয়া শায়িত। এমন সময় তিনি ঘর  
খুলিতেই ডাক পিয়ন তাঁহার হস্তে একখানি  
সত্র দিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানি যথাস্থানে  
স্থাপিয়া তিনি পুনর্বার শয্যা গ্রহণ করিলেন।

প্রায় বেলা তিনটার সময় পূজারি সারিয়া  
খুলিখুলিত কলেবরে বিপ্রদাস বাড়ী প্রবেশ  
করিলেন। দয়াময়ী তাঁহার পদধর ধৌত  
করিয়া দিলেন। একটি খালার অন্ন-ব্যাঞ্জন  
সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। ব্রাহ্মণ  
বসিয়া আহাঙ্গ শেব করিয়া আঁচমন পূর্বক  
বলিলেন,—“গোপালকে আর পড়াইতে  
পারিলাম না। সবই শু গেল, ভরসা মাত্র  
ননী ঘোষ, সে যদি ভরসা দেয় তবেই।”

বিপ্রদাস একখানি জল-চৌকিতে বসিয়া  
ভাখুল চর্ষণ করিতেছেন। দয়াময়ী তামাক  
প্রস্তুত করিয়া কলিকায় “হু” দিতে দিতে  
একখানি পত্র হাতে লইয়া বলিলেন,—“দেখ  
এই চিঠিখানি আজ ডাকে এসেছে। ব্রাহ্মণ  
পত্রখানি হস্তে লইয়া পাঠ করিতে করিতে  
বেন কেমন হইয়া গেছেন। হঠাৎ তাঁহার  
হৃৎখানিতে কে বেন ধাক্কাটী কালী মাখাইয়া  
ছিল। হুই হস্তে আপন বস্তকটী চাপিয়া  
ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

“সর্বনাশ, ননী ঘোষ মারা গিয়াছে।”  
সকল সঙ্কে ব্রাহ্মণের আবার কীণ বর্জকটি

হঠাৎ নির্বাণ হইল। গোপাল সন্ধ্যার  
সময় বাটা করিয়া এ সংবাদ জ্ঞাত হইলেন।  
অর্ধপথে বাধা পাইয়া এই বেধাবী বালক  
বড়ই মর্মান্বিত হইল।

কলিকাতার ২নং বৈটকখানা ঘোড়ে  
একটি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ীতে আজ মহা সমারোহ।  
একটি প্রশস্ত দালানে প্রাচ্যোপযোগী নানান  
বস্তু ধরে ধরে সজ্জিত। বহুদূর হইতে অনেক  
আত্মীয় স্বজন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া  
প্রাচ্যোপলক্ষে আগমন করিয়াছেন। ভট্টা-  
চার্যাদিগের শাস্ত্রীয় তর্ক, লোকজনের বাস্তব  
বিতণ্ডা, বালকবালিকার আনন্দ কোলাহলে  
বাড়ীটি যেন মুখরিত।

অন্ত ননীলাল ঘোষের প্রাঙ্গণ। বিপ্রদাস  
দুই দিন হইল কলিকাতার আসিয়াছেন।  
প্রাঙ্গণবাড়ী আসিয়া অস্ত্রান্ত ব্রাহ্মণের মত বখেটে  
প্রাপ্তি সত্ত্বেও তিনি ভেতন লুপী হইতে পারেন  
নাই। একমাত্র আত্মীয় ভ্রাতৃ প্রিয় শিষ্যের  
মৃত্যুতে তিনি বিশেষভাবে দুঃখিত হইয়াছেন।

একদিন প্রাতঃকালে, একটি নাতিদীর্ঘ  
মুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া বিপ্রদাস তাঁহার কলি-  
কাতার একটি বন্ধুর নিকট ননীঘোষের মৃত্যুতে  
দুঃখ প্রকাশ করিয়া, গোপালের পাঠ সম্বন্ধীয়  
কথাবার্তা কহিতেছিলেন। এমন সময় ননী  
ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনী ঘোষ আসিয়া বসিল,  
এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল—“ভট্টাচার্য্য মহাশয়  
গোপাল বাবুকে আর পড়াইবেন না কি ?  
ভট্টাচার্য্যের ছেলের আর বেশি পড়ার দরকারই  
বা কি ? আর আমাদের ত এখন বয়স  
অবস্থা পাড়াইল, তাহাতে বে আর অগুনতিক

কোন সাহায্য করিতে পারিব—সে আশাত নাই।”

কলী বোব বাহা বলিবে, বিপ্রদাস পূর্বেই তাহা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে নবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সকল আশা নির্মূল হইবে। তিনি কণিকে ভালরূপ জানিতেন; তাহাকে আর কোন কথা বলিহে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। যে বস্তুটির সহিত ইতিপূর্বে তিনি কথাবার্তা করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“জন্মলেন ত ? ছেলেরা আমার বড় ভাল বলে ডাকে পড়াবার আমার এত আকিঞ্চন।”

বস্তুটি কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—“আপনি এক কাজ করুন। গোপালের বিবাহ দিন। আমি সবজজ রমেশবাবুর ছেলেকে পড়াইয়া থাকি, তাঁহার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে, কন্যাটি আমি দেখিয়াছি—কন্যা শিক্ষিতা এবং সুন্দরী। রমেশবাবু একদিন আমার নিকট কন্যা কল্যাণীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছিলেন—“একটি গরীবঘরের ভাল ছেলে পাইলে, তিনি তাহাকে মাহুষ করিয়া লইতে পারেন। আমার বোধ হয় তিনি আপনার স্বপ্ন হইবেন।”

(৩)

সবজজ কন্যা কল্যাণীর সহিত গোপাল-চন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গোপালের আর সে দিন নাই। রমেশবাবুর কুপার তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। সে এখন আর গরীব আশ্রয় সন্ধান নহে। এখন সে “গোপাল বাবু”—সবজজ জায়তা।

গোপালের প্রতীতি দেখিয়া রমেশবাবু বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। স্বপ্নরাসের থাকিয়া সে কলেজে পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। গোপালচন্দ্র একে একে আই এ, বি এ, ও এম এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নর মহাশয়ের মেহ-বস্ত্র অপেক্ষাকৃত বর্ধিত হইয়াছে। বিপ্রদাস মধ্যে মধ্যে কলিকাতার আসিয়া পুত্রকে দেখিয়া বাইতেন এবং দয়াময়ীকে সে সংবাদ দিয়া সুখী করিতেন।

বিবাহের পর বাজ সাতদিনের জন্ত নববধূ কল্যাণী স্বপ্নরাসের হেতমপুরের বাটীতে আসিয়াছিল। কিন্তু ঐ সাতদিনের মধ্যে, সবজজ কন্যার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে গিয়া বৃদ্ধ বিপ্রদাসের প্রাণান্ত পরিশ্রম হইয়াছে। এবং যথাবিহিত ব্যয় নির্বাহ করিতে তাঁহাকে তাঁহার শেষ সম্বল বাস্তবিকটাটি পর্যন্ত ব্যয় করিতে হইয়াছে। যথাসর্ব্বম্ ব্যয় করিয়াও তিনি কল্যাণীকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হন নাই। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া আসিয়াছে “সে আর কখনও এ জঙ্গলী দেশে আসিবে না।”

সে দিন পূর্ণিমা রজনী। আকাশ মেঘমুক্ত নির্মল। চন্দ্রদেব নীল আকাশে সকাল সকাল উঠিয়া নিজে হাসিতেছেন এবং জগৎ শুভ সকলকেই হাসাইতেছেন। বৃদ্ধ লতা, পত, গন্ধী, সকলেই যেন সেই নির্মল হাসিতে আজ যোগদান করিয়া, চন্দ্রমা-কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সকলে হাসিলেও, আজ বিপ্রদাস বড়ই বিবর; অর্থাভাবে এবং তার তাঁহার গৃহ-গুলি বেরান্বন হয় নাই, বিহানার শারীত

অবস্থাতেই তিনি তাঁহার ভগ্ন শরের ছিন্নপথ হইতে তাঁহের আলো আঁক তাঁহার পক্ষে স্থলের বদলে হুঃখই চালিয়া দিতেছে । পুত্র গোপাল-অনেক দিন দেশে আসেন নাই । ব্রাহ্মণী বড়ই কাতরা হইয়া উঠিয়াছেন । পুত্রের পাঠের খরচ নির্বাহ করিতে তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিগাছে । শেব সবল বাস্তবতাটীও নববধু কল্যাণীর লক্ষ্যনার হস্তচ্যুত প্রায় । এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ স্ত্রী হইবেন কি করিয়া ? বড় ঘরে আত্মীয়তা করিয়া তিনি যে বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহা এখন তিনি বেশ বুঝিয়াছেন । এখন ভরসা মাত্র গোপাল, সে যদি মাহুদ হইয়া পিতামাতাকে স্ত্রী করে তবেই ।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর গত হইল । অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোপালের স্বভাব-চরিত্র ও মনোবৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । সে এখন জনসমাজে দরিদ্র পিতার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে । অধিক সময় এবং অনেক স্থানে সে পিতার পরিবর্তে খণ্ড মহাশয়েরই পরিচয় দিয়া স্ত্রী হয় । গোপাল এখন বহু বড়লোকের সহিত পরিচিত ।

ব্রাহ্মণীর ক্রন্দনে বাঞ্ছিত হইয়া, একদিন বিপ্রদাস পুত্র-দর্শনাভিলাষে কলিকাতায় আসিলেন । সে দিন কোন বড় লোকের বাড়ীতে গোপালের নিয়ন্ত্রণ ছিল । তিনি যখন রমেশবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, তখন গোপালচন্দ্র সাহেবী বেশে সজ্জিত হইয়া একখানি “কিটনে” আসিয়া উঠিল । বোড়া

বোতা হইলেই গাড়ী বাহির হইয়া বাইবে । বিপ্রদাস গাড়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অনিদিষ্ট-লোচনে পুত্রের সৌভাগ্য-দর্শনে পুলকিতচিত্তে মনে মনে ভগবানের নিকট গোপালের স্বার্থ জীবন কামনা করিলেন এবং প্রকাণ্ডে বলিলেন—“বাবা বেশ ভাল ছিলে ত ? এবার আমার সঙ্গে তোমার বাড়ী যেতে হবে কারণ তোমার জননী বড়ই কাতরা হইয়াছেন ।” পিতার দর্শনে বা তাঁহার ক্রোধ করণীতে পুত্রের কোন চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না । গোপাল অবিচলিত স্বরে কোচম্যানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল “জলদি করো, ত্বর হোতা হার ।” ব্রাহ্মণ ভাবিলেন পুত্র বোধ হয় তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই ? একটু উচ্চস্বরে বলিলেন—“বাবা কখন কি হবে ? একবার পিতার দিকে বক্রনয়নে চাহিয়া, দ্বিরুক্তিভাবে গোপাল বলিলেন—“আপনি রোজ রোজ কেন এখানে আসেন ? এরকম বেশে এখানে আসিতে আপনার লজ্জা বোধ হয় না ? আপনার যাহা দরকার হইবে পুত্রের দ্বারা জানাইতে পারেন ।”

এতদিন পুত্রের ভাবগতিক ব্রাহ্মণের নিকট ভাল বোধ হইতেছিল না । কিন্তু সেহ অকস্মিত পিতা পুত্রের উপর সন্দেহ করিতেও সাহস করেন নাই । তাঁহার গোপালই একমাত্র ভরসা । গোপালকে সন্দেহ করিলে চলিবে কেন ? কিন্তু অত পুত্রের এই নিদারুণ বাক্য-গুলি তাঁহার প্রাণে শেলসর-বিদ্ধ হইল । দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে, হঠাৎ তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, চক্ষে জগৎ-অন্ধকার

দেখিলেন, পৃথিবী যেন তাঁহার পদতল হইতে নিম্নে সরিয়া গেল, তিনি পড়িয়া গেলেন। সেই মুহূর্ত্তেই ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাবুক পড়িল, গোপাল সমস্ত ফিটন সম্বন্ধে কটক পার হইয়া গেল।

(৪)

রমেশবাবু গোপালের কোন অভাব না রাখিলেও, তিনি গোপালকে যে পকেট খরচ দিতেন, তাহাতে গোপালের অভাব মিটিত না। সবলজ কত্যা কল্যাণীর সময়োচিত প্রার্থনাগুলি অনেক সময় পূর্ণ করিতে না পারিয়া সে বিশেষ লজ্জিত হইত। অগত্যা গোপাল এখন অর্ধ উপার্জনের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং সময়ই রমেশ বাবুর সুপারিশে কেমি রেল কোম্পানীর আফিসে সে একটা বড় পদ পাইল, শীঘ্রই সে ২০০ হইতে ৩০০ টাকা বেতন পাইতে লাগিল। গোপাল শিক্ষিত যুবক, সে কি পিতামাতাকে একেবারে ভুলিতে পারিবে? চাকরি ছইবার দুই মাস পর হইতে সে পিতাকে মাসে দুড়িটা মুজা পাঠাইয়া থাকে।

বিপ্রদাস আর কলিকাতায় আসেন না, কারণ এখনও তিনি তাঁহার পোষাকের কোন-রূপ উন্নতি করিতে পারেন নাই। পুত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহারে উত্তরেই তাঁহারা বিশেষভাবে মর্মান্বিত হইরাছেন। পুত্র প্রেরিত দুড়িটা মুজায় কার্যকর শস্যের বাজা নিকীর্ষ করিতেছেন। ব্রাহ্মী পুত্রের অভাবে অনেক কাঁদিয়া শেষে পাখান হইয়া পড়াছেন। কিছুদিন পরে তিনি ভাবিলেন গোপাল ঐ রেলের ম্যানেজার হইরাছে। তাঁহার বেতন সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশত

টাকা হইরাছে। পুত্রের সৌভাগ্যে তিনি এখনও সুখী হইলেন। এবং আশা হইল শীঘ্রই পুত্র দেশের দিকে নবর দিবে।

বিপ্রদাসের বাস্তবতাটা যে লোকের নিকট দুই বৎসর মেরাদে বন্ধক ছিল, তাহার সময় উত্তীর্ণপ্রায়, মহাজন অনেক তাগাদা করিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ পুত্রের দোহাই দিয়া এতদিন তাহাকে শান্ত করিয়া আসিয়াছেন। অতঃপে আসিয়া বলিয়া গেল, “আর সাতদিনের মধ্যে যদি তিনি কর্ত্তব্য পরিশোধ না করেন, তবে বাটা নিলামে চড়িবে।” অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপ্রদাস গোপালকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে যদি সাতদিনের মধ্যে টাকা না আসে, তবে তাঁহাকে ভিটা ছাড়া হইতে হইবে।

যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল, গোপাল লিখিয়াছে—“আপনার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইয়া হুঃখিত হইলাম। উপস্থিত আমার অনেক খরচ, এ মাসে অনেক টাকার দরকার কারণ, আমার জীর কোন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে উপঢৌকন স্বরূপ একছড়া নেক্লেস তৈয়ারি করাইতে হইবে। আমার জীর দেহও খুব খারাপ, ডাক্তারদের মতে তাঁহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে হার্ডয়া বদলাইতে পাঠান বিশেষ আবশ্যক। আগামী দুই মাস আমার ব্যায়া আপনাদের কোন সাহায্য হইবে না, পরে বিবেচনা করা যাইবে।”

(৫)

অতঃ দুই মাস বিপ্রদাস ভিটা ছাড়া হইয়াছেন। তিনি অনেক স্থানে মাথা রাখিবার

একটু স্থান প্রার্থনা করিয়া হতাশ হইয়াছেন। কেহই তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করে নাই। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছে—“যার রাক্ষাস মত ছেলে তার আবার অভাব কিসের? সন্ন্যাস না কি কখনও ভিক্ষা মাগে?”

কোতে, হুঃখে অবসর হইয়া ব্রাহ্মণ লোকালয় ভ্রাম্য করিয়া গাছতলা আশ্রয় করিয়াছেন। ব্রাহ্মণীও অবহার বিপর্যয়ে অকালে বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন। এত হুঃখেও কিন্তু তিনি একদিনের জন্তও ব্রাহ্মণকে ভ্রাম্য করেন নাই। বরঞ্চ পূর্বপেক্ষা তাঁহার স্বামী-ভক্তি শতগুণে বর্দ্ধিতই হইয়াছে। তাঁহার সেবা ও যত্নে ব্রাহ্মণ এখনও দাঁড়াইয়া আছেন, নতুবা অনেকদিন পূর্বে তাঁহাকে পাগল হইতে হইত।

ভিক্ষাই যখন বৃদ্ধি এবং গাছতলাই যখন সঞ্চল হইল, তখন দেশ ছাড়িয়া বিদেশে বাওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া, ব্রাহ্মণ বহুস্থান ঘুরিলেন এবং অবশেষে একদিন কোন রেলের একটা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনের বাবু দয়া প্রবশ হইয়া, চান্দা করিয়া, কিছুদিন এই ব্রাহ্মণ দম্পতীকে আশ্রয় দিলেন। তাঁহারা যোষ হয় এই ভিক্ষুক দম্পতীকে সাধারণ পেশাদার ভিক্ষুক বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। একদিন কথার কথার ব্রাহ্মণ সকলের সাক্ষাতে নিজ পরিচর অনিচ্ছাসম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া কেলিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, সেই দিন হইতেই ব্রাহ্মণের ভ্রাম্যচক্রের গতি হঠাৎ পরিবর্তন হইল। সন্ধ্যার সময় বড় বাবু সীকরে তাঁহা-

বিশকে আগম বাসার লইয়া গেলেন। নিম্ন-প্রায় ব্রাহ্মণ আশ্রয় পাইল। ব্রাহ্মণ-বিশক ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

একদিন সংবাদ আসিল, রেলের স্টেশন ম্যানেজার সাহেব লাইন পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন। তাঁহার আগমন সংবাদে ষ্টেশনটিতে মহা হলুদুল পড়িয়া গেল। হঠাৎ একটা ব্যস্ততার সাড়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই প্রাণপণ যত্নে কাজ করিতেছেন। সকলেই ব্যস্ত। সেইদিন বড় বাবু বাসার আসিয়া বিশদাসের সহিত অজ্ঞাত কথাবর্তার পর বলিলেন “দেখুন আপনি একটা কাজ করুন, কাল সকালে আমাদের নুতন সাহেব এখানে আসিতেছেন, শুনেছি তিনি নাকি খুব দয়ালু ব্যক্তি, আমাদের ইচ্ছে আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। আপনার সম্বন্ধে বা কিছু বলবার আমি বলব। দেখি যদি কোন উপায় হয়।

ষ্টেশনটি আজ শূন্যরূপে সজ্জিত। প্রত্যেক কর্মচারী আপনাপন পোষাক পরিধান করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। এমন সময় দক্ষীতে সম্মুখে একে একে ১০টা বাজিল। হঠাৎ স্থানটি শান্তমুষ্টি ধারণ করিল। সকলেরই মুখে উৎসুক ভাব বর্তমান। ঘুরে ঐ সময়ে ইঞ্জিনের বাশী বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ মন্ত্র পঠিতে একখানি “স্পেসল” ট্রেন আসিয়া থামিয়া গেল।

একখানি সাদা সংয়ের সেকুনের জিহ্বা একটা সাহেব ও রাশিকার ধরণের পোষাক পরিহিতা একটা বাকানী স্ট্রোলক বসিয়া



আছে। উদ্ভিদারী একটি চাপরাশী নামিয়া সেজনের দরজা খুলিয়া সেলাম করিল। সাহেব গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেই উপস্থিত সকলে সেলাম বাজাইল। সাহেব বড় বাবুকে সঙ্গে লইয়া কার্য পরিদর্শনে চলিয়া গেলেন। যেম সাহেব গাড়ীতে রহিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টার পর সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। এবং গাড়ীতে উঠিয়াই বেহারাকে “চা” দিতে হুকুম করিয়া যেম সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“কোন কষ্ট হয় নি ত?” বেমলোহেব মন্তক আশ্বাসন করিয়া সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এমন সময় বড় বাবু এক ভিক্কু দম্পতীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আর একবার সেলাম ঠুকিয়া সাহেবকে ভিক্কু সঞ্চায়ী সমস্ত ব্যাপার আত্মপূর্বিক বর্ণনা করিয়া তাঁহার রূপা প্রার্থনা করিলেন। ভিক্কু দেখিয়াই যেম সাহেব চটিয়া উঠিলেন এবং নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ভিক্কুদ্বয়ে সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“তোমার লাইনের বন্দোবস্ত খুব ভালই দেখছি! ভিখারীরা অবোধে এসে ভদ্রলোককে বিরক্ত করিতে পার, বেশ বন্দোবস্ত, বেশ, বেশ।”

সাহেব ভিখারীঘরের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষে বিরক্তিতাব ঘেন ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু এ কি তিনি আর চক্ষু ফিরাইতেছেন না কেন? একদুষ্টে কি দেখিতেছেন? তাঁহার চক্ষে পলক নাই। তিনি কি হইয়া গেলেন? ওকি সাহেব কাঁদিতেছেন? চক্ষের অন্তে বড় ভাসিয়া যায় যে! ঠিক সেই সময়

ব্রাহ্মণ বুধ ভুলিয়া সাহেবের দিকে চাহিলেন, চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—“বাবা! গোপাল! ভুলি। ব্রাহ্মণ আর ছির থাকিতে পারিছেন না, বাবা ছুরিয়া পেল, তিনি পড়িয়া গেলেন। পার্শ্ব হইতে ব্রাহ্মণ ঠিক সেই মুহূর্ত্তে “বাবা গো” বলিয়াই স্বাধীর পার্শ্বে পতিত হইলেন।

সাহেব আর ছির থাকিতে পারিলেন না। একবারে সহস্র বৃত্তিক দংশন যাতনা অমুভব করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে কোড়ে করিয়া বসিলেন। তাঁহার নয়নের অবাধ্য অশ্রুপ্রাণী আজ ফোঁটায় ফোঁটায় করিয়া ব্রাহ্মণের তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছে।

সাহেবের কোড়ে ভিখারীদ্বয় নয়নে অশ্রুধারা, এবং বদনে পিতৃ সোধোদন শুনিয়া দর্শকগণের অশ্রুরোধ করা কঠিন হইয়া উঠিল। এই অপূর্ব মিলনে সকলেই আশ্চর্য হইয়া সম্বরে বলিয়া উঠিলেন—“স্নেহের জয়।”

যেমসাহেব কিছু বৃত্তিতে না পারিয়া উদাস—নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীললিতমোহন মজুমদার।

## সাধন সঙ্গীত ।

রবিবাবুর একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এ গানটির ভিতরে যে সাধনার কথা লেখা আছে, তাহার ভিতর কিছু বলিবার লব এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

রাগিনী কাঞ্চি—তাল একতাল।

বাকে বাকে তব দেখা পাই

চিরদিন কেন পাই না।

কেন যেন আসে হৃদয়-আকাশে,  
তোমারে দেখিতে ঘের না।

কণিক আলোকে আঁধার পলকে  
তোমার বসে পাই দেখিতে,  
হারাই হারাই লগ্না হর তর,  
হারাইরা ফেলি চকিতে।

কি করিলে বল পাইব তোমারে,  
রাখিব আঁধিতে আঁধিতে।

এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ,  
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।

আর কারো পানে চাহিব না আর,  
করিব হে আমি প্রাণপণ;  
তুমি যদি বল এখনি করিব  
বিষয়-বাসনা বিসর্জন।

এই গানটি পড়ে এবং শ্রুত করে গানটি  
গেয়ে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইল  
তাহা প্রকাশ করিতেছি। রবিবার শুধু কবি  
নন—তিনি কবিতা রচনা করিতে পারেন,  
গান রচনা করিতে পারেন এবং মধুরকণ্ঠে  
স্বকীত করিতে পারেন। একাধারে রবিবার  
কবি, গায়ক, তক্ত ও প্রেমিক। প্রেমিক  
কবি গান করিয়া অগতকে প্রেমভক্তি নিখাই-  
তেছেন, সাধনার উপদেশ দিতেছেন। তিনি  
নিখাইতেছেন—যানব হৃদয় অতীব ক্ষুদ্র।  
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটা বৈ চুটির স্থান হয় না।  
শ্রীভগবানও বিষয় লালসার একত্র সমাবেশ  
হইতে পারে না। তুমি হয় শ্রীভগবানকে  
লইয়া থাক, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ কর;  
অথবা বিষয়-বাসনা লইয়া থাক, শ্রীভগবানকে  
পরিত্যাগ কর। যিনি তক্ত তিনি বলিবেন—

আমি শ্রীভগবানকেই চাই, বিষয় লুপ্ত চাহি না।  
তাই প্রেমিক কবি শ্রীভগবানকে সাধোঁধন  
করিয়া বলিতেছেন—

“তুমি যদি বল এখনি করিব  
বিষয়-বাসনা বিসর্জন।”

বিষয় বাসনা বিচ্যুতিত না হইলে হৃদয়ে  
কতু প্রেমের স্কার হয় না; প্রেমের স্কার  
না হইলে ভাগ্যে ভগবান ঘটে না। সাধক  
একথাও বলেন সে প্রেম যেনন তেনন হলে  
চলবে না; সে প্রেম অহেতুকী হওয়া চাই,  
আবার অগাধ ও অসীম হওয়া চাই অর্থাৎ  
একটু আঁধটু প্রেমের কর্ম নয়। কবি বলি-  
তেছেন—শ্রীভগবানকে হৃদয়ে রাখিতে হইলে  
অগাধ প্রেমের প্রয়োজন। বিনয়ে তৃণ অপেক্ষা  
নীচ হইয়া সাধক বলিতেছেন—আমি প্রেমের  
ভিখারী; আমি অত প্রেম কোথায় পাব—

“এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ  
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।”

জামিলাম যেমন গান-রচনা করে না—  
প্রেম আসে না। প্রেম না এলে তাঁর দর্শন  
পাওয়া যায় না।

তক্ত চায় তার প্রিয়দর্শনকে চ’খে চ’খে  
রাখিতে, তাই ভগবানকে ভিত্তাসা করিতেছে—

“কি করিলে বল পাইব তোমারে  
রাখিব আঁধিতে আঁধিতে।”

ভক্তের একান্ত আকিঞ্চন ভগবানকে চির-  
দিন দেখে এবং অনুকণ দেখে। কপালকর্মে  
তাঁকে চিরদিন দেখা ঘটে না, আর অনুকণ  
দেখাও ঘটে না। তক্ত সেই রেশকর বিয়ের  
কথা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—

“নাথক নাথক তব বেধা পাই

চিরদিন কেন পাই না।”

সাধক! তুমি সাধনার সিঁড়িলাভ না করিলে তোমার প্রিয়দর্শনকে চিরদিন দেখিতে পাইবে না, নাথক নাথকই দেখিতে পাইবে। দেখ, তুমি ত নাথক নাথক দর্শন পাও; কিন্তু আমার মত পাখও বে আদৌ তাঁর দর্শন পায় না। আমি আমার মনকে বুঝাতে পারি, তুমি তোমার মনকে বুঝাতে পার না? সরল সাধন পথে চলে যাও, সব পাখে কিছুই অভাব হবে না—ঈশ্বর এই ত উপদেশ। ভুলবাক্যে অটল বিশ্বাস থাকা চাই; ফল কামনা রহিত হয়ে কাজ করা চাই—এই ত সার কথা। হরি লুকাচুরী খেলিতে ভাল-বাসেন। চাঁদ যেমন লুকাচুরী খেলে, একবার মেঘের আড়ালে লুকায় আবার বাহির হয়, হরির লুকাচুরী খেলাও তজ্ঞপ। হরি তত্ত্বকে দর্শন দিতেছেন, দর্শন দিতে দিতে অবৃত্ত হইয়া যান। এহ তাকে চখের সামনে দেখচ আর পরকণে অবৃত্ত, আর নেই। ষাঁরা সাধনা করেন, তারা একথা বেশ জানেন। নিম্নোক্ত রজনীতে অন্ধকার গৃহে একাকী আপন অপা-সনে বসিয়া নিম্নলিখিত নেত্রের বখন ধ্যানে নিমগ্ন থাক, আর বখন তোমার অন্তর্ভুক্তি আজা-চক্রে দিকে সন্নিবিষ্ট থাকে, তখন তোমার চিত্তগট ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। কিকিং পরে দেখ সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ

করিয়া একটা উজ্জ্বল বিদ্যুৎ তোমার চিত্তগটে উদ্ভিত হইয়াছে এবং তারার জ্বার কিছুনিহ ক্রিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই আলোক বিদ্যুৎ বড় হয়, বড় হইয়া ফাটিয়া যায়। তার-পর এক অপূর্ণ বৃত্ত তোমার মানস চক্রে উপর তাসিয়া উঠে আর তুমি দেখ—

“সাবিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্তীনারায়ণঃ সরসিজা-  
ননসন্নিবিষ্টঃ কেহুরবান্ কণকমুণ্ডলবান্  
কিরীটিহারী হিরণ্যবশুঃ বৃত্তশ্চচক্রঃ।”

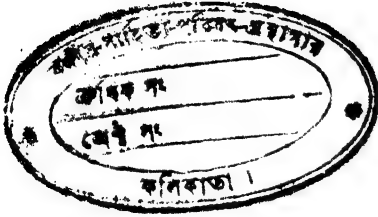
ইনিই তোমার ইষ্টদেবতা, তোমার প্রিয়-দর্শন ঈশতগবান। এ দর্শনলাভ স্মৃতি সাপেক্ষ, সাধনার ফল। চিত্তগটে আর সে বন অন্ধকার নাই, ফোটি সূর্য ও কোটি চক্রেয় সূর্যমণ্ডল আলোকে ঈশতগট উদ্ভাসিত। তোমার প্রাণমন আনন্দে বিগলিত। কপিকের তরে তুমি আর তোমাকে নেই—আনন্দে যাতরারী, বিস্তার, সহসা তুলার জ্বার শুভ্রবর্ণ মেঘ উদয় হইয়া তোমার জরযাক্ষকে চাকিরা কেনে আর অমনি তোমার ইষ্টদেবতার চিহ্নরী সৃষ্টি অবৃত্ত হইয়া যায়। ক্রমশঃ চিত্তগট আবার পূর্বের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সাধক কবি তাঁর প্রিয়দর্শনকে হারা হইয়া বেদ করিয়া বলিতেছেন—

“কেন মেঘ আসে স্বর আকাশে

তোমারে দেখিতে ঘের না।”

(ক্রমশঃ)

ঈশানচক্র ঘোর।



সেটি কি ?

সুখ ও শান্তি একবৃত্তান্তে স্বর্গীয় পুণ্য ;  
সুতরাং তাঁহাদের সৌরভলাভ সামান্য জনের  
সৌভাগ্য-প্রণোদিত। জীবনের এক এক অঙ্ক  
পরিসমাপ্তির সহিত, কত খেলা, কত আশা শেষ  
হইয়া গেল। কতবার এক একটা যবনিকার  
উত্থান-পতন ঘটিল, কিন্তু আশ্চর্য্য্য প্রহেলিকা,—  
প্রহসনের রঙ্গরঙ্গ ও ব্যঙ্গোক্তি যেন বাড়ি-  
তেছে। আশার উদ্বোধনী শক্তি যেন নিত্য  
শক্তি লাভ করিতেছে। বিজয়ীর খেলার মত  
চৈতন্তের উদয় ও বিলয় ঘন ঘন হইতেছে, সে  
ঘন উজ্জল ও ঘন স্তিমিত আলোকে মন দ্রুত  
দ্রুত করিতেছে, আতকে দেহ শিহরিতেছে—  
কিন্তু কই আমি ত ছাড়ি না। আমি না  
ছাড়িলে সে ছাড়িবে কেন ? এত ভয়, এত  
যাতনা,—কিন্তু আমি যা' তাই ; ইহার মূল  
“আমি”, এই ‘আমি’ই আমার সর্বনাশ  
করিল। ছাই ভয়, কি ধূলাখেলা পাইয়াছি,  
তাহাতে যে কি মধুরতা আছে—খেলায় এত  
হারিতেছি—মেশার কোঁকে তথাপি ছাড়িতে

পারিতেছি না,” কেবল ধূলা মাখাই সার  
হইতেছে—কখন নাকে চোখে বালি ঢুকি-  
তেছে—কত কঁাদিতেছি,—বাতনার অস্থির  
হইতেছি,—তবুও ছাড়িতেছি না—পরন্তু অপর  
খেলুড়ে হইয়া, জ'জনের খেলা একাই করি-  
তেছি, ক্রুধা তৃষ্ণা বলিয়া মনে নাই, অন্তঃকল-  
গামী সূর্য্য, তবুও ক্রম্পে নাই। হুয় হুগুণে  
ছাই,—খালিই হারিতেছি,—এইবার জিতি-  
বই—অই যা' ঘুঁটি হারাইয়া গেল—সন্ধ্যা  
হইল ;—এখন যেমন কর্তব্য তেমনি কল ! অন্ধ-  
কারে কেহই নাই ;—একি, নিজে যে  
নিজেকেই দেখিতে পাই না,—কেবল মশক  
মক্ষিকার ভোঁ ভোঁ শব্দ, দংশন আর গাজ্রদাহ !  
একা দিশাহারা ! এ অবস্থায় গোধূলি ফলকে  
একটা মাত্র উজ্জল নক্ষত্র—তাহাই ভরসা—  
‘সেটি কি ?’—কে বলিবে সেটি কি ? ‘সেটি  
কি ?’ কথাটা সহজ,—কিন্তু তাহার ভিতরে  
চুকিয়া, তাহার মূল-তত্ত্ব জানা,—তবে ত উজ্জর  
দেওয়া, তাহা বড় শক্ত ! সেটির বাহিরে

কিছুই নাই—রং টং গঠন থাকিলেও জানা যায় না, ভিতর—সেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতম, আবার বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃহত্তম, সেটির ভিতর অনন্ত,—অনন্ত আকাশ ও অনন্ত জলধির সহিত অনন্ত কোটি বিশ্ব তাহার মধ্যে—মৃষ্টিমেয় বায়ুকারাশির জায় খেলা করিতেছে। সব আছে আবার কিছুই নাই—কেবল ধূ ধূ ধূ! অনন্ত প্রাহেলিকা! তবে সেটি ক্ষুদ্র না বৃহৎ—অল্প না অনন্ত? বলিতে পারে কে ‘সেটি কি?’ সীমান্ত জীবন, সংসার মায়াদৃষ্টিসম্পন্ন বদ্ধ মানব হইয়া, আমি ও জানিতে বা বলিতে পারিলাম না ‘সেটি কি?’

আমি সীমান্ত জীবন,—সংসারাবদ্ধ ও মায়াদৃষ্টিসম্পন্ন—সেটি আত্মতত্ত্ব পরিশুদ্ধ অনন্ত—সংসারের বাহিরেও মায়াশূন্য,—তবে আমি কিরূপে তাহাকে জানিব? আমি মানব, মানব জীবন এমন ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত—সজ্জিত, এমন নৈসর্গিক মহাপ্রাণতায় বিভোর, একবার পূণ্য-পরিমলে এমনি সুরভিত—আবার আবিলতায় সমাকীর্ণ! তাহার নিজের হৃদয়ের সুখ ছায়ায় প্রতিকৃতি মুহূর্তের মধ্যে, নিমিষেষু মধ্যে তাহার মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়। অনিবার্য্য বিগলিত আনন্দ বা দুঃখাশ্রু গণ্ডস্থলে প্রবাহিত হয়। সেই জগত্ই মানব আপনার ভাষে আপনি বিভোর, সেই আনন্দ ও বিষাদে মানব সেই বিভোরতার সহিত নীরব নিশ্চল নিধর। সেইজগৎ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীকে স্তম্ভপ্রদ, বসন্ত বায়ুকে পীযুষবর্ষা, পিক কাকলীকে সে কখন চায়, আবার চায়ও না! তাহার মুখমণ্ডলেও আরক্তিম ভাবে এই দুইটী ভাব কখন

একা একা—কখন যুগপৎ প্রতিফলিত হয়ই। আনন্দের ভাবে মানব দেবশক্তি লাভে প্রকৃত ভালবাসার নীতল ছায়ায় বাস করে, কিন্তু সে ভালবাসা কই? সে যে স্বার্থাক্ষ হইয়া তাহার প্রতিদান চায়—তাহাত ‘সেটি কি’—বুঝিতে না পারিয়া পৃথিবীকে জলহুলশূন্য, জীবশূন্য, তরুলতাশূন্য রবীন্দ্রতারকাশূন্য দেখে—সে দেখে আবার ত্রিশির কাচের মধ্য দিয়া এক রঙে নানা রঙের প্রতিফলন। তবে কেমন করিয়া বুঝি যে ‘সেটি কি!’

মানব লৌকিক ব্যবহার ও লোক-প্রাণতায় বিশুদ্ধভাবে বাহা করিতে চায়—সে তাহাকে অন্তভাবে সাজাইয়া বিসদৃশ করিয়া সব হারাইয়া ফেলে। সে জ্ঞান-কর্মকে খেলার জিনিস মনে করিয়া তাহাদের দ্বারা বন্ধনটি আনিয়া মুক্তির পথ কণ্টকিত করিয়া, বাহিণ্ডে ‘সেটি কি’ খুঁজিতে থাকে, কাঁটা ভাঙ্গিয়া ভিতরে যাইতে চাহিলেও পারে না,—কাজেই আসলে নকল উঠিয়া তাহাকে আমার মত ‘সেটি কি’ জানিতে দেয় না—ভুলাইয়া দেয়। সেই আনন্দের পরিবর্তে তখন কেবল তাহার বিষাদ—হাসির স্থানে কেবল কান্না। সেই আত্মমানির্জমিত বিষাদপূর্ণ মুখ তাহার হতাশের প্রতীপাদক ও প্রথম অঙ্ক। এই অঙ্কের অভিনয়—প্রথম আনন্দ পরে দুঃখ—ইহাতেই এ অঙ্কের পরিসমাপ্তি—ত্রয়োতান বাদনের পর পটোভোলন ক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয়—এইরূপে পঞ্চাশ নাটকখানির অভিনয় শেষ হইয়া যায়। কত কে কি কি সাজিয়া এল—আমিও ‘আমিও’ মাখিয়া সেগুলির মধ্যে ‘সেটি’কে ধরিতে

গেলাম, বা—আপন হারা হইয়া সব ভুল। সকলেই সাক্ষরে গিয়া সাক্ষ থুলিয়া ফেলিয়াছে, কাহাকেও আর চিনিতে পারিলাম না—আমি এখন যে একা—সেই একা! সেই পঞ্চাঙ্গ নাটকের পরিচয় পত্রিকা (programme) বানি দেখিলাম—দেখি ক্ষতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতেই পঞ্চাঙ্গ নাটক—সকলে নাম রাখিয়াছে। কিন্তু কেহ প্রত্যক্ষ নাই, শেষে পঞ্চভূত তাহাদের উৎপত্তির কোলেই নিবৃত্তি লাভ—শেষে মাটি পর্যন্ত নাই—শূন্য! তাহ'লে কেমন করিয়া জানিব 'সেটি কি'?

তাই ত, আমারই ত ভুল! যুগরূপী আমি, আগার নাভি মধ্যে কস্তুরিকা, তাহার গন্ধ 'সেটি' আমি কিন্তু সেই গন্ধে আশ্বহারা হইয়া 'সেটি' কোথায় বলিয়া ছুটাছুটি করিতেছি, এখন দেখিতেছি 'সেটি কি'—সেটি কি যুগ-নাভি—যার গন্ধে বহুদিন গৃহ সুরভিত রহিয়াছে। কি যে দেখিলাম সেটি?—ভক্তিতে পাঁচ বৎসরের ছেলে জীব, প্রজ্ঞাদ কিসে, 'সেটি কি' জানিয়াছিল? ভক্তিতে—বা বা, তাহাকে জানা বা ধরা এত সহজ? সে এত নিকটে আছে! আমি ত্রিলোক ঘুরিতেছি—এ ও তা কত পড়িতেছি—কত লোকের কত বক্তৃতা শুনিতেছি—তাই ত বিবেকের কোলে ভক্তি—ভক্তিতেই ভক্তির ধন ভক্তাধীন সেটি! হলামই বা আমি সীমান্তজীবন, সংসারাবদ্ধ ও মায়াদৃষ্টি-সম্পন্ন—ধাক্ক সর্ব আমাতেই ধাক্ক। আমি আমার মনের মত তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেই তখন আমি অনন্ত জীবন সংসারযুক্ত, যারামূল্য হইব। তখন সেটি আমার হৃদয়ে 'সেটি কি'

প্রকাশিত হইবে—আপনার নাভিকূণে যুগমুদ্র পাইয়া যুগ আর কোথা কোথা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে না। সনকাদি ঋষিগণ, নারদাদি তত্ত্বরন্দ, রাঘব, পাণ্ডব, ভীষ্মাদি কৰ্ম্মিগণ, জীব, প্রজ্ঞাদ শিশুপ্রাণ সেই ভক্তিকে ধরিয়া সংসারে থাকিয়াও আপনহারা হন নাই, হৃদয়স্থ 'সেটি কি' জানিতে পারিয়া, মর হইয়া অমরত্ব লাভে অনন্ত জীবন পাইয়াছেন। এখন কুহেলিকা তিমিরের মধ্য দিয়া সূর্য্যের আভা দেখিয়া বুঝিহু—'সেটি কি'? মানব চক্ষে এ তিমির কাটে না; আবছায়ার জায় একটু ধাক্কিয়া যায়, ইহার মধ্য দিয়া পূর্ণদর্শন না হইলেও, জানা যায়—'সেটি কি'। পূর্ণদর্শন মৃত্যুর পর শালোক্যাদি ঋক্তির পূর্বে অথবা ভক্তির পর-পারে যাওয়ার পর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন বুঝিহু 'সেটি কি'। সেটি অনন্ত মহাপুরুষ—সর্বব্যাপী, সর্বদর্শী, সর্বকালজ জীবের হৃদয়স্থ সচ্চিদানন্দ ভূমাপুরুষ। তাহা এই সান্ত-জীবনের অন্তরূপই সান্তরূপ। অনন্ত হইয়াও সান্তরূপে পরিপুষ্ট; কেন না, সান্ত-জীবনে অনন্তের জ্যোতিঃ দেখা বা সহ করা যায় না। তাই আমরা চতুর্মুখ বা দেবগৃহে যাইয়া তাহার সান্তরূপ দর্শন আশ্বহারা হইয়া উঠি; তখন সেইগুলির মধ্যে একটিকে হৃদয়ে ধরিতে পারিলে, ঠিক বুঝিতে পারি—'সেটি কি'; কিন্তু পাঁচটিকে ধরিতে যাই বলিয়া আমাদের এই দুর্দশা—'সেটি কি', তাহা জানিবার পূর্ণ অতাব। এখন বুঝিলে—'সেটি কি'। জান-কৰ্ম্মযোগে ঐরূপ সাদৃশ্য ভক্তি মাধ—জানকৰ্ম্ম দূরে বাইবে; জান না—যে অগ্নিতে অগ্নি জ্বলে

নূতনটি প্রস্ফলিত হইলেই পূর্বের অর্থাৎ আদি-  
টির আর প্রয়োজন হয় না, ক্রমে তাহার সব্বাও  
থাকে না। তবেই পুরাতন জ্ঞান-কর্ম ছাড়িয়া  
তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন সাধিক তন্ত্রির বলে  
দেখিতে পাইবে—‘সেটি কি’? তখন শুনিতে  
পাইবে—তোমার ‘সেটি’ বলিতেছে—

“যে তু ধর্ম্মমুতমিদং যথোক্তং পূর্ণ্যাপাসতে ।

শ্রদ্ধাদাদা মৎপরমা তক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া ॥”

(গীতা—১২শ অঃ, ২০ শ্লোকঃ)

কিন্তু তাহা শুনা, বুঝা, ধরা বড় সহজ, আবার  
বড় শক্ত, আবার বড় কঠোর। এক দেহে  
স্থিতি-স্থিতি-ক্ষয়, সব-রজঃ-তমঃ—তাহাতেই  
সেই তক্তি, সেই শান্তি। ঐ শুন ‘সেটি’  
বলিতেছে—

“প্রয়োহি জ্ঞানমত্যাগ জ্ঞানাক্যানং

বিশিষ্টতে ।

ধান্যং কর্ম্মফলত্যাগ ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম ॥”

(গীতা—১২।১২)

এখন বল দেখি ‘সেটি কি’ এবং সুখ ও  
শান্তি কেমন জিনিস।

ঐশ্বর্য্যাবনচন্দ্র সেন ।

## শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যাতুল। কি ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে?  
বৈক্য। (যাতুলের পাখের আসনেই বৈদ্য-  
ভিক্ত পণ্ডিত উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি আবার  
উত্তর দাড়াই হইলেন) শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্বদিন সংবৎসর  
করিয়া দানাদি সমাপন করতঃ শ্রাদ্ধ করিতে

বসিবেন। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ  
সংযম এবং পবিত্রতার সহিত শ্রাদ্ধপূর্বক  
কার্য্যে ব্রতী হইবেন। শুদ্ধাচারে না থাকিলে  
মন উদ্বিগ্ন, ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত থাকিলে মন্ত্র ঠিক  
উচ্চারিত হইবে না, মৃত ব্যক্তির চিন্তার বল  
রহিবে না। শ্রাদ্ধ সময়ে অল্প কথা কহিতে  
নাই, অশ্রুপাত করিতে নিষেধ আছে। শ্রাদ্ধ-  
কর্ত্তা যদি শ্রাদ্ধকালে অশ্রুপাত করেন, তবে  
প্রেত ব্যক্তিকে অবশ্য হইয়া তাহাকে ভোজন  
করিতে হয়। মুণ্ডিত-শিরঃ পবিত্র বসন-পরি-  
ধারী যজমান একমুনে পিতৃগণের আবাহন মন্ত্র  
পড়িবেন যথা—

আয়াস্ত নঃ পিতরোহুয়িষ্মাস্তাঃ পার্শ্বে বসানঃ ।  
অগ্নিন্যজ্ঞে স্বধা মম্বস্তোহযিক্রবস্ত তেবেস্তায়ান্ ॥

অনন্যমনে সম্বস্তক চিন্তার ফলে দেহে  
একটা শান্ত কোমল তড়িতের সঞ্চার হয়।  
যাহাতে তড়িতের কার্য্য সম্বর হয়, তাহার যথা-  
যোগ্য ব্যবস্থাও আছে। কুশ তড়িৎ-আকর্ষণের  
পক্ষে অব্যর্থ উপায়। শ্রাদ্ধে কুশাদুরী ব্যবহার,  
কুশ-ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করণ, কুশ দ্বারা জলসেচন,  
কুশোপরি পিণ্ডদান ব্যবস্থিত দেখিতে পাওয়া  
যায়। মৃৎপাত্র তড়িৎ উৎপত্তির নিবারণ বলিয়া  
শ্রাদ্ধে একেবারে অব্যবহার্য্য। কলার খোলার  
পরিবর্ত্তে কদলী পত্র ব্যবহার প্রশস্ত নহে।  
ভিল, দুধ, পায়স, রসতা, তণ্ডুল, গব্যঘৃত,  
দধি, যক্ষু, স্থলবিশেষে মৎস্য ও মাংস শ্রাদ্ধের  
উপকরণ। ফল মূল বিস্তৃত মিষ্টান্নাদিও শ্রাদ্ধে  
হয়। যাহাদের প্রকৃতই শক্তি নাই তাহারা  
ব্যতীত অপরের পক্ষে বজ্রের অভাবে গামছা  
দান দোষের। বজ্রের কার্য্য গামছা দ্বারা হয়

না। পিতৃগণ গামছা পরিয়া আছেন—ইহা কি সন্তান চাহিবেন? আপনাকে গামছা পরাইয়া লোকসমাজে বাহির করান যায় কি? পুরোহিতকে কীকি দিতে যাইয়া আপনাকেই পিতৃপুরুষকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেই কীকি দেওয়া হয় না কি?

কাহাকে আবাহন করিতে হইলে নাম ধরিয়া আহ্বান করাই বিধেয়। রাশি নক্ষত্র ধরিয়া যে রাশি নাম সেই নামই শ্রাদ্ধের নাম। পিতা, মাতা, পিতামহাদির পবিত্র নামোচ্চারণ সেই নামেই করিতে হয়। এ নাম লওয়ায়, নাম ধরিয়া ষাণ্মাদি নিবেদন করার কতই সুখ জন্মে, সন্তানোচিত ভক্তির ভাব ইহাতে বেশ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

মাতুল। শ্রাদ্ধে প্রতিনিধি দেওয়া কি উচিত?

বৈদান্তিক। শ্রাদ্ধে প্রতিনিধি দেওয়া বিধেয় নহে। বুদ্ধি-শাস্ত্রে প্রতিনিধি দেওয়ার ব্যবস্থা দেখা যায়। আর শ্রাদ্ধকর্তা প্রকৃত অক্ষম হইলে প্রতিনিধির ব্যবস্থা চলিতে পারে, কোন কোন স্থানে একেবারেই চলে না। এ সম্বন্ধে স্থানীয় স্বর্গ পণ্ডিত মহাশয়গণের ব্যবস্থাসুসারে চলিতে হইবে। উপবাসাদি তুচ্ছ কষ্টের জন্য বা সামান্য দুই একটা রুখা কার্ঘ্যের ছলে অনেকে পুরোহিতের উপরই শ্রাদ্ধের ভার দিয়া দেন; ইহা লজ্জাকর নয় কি? সন্তান বহুতে পিতৃপুরুষকে আহ্বান করিবে, অন্ন দিবে—ইহা কি ভাল কার্য নহে? ইহা কি আনন্দের, তৃপ্তির নহে?

মাতুল। শ্রাদ্ধকর্তার বেশভূষার বৈচিত্র্য কেন?

বৈদান্তিক। পিতৃপুরুষগণকে অন্ন দিবার সময় বিলাসী সাজিয়া ত দেওয়া চলে না বা অপবিত্র মলিন বস্ত্র পরিয়া দেওয়া উচিত নহে। আশ্রাদ্ধেই বেশভূষার বিশেষ বৈচিত্র্য। শ্রাদ্ধকর্তার যুগ্মতাম্র, তৈলহীন কৃষ্ণ অঙ্গ, অনাকৃত চরণ, আর কঙ্কশোভিত গলদেশ যেরূপ শোক, দৈন্ত ও সন্তানোচিত ধর্মের অভিব্যক্তি করে, পাশ্চাত্যদেশে ব্যবস্থিত কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ সেরূপ করে কি? পতিহীনা বিধবা বধন চিকুর জাল কাটিয়া, অলঙ্কারগুলি খুলিয়া, হাত ধালি করিয়া শুভ্রবস্ত্রে বাহির হন, তখন সে মুক্তি দেবীভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে না কি? পুরুষের কামনা-পঙ্কিল দৃষ্টি সে পবিত্র তপস্বিনী শাদ্ধ দেখিয়া ভক্তিতে নত, লজ্জায় কুণ্ঠিত, দৈন্তে ব্যথিত ও গৌরবে বিনীত হইয়া পড়ে না কি?

মাতুল। গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত কেন?

বৈদান্তিক। গয়াসুর ভগবানের নিকট বর লাভ করে, তাই গয়ার শ্রাদ্ধ প্রশস্ত—হানি নাহাছে! আমাদের শ্রাদ্ধ বধন শাস্ত্রে প্রশস্ত বলিয়া লিখিত আছে, তখন আমরা যুক্তি ধারী বুঝাইতে না পারিলেও বুঝিতে হইবে প্রশস্ত। শ্রাদ্ধ গঙ্গার তীরেই সাধারণতঃ প্রশস্ত। গঙ্গার বারি যে সকল প্রকার বারি অপেক্ষা গুণে শ্রেষ্ঠ ইহা এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, গঙ্গায়ুক্তিকার গুণ যে অসামান্য তাহা এক্ষণে জনসমাজে স্বীকৃত হইতেছে। শ্রাদ্ধ ও পিতৃদান জন্য গয়াক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠতা। “এইব্যাবহবঃ পুত্রো বয়োহ্যেকোহপি গয়াঃ ত্রয়েৎ” বৃহস্পতি ঋষির— যদি তাহাদিগের মধ্যে একজনও গয়াক্ষেত্রে



গমন করিয়া শ্রদ্ধা করে, তখন ত আর বাস্পীয়-  
যান ছিল না যে, মনে করিলেই দিনে দিনে  
বাওয়া হইবে । গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান  
করিলে মৃত ব্যক্তি প্রেতাবস্থা হইতে উদ্ধার  
পায়, ভূতযোনি হইতে অব্যাহতি লাভ করে,  
বড়ট। সত্ত্বর তাহার উপকার সাধিত হয় । কর্ণ-  
কল সহজে ষণ্ডনীয় নহে বলিয়া একেবারেই  
নির্করণ মুক্তি লাভ ঘটে, কিংবা অনন্তকালের  
জন্ত ত্রীভগবৎ সাযুজ্য লাভ হয়—ইহা  
আমরা বলিতে পারি না। তবে একের  
শক্তি যখন অপরে সঞ্চারিত হয়, যাতার প্রাণ-  
ভরা ডাক যখন ভগবানের চরণে পৌছিয়া  
সন্তানের রোগ আরোগ্য করে, তখন সন্তানের  
শ্রদ্ধা-ভক্তির গুণে, মনঃ-শক্তির বলে, পুণ্যের  
জোরে পিতৃগণের উদ্ধার হইতে না পারার  
কারণ নাই। অপবাতে মৃত্যু হইলে প্রেত-  
শিলার পিণ্ড দিতে হয়। আত্মহত্যাকারীরও  
কেহ কেহ প্রেতশিলার পিণ্ডও দিয়া আসেন।

যাতুল। আত্মঘাতীর পক্ষে ব্যবস্থা কি ?

বৈদান্তিক। আমাদের প্রাচীন কোন কোন  
সংহিতাগ্রন্থে আত্মহত্যাকারীর জন্য নারায়ণ  
বলি ও বর্ণিবধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে।  
তাহা না করিলে সন্তানের প্রত্যবায় নাই, তবে  
ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ  
শাস্ত্রকারেরা আত্মঘাতীর দাহ, শ্রদ্ধা নিষেধই  
করিয়া গিয়াছেন। ব্যবস্থাপক রঘুনন্দন ত  
আত্মঘাতীর দাহ ও শ্রদ্ধার একেবারেই ব্যবস্থা  
দেন নাই। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ  
করিয়াছেন যে, আত্মঘাতীর জন্ত যদি কেহ  
অনুতাপ করে, রোদিন করে, তবে সেও প্রায়-

শ্চিত্তাহ। আত্মঘাতীকে আত্মীয় স্বজনকে  
স্পর্শ করিবে না, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।  
মুকোফরাসে পায়ে দড়ি বাধিয়া, রাস্তার উপর  
দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। উঃ কি ভীষণ  
দণ্ড! যে জোর করিয়া নিজের প্রাণ নষ্ট  
করিতে চেষ্টা করে, বর্তমান আইনে তাহার  
দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। বলপূর্বক নিজের প্রাণ  
যে নষ্ট করে, সেই পাপী ব্যক্তি সেই ঠোকেই  
মৃত্যুর পর অবস্থিত করিয়া থাকে, তবে বহুকাল  
পরে অবশ্য একদিন না একদিন কল্লাস্তরে পুন-  
রায় জন্মগ্রহণ করিবে। পরের মঙ্গলেচ্ছায়,  
ধর্মের জন্য যে প্রাণ দেয়, সে আত্মঘাতী নহে।  
শাস্ত্রীয় হোমানলে প্রাণ-বিসর্জন, তুষানল প্রায়-  
শ্চিত্ত কিংবা সহমরণ প্রভৃতি আত্মরলিও আত্ম-  
বিসর্জন। ইহা আত্মহত্যা ত নহেই, উপরন্তু  
পুণ্যকার্য।

যাতুল। প্রেতগণ শ্রদ্ধাশূন্য কি আগমন  
করেন ?

বৈদান্তিক। যাহারা “কোথায় দেহ,  
কোথায় দেহ” করিয়া ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ  
করে, তাহারা আত্মন বা না আত্মন শ্রদ্ধার  
দ্বারা তাঁহাদের ত সংস্কারমূলক ভোজন সমাপন  
ঘটে আর শাস্ত্রে বলে “কর্ষণা পিতৃলোকঃ”  
সকাম শাস্ত্রীয় পুণ্যকার্যকারী ব্যক্তিগণ ধূমধান  
মার্গে যাইয়া পিতৃলোকে বাস করেন, আবার  
যথাসময়ে মর্ত্যে আসিয়া জন্ম লন। এই পিতৃ-  
লোকে যাহারা যুগ পরিমিত কাল অবস্থানে  
অধিকারী হন, তাহারা পিতৃদেবতা। পিতৃগণের  
দেহও বায়বীয়, তবে তাঁহাদের পক্ষে সঙ্কর-  
মূলক দেহ ধারণ কতকটা আরম্ভের মধ্যে।

আধ্যাত্মিক শক্তিতে অন্তরীকৃত্ব লিঙ্গদেহীকে আনয়ন করা অসম্ভব নহে । যোগসাধনা ব্যতিরেকে বিনা মন্ত্র সাহায্যে কেবলমাত্র ইচ্ছা-শক্তির বলে পাশ্চাত্য মনোবিগণ অনর্থক কষ্ট দিয়া মৃত ব্যক্তিকে আনয়ন করিতে পারিতেছেন, আর আমরা ভক্তিপূর্বক মন্ত্রশক্তি সহকৃত ইচ্ছাশক্তির বলে সন্তুখে ঋণ্য দ্রব্য রাখিয়া আনিতে পারিব না—ইহা কি সম্ভব ? মাত্র কোতুহল তৃপ্তির জন্য মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়া আনয়ন করা অবশ্য অনায়াস । শ্রাদ্ধে দ্রব্য দিতেছি, পিতৃগণ পাইতেছেন—ইহা ভাবিয়া কি সন্তানের কম তৃপ্তি ? ভক্তির টানে ভগবান নামেন আর পিতৃপুরুষগণ নামিবেন আশ্চর্য্য কি ? সংস্কারের মাহাত্ম্য এমনই যে, শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলেই পিতৃপুরুষগণ সন্তানপ্রদত্ত অন্ন-জলের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত থাকেন, ইচ্ছাশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও তড়িৎ শক্তির বলে অন্তরীকৃত্ব লিঙ্গ দেহীগণ বায়ুভূত হইয়া মনোগতিতে শ্রাদ্ধস্থলে আসেন কিনা, শ্রাদ্ধার দৃষ্টি করিয়া সংস্কারমূলক ভোজন সমাধা করিয়া তৃপ্ত হইলেন কি না—আমাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই । তবে আমরা যদি সেরূপ পুত্ৰ সন্তানবিশিষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তিমুত হই। তবে হয়ত বুঝিতে পারিতাম । কেহ যেন ভাবিবেন না যে, শ্রাদ্ধার গিলিয়া ষাইবার জন্য আমরা ভূতবোণিকে আহ্বান করি ।

• মাতুল । শ্রাদ্ধ ত বৈদিক কার্য্য । উহা কি বজ্জ ?

বৈদান্তিক । বজ্জ অনেক প্রকার । এক্ষণে বড় বড় বজ্জ হইবে না, হওয়ার সুবিধাও নাই ।

আর সম্ভবও নহে । শ্রাদ্ধ পিতৃবজ্জ । সন্তানের পক্ষে সকল বজ্জ অপেক্ষা পিতৃবজ্জই বড় । শ্রাদ্ধ-তর্পণ পিতৃবজ্জ । দেবকার্য্য হইতে সন্তানের নিকট পিতৃকার্য্য শ্রেষ্ঠ ।

"দেবকার্য্যায় পিতৃকার্য্যায় বিশেষাভে" । তাহা হইলে আপনারা সকলে দেখুন, শ্রাদ্ধ উপকারক কি না ? কষ্টকর রোগ-যাতনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য লোকে চিকিৎসকের শরণ লয় । রোগ সারক, আর না সারক, তথাপি চিকিৎসা ত বিশেষ । এই শ্রাদ্ধাদিও তজ্জগৎ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা । নরকস্থ জীবের নরক যন্ত্রণার যদি কিছু উপসম পায়, লিঙ্গদেহীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জ্বলিত কষ্ট যদি কিছু দূর হয়, কষ্টকর ভূতবোণি হইতে যদি অব্যাহতি লাভ ঘটে, মৃত আত্মার পারলৌকিক কোন প্রকার উপকার যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ কতই না উপকারক হইল ?

মাতুল । শ্রাদ্ধে গবীদান খুবই প্রশস্ত কেমন ?

বৈদান্তিক । গবীদান ব্যতীত বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ত হয়ই না । উপরন্তু গবীদানের প্রশংসা আর কি করিব ? পূর্বে এক বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের জন্যই ভারতে গোজাতি রক্ষা পাইত । বৃষোৎসর্গে চিহ্নিত করিয়া বৃষ ছাড়িয়া দৈওয়া হইত । এই চিহ্নিত বৃষকে ধর্ম্মের বাঁড় বলিত । ধর্ম্মের বাঁড় সাধারণ সম্পত্তি । সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া যে কেহ তাহাকে হলকার্য্যে লাগাইবে, দামড়া করিয়া গইবে, কিংবা হত্যা করিবে তাহার বো

ছিল না। তাহার উপর বড় বড় ষাট আছে—  
 উহার সাধারণ সম্পত্তি। তাহা বলিয়া কেহ  
 যদি উহা নষ্ট করে, উহার কোন ক্ষতি করে,  
 রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন না? কিন্তু  
 আমাদের উচ্চ বিচারালয়ের বিচার-  
 পতিরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ সাধারণ  
 সম্পত্তিকে কেহ যদি দামড়া করে, হত্যা করে,  
 তাহার দণ্ড হইবে না। বলা বাহুল্য, বিচারক  
 এমনদীর নন। গবী ও ভূমিই ভারতের প্রধান  
 সম্পত্তি। শ্রাদ্ধে গবী ও ভূমি দান  
 আবশ্যক। লোকে এক্ষণে চারি আনা  
 দিয়া ভূমিদানের কর্তব্য শেষ করেন। ভাড়া  
 করিয়া কেথিও কোথাও গবীদান নির্বাহিত  
 হইয়া থাকে। ধর্মের বাঁড়ই আমাদের  
 যোজ্ঞাত্মির রক্ষক। এক্ষণে ধর্মের বাঁড়  
 বাহাতে রক্ষা পায়, তজ্জন্ত দুই এক জন মহাত্মা  
 তত্ত্বনিয়াছি চেষ্টা করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-সভা একত্রে  
 এক আবেদন নাকি মহামাত্ত গভর্ণমেন্টের  
 নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন—কিন্তু ফলে কি  
 হইল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

পিতৃগণ-উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক যাহা দেওয়া  
 যায়, তাহাই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের সার্বভৌমিক  
 অর্থে শ্রদ্ধাদত্ত যে কোন দ্রব্যই শ্রাদ্ধ। বালির  
 পিণ্ডও শ্রাদ্ধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের  
 দিন মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভগবানের নিকট  
 আত্মল প্রার্থনাও এক প্রকার শ্রাদ্ধ।

এমন সময়ে শ্রাদ্ধকর্তা করযোড়ে পণ্ডিতগণ  
 সকাশে নিবেদন জানাইলেন যে, সকলকে  
 গাত্ৰোখান করিতে হইবে। তখন একে একে  
 সকলেই উঠিলেন। বলা বাহুল্য, বহুক্ষণ

বিচারের ফলে সকলের ক্ষুধা বোধও বিলক্ষণ  
 হইয়াছিল। বিচার-সভা শেষ হইল।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

## বসন্ত-চিত্তা ।

শীত ঋতুর অবসানে অনেক রক্ষকে মৃত-  
 প্রাণ নির্জীব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের  
 পত্র সকল ঝলিত হইয়া পড়িয়া যায়, তখন  
 তাহাদের শাখা-প্রশাখা সকলকে সহজেই শুক  
 বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে আর সুন্দর পুষ্প  
 ফুটে না, সুমিষ্ট ফলের লোভে আকৃষ্ট হইয়া  
 পাখীসকল তথায় আসিয়া তখন আর মধুর  
 সঙ্গীত করে না, আতপতাপে ক্রিষ্ট হইয়া  
 পথিকগণ বিশ্রামার্থ আর তাহাদের ছায়ার  
 উপবেশন করে না, তখন তাহাদের দিকে  
 দৃষ্টিপাত করিলে মনে কোনও আনন্দের উদয়  
 হয় না, কিন্তু কিছুদিন পরে সুমধুর বসন্তকাল  
 আসিল, অমনি শুক কাঠবৎ সেই শাখা-প্রশাখা  
 ভেদ করিয়া সুকোমল নবীন পল্লব সকল  
 বিকসিত হইল। সুগন্ধপূর্ণ মধুর সৌরভ চারি-  
 দিকে বহিতে লাগিল, পাখীসকল কাঁকে  
 কাঁকে উড়িয়া আসিয়া সেই সকল শাখায়  
 আবার উপবেশন করিল এবং সুপক ফলাহার  
 করিয়া আনন্দে মনোহর গান গাহিতে লাগিল,  
 পথিকগণ দলে দলে আসিয়া সেই অশ্রীতল ছায়ার  
 উন্নীত হইল এবং গ্রীষ্মের প্রথম উত্তাপ নিবা-  
 রণ করিয়া বিশ্রাম স্থ ভোগ করিতে লাগিল।  
 শুক মনে করিয়া যে সকল বৃক্ষদিগের প্রতি কেহ  
 দৃষ্টিপাত করে নাই, এখন তাহার কেমন সুন্দর

শোভা হইয়াছে, এখন সে নব পল্লব-বসনে  
বীর্য শরীর আকৃত করিয়া উজ্জ্বল কুমুদের  
যুক্ট শিরে ধারণ করিয়াছে । কে এই শুষ্কে  
সরস করিল, কে এই যুতকে সজীবিত করিল ?  
কাহার প্রসাদে এই মধুর বসন্তকাল আসিয়া  
অকোমল বায়ুস্পর্শে এই বৃক্ষসকলকে বাঁচাইয়া  
নব জীবন দান করিল ?

বাঁহার রূপায় শুষ্ক তরুসকল যুগ্মরিত হই-  
তেছে, পক্ষীর পাখা হইতে পালক খসিয়া  
পড়িলে বাঁহার করুণা আসিয়া তাহাকে আবার  
নবীন উজ্জ্বল পক্ষ-ভূষণে অলঙ্কৃত করিতেছে,  
সেই করুণাময় কি তাহার সৃষ্ট অভিনব মানব  
সন্তানদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছেন—ইহা কি  
কখনও সম্ভব ? পাপের গর্ভে পড়িয়া তাহার  
চিরদিন হাহাকার করিবে, কুসংস্কার-জালে জড়িত  
হইয়া তাঁহা হইতে দূরে বাস করিবে, তিনি  
তাঁহাদের হুঃখ দেখিবেন না, তাঁহার করুণা  
আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে না—ইহা  
কখনই সম্ভবপর নহে । এই মানব জীবনের  
মধ্যে প্রতিনিয়তই তাঁহার করুণার পরিচয়  
পাওয়া যায় ।

সংসারাসক্তির দাস হইয়া মানুষ যখন  
ধর্মহীন জীবন যাপন করে, জন্মের উচ্চ বৃত্তি  
সকলকে স্বার্থপরতার ও পাপ প্রবৃত্তির অধীন  
করিয়া ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার মধ্যে ডুবিয়া থাকে,  
তখন তাহার জীবন গলিতপত্র বৃক্ষের ন্যায় শুষ্ক  
ও নির্জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয় । তখন সে  
জীবনের কোন শোভা কেহ দেখিতে পায় না,  
তাঁহার সদ্গুণরাশির সৌরভ চারিদিকে  
বিকীর্ণ হইয়া কাহারও চিত্ত হরণ করে না,

তাঁহার প্রেমের মধুরতা আশ্বাসন করিয়া  
কাহারও প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাঁহার  
পবিত্র সহবাসে থাকিয়া পাপের উত্তাপ  
নিবারণ করিতে পারিবে—এ আশায় তাঁহার  
নিকট কেহই শীতল হইতে আসে না, সে  
জীবনে কোনও বিশেষত্ব কেহ দেখিতে পায়  
না । আহার নিদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তির  
অনুগত হইয়া যে পশুবৎ জীবনযাপন করে,  
তাঁহার কোনও উচ্চ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে  
তাঁহা দেখিয়া কেহই সেরূপ বোধ করিতে  
পারে না, সংসারের মধ্যে এরূপ অসংখ্য জীবন  
দৃষ্ট হইবে—যাহা দেখিয়া মানব-জীবনের  
কোনও মহত্ত্ব আছে, ইহা অনুভব করিতে পারা  
যায় না । সংসারের বাঁতাসে তাঁহা ভয়ানক  
ভাবে বিরূত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এই নিস্তেজ  
শুষ্কপ্রায় মানব জীবন যদি একবার ধর্মের  
সংস্পর্শে আসে, সত্যের একটু আভাস যদি  
তাঁহার উপর অঙ্কিত হইয়া যায়, ঈশ্বরের জ্ঞান,  
প্রেম বা পবিত্রতার অতি অল্প মাত্রাও যদি  
তাঁহার উপর পতিত হয়, তবে বসন্ত-সমীরণ  
স্পর্শে যেমন শুষ্ক বৃক্ষ সকল নবদেহ ধারণ করে,  
সেই মানবজীবনও সেইরূপ নবভাবে পরিবর্তিত  
হইয়া যায় । পুরাতন পাপ-তাপ-মলিনতা  
কোথায় চলিয়া যায়, স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা  
প্রভৃতি সন্ধীর্ণ ভাব সকল শিথিল হইয়া পড়ে,  
অহংকার-আত্মাভিমান, ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা,  
হৃদমনীয় রিপুহুলের কঠোরতা কোথায় পলায়ন  
করে । তখন সে জীবন কেমন সৌন্দর্য্যে বিভূ-  
ষিত হয়, যেখানে জ্ঞান ছিল না—সেখানে জ্ঞান  
রাশি প্রকাশিত হয়, পাপের অন্ধকার প্রাণ

রাজত্ব করিতেছিল, পুণ্য-পবিত্রতার জ্যোতি আলিয়া সেই স্থান আলোকিত করিতে থাকে, বোর স্বর্ধপরতা ও বিশ্বাসক্তি যাহার স্বর্ধত্ব ছিল, তাহার মধ্য দিয়া প্রবল প্রেমের বস্ত্র প্রবাহিত হয়, পূর্বে যাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিত না, এখন জীবনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখিয়া সকলের চক্ষু সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। সেই ব্যক্তির জীবনে কে এই আশ্চর্য্য পরিবর্তন করিল, এই নিশ্চেষ্ট মৃত-প্রায়কে কে নবজীবন প্রদান করিল? কাহার প্রভাবে এই অসার্য্যকর্য্য জীবন এইরূপ সম্ভব সুন্দর ভাব ধারণ করিল? সম্ভবতঃ সেই সত্য স্বরূপের—সত্য ভাবের বাতাস একবার মাত্র এই জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাই এই শুক জীবন যুহুলিত, যুগ্মিত হইল। সেই প্রেমময়ের প্রেমের ক্ষুদ্র এক কণিকা শিশিরবিন্দুর ছায় এই জীবনের উপর পতিত হইয়াছিল, তাই অমনি ইহা হইতে কত সঙ্গুণ রাশি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। ধর্ম-জগতের ইতিহাস চিরকালই ইহার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে, এখন যাহা-দিগকে সাধু মহাজন বলিয়া সংসারের লোক সকল প্রকার চক্ষে দেখিতেছেন, যাহাদের জীবনের সঙ্গুণ সকল আলোচনা করিয়া কত লোকের হৃদয় ধর্মভাবে পরিপূর্ণ হইতেছে, তাহাদের পূর্ব জীবনের বিষয় যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তাহারা কোনকালে তখন সাধারণ লোকের মত সামান্য সামান্যিক : কারোই লিঙ্গ থাকিয়া কেবল অধোপার্জনই জীবনের সার মুখ বলিয়া

মনে করিতেন, কেহ বা ইচ্ছার দ্বাস বোর পশ্চাত্তরীর ছায় পাপের গভীর পক্ষে একেবারে হৃদয় মগ ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। জীবনের কোন উচ্চতর লক্ষ্য যে আছে তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারিতেন না, জগতের লোকে তখন তাহাদিগকে কতই ঘৃণা করিতেন কিন্তু যখন একটু ধর্মভাব তাহাদিগের প্রাণকে স্পর্শ করিল, স্পর্শমণি স্পর্শে মোহ যেরূপ স্বর্ণ হইয়া যায়, সেই ভাবে তাহাদের শুক মলিন জীবন তখন সুন্দর পবিত্র হইয়া পড়িল, লোকে দেখিয়া মনে করিল—এ ব্যক্তি বুঝিবা সে ব্যক্তি নয়, জীবনে যেন যুগান্ত প্রলম্ব উপস্থিত হইয়াছে। যিনি বোর কুসংস্কারাগ্নি ছিলেন, এখন তাহার নিকটে বাসিয়া কত লোক ধর্মশিক্ষা করিতেছে, তাহার উপদেশে কত লোকের বোর সংশয় ভঞ্জন হইয়া যাইতেছে। যিনি স্বর্ধপর অবিবাসপরায়াণ ছিলেন, প্রেমের প্রভাবে তাহার হৃদয় এখন উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। কয়েক জন আত্মীয় পরিবারের মধ্যে যাহার প্রাণ আবদ্ধ ছিল, এখন তিনি সকলকেই আপনায় মনে করিয়া বাহ প্রসারণ পূর্বক আলিঙ্গন করিতে আগ্রস হইয়াছেন, যাহার জীবনের কলঙ্কে গৃহ পরিবার কলঙ্কিত হইয়াছিল, পাপের পুতি গন্ধে সমাজের নৈতিক বায়ু দূষিত হইয়াছিল, এখন তাহার পুণ্যের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া কত লোক দেবভুল্য জ্ঞানে তাহাকে নমস্কার করিতেছে, তাহার পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া কত ব্যক্তির ঘৃণিত চরিত্রের পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে।

তখন তাহাদিগের পূর্ব জীবনের পাপ, মলিনতা, স্বার্থের ভাব সংসারাসক্তি চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বস্তু সকল নব-পল্লব ও সুন্দর পুষ্পে শোভিত হইয়া যেমন উদ্ভানকে আলোকিত করে, সেইরূপ তাহারা দেহ ও জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার সৌন্দর্য সংসারীর অন্ধকারময় জীবনকে আলোকিত করিল। লোকে যখন তাহাদের জীবনের এই সকল আশ্চর্য্য ভাব দেখিতে পাইল, তখন তাহারা সেই জীবনকে কোন দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না, এইরূপে মানব যখন ঈশ্বর-প্রেমকে আশ্রয় করে, তখনই তাহার জীবনের প্রভাব ভাষাচ্ছাদিত অগ্নির ছায়া কোন না কোন রূপে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্বার্থের উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিতে না পারিলে, পরমেশ্বরকে সত্য বলিয়া আশ্রয় করিতে না পারিলে মানুষের পশুত্ব ঘুচিবে না। তাহার জীবনের কোনও মহত্ব লক্ষিত হইবে না, আর জগতের গোকেও সে জীবনের কোনও বিশেষত্ব দেখিতে পাইবে না। সাধুগণও আমাদের মত সাধারণ মানুষ, কিন্তু তাহারা সেই বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারিয়া ছেন, যাঁহা ছুইলে মানবের পশুত্ব ঘুচিয়া যায়, পাপ চলিয়া যায়, বাসনার বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, রিপু কুলের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, যাঁহা পাইলে হৃদয়ে বিমল জ্ঞানের উদয় হয়, প্রাণের ভিতর মধুর প্রেম পবিত্রতা—আগ্রত হয়, শঙ্কত মুখ, আনন্দের প্রসবণ পুলিয়া যায় এবং জীবনের সমুখে এক অনন্ত উন্নতির ক্ষেত্র

প্রকাশিত হয়, তাই তাহাদিগকে দেখিয়া জগতের লোক মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বিনি সেই সত্য পুরুষকে সামান্য পরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি চিরতরে ধন্য হইয়া গিয়াছেন, তাহার জীবনের সদ্‌গুণের এবং নানা প্রকার হিতকর কার্যের দ্বারা জনসমাজ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু পূর্বে তাহার জীবন কি এমন সুন্দর ছিল? যে কার্য্যকারিণী শক্তির দ্বারা তিনি সমাজের এত হিতসাধন করিতেছেন, তখন কি তাহার এ শক্তি ছিল? তিনি যে কোন বিশেষ শক্তির অধীন, তখন কি তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন—কখনই না; স্পর্শমণির স্পর্শে তাহার জীবনে এ সকল বিচিত্র ভাব—অদ্বুত শক্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্ম শক্তিতে মানবকে কত দূর অগ্রসর করিয়া দেয়, সত্যের বলে জীবনের উন্নতির পথ কেমন পরিষ্কৃত হইয়া যায়, তাহা আমরা অনেক সাধুর জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াও ঘোর অবিশ্বাসী রহিয়াছি এবং সেই শক্তির উপর ভাল করিয়া নির্ভর করিতে পারিতেছি না। একমাত্র সত্যস্বরূপ ধর্ম্মকে স্পর্শ করিয়া জীবনের কল্পিত পরিবর্তন ঘটিল সাধুর জীবনে তাহা জানিতে পারিলাম কিন্তু সেই সত্যের আধারকে আমরা কায়মনে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পারিলাম না, যদি তাহার উপর জীবনের মূল ভিত্তি স্থাপন করিতে পারি, তবে না জানি আমাদের জীবনে কি অপূর্ব শক্তি, কি বিচিত্র ভাব আগিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না, সেই প্রেম পবিত্রতার উৎসকে স্পর্শ করিলে

নিশ্চয় আমরা নবজীবন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে জীবনের পাপ, তাপ, মলিনতা, কুপ্রবৃত্তি থাকে না; অহঙ্কার, আত্মাভিমান, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা চূর্ণ হইয়া যায়; পবিত্র তত্ত্বজ্ঞান আসিয়া জীবন-পথকে পরিষ্কৃত ও আলোকিত করে, প্রেম আসিয়া সকল কার্যকে মিষ্ট ও সরল করে, যে দুর্জয় রিপুকুলকে সহস্র চেষ্টায় জয় করিতে পারা যায় নাই, তখন দেখি যে, তাহার আপনা আপনি বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সেই সত্য স্বরূপকে ভাল করিয়া আশ্রয় করিতে হইবে, তাঁহাদের উপর একান্ত মনে নির্ভর করিতে হইবে, তবে তাঁহার দুর্জয় শক্তি, আবির্ভূত হইবে। পরমেশ্বর করুন এইরূপ বিশ্বাসের সহিত যেন আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারি এবং তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসন্ত-কালের নিরস তরুর মত সরস হইতে পারি।

শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ।

## প্রণয়-চিত্র

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

২। তিলোত্তমা—আমরা প্রথমে

যখন তিলোত্তমার সাক্ষাৎলাভ করি তখন তাঁহার প্রণয় প্রস্তুটোগ্রন্থী। তখনও ইহা প্রস্তুটুই হয় নাই। তাঁহার প্রণয়ের প্রথম উদ্দেশ্য-কেন্দ্রে সেই এক শিব-মন্দির। তিনি সহচরী সমভিব্যাহারে সেই শিব-মন্দিরে পূজার অস্ত গিয়াছেন, এমন সময়, ঘোরা নিশিধিনী আরও বিঘোরা হইয়া আসিল,

তীমা ঝটিকা আরও তীমা হইয়া বহিতে লাগিল, ক্রমশঃ বৃষ্টি-ধারা তীরবেগে তৃপ্তে পড়িতে আরম্ভ করিল, আর মাঝে মাঝে ক্রন্দনীরদমালা ভীষণ অশনিপাতে সমস্ত ভূমিখণ্ড স্কাপাইতে লাগিল। তিনি সন্নিবী মধ্য-বস্ত্রিনী হইয়া মন্দিরাত্যন্তরে ভয়াকুল চিন্তে অবস্থান করিতেছেন, উপায় কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় বিধাতৃ-বিধানে উপায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে উপায় আর কেহ নয় বীর-যুবক জগৎসিংহ। তিনি তিলোত্তমার ভর দূর করিলেন, বিপদে সহায় হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমুচিত প্রণয়-কলিকাকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিলেন।

তিলোত্তমার প্রণয়ে চিন্তা আছে—সে চিন্তার গভীরতা আছে। বাহু জগতের কোলাহল সেখানে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি নিজের নির্জন কক্ষে বসিয়া প্রণয়ীর কথা ভাবিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে নিমেষের মধ্যে চিন্তার অন্তলম্পর্শ গর্ভে নিমগ্ন হইলেন। বাহু জগতে কি হইতেছে, কে কি করিতেছে তিনি নিজেই কি করিতেছেন তাহার সংবাদ আর তাঁহার কাছে পৌছায় না। এইটা তিলোত্তমার প্রণয়ের নিজস্ব না হইলেও বিশিষ্টভাব বটে।

আয়েষার প্রণয়ে আশা নাই; কিন্তু তিলোত্তমার প্রণয়ে আশা আছে—সেই আশাই তাঁহার জীবনী-শক্তি। সেই আশার ক্রাস বুদ্ধির সহিত তাঁহার জীবনী-শক্তির ক্রাস বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন তিলোত্তমা

বীরাঙ্গ সিংহের দুর্গে, ততদিন তাঁহার প্রণয় পাত্র জগৎসিংহকে পাইবার তাঁহার আশা আছে, আর সেই আশাই তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তারপর পাঠান সৈন্ত সেই দুর্গ অধিকার করিল। তিলোত্তমা তাহাদিগের হস্তে বন্দি হইলেন। জগৎসিংহ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। জগৎসিংহকে পাইবার আশা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার জীবনী-শক্তিরও ক্রমশঃই অভাব হইতে লাগিল। অবশেষে, বহুদিন পরে তিনি একরূপ যত্ন-শয্যায় শয়ন করিলেন। পশ্চাৎ যখন অভিরাম স্বামীর পত্রের সাহায্যে জগৎসিংহ তিলোত্তমার সেই যত্ন-শয্যার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন জগৎসিংহকে পাইবার আশাও তাঁহার ফিরিয়া আসিল। তিনি ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন।

তিলোত্তমার এক প্রণয়ে ত্যাগ আছে বটে, কিন্তু তাহা আত্ম-ত্যাগ নহে—দেহ-ত্যাগ, তাই মনে হয় বুঝি, স্বার্থের সহিত মহারণে তিনি আয়েবার মত ভয়যুক্ত হইতে পারেন নাই। এ পরাভবের কারণ তাঁহার হৃদয় দৌর্বল্য। তিলোত্তমার এই হৃদয়-দৌর্বল্য আদরণীয় না হইলেও দুর্বল নহে, যেহেতু ইহা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। যুদ্ধ-বারিধির বিশাল তরঙ্গাভিঘাতে অদৃঢ়নিশ্চিতা তরলী ত ভঙ্গোন্মুখ হইবেই। গভীর নৈরাশ্রের ভীষণ তাড়নে জগচ্চরিত্রানভিজ্ঞা অতএব কোমলহৃদয়া তিলোত্তমা ত জর্জরিতা হইবেনই !

জগৎসিংহ—জগৎসিংহের প্রণয়—হির-দীর। এ প্রণয়ে চাকল্য নাই—লক্ষ্য বস্তুর পরিবর্তন নাই। এ শুধু তিনি সহস্র কিরণ। অপূর্ণ রাগরঞ্জিত প্রভাত ভাঙ্গ যখন গগনপটে উদ্ভিত হইলেন, স্বচ্ছ সরোবর মধ্যবর্তিনী কমলিনী তখন হাসিল। অশ্রুমালা সেই হাস্যে বিবোধিত হইয়া কমলিনীকেই প্রণয়-পাত্রী নির্ধারণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে গগন ঘনঘটাজ্বর হইল। নিম্নে ঝটিকা বেগে বহিতে লাগিল। অশ্রুমালা মেঘ-প্রভাবে অন্তর্মিত হইলেন। কমলিনীও ঝটিকাঘাতে সলিলশায়িনী হইল। দিবাকর আর কমলিনীকে দেখিতে পান না ; কিন্তু তাই বলিয়া, কই, পার্শ্বস্থিতা চপলায় চিত্ত-বিমোহন রূপে ত কমলিনীকে ভুলিলেন না। যখন আকাশ মেঘ বিনিযুক্ত হইল—ঝটিকা ধায়িয়া গেল—তখন আবার সেই ভাঙ্গ পূর্ণরাগ ধরিলেন এবং কমলিনীকে পূর্ণ প্রেম-ধারা ঢালিয়া দিলেন। কমলিনীও পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া পুনরায় হাসিল। জগৎসিংহও ঠিক ঐ প্রভাত ভাঙ্গর মত প্রথমে তিলোত্তমাকে দেখিলেন এবং তাঁহার অতুল-নীয়া সৌন্দর্য্য সম্পত্তি দেখিয়া তাঁহাকেই নিজের প্রণয় পাত্রী নিরূপণ করিলেন। পরে তাঁহাদিগের ভাগ্য-গগন মেঘাজ্বর হইল, তাঁহারা উভয়েই কতলুর দুর্গে বন্দী হইলেন। জগৎসিংহ সেই বনভরোময় কতলু-গৃহে চপলাবরূপিনী আয়েবাকে দেখিলেন। কিন্তু, কই, নবাবনন্দিনী আয়েবার সে প্রাণোন্মাদিনী সৌন্দর্য্য-ধারার মুক্ত হইয়া তিনিও তিলো-



স্বামাকে ভুলিলেন না। যখন তাঁহানিগের ভাগ্য-গণন শেষ বিনিমুক্ত হইল, তখন আবার তিনি তিলোত্তমাকেই প্রণয়-স্বাধাদান করিলেন। বৃত্তকলা তিলোত্তমা সজীবিতা হইয়া উঠিলেন। জগৎসিংহ কর্তৃক আরেবার প্রণয় প্রত্যাধান তাঁহার চরিত্রের একটি উজ্জ্বল বৃত্তান্ত। জগৎসিংহ জানিতেন যে, রূপে-গুণে, ঐশ্বর্যে, ক্ষমতায় নবাব-নন্দিনী আরেবা অতুলনীয়—তিনি জানিতেন যে, আয়েবাই তাঁহাকে কঠোর মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—তিনি আরও জানিতেন যে, এই আরেবাই অযাচিত ভাবে তাঁহাকে প্রণয় দান করিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি আরেবার প্রণয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। তাঁহার এরূপ ক্ষেত্রে এ প্রণয়-তুচ্ছতা এই কলুষ-পূর্ণ মানব-সংসারে অনূক্ত না হইলেও বিরল দৃশ্য।

আরেবার নিরাশ প্রণয়ে আলা নাই, কিন্তু জগৎসিংহের হতাশ প্রণয়ে নির্ধন দহনগুণ, আছে। জগৎসিংহ কতলু-দুর্গে বন্দী। তিনি রোপ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহের পরিবারের কোনও সংবাদ পান নাই, তিলোত্তমারও কোন সংবাদ পান নাই। সেজন্য তিনি অন্তান্ত চিন্তাশীল। হঠাৎ এক দিন মুসলমান বেশধারী গজপতিকে দেখিতে পাইলেন। ওসমানের দ্বারা তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, শত্রুকর্তৃক বীরেন্দ্রের দুর্গাধিকারের পক্ষ হইতে বীরেন্দ্রসিংহের পরিবারবর্গের কংসাদ কিজালা করিলেন। তদন্তরে বাহা শুনিবেন, তাহাতে তাঁহার সেই বিশালহৃদয় বহুমান হইয়া উঠিল। তিনি শুনিবেন

তিলোত্তমা ও বিমলা কতলুখাঁর বান্দী হইরাছে। জগৎসিংহ এতদিন হৃদয় মধ্যে এক পরিভ্রমণে তাঁহার প্রাণ-প্রতিমা প্রণয়িনী তিলোত্তমার একটি স্বর্ণ প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়া ছিলেন, আজ তাহা সহসা ঘৃণা-কোভ-হতাশের অনলরাশিতে গলিয়া যাইয়া সমস্ত হৃদয়ের উপর ছড়াইয়া পড়িল। তিনি অন্তর্জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে মনে মনে ইচ্ছা করিলেন যে, এই স্নিগ্ধোজ্জ্বলা, মলয়-শীতলা বসুন্ধরার বক্ষে ঐ অনলময়ী তিলোত্তমা আর না থাকে, তাই তিনি বলিলেন,—“তিলোত্তমা আর না বাঁচিয়া থাকে।”

জগৎসিংহের এই প্রণয়-জ্বালা তাঁহার চরিত্র-গরিমা হ্রাস করিতে পারে না। তিনি রাজপুত, তাঁহার শিরায় শিরায় রাজপুত-শোণিতের সহিত রাজপুতকুলোচিত জাতি-গর্ভ প্রবাহিত। যখন তিনি শুনিলেন যে, রাজপুতকুলভূষণা তিলোত্তমা যেচ্ছায় জগৎসিংহের অযাচিত প্রণয় দূরে নিক্ষেপ করতঃ বিজাতি বিধর্মী কতলুখাঁর প্রণয়ের জন্য তাহার পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়া বদ্ধ রাজপুত রক্ত কলুষিত করিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে ত ঐ আলা উপস্থিত হইবেই।

(ক্রমশঃ)

ঐগদাধর সিংহ রায় এম.এ, বি.এল।

## অভাগিনী ।

শান্তিপুর গ্রামখানি বিধাতার অপূর্ণ লীলা-নিকেতন। গ্রামের প্রাকৃত্যুগ দিয়া বিষ্ণু-পাল-পদ্ম-নিঃসৃত পুষ্যসলিলা ভাগীরথী কলনায়ে

বহিরা বাইতেছে। এই ভাগীরথী-উপকূল  
অখোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস।  
তিনি দয়াধর্মের অত্যাশ্রয়ী জীবন্ত প্রতিমূর্তি!  
পরের চুঃখমোচনে, পরোপকার-ত্রিতে তিনি  
সদাই তৎপর। পূর্বে তাঁহার অবস্থা নিতান্ত  
মন্দ ছিল না; কিন্তু নির্ভর নিয়তির ছলনায়  
শেষদশায় বড় কষ্টে পড়িয়াছেন! সংসারে  
গৃহিণী—পুণ্যবতী, আর একমাত্র আদরের  
কন্যা—সুখা।

সুখা চতুর্দশ বর্ষীয়া সুন্দরী কিশোরী।  
যৌবনোন্মুখী কিশোরীর ললিত কমলীয় দেহে  
অল্পপম লাবণ্যের কনকোজ্জ্বল স্নিগ্ধজ্যোতিঃ  
ধীরে ধীরে ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

হিন্দু-ঘরের মেয়ে, —এখনও তাহার বিবাহ  
হয় নাই। বাপের টাকা নাই; স্বতরাং  
ভাল ঘরে, ভাল বরে সুখাকে দান করা পিতার  
অসাধ্য হইলেও, তিনি স্নেহের কন্যাকে  
জলে ফেলিয়া দিতে পারেন না!—অবশেষে  
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যথাসর্ব্বথ বিনিময়ে  
এক স্থানে সঞ্চয় ঠিক হইল! পাত্রের নাম—  
শিশিরকুমার—বয়স বিশ বৎসর। বিশেষ গুণ  
কিছুই নাই, তবে গৃহে সঞ্চিত টাকা কিছু আছে।

সুখার বিবাহ হইল। বিবাহের পরদিন  
স্বগুরুগৃহে যাত্রা করিবার সময় সুখা মায়ের  
বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রু-উজ্জ্বলিত-কণ্ঠে  
বলিল—“মা! সেখানে কে আমার আদর  
করবে?” স্নেহময়ী অশ্রু মুছাইয়া কন্যাকে বুকে  
চাপিয়া ধরিলেন।—সুখা এখন পিতাকে প্রণাম  
করিতে গিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিয়া  
ফেলিল, তখন পিতার অশ্রুও আর বাধা মানিল

না।—তথাপি তাহাকে বাইতে হইল। সন্দি-  
হিতকে ছাড়িয়া, পিতৃগৃহের ধলাধেলা ফেলিয়া  
সুখা আজ জীবনের পরীক্ষা দিতে স্বত্তরাগরে  
চলিয়া গেল।

(২)

“রেখে দাও তোমার ও-মায়া-কায়া।  
কিছুতেই তোমার আর সে বাড়ীতে বাওয়া  
হবে না।”

“মা ও বাবার জন্য মন কেমন করে!”

“অমন অদাতা বাপের মুখ দেখতে নাই।  
কাকি দিয়ে এতগুলি টাকা ঠকাইল। অমন  
ছোট লোকের সঙ্গে আর সঞ্চয় কি?” এই  
বলিয়া সুখার শাওড়ী তথা হইতে চলিয়া  
গেল। অভাগিনী সুখা বসিয়া কাঁদিতে  
লাগিল।

সুখার পিতার ধ্বংস বরসজ্জা দিবার কথা  
ছিল, তদনুরূপ নাকি জিনিষ-পত্র দিতে পারে  
নাই! তাহাতে বরের পিতামাতা রাগিয়া  
লাল হইয়াছেন। এতগুলি অর্থ যে ঠকাইল,  
তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা কিসের?  
এমন ছোট লোক কুটুম্বের সঙ্গে তাঁহার  
কোনরূপ সঞ্চয় রাখিতে চান না। স্বতরাং  
পুত্রবধূকে আর পিত্রালয়ে পাঠাইলেন না।  
অভাগিনী বালিকা চিরতরে স্বগুরু-গৃহে বন্দি  
হইল।—সুখার পিতামাতা এ সংবাদে জ্ঞপ্ত  
বড় ব্যথা পাইলেন। সে পরীক্ষা প্রাপ্ত গিয়া  
বৈবাহিককে কত অশ্রু বিনয় করিল, কিন্তু  
কোন ফল হইল না। অখোরনাথ অশ্রু মুছিতে  
মুছিতে বাটী ফিরিলেন।

সুখা আর কি করিবে? সে শুধু কাঁদিতে

জানেন—পরোধীনা বালিকার অশ্রুজল ভিন্ন°

আর কি সঞ্চল আছে ? কয়দিন সে কাঁদিয়াই কাটাইল ;—স্নানাহার করিল না। তাহাতে খণ্ডর-শাওড়ী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কটুক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। অগত্যা সুধা শান্ত হইয়া গৃহকাজে মনোযোগ করিল।—সে স্বহস্তে ঘর কাঁট দেওয়া, ঘর ধোয়া, বিছানা করা, জল তোলা, বাটনা বাটা, রান্না, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজ করিতে লাগিল। তথাপি তাহার নিস্তার নাই ; সে সর্বদাই খণ্ডর-শাওড়ীর বিষমাখা-বাক্যবাণে জর্জরিত হইতে লাগিল। হায় রে, অবোধ বালিকার কোমল হৃদয়ের মর্যাদাসিক ব্যথা কে বুঝিবে ? সে নীরবে সব সহ্য করে—বিরলে বসিয়া কাঁদে !

ক্রমে ক্রমে দিন যাইতে লাগিল।—হায়, সুধার হৃৎকের অবধি নাই। পিতামাতার এত আদরের কন্যা—এত স্নেহের ধন—ননীর পুতলী সুধার আজ কি দশা !—দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। তাহার লাজনা-গজনার অবধি নাই—হৃদয়ে কেবল অহর্নিশ ভূষের অনল জ্বলিতেছে ! মনের হৃৎকে সে ক্ষণকাল বসিয়া কাঁদিবে এমন অবসরটুকু নাই ; সমস্ত দিন তাহাকে গৃহকাজে খাটিতে হয়। এত করিয়াও খণ্ডর-শাওড়ী ও বামীর মন পায় না। উঠিতে বসিতে লাজনা ! নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সে সকল সুখে বঞ্চিতা ; হৃৎ ও কষ্ট ভোগ করিবার লজ্জাই যেন সে পৃথিবীতে আসিয়াছে। বামী তাহার সঙ্গে কোনদিন ছুঁটা ভালবাসার কথা বলেন না। উপেক্ষিতা অনাড়ম্বর অভ্যাগিনী সুধার কপালে কি এই ছিল ?

(৩)

সেদিন বৈকালে সুধা উঠান কাঁট দিতে-ছিল ! এমন সময়ে সুধার পিস্তৃত ভাই শশিভূষণ আসিয়া বলিল—“সুধা ! ভাল আছিস্ ত ?”

সুধা।—“হাঁ দাদা ! বাবা মা ভাল আছেন ?”

শশী।—“মামার বড় শক্ত ব্যারাম, জীবনের আশা খুব কম ! তোকে একবার দেখতে চেয়েছেন,—তাই নিতে এসেছি !”

সুধা।—“চিকিৎসা হচ্ছে না ?”

শশী।—“কি দিয়ে হবে ? মহাজনেরা নাগিশ করে বিষয়-সম্পত্তি সব নিয়েছে। বাস্তবিক পৰ্য্যন্ত উচ্ছন্ন গিয়েছে ! অর্থাভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না।”

সুধার চোখে জল আসিল, বজ্রাঙ্কলে নয়ন মুছিয়া বলিল—“বাবা এখন কোথায় আছেন ?”

শশী।—“আমাদের বাড়ীতে।”

সুধা।—“এত টাকা কর্ত্ত্ব করে বাবা কি করেছেন ?”

শশী।—“তা জান না ? তোমার বিয়ে দিয়েছেন !”

\* সুধার হুই চক্ষু দিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। অশ্রু-উচ্ছ্বাসিত-কণ্ঠে সে বলিল,—“দাদা ! আমার লজ্জাই বাবা এমন দশায় পড়েছেন ! আমি বাবার ধন-প্রাণ নাশ করুতে জন্মে ছিলেম ! যদি ছোট বেলার আমার মুন খাইয়ে মেরে ফেলতেন, তা হলে তা—”

শশী।—“হিং ! সুধা কাঁদছিস। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, যা তোর শাওড়ীকে বলগে যা, কি বলে ?”

“এঁরা কি আমার ছেড়ে দেবেন ? আচ্ছা, বলে দেখি ।”

সুধা শান্তডীকে বলিল—“মা ! বাবার বড় শক্ত ব্যারাম, দাদা নিতে এসেছেন, একবার বাবাকে দেখতে ইচ্ছা করে !”

শান্তডী বন্ধার দিয়া বলিয়া উঠিল—“যাবে যাও, আর আসবার নামটি করো না !”

সুধা কাঁদিয়া ফেলিল, শান্তডী পূর্ববৎ বলিল—“কাঁদতে লজ্জা করে না—কোন মুখে কান্না আসে ? তোমার বাপ মরুক আর বাঁচুক, আমার কি ?

“আমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন । মা ! আপনার পায়ে পড়ি ।”

“মাঃ আলালে ।” বলিয়া শান্তডী সজোরে পা ছাড়াইতে গিয়া পুত্র-বধূকে এক পদাঘাত করিল ।

সুধার যাওয়া হইল না । শশিভূষণ বাটার ওনা হইবে, এমন সময় সুধা আসিয়া শশীকে নিভুতে ডাকিয়া লইয়া গেল । সুধা হাত হইতে “সোণার বালা” জোড়া খুলিয়া বলিল—“দাদা ইহা বিক্রী করে বাবার চিকিৎসা করো !—আর বলো, সুধা মরে গেছে ।”

“এ-যে—”

“কোন কথা বলো না ! যাও—”

“এঁরা যে তোকে—”

“লাজনা-গঞ্জনা দিবে ? সহ করতে পারব, বাবা আমার জন্য এত লাজনা-গঞ্জনা সহ করলেন, আমি তাঁর জন্য এ তুচ্ছ লাজনা সহ করতে পারব না ? যাও—দেবী করো না ।”

শশী আর কিছু বলিল না, ত্রস্তে বালাজোড়া

উড়ানীর আড়ালে ঢাকিয়া চলিয়া গেল ।

সুধার চোক দিয়া দুই কোঁটা অশ্রু বরিয়া পড়িল !

কথা চাপা রহিল না, এমন কথা কি চাপা থাকিতে পারে ?

চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই শ্বশুর-শান্তডী জানিতে পারিলেন, বৌ “বালাজোড়া” পিতার চিকিৎসার পাঠাইয়া দিয়াছে । কথা প্রকাশ হইল, সুধার কপালে আগুন জ্বলিল । শ্বশুর-শান্তডী বৌকে নানা অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াও নিরস্ত হইলেন না । কর্তা বলিলেন—“এখনি বৌকে জন্মের মত বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও ।” গিন্নী—“তা আবার বলতে ? এমন অলক্ষ্যকে আর বরে জায়গা দিতে আছে গা ? চোরের জাত, এখনি এ বাড়ী হতে দূর হও ।”

সুধা গৃহমধ্যে কপাটের আড়ালে দাড়াইয়া সব শুনিতেছিল । আর নীরবে নয়ন-জলে অভিষিক্ত হইতেছিল !

কর্তা—“এখনও দাঁড়িয়ে টেরলে ? যাও এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না—বাপের বাড়ী যাও !”

বধূ মুহূরুরে বলিল—“না, আমি যাব না ।”

গিন্নী—“যাবিনে ? হারামজাদির বেটা, যাবিনে !”

কর্তা—“এখনও ভালভাবে বলছি—যাও !”

সুধা—“আমি ঘরের বৌ, ঘর ছেড়ে কোথা যাব ? আপনারা গুরুজন দোষ করে থাকি, শাস্তি দেন !”

গিন্নী—“রেখে দে তোর আত্মাদের কথা, এখন যাবি কি না বল ? ভালয় ভালয় ধীসুত

মঙ্গল, নইলে কাঁটা পেটা করে বাড়ী হতে  
তাড়িয়ে দিব।”

বধু—“মা! বাপ-মা আপনাদের হাতে  
তুলে দিয়েছেন, এখন আপনারাই আমার মা-  
বাপ।”

গিন্নী—“এত দেখছি কম বদমায়েসী জানে  
না গা? বের হবি না কি? এখন বের হ  
বলছি!”—এই বলিয়া বধুর হাত ধরিয়া হড়  
হড় করিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল।

বধু সকাভরে বলিল—“মা আপনার পায়ে  
পড়ি,—এমন করে”—

গিন্নী—“মা এখনি দূর হয়ে যা!” বলিয়া  
গৃহিণী বধুর গলা ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা  
মারিল। বধু চৌকাঠে পড়িয়া গেল,—মস্তক  
আহত হইল। সুধা মুচ্ছিতা হইয়া পড়িয়া  
গেল—গৃহে শোণিত-ধারা প্রবাহিত হইল।  
শিশির ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—“মা! এক-  
বারে মেরে ফেলে?”

শিশির সুধাকে ধরিয়া উঠাইল।—সুধার  
চোখে মুখে অল দিয়া মুচ্ছা ভঙ্গের চেষ্টা করিল;  
কিন্তু চৈতন্য হইল না। তার পর তিন জনে  
ধরাধরি করিয়া মৃতবৎ সুধাকে শয্যায়  
শোয়াইল। আঘাত বড় সাংঘাতিক হইয়াছে।

সংবাদ পাইয়া সুধার মাতা সুধাকে  
দেখিতে আসিলেন। মেয়েকে দেখিয়া মাতা  
কাঁদিতে লাগিলেন।—সন্ধ্যার পূর্বে সুধার  
একবার মাত্র চেতনা স্ফুর হইল। মাতা  
ডাকিলেন—“সুধা! মা আমার!”

“কি মা?”

“তুমি পড়ে গেলে কি করে?”

এই বুঝি বলিয়া ফেলে? কর্তা

ভীতি-রিহবল-বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হইল।

“মা! হঠাৎ আমি পড়ে গিয়েছিলেম।  
এঁদের কোন দোষ নাই।” সুধা কাঁদিয়া  
ফেলিল। তারপর অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—

“মা! বাবা কেমন আছেন?”

“একটু ভাল হয়েছেন! তিনি তোমার  
“বাবা” গ্রহণ করেন নাই। আমার কাছে  
পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

“মা!”

“কি মা!”

“জীবনের খেলা ত ফুরাল, মরণকালে  
একবার বাবাকে দেখতে পেলাম না। তাঁরে  
আমি বড় কষ্ট দিলাম। উঃ, বড় যাতনা—”

এই সময় সুধার স্বস্তর বলিলেন—  
“বোমা! তুমি ভাল হয়ে উঠ, এইবার তোমায়  
পাঠিয়ে দিব।”

সুধার চোখে আবার দুই ফোঁটা অশ্রু  
দেখা দিল। এই অশ্রুই শেষ—

প্রভাতের নির্মল বায়ুর সহিত সুধার প্রাণ-  
বায়ু মিশিয়া গেল! আজ উপেক্ষিতা অনাদৃত  
সুধা নিষ্কৃতি পাইল!—তারপর চিতার পবিত্র  
ধূম স্বর্গে উঠিয়া দেবতা-পদে বিলীন হইয়া  
গেল—স্বস্তর-শাওড়ী ও স্বামীর অমৃত্যু-প-  
অশ্রু আশান-ভাঙ্গ সিক্ত করিল। \*

ত্রিভোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

\* এই গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু  
ইহার সহিত কোন ভঙ্গ পরিবার সংশ্লিষ্ট থাকার নাম ধাম  
পরিবর্তন করিয়াছি। লেখক।

## হরিনাম ।

( পূর্ব-প্রকাশিত অংশের পর )

গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“অহমাত্মা শুড়াকেশ সৰ্বভূতাস্বস্থিতঃ ।”

অর্থাৎ আমিই ( শ্রীকৃষ্ণই ) সৰ্বভূতস্থিত  
আত্মা । সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম ;  
তিনিই এ বিরাট বিশ্বের নিয়ন্তা—তিনিই সৰ্ব-  
পূজ্য জগদীশ্বর ।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

“ময়া ততমিদং সৰ্বং জগৎ” যিনি সমগ্র  
ব্রাহ্মণ্য আছেন, তিনিই আমি । যিনি সৰ্বত্র  
বিদ্যমান এবং সকল বস্তু যাহাতে অবস্থিত,  
সেই সৰ্ববাপী আত্মা ব্রহ্মই আমি । যথাঃ—

“যো মাং পশুতি সৰ্বত্র সৰ্বত্র ময়ি পশুতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চঃ মে ন প্রণশুতি ॥”  
আবার—

“সৰ্বতঃ পানিপাদন্তং সৰ্বতোক্ষিণিরোবনম্ ।

সৰ্বতঃ স্ফুটিমল্লোকে সৰ্বমাদৃত্য তিষ্ঠতি ॥

তিনিই সৰ্ববাপী বিশ্বরূপ ; তাঁহার হস্ত,  
পদ, নেত্র, শির, যুগ্ম ও স্ফুটি জগতের সৰ্বত্র  
ব্রাহ্মণ্য বিদ্যমান আছে ।

“বহিরন্তঃ চ ভূতানাচ্চরং চরমেব চ ।

স্বস্মাস্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাণ্ডিকে চ তৎ ॥”

সকল পদার্থের ভিতরেও তিনি, আবার  
বাহিরেও তিনি ; স্থাবর জগৎ সবই তিনি ।  
স্বপ্ন হইতেও স্বপ্ন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয় ।  
তিনি দূর হইতেও দূর এবং নিকট হইতেও  
নিকট ।

“অবিতস্তক কৃত্যেবু বিভক্তামিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভক্তি চ তজ্জ্ঞেয়ং এসিচ্ছ প্রভবিস্ চ ॥”

তিনি এক অখণ্ড আত্মরূপে সৰ্বভূতে অব-  
স্থিত থাকিয়া প্রত্যেক প্রাণীতে বিভিন্ন বলিয়া  
বোধগম্য হইয়া থাকেন । তিনিই জ্ঞেয় এবং  
তিনিই সৃষ্টি ও সংহারিকর্তা ।

“জ্যোতিষামপি তচ্ছোহিতস্তমগঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্ব্বত্র বিষ্টিতম্ ॥”

তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ ; তিনিই অবিচ্ছিন্নরূপে  
অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত । জ্ঞান ও জ্ঞেয়  
সবই তিনি । তিনি সৰ্বদ্বন্দ্বয়ে সৰ্বনিয়ন্তারূপে  
অবস্থিত ।

“সমং সাক্ষেণ ভূতেশু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্চং সবিনশ্চন্তং যঃ পশুতি স পশুতি ॥”

যাহা সৰ্বভূতে সমভাবে স্থিত, সৰ্বভূত  
বিনষ্ট হইলেও যাহার বিনাশ হয় না, সেই  
ব্রহ্ম পদার্থই আমি ( শ্রীকৃষ্ণ ) । যিনি আমাকে  
এরূপভাবে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শী ।

“সৰ্বী নীজং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥”

( ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ )

সৰ্ববীজস্বরূপ পরম ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ । যিনি  
পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ ।

“কৃষ্ণ ব্রহ্মে করে ভেদ, নর বুঝে নায়ে,

অভেদ কহে সৰ্ব বেদ ।

অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই,

তাঁরে না লাগে পাপ ক্রৈদ ॥”

কৃষ্ণ ও ব্রহ্মে কোন পার্থক্য নাই ; যেই  
কৃষ্ণ, সেই ব্রহ্ম । ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের অভিমত  
ও ভক্তের বিশ্বাস । এ বিশ্বাস বলেই ভক্ত কবি  
গাইয়াছেন,—

“কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ পূজ দিন যায় বঞ্চে ।

অবহেলে নাশ পাপ কৃষ্ণ কথা কঞা ॥  
 ধন জন পুত্র দেহ সকলি অসার ।  
 পরিণামে সংহতি দেখ কেহ নহে আর ॥  
 পণের পরিচয় দেয় সকল বন্ধুগণ ।  
 এতক জানিয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥”

( যম-সংহিতা । )

হরিভক্ত যখন হরিদাস ঠাকুর গাইরাছেন,—  
 “বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে ।  
 কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন !  
 হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন ॥”

আবার—

“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ লও কৃষ্ণ নাম ।  
 কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন ॥  
 তোমা সবাঁকার লাগি কৃষ্ণ অবতার ।  
 হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥”

( শ্রীচৈতন্য ভাগবত । )

কলির অবতার পতিতপাবন শ্রীগৌরাক্ষ  
 মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে গাইরাছেন—  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং ।  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং ॥  
 রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং  
 কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব পাহি মাং ।

( ৩ )

অবতার-প্রসঙ্গে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পরই  
 কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীগৌরাক্ষদেবের পবিত্র নাম  
 বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ‘হরিবোল’ বলিয়া প্রেম-  
 ভক্তি বিতরণ পূর্বক কলির জীবোদ্ধারের জন্ত  
 পাতকী প্লাথওদিগকে মধুব হরিনামে পুণ্য

পবিত্রতাময় করিবার জন্তই শ্রীভগবানের এ  
 বারের এ অবতারই গ্রহণের—এ মনুষ্য-জন্ম-  
 ধারণের প্রয়োজন হইয়াছিল ।

শুষ্ক জ্ঞানের তর্ক লয়ে মত্ত যবে ছিল পণ্ডিতদল,  
 জ্ঞানযোগী যত জ্ঞানের গরবে ভক্তিরে দিলা

রসাতল ।

নদীয়ায় প্রভু জন্মিলে তখন বাণী-বরপুত্র-স্থান,  
 উঠিল গগনে ‘হরিবোল’ ধনি, বহিল ভক্তির  
 বাণ ।

শচীর নন্দন হ’য়ে চৈতন্য রূপেতে মোহিলে

সংসার,

‘পাপী-ক্রোধ’ তরে হরিপ্রেমভরে হ’লে চৈতন্য

অবতার ।

গারিল এ বিশ্ব মত্ত প্রেমভরে অগতে উঠিল

রোল,

ভক্তির স্রোতে ভাসিল ধরা বিশ্ব-কণ্ঠে সদা

হরিবোল !

বর্তমান যুগের ধর্ম জগতে শ্রীগৌরাক্ষ মহা-  
 প্রভুর ভক্ত সংখ্যাও বড় কম নহে । এমন দিন  
 নাই, যে দিন রজনীতে বজীর বৈষ্ণব ভবন  
 —গৌর-ভক্তের পুত্র নিকেতন, গৌর সঙ্গীতের  
 পবিত্র-মধুর ধ্বনিতে—“প্রাণগৌর নিত্যানন্দ”  
 রবে মুখরিত না হয়, এমন যামিনী নাই, যে  
 রাত্রিতে—

“শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর,

হৃৎধিতের বহু প্রভু মোরে দয়া কর ॥”

এবং ভজ গৌরাক্ষ, কহ গৌরাক্ষ, লহ  
 গৌরাক্ষ নাম” প্রভৃতি গৌর-সঙ্গীতের সুরসাল  
 পদাবলীতে—খোল, করতাল ও মৃদঙ্গের মধুর  
 রবে গৌর-ভক্তগণের পবিত্র গৃহ প্রতিধ্বনিত

না হয়, এমন দিন নাই, যে দিন শ্রীগোরাঙ্গ  
মহাপ্রভুর পবিত্র-মধুর নামে মরোৎসবের পূণ্য-  
যজ্ঞের অমৃতোপম মহাপ্রসাদে শত সহস্র দীন  
সরিদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবের পরিতৃপ্তি ভোজন না হয়,  
এমন দিন নাই, যেদিন ভক্ত তাঁহাকে ভগবানের  
অবতার জ্ঞানে প্রেম-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে  
পূজা করিয়া প্রাণে বিপুল শ্রীতি অমৃতভব না  
করেন। তিনি ভগবান, তিনি বিষ্ণুর অবতার,  
তাই প্রত্যহ বহু ভাগ্যবান ভক্ত তাঁহাকে ধূপ,  
দীপ, গন্ধ-পুষ্পাদি বিবিধ উপচারে অর্চনা  
করিয়া—তাঁহার স্তব-স্তুতি ও নাম-গানে উন্নত  
হইয়া প্রেমাক্রপাত করিয়া থাকেন। প্রসঙ্গাধীন  
এখানে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থ “চৈতন্যচরিতামৃত”  
তইতে চুইটী গোরাঙ্গ-স্তব উদ্ধৃত হইল, যথা—

“বিশ্বস্তর চরণে আমার নমস্কার।

নব ঘন পীতাম্বর বসন যাঁহার ॥

শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।

নব গুঞ্জ শিবি-পুচ্ছ ভূষণ যাঁহার ॥

গজাদাস-শিষ্য-পদে মোর নমস্কার।

কোটি চন্দ্র যিনি রূপ বদন যাঁহার ॥

বনমালা করে, দধি ওদন যাঁহার।

জগদ্বাণ-পুত্র পায়ে মোর নমস্কার ॥

শূঙ্গ-বেত্র-বেণু-চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।

সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥

চারি বেদে যাঁরে ঘোষে নন্দের কুমার।

সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥

তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।

তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর ॥

জানকী-জীবন তুমি, তুমি নরসিংহ।

অজ ভব অদি ভব চরণের ভঙ্গ ॥

তুমি সে বেদান্ত বেদ, তুমি নারায়ণ।

তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন ॥

তুমি হরগ্রীব, তুমি জগৎ-জীবন।

তুমি নীল-চন্দ্র স্রাব কাষণ।”

আবার,—

“জয় জয় সর্ব প্রাণনাথ বিশ্বস্তর।

জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা-সাগর ॥

জয় জয় সিদ্ধহত রূপ মনোহর।

জয় জয় শ্রীবৎস কোমল-বিভূষণ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।

জয় জয় সর্ব জীবের শরণ ॥

তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।

তুমি মৎস্য, তুমি কুর্মা, তুমি সনাতন ॥

তুমি যে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন।

তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন।

তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।

হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম ধীর ॥

সংকীর্ণনারত্তে পুনঃ তব অবতার।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাই আর ॥”

ফলতঃ যে মহাপুরুষ নবদ্বীপ হইতে নীলা-  
চল, পূর্ববঙ্গ হইতে কল্যাণ কুমারীকা পর্বাঙ্গ  
হরিনাম-প্রাবনে পবিত্র করিয়াছিলেন, যে মহা-  
পুরুষ পতিত পাষণ্ডের প্রাণে হরিনামের পুত  
প্রবাহ সফালনে পাপীর হৃদয়-কন্দর পূণ্য-  
পবিত্রতাময় করিয়া তাহাদিগকে মুক্তির পথে  
টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যিনি স্বয়ং অপার  
স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননীর মায়্যা-পাশ, অসামান্য  
রূপ-গুণশালিনী পতিব্রতা তরুণী ভাৰ্য্যার অনা-  
বিল প্রেম এবং অসাধারণ প্রতিভা, বিশ্ববিক্রমী  
বিজ্ঞা-গৌরব ও প্রভূত বশ-সম্পদের মমতা



পরিচয় করিয়া যৌবনে বোণী সাজিয়া বিশ্ব-  
বাণীকে সন্ন্যাসের অপূর্ণ মাহাত্ম্য, ত্যাগের  
মহামন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন; যিনি পতিতের উদ্ধার  
সাধন করিয়া, নীচকে উচ্চ করিয়া, অমানীকে  
মান্ত প্রদান করিয়া এবং গলিত কুষ্ঠীকে প্রেম  
ভরে কোল দান করিয়া জগতে মহান্ উদা-  
রতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন,  
বাহার হরিনাম কীর্তনে নদে ডুবু ডুবু, শান্তিপুর  
প্রাণিত, প্রয়াগ নিমজ্জিত, নিলাচল অভিনুক্ত  
এবং সমস্ত গোড়দেশ মুখরিত হইয়াছিল, যিনি  
লোক শিক্ষার্থ হরিনামের “হ” উচ্চারণ করি-  
তেই তাবাবশেষে মুচ্ছা যাইতেন,—‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’  
বলিয়া ধরাতে লুটাইতেন, পবিত্র প্রেমাশ্রুতে  
ধরিত্রী-বন্ধ শীতল করিতেন, সেই প্রেমের  
ঠাকুর, প্রেম-ভক্তির অবতার নির্বিকার মহা-  
পুরুষকে—সেই মূর্তিমান্ বিগ্রহকে ভগবানের  
অবতার বলিয়া পূজা না করিলে, নারায়ণ জ্ঞানে  
তাঁহার পদে প্রেম-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না  
করিলে, তাঁহার চরণ তলে মস্তক না লুটাইলে  
মানুষের প্রাণ পরিত্যক্ত হইবে কেন ?

মহাপ্রভুর হরিনাম প্রচার সম্বন্ধে কবি  
বলিয়াছেন,—

‘বাহার কীর্তন, করি অক্ষুণ্ণ,

শিব দিগম্বর ভোলা ;

সে প্রভু বিহরে নগরে নগরে,

করিয়া কীর্তন খেলা ।’

প্রেমের রাজত্ব, দৈতের দেবত্ব, আদর্শ  
চরিত্র-মামুখের অসাধারণ মহত্ত্ব ও হরিনামের  
অপূর্ণ মাহাত্ম্য প্রচার এবং পতিতের উদ্ধার  
সাধন করাই বৈষ্ণব জীবনের নররূপে

অবনীতে অবতীর্ণ হইবার কারণ বলিয়া  
প্রতীয়মান হয়। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত  
লোক শিক্ষার্থ তিনি আজীবন দেশে দেশে  
ঘুরিয়া কেবলই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া অশ্রুপাত  
করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র প্রেমাশ্রু-  
পাতে সত্য সত্যই বহুমতী সিক্ত হইয়াছিল—  
বিশ্বাসীর প্রাণে হরিভক্তির অমৃতনির্ঝরিণী  
প্রবাহিত হইয়াছিল।

“পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার ।

প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥”

(চৈতন্য ভাগবত)

গঙ্গা যমুনা নারিল প্রয়াগ ডুবাইতে ।

প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বহাতে ॥

(চৈতন্য চরিতামৃত)

অশ্রু, কন্শা, শ্বেদ, পূলক ও হৃদয় প্রভৃতি  
কৃষ্ণ ভক্তির নয়টি লক্ষণ। প্রভু স্বয়ং ভক্ত  
সাজিয়া জগৎবাসীকে ভক্তির এই নব লক্ষণ  
শিক্ষা দিয়াছেন। হরি বলিতেই তাঁহার  
অশ্রুপাত হইত, ‘কৃষ্ণ’ বলিতেই তিনি মুচ্ছা  
যাইতেন—কাদিতেন, নাচিতেন ও হৃদয়ধ্বনি  
করিয়া উঠিতেন। ভক্তকবি গাইয়াছেন—

‘কাঁপে অঙ্গ, ভাসে বক্ষ প্রেমাশ্রুধারা,

মুখে তব জয় ধ্বনি—হরি হরি বোল,

পাপ তাপ চঃখ দৈন্ত লোটে এসে পায়,

চিদানন্দে তেবে ভক্ত—দাও তারে কোল”

(বর্ণন) ।

ক্রমশঃ

জীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন ।

## মাতৃনামের জয় ।

রিপূরাজ কাম সহাস্য বদনে

যুবকের প্রতি কয়—

“বিফল বাসনা জিনিতে আমায়ে

কহি তোমা’ স্ননিষ্ঠয় ।

মম শরশনে অলঙ্কে গোপনে

জুড়িয়া কুসুম শর,

প্রেমের পিয়াসা বাড়িয়ে তুলিব

বঁধি তব কলেবর ।”

জয় মা স্মরিয়া পরবে নাঁচিয়া

যুবক হাসিয়া কয়,

“তোমার কোমল কুসুম শায়কে

নাহি করি আমি ভয়,

রসনা ধুতুকে জয় মা শায়ক

থাকে যদি চির গাঁথা,

আমার চরণে চির অবনত

রহিবে তোমার মাথা ।”

বাধিল সময় । মদন ইচ্ছিতে

যোড়শী রূপসী নারী—

এল রণভূমে কাম অশুকুলে

মোহিনী সুবেশ ধরি ;

প্রেমিতে মাতিয়া প্রেম উন্মাদিনী—

যুবকের প্রতি ধায়,

মা মা বলিয়া যুবক সঙ্গ

লুটাল তাহার পায় ।

হারিয়া অনঙ্গ বলিয়া উঠিল

বিষাদ বেহাগ তাঁনে,

“নাইকো শক্তি করিতে প্রবেশ

মাতৃ-নাম যেই স্থানে ।”

ঐবদন্ত্য নাথ ।

## কমা ।

(গল্প)

পত্নীর বিরুদ্ধে মানা অভিযোগ শুনিয়া

নরেন বাবু সেদিন হন হন করিয়া শুইবার

ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন “বলি রোজ রোজ

এমনি ঝগড়া করা কি ভাল ?”

নরেন বাবুর অভিমানিনী পত্নী বীণাপর্ণি

ধবধবে শান্তিপুরে কাপড় পরিয়া সাচ্চা লেস

বসান সেমিজ গায় দিয়া জানালার ফাঁকের

কিরণটুকু গায়ে মাথিয়া বালিসের উপর মুখ

ওঁজিয়া উণ্ড হইয়া শুইয়াছিল, অভিমানের

মাত্রা একটু চড়াইয়া বলিল “কে ঝগড়া

ক’তে বলে ?”

—“বলবে আর কে তুমিই কর! মা যা

বলেন, তা শুনলেই তো হয় ।”

—“কথার মত কথা বললেই শুনতে ইচ্ছে

হয় ।”

—“দ্যাখো, তিনি তোমার চেয়ে বুদ্ধিমতী,

একজন পাকা গৃহিনী, তোমার চেয়ে

তার সংসারিক অভিজ্ঞতা ঢের বেশী, তোমাকে

বুঝতে হবে যে, তিনি নিশ্চয়ই তোমার চেয়ে

বেশী বোঝেন । বাকবিতণ্ডা না করে যা

বলেন, করলেই তো সব চুকে যায় । তাঁর

হুকুম মাথায় পেতে লওয়াই তোমার উচিত ।

আরও দেখ, দিন ৩৪ বার করে চা খাওয়া,

রোজ রোজ সাবান মাখা, নভেল পড়া, এ সব

শুনে পাড়াশুদ্ধ লোক তোমার মিন্দে করে,

মাকে অনেক কথা শুনতে হয়, তাই তিনি

ওগুলো করতে নিষেধ করেন । যাঁতে পাঁচ-

মনে নিন্দে করে সে কাজ না করাই ভাল ।”

—“আমি কারো নিজের ধার ধারি না, চা খাব, তার আবার নিন্দে কি ? ছোট বেলা থেকে চা খাওয়া অভ্যাস । একদিন না খেলে গায় হাতে ব্যথা ধরে, শরীর খারাপ হয়, নভেল না পড়লে সমস্ত দিনটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, সাবান না মাখলে গা ঘান ঘান করে । ওসব আমার চিরকালে অভ্যাস, এখন আমি ছাড়তে পার্কে না ।”

—“মাকে মাঝে না হয় চা খেলে, কালে-তস্লে না হয় এক-আধটু বই পড়লে, গায়ে সাবানও মাখলে । রোজ রোজ সাবান মাখলে যদি কথা উঠে, সাবান না মাখলেই পার । সাবান না মাখলে বুঝি সুন্দরী হওয়া যায় না ?”

—“তোমরা পাড়ার্গেয়ে জংলী—ধুলো-কাটার থাকতে ভালবাস, তোমাদের সাবান না হলে চলে, আমার তা চলে না ।”

—“ত্যাখো পাড়ার্গেয়ে জংলী বলে যত দোষ আমার ঝাড়েই ফেলো না । পাড়ার্গেয়েই হই, আর জংলীই হই, ধর্ম্মতঃ আমি তোমার স্বামী, যদি পাড়ার্গেয়েদের উপর এতখানি অশ্রদ্ধা, তবে তোমার বাবা এমন জংলীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন ?”

—“তিনি কি আর জেনেছিলেন যে, চির-কাল তোমার পড়াই শেষ হবে না, পাড়ার্গেয়েই থাকবে । বাবা মনে করেছিলেন, জামাই বাবু আরার শীগগীর একটা ছোমড়া চোমড়া বাবু হবে, সহরে থাকবে বেশ একটু সভ্যতাবাও হবে । তুমি যে আমাকে এমনি করে

পাড়ার্গেয়েদের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখবে; তা তো তিনি জানতেন না ।”

—“কে পাড়ার্গেয়েদের অন্ধকারে ডুবে থাকতে বলে ? বাপের বাড়ীর সভ্যতার আলোতে হাবুডুবু খাওগে, কেউ নিষেধ করবে না ।”

বীণাপাণি এবার কি ভাবিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল । পত্নীকে নীরব দেখিয়া নরেন বাবু মনে করিলেন, বলিবার পালাটা বুঝি তাঁর । ভাই তিনি জোর গলায় বলিলেন “যদি স্বামী বলে অন্তরে একটুও ভক্তি-ভালবাসা থাকে, তবে যা বলি শোন । তুমি এই কু-অভ্যাস ওলো ত্যাগ কর, মা যা বলেন, তা শোন, তাঁর উপর ভক্তি হারিও না ।”

—“বই পড়া, চা খাওয়া, সাবান মাখা, এসব বুঝি কু-অভ্যাস ? পাড়ার্গেয়েদের কাছে এ ওলো কু-অভ্যাস মনে হ’তে পারে । আমি কিন্তু তা মনে করি না । ও ওলো কু-অভ্যাসই হোক, আর সু-অভ্যাসই হোক, আমি ছাড়তে পার্কে না । তোমাদের এ পাড়ার্গা ছেড়ে থাকতে পার্কে, তথাপি আমার ছোটবেলার অভ্যাস আমি কিছুতেই ছাড়তে পার্কে না ।”

—“ওঃ এত বড় স্পর্ধা ! তুমি কি না ছার সাবান মাখা, চা খাওয়া ও নভেল পড়বার জন্ত আমার দেবীস্বরূপিনী মাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পার ! ধিক্ তোমার নারী জন্মে ! দূর হও পাপিয়সী—এই মুহূর্তেই তুমি আমার চোকের আড়াল হও । আজ হতে তুমি আমার পত্নী নও—চুচোকের বিষ ।”

অভিমানিনী বীণাপাণির অভিমানের মাত্রা এবার উনপঞ্চাশে উঠিয়া গেল । তাহার এত

খানি অপমান সহ্য হইল না। সে অনেকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। তাহার পর রাত্রা ঘরে বাইরা দ্বার বন্ধ করিয়া একখানা ছিন্ন মাদুরে শুইয়া পড়িল।

নরেনবাবু পড়াকর্তৃক-তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া পালঙ্কের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু নিদ্রাদেবীর অশুগ্রহ হইল না, এ পাশ ও পাশ করিয়া কোন রকমে রাত্রিটা কাটাইলেন। প্রভাত হইল, কোকিল গাহিল, ফুলও ফুটিল, রাঙা রবি আকাশে হাসিমুখে দেখা দিল, নরেনবাবু কিন্তু আজ হাসিলেন না, অস্ত্রদিনের মত সকালে জল খাবারও খাইলেন না, একখানা শার্ট গায়ে দিয়া ক্ষুধ মনে বাজীর বাহির হইলেন। সকালে উঠিয়া রাত্রাঘরের দোর বন্ধ দেখিয়া নরেন বাবুর মা ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝিয়া লইলেন। বোমা যে একঙয়ে তাহাও তিনি জানিতেন, তবু ডাক দিতে হয় তাই ডাকিলেন “ও বো-মা বো-মা ! এতখানি বেলা হয়েছে ওঠ, এখনও কি এমনি করে পড়ে থাকতে হয় মা !”

সুশীলা শাওড়ী ঠাকুরানী কত ডাকাডাকি করিলেন, দোরে থাকা দিলেন, কিন্তু বো-মার সে দিকে গ্রাহ্য নাই, সে নীরব নির্ম্মাক, এ কি ? তবে কি নরুর সঙ্গে ঝগড়া ক’রে বিষটি সুখেলে নাকি ? তিনি আবার ডাকিলেন, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন “ওমা হেয়, আমার গা ছুর ছুর” করচে মা, একবার যা মা ভট্টাচ্ছিন্নের বড় বোমাকে শীগগির ডেকে আন। ও বো-মা ! বো-মা !

বোমার যে সাড়াশব্দ নেই গো ! কি হবে গো ! নরু কোথা গেলরে।”

ভট্টাচ্ছিন্নের বড় বো সম্পর্কে বীণার দিদি, তার মাসিমার মেয়ে, নাম সুহাসিনী। সুহাসিনীর সঙ্গে বীণার খুব আলাপ খুব ভালবাসা, ডাক শুনিয়া সুহাসিনী তাড়াতাড়ি আসিল এবং চোঁচাইয়া বলিল “এখনও এমন করে শুয়ে কেন বীণা ? কি হয়েছে কি ? দোর খোল না !

—“একটু শুয়ে আছি তার লজ্জা পাড়াগড় লোক ডাকাডাকি কেন ? সবাই মনে করেছে আমি বুঝি বেঁচে নাই। তা আমাদের কি আর মরণ আছে দিদি ! তবে শরীরটা যে রকম খারাপ হয়ে আসচে তাতে আর বেশী দিন নয়। রাত্রি থেকে বুকে ব্যথা আর জ্বর ; কথাটা কহিতেও কষ্ট হচ্ছে, এখন দোর খুলতে পার্কে না, শরীর টা মোটেই ভাল নয় বিরক্ত করো না দিদি, তুমি এখন যাও, খানিক পরে এসো।”

বীণার মূণ হইতে যাহা একবার বাহির হইয়াছে, তাহার আর নড় চড় হইবে না। বীণা চিরকালই একঙয়ে, কাজেই সুহাসিনী কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। প্রতিবেসিনীদের মধ্যে যাহারা চীৎকার শুনিয়া আসিয়াছিলেন তাহারাও কেহ বা ‘ছুড়িটার আচরণ দেখে গা জ্বালা করে’ কেহ বা ‘বো-টা কি দস্তি গো’ ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিজের নিজের গৃহে ফিরিলেন।

নরেন বাবু যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন বেলা প্রায় ১২টা, তখনও পর্যাপ্ত তিনি জলম্পর্শ

করেন নাই, রোদের তাপে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। ঘরে পা দিতে না দিতেই তাঁহার মা বলিলেন “সকাল থেকে কিছু খাসনি এতখানি কেলা হয়ে গেছে, তারপর বৌমারও রাত্রি থেকে অনুখ, তারই বা হবে কি? ডাক্তার ডেকে আন, এমন করে চুপ ক’রে বসে থাকলে চলবে কেন?”

—“ডাক্তার কেন? অনুখ না ছাই, ও অনুখ ডাক্তারের বাবাও সারাতে পারবে না। মরুক, চুলায় থাক! এমন পরিবার ম’রলেই কি আর বাঁচলেই কি?”

“সে কি রে? মরবে কি? বালাই এমন কথা কি বলতে আছে বাবা! তোরা আমার জন্য জন্ম বেঁচে থাক, সুখে খরকরা কর, আমি যেন তোদের কোলে চলে যেতে পারি।”

নরেন বাবু বীণার পানে ফিরিয়া চাহিলেন না, ডাক্তারও ডাকিলেন না! মধ্যাহ্ন অতীত হইলেই চারিটা ভাত মুখে দিয়া মামার বাড়ী যাইবার ছুতো করিয়া মায়ের পদধূলি লইলেন। মা বলিলেন—“এমন সময় যাবি কি? বৌমার অনুখ দেখে যাবি কোথা? আসি একা কি করি বাবা?”

—“তোমাকে কিছুই কর্তে হবে না—চুপ ক’রে বসে থাক। রোগ বালাই কিছু নয় তুমি ভেবো না। আমি শীগগীর ফিরব।”

—“বা খুসী তাই কর। তোদের সব ব্যাভার দেখে, মাথা খুঁড়োময়তে ইচ্ছে হয়।”

নরেন বাবু মার কথা শুনিলেন না। তিনি মামার বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বামী চলিয়া গেলে বীণাপাণি রান্নাঘর হইতে বাহির

হইয়া শুইবার ঘরে গেল ও টাক হইতে ভাড়া-তাড়ি একখানা চিঠির কাগজ ও খাম বাহির করিয়া আনিল, পত্রে গে লিখিল :—

সরোজপুর, শনিবার,

“প্রিয়পুত্র—

বাবা! আপনার পত্র পেয়েছি। কয়দিন শরীরটা বড় খারাপ। বুকে বাধা হ’য়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি। এক্ষেত্রে চিঠি লিখতে পারি নাই। বুকের বেদনা ক্রমশঃ বাড়চে। পাড়ার ডাক্তার ভাল পাওয়া যায় না—খাবারও বিশেষ অনুবিধা, কোন জিনিষ মিলে না। এদেরও আমার উপর তেমন যত্ন দেখি না, এ অবস্থায় বেশী দিন এখানে থাকলে মারা যাবো। সত্তর এক খানা পাকী পাঠাবেন, সুখা যেন সঙ্গে আসে ইতি।

আপনাদের স্নেহের

“বীণা”

বীণাপাণির পত্র পাইয়া অবনীবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। বড় লোক, এক বই মেয়ে নয়, তাও আবার এমন হ’ল। আহা না জানি বীণা আমার সেখানে কত কষ্টই পাচ্ছে! কত লাঞ্জনাই ভোগ কচ্ছে!

পত্র শুনিয়া অবনীবাবুর পত্নী ঝঞ্ঝার দিয়া বলিলেন “ওমা এমন অনুখ হয়েছে তা একটু যত্ন নেয় না গা। চার পাঁচ দিন ব্যারাম তা একখানা চিঠি দিয়ে থবর নেই! ছি ছি কেমন ধারা শাড়ী গো!”

অবনী বাবু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পাকী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সুখার অর হওয়ার বাইতে পারিল না। অপত্যা সঙ্গে চলিল শত্ৰু মিত্র চা ভোজী ভৃত্য সিউরাম সিং।

( ২ )

বীণা এবার কারো কথা শুনবে না, বাপের বাড়ী যাবেই যাবে। সন্ধ্যার পূর্বেই পাকী আসিয়া পঁহুঁছিয়াছে। সহসা পাকীর আবির্ভাবে সরলা শাওড়ী ঠাকুরাণী প্রথমে একটু হতভম্ব হইয়াছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই সিউরাম সিংহের প্রমথ্যৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। বোঁয়ার কি অসুখ, কেন বাপের বাড়ী যাচ্ছে, ক্রমে তিনি সব বুঝিলেন, সব জানিলেন। বোঁমা যে নিবেশু মানিবে না তাহাও তিনি জানিভেন। তবুও বলিলেন “আমি আর কখন কিছু ব'লবো না মা, তুমি ঘরের লক্ষ্মী ঘরেই থাকো। যাবে কেন মা ? আর যদি নিতান্তই যেতে চাও তো নরু ফিরে এলে—”

বীণাপাণি শাওড়ী ঠাকুরাণীর কোন কথা কাণে তুলিল না, যাইবার পূর্বে তাঁহার অন্ত-মতিও লইল না। প্রত্যাহ হইতে না হইতেই বীণাপাণি পাকী হাঁকাইয়া আজ পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।

বীণাপাণি বর্ধমান্নে আসিল। সহরের বড় বড় ডাক্তার ডাকাইয়া বোগ পরীক্ষা করান হইল। ফলে রোগটা ( Heart-disease ) বুকের ব্যারাম সাব্যস্ত হইল। রীতিমত চিকিৎসা চলিল। তিন মাস গেল, চার মাস গেল, কিন্তু বোগ উপশম হইল না। বীণার শরীর দিন দিন কম্বু পাঠিতে লাগিল। বীণার আহারে রুচি নাই, রাত্রি ঘুম নাই, কারো সঙ্গে কথাটা অবধি কইতে বিরক্ত। সে কেবলই নির্জনে বসিয়া কাঁদে, হা হুতাশ করিতে থাকে। কি দোষে আজ সে বামীব

আদর সোহাগ হইতে বঞ্চিত, সে এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে এমন কঠোর জীবন যাপন করিবে” ইত্যাদি সহস্র প্রশ্ন তাহার বিরহ-উবেগিত হৃদয়কে অধিকতর আকুল করিয়া তুলিল। তাহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, শান্তি নাই। যুখে চিন্তার ঘোর কালিয়া, মনে শুধু অশান্তি।

\* \* \* \*

সে দিন রবিবার। সকাল সকাল কাজ সারিয়া গৃহিনী ঠাকুরাণী পূজার উত্তোগ করি-বেন এমন সময় শান্ত আসিয়া তাঁহার পায়ে চিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। বীণার মা শান্তকে হঠাৎ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন “শান্ত না কি ? কখন আসা হ'ল মা ? ও কি ! ব'সতে একটা আসন দে তো !”

“কাল সন্ধ্যার টোণে এসেছি মা।”

“তা বেশ হয়েছে। বোস্ মা বোস্ ! দিদির যুখে শুনি বড় কাঁকের ঠেলা, একবার নিখাস ফেলতে সময় পাসনি। যা হোক বাপের বাড়ীতে এখন দিন কতক সোয়াস্তিতে কাটা।”

—“সোয়াস্তি পাবার কি ঘো আছে মা !

সংসারের যে কষ্টট, তাতে কোথাও পা-টী বাড়তে পাই না। আসতে কি পারতুম, বাবার অসুখ, না এলে নয়, তাই দু দিনের জন্যে এসেছি। আসবার সময় শওর মশার ব'লেছেন, যাচো কিন্তু শীগ'গীর ঘেন এসো। লোক জন নেই মা, সেবা শুশ্রূষার ক্রটি হ'লে এবার ঠিক মারা যাবো। জান তো তোমার যথেষ্ট বেঁচে আছি।”

—“তোমার স্বপ্নের আবার হয়েছে কি?”

—“সেই আজমা—হাঁপানীর ব্যারাম ত এখনও সারে নাই।”

—“জামাই-বাবাজী বেশ ভাল হো?”

—“কেউ ভাল নয়, সব ব্যারাম যা সব ব্যারাম। আজ সর্দি, কাল জ্বর, পরশু পেটের অসুখ, একটা না একটা লেগে আছে। মোটের মাঝে বড় দিদির শরীর ভাল ছিল তাও আবার ক’দিন মাথার ব্যারাম হয়েছে, সর্বদা মাথা টিপ টিপ ক’চে, আগুনের তাতে ঘেসবার যো নাই, কোন কাজ করবার যো নাই। গৃহস্থালীর বগ্গাট যা কিছু আমাকেই পোয়াতে হয়। রান্না বাস্না সেবা যত সব আমাকেই কতে হয়।”

বড় দিদির ২৩টা ছেলে মেয়ে, তাদের খাওয়ান, পরান, ‘শোয়ান সব তার আমার উপর। আমি ছেলেদের খুব ভালবাসি বড় দিদিও আমাকে নিজের বোনের মত ভাল-বাসেন—”

“তোমার শুণে সকলেই যে তোকে ভাল বাসবে মা? তুই যে লক্ষী—সোণার শাস্ত। আহা এমন লক্ষী মেয়ে কি হয়? নারায়ণ করুন বৈচে থাক, পেটে দুটো হোক, স্নেহে সংসার কর, আমাদের তো মা মনে বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই, বীণার অসুখ নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। চিকিৎসা হচ্ছে, ঔষধও খাচ্ছে অথচ ব্যারাম এক তিলও কমছে না। জিজ্ঞাসা করলেও কোন উত্তর নাই। কি যে হবে। রাত্রিনিদ্র কীদছে কাটছে। যদি পারিস মা না হয় একটা বিহিত কর। এমনি করলে

কোন দিন মারা যাবে যে?”

“হাঁ মার মুখে অসুখের খবর পেয়েই ছুটে এলাম। কোথায় সে?”

গৃহিণী অঙ্গুলি সন্ধিতে বীণার শয়ন-কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। শান্ত বীণার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিল,—“ইস তেমন যে চেহারাখানা একেবারে কাণী হ’য়ে গেছে! কি অসুখ হয়েছে তাই—অমন মন ভারী ক’রে রয়েছে যে?”

শৈশবকাল হইতে বাহার সুখে অত ভাব অত ভালবাসা সে শান্তর সঙ্গে বীণা আজ ভাল করিয়া কথা কহিল না, শুধু বলিল “মনটা বেশ ভাল নাই।”

“ভাল নাই কেন? জামাই বাবুর পত্রটুকু পাও না? মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে মন কষাকষি চলে কি?”

বীণা মনোভাষ গোপন করিয়া ঘাড় নাড়িয়া দিল।

“তবে এমন কেন? শুন্লুম কিছু খাও না দাওনা, কেবল কাঁদছে কাটছে, কি অসুখ হয়েছে খুলেই বল না তাই! রোগের মত ঔষধও তো আছে!”

বীণার কি অসুখ সে কি বলিবে—কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, শুধু মুখ নীচু করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শান্তর বুঝিতে ব্যাকি রহিল না, বেদনাব্যঞ্জক আকুল নিশ্বাসই বীণার গভীর মর্ম্মভাব ব্যক্ত করিল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল “স্বপ্ন-বাড়ীর জন্তে মন কেমন করছে নয়? সেখানে থাকলে তুমি সুখী হও?”

বীণার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। সে কিছুই বলিল না, কয়েক বিম্বু অশ্রু তাহার গণ্ডদেশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

“তার জন্তে কান্না কেন বোন ? তুমি যাতে সুখী হও তাই করা যাবে। এর জন্ত এত মন খারাপ করতে হয় ? উঠ আমার সঙ্গে এস, উনি এবার পুঙ্কার উপহারে খুব ভাল ভাল বই দিয়েছেন পড়া যাবে চল।” এই বলিয়া শান্ত বীণার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। বীণার চিরদিনই পড়াশুনায় কৌক, সুতরাং বইয়ের নামে সে কোন আপত্তি করিল না।

শান্তদের ঘরে বীণা অনেকক্ষণ কাটাইল। শান্ত তাহাকে তাহার নিজের সম্বন্ধে, স্বামীর শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধে কত কথা বলিল, কত প্রশ্ন করিল কিন্তু শান্ত সকল কথার উত্তর পাইল না, বীণা মন ধুলিয়া আলাপ করিল না, তাহার কিছুই ভাল লাগিল না, বিরক্তির সহিত দুচারিটা কথার জবাব দিয়া সে বাসায় ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় সে একখানা বই সঙ্গে আনিল। সে বইখানা “লক্ষ্মী-বৌ।” বেশ বন্ধুরকে তকতকে বাঁধা, বইটার ২১৮টা জায়গা বীণার বড় ভাল লাগিল, তাই সে পড়িল.....স্বামী মূর্খই হউক আর বিদ্বানই হইন, ধনীই হউন আর নিধনই হউন, কন্দর্পের মত হৃন্দরই হউন আর কুৎসিৎই হউন, তিনি তো তোমার স্বামী, তোমার পূজনীয়। তাহাকে অশ্রদ্ধা করা কি তোমার উচিত ? তাহাকে তুচ্ছ তাম্বিল্য করার পরিণাম জান তো ?—অনন্ত নরক। শত কাজ ফেলিয়াও

তাহার সেবা করাই তোমার কর্তব্য, পতিব্রত চরণই তোমার একমাত্র সাগনার ধন। স্বামীই তোমার আরাধ্য দেবতা, তুমি তাহার চিরদাসী।

শুধু স্বামীভক্তি করিলে, স্বামীর সেবা করিলেই তোমার কর্তব্য শেষ হইল না। শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে না। শিশিলে বুঝিবে তোমার স্বামীভক্তির সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। তাহাদের সেবা করা, তাহাদের আদেশ-নিষেধ আশীর্বাদের মত মাথায় পাতিয়া লওয়াই তোমার উচিত। যৌবনের অধিকারে, মনের গৌরবে মনে করিও না যে আমি বড়। ভাল কাপড় পরিয়া, গহনা পরিয়া পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইলেই তোমাকে কেহ বড় বলিবে না। বড় হইবার অধিকার তোমার নেই। তুমি চিরকাল ছোট—ছোটই থাকিবে।

বইখানা পড়িয়া বীণাপাণির বুকের ভিতর কি যেন করিয়া উঠিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। হৃৎখে পড়িলে মাহুয যেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার প্রাণের সকল বেদনা দেবতার চরণে নিবেদন করে, বীণাও আজ তেমনি করিয়া করষোড়ে স্বামীকে নিবেদন করিল :—স্বামী ! নাথ ! তুমিই আমার প্রাণের একমাত্র দেবতায় এ জীবন যৌবন সব তোমারই। আমি তোমার—চিরদিন তোমারই। রূপ-গরিমার, যৌবন জ্বলন্ত উজ্জ্বলতাবশে তোমাকে তুচ্ছ জান করিয়াছি—তোমাকে ভক্তি করিতে শিখি নাই, আমি বোর অপরাধিনী—পাপীয়াসী। হৃদয়ের



একবার দেখা দাও, আমি যতদিন বাঁচিব তোমার পদপূজা করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব ।’

লজ্জার, ক্ষোভে, অমৃততাপে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িতেছিল, সে চলিতে পারিল না। সুন্দর যুগ্মবাণি বহিয়া দরদর ধারে অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইল। তখন তাহার মনে হইতেছিল, স্বামীর সহিত দেখা হইলে তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাদিয়া বলিব “প্রভু! আমার ক্ষমা কর—আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর ।”

বীণপাণি দিনে দিনে শুকাইয়া আধখানি হইয়া গেল। কত ভ্রম, কত চিকিৎসা কিছুতেই কিছু হইল না। সেই শুষ্ক কান্না—সেই শুষ্ক হা-হতাশ। সে কান্নার আর শেষ নাই, সীমা নাই। ব্যাপার দেখিয়া পাড়ার লোক, বাড়ীর লোক সব অবাক। বীণা কেন এমন করে, কেহ তার কুলকিনারা পার না। সকলেই বলে বীণাকে এবার একবার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিবে দেখ, সেখানে থাকলে যদি সারে। অবনীবাবুও নানাদিক ভাবিয়া আশামী বৈশাখের প্রথমেই বীণাকে শ্বশুরালয় পাঠাইবেন স্থির করিলেন।

এদিকে বীণা নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া কতবার কত কাকূতি মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিয়া স্বামীকে পত্র লিখিল কিন্তু তাহার সে কাতর নিবেদন অগ্রাহ হইল, মরুভূমির পত্রের লবণ পৰ্য্যন্ত দিলেন না। বৌমার কাতর আবেদনে নুরেন বাবুর মা’র কোমল হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি বৌমার

হৃদয়বহার বা অবাধ্যতার কথা সব ভুলিয়া গেলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে নরেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিলে বৌমাকে আনাইবেন ঠিক করিলেন।

(৩)

চৈত্র মাস শেষ হইতে না হইতে, ঢাকে কাটি পড়িতে না পড়িতে নরেন বাবুদের কলেজ বন্ধ হইল। গ্রীষ্মাবকাশে নরেন বাবু বাড়ী আসিলেন। ছুটির লম্বা দিনগুলো নরেন বাবু কেবল বই পড়িয়াই কাটাতে লাগিলেন, বীণাপাণির কোন খবর লইলেন না, খবর লওয়াটা কর্তব্যের মধ্যেও গণিলেন না। রকম স্কম দেখিয়া নরেন বাবুর মা একদিন বলিলেন—বৌমাঝে আনবার কথা তো মুখেও একবার অনিস্ নি, এবার একটা দিনটিন ঠিক ক’রে বৌমাকে আনবার ব্যবস্থা কর। তোর শ্বশুর পাঠিয়ে দিবেন লিখেচেন। বৌমাও ক’ত দুঃখ ক’রে পত্র লিখেচে। বোকা মেয়ে যদি দোষই করে ফেলেচে তা ব’লে কি আর তার ক্ষমা নেই? আর কি চূপ, ক’রে থাকে ভাল?”

“থুব ভাল। আমি সে পাপকে প্রায় দিতে পারুব না, এখানে তার স্থান নাই।”

“পাপ কিবে! সে যে বৌ—ঘরের লক্ষ্মী যে রে? তার আবার স্থান নেই কি? আহা ঘর আলো বৌ, চিরকাল ঘর আলো করেই থাকবে।”

‘তোমার ঘর আলো বৌ তোমাকে আলো ক’রে থাকবে, আমার সঙ্গে কিন্তু নিশ্চয় জেনো তার কোন সম্পর্ক নাই, থাকবেও না।’

—‘একেই বলে পণ্ডিত মূর্খ। এতদিন দেখাপড়া শিখে বুঝি তোর এই বিদ্বেষ হল,

আহানুক কোণাকার। তুই না আনিস, আমার কণ্ঠব্য আমাকে কণ্ঠে হবে, বোমাকে আনতেই হবে !’

চিরবাঁধিতা বীণাপানি বহু আশা বুকে লইয়া স্বত্তরালয়ে আসিল। সে কত কাঁদিল, স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল; বলিল, এ অধিনী আপনার চিরদাসী, আমি অপরাধিনী, আমাকে ক্ষমা করুন। কত কাতরোক্তি, কত কান্নাকাটি কিন্তু কোন কথাই ঝাটিল না, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নরেন বাবু পত্নীর উপর কড়া হইয়া মাতৃভক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। যেচ্ছায় নিরাসিতা বীণাপানী নিরাসিতার মতই রহিল।

সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। নরেন বাবুর কলিকাতা যাত্রার দিনও নিকট হইয়া আসিল। কলেজ খুলিতে আর বার দিন মাত্র বাকী! মনের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া ছুটির শেষ করটা দিন আমার বাড়ীতে কাটাইবেন ঠিক করিয়া সে দিন মধ্যাহ্নের প্রপর রৌদ্রে নরেন বাবু রায়গড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছুটির দিন অতিবাহিত হইল অথচ নরেন বাবু বাড়ী ফিরিলেন না, বীণা সবই বুকিল, সে তাবিল স্বামীর চক্ষে আমি ঘৃণিত অপদার্থ; আমার জন্তই তিনি আজ গৃহতাগী, এমন ঘৃণিত জীবন সে আর রাখিবে না, মরিবেই। মরণই তার সুখ। মেয়েমানুষ মরণে ভয় কি?

প্রায় পঞ্চাধিক কাল মাতুলালয়ে অবস্থিতির পর নরেন বাবু বাড়ী ফিরিলেন। আজ তাঁর কলিকাতা যাত্রার দিন। রাত্রের টোপে তিনি

কলিকাতা রওনা হইবেন। বহুবু পথ দ্বাষ্ট্রী। তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। তাই তিনি যথাসম্ভব সম্বর আনাহার শেষ করিয়া বিশ্রামলাভের আশায় স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শুইতে বাইবেম, এমন সময় দেখিলেন বালিশের নীচে একখানি চিঠির একটু অংশ দেখা যাইতেছে। পত্রখানা বোধ হয় ডাকে দিবার জন্য বীণা বাহিরে রাখিয়াছিল, পত্রখানা বীণার বাল্যসঙ্গিনী শান্তর উদ্দেশে লেখা। চিঠির উপর আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে—“শ্রীমতী শান্তলতা দেবী।” নরেন বাবু পত্রখানি বাহির করিয়া সোৎসুক পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা আছে—“তাই ‘মনের মতন’! তুমি আমার বাল্যসঙ্গিনী; বাল্যকালের সেই একসঙ্গে ধূলাখেলা, বেড়ান, সেই মালাগাঁথা, আজ একে একে সব মনে পড়চে। আমাদের সোণার শৈশব কি সুখেই কেটেছে তাই! সব ছিল, সব গিয়েছে, আমার সে সুখের দিন আর নাই। দুঃখের বোকা মাথায় নিয়ে সংসারে এখনও বেঁচে আছি, ইহাই আশ্চর্য! আমার মনোকষ্টের কারণ এতদিন বলি নাই, আজ তোমাকে বলব। না বুকে আমি সোণার স্বামীকে অবজ্ঞা করেছিলেম, তাই আজ আমি তাঁহার বিব-যরণে পতিতা, সোহাগ, আদর, ভালবাসা হইতে চিরদিনের মত বঞ্চিতা হয়েছি। সংসারে আর বাঁচিয়া কি সুখ তাই? বাকে নিয়ে সুখশান্তি তিনি যখন বিদ্রূপ, তখন বাঁচিয়া থাক। বিড়ম্বনা মাত্র। তাই মনে তাবিয়াছি—এ জীবন আর রাখব না। বিব খাব। তুমি হয়ত বলবে—

আমরহত্যা মহাপাপ, কিন্তু এ দণ্ড-জীবনের আর  
পাপ-পুণ্য কি ভাই? আমিওকে অবজ্ঞা করে  
যে পাপার্জন করেছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-  
করণ আজ এ জীবন আছতি দিব। এ  
কক্ষে আমি সুখে বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু আমার  
অন্তরে যদি তিলমাত্র স্বামীভক্তি থাকে, তবে  
যেন পরকক্ষে স্বামীসুখে সুখী হই—এই আশী-  
র্বাদ করে। তাই। মনে বড় দুঃখ রইল, এ  
জনমে তোমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হইল না।  
ইতি—তোমার হস্তভাগিনী ‘মনের মতন’।

ওঃ কি নিদারুণ কাহিনী! পত্র পাঠে  
নরেন বাবু ধিরিয়া উঠিলেন। মনে মনে  
ভাবিলেন,—আমি যদি আজ আমার বাড়ী  
থেকে ফিরে না আসতুম, তা হলে না জানি কি  
স্বপ্ননাশই ঘটতো। তিনি তাড়াতাড়ি বিষের  
অম্লসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত ঘরখানি তন্ন  
তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও বিষাক্ত  
কোন জিনিস দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে  
হুতাশ ক্রমে চাবির তোড়টা হাতে করিয়া  
বীণাপাণির অজান্তসারে তাহার ট্রাক খুলিয়া  
দেখিতে পাইলেন,—ট্রাকের ভিতর একটা  
কোটায় আফিং রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই  
নরেন বাবু ধনু ধনু করিয়া কাপিতে লাগিলেন,  
জ্বপিত্ত ক্রত স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি  
ধীরে ধীরে আফিংএর কোটাটা ট্রাক হইতে  
বাহির করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। মনে মনে  
ভাবিলেন,—এখনই বীণাকে ডাকিয়া তাহার  
সকল ঘোষ সাক্ষ্যনা করেন। তাহার শূত্র ক্রমে  
আমার পূর্ণ করেন; কিন্তু তখনই লক্ষ্য  
আসিয়া তাহার কণ্ঠে রাখ করিল।

রাত্রি ১২টা বাজিয়াছে। পল্লিবাসী সক-  
লেই সুপ্ত। এই নিমুক্ত রাত্রিতে নরেন বাবু  
তাহার শয়নাগারে চোখ মুঁদিয়া ঘুমের ভান  
করতঃ বিছানায় শুইয়া আছেন—এমন সময়  
বীণাপাণি নিঃশব্দ পদসঙ্কারে ধীরে ধীরে তথায়  
আসিয়া অতি সন্তর্পণে ট্রাকের ডালা খুলিয়া  
কি যেন খুঁজিতে লাগিল। তখন নরেন বাবু  
মুখ তুলিয়া বলিলেন,—“এত রাত্রে ট্রাকের  
ভিতর কি খুঁজছ বীণা?”

বীণার মুখে আর বাক্য সরিল না। সে  
কাদিয়া ফেলল।

নরেন বাবু বিছানা হইতে উঠিয়া বীণার  
হাত ধরিয়া বলিল—“কৈদো না বীণা! সে  
দিনও তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলে,  
আমি ক্ষমা করি নাই, কিন্তু আজ আমি স্বতঃ-  
প্রবৃত্ত হইয়া যেহেতু তোমার সকল অপরাধ  
ক্ষমা করলেম।”

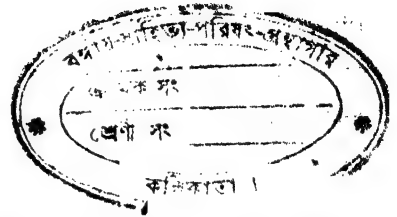
বীণা আবার কাদিয়া ফেলিল। নরেনবাবু  
পকেট হইতে ক্রমাল বাহির করিয়া বীণার মুখ  
মুছাইয়া দিয়া বীণাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া  
বলিলেন—“বীণা! আমি বড় নিষ্ঠুর, আমি  
তোমায় অনেক কাদিয়েছি। বীণা! তুমি  
আমায় ক্ষমা কর।”

বীণার মুখে এবার হাসির রেখা ফুটিয়া  
উঠিল, সে বলিল—“হিঃ! ও কথা কি বলতে  
আছে? আমি তোমার চিরদাসী, তুমি আমার  
ক্ষমা কর।

ভূতনাথ পত্রনবীশ।



## মুক্তি ।



ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমুক্তিঃ  
ব্রহ্মাতীতং গগন সঙ্গুতং তত্ত্বমশ্রাদিলক্ষ্যম্ ।  
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিত্বতঃ  
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সঙ্গুতং তং নমামি ॥  
সর্বদা-সাক্ষী জ্ঞান-মুক্তি ত্রিগুণচরণে নমস্কার ॥  
বহুস্রুতী চিগ্নরী বিশ্বমুক্তিকে নমস্কার ॥

পরমাত্মরূপী নিজবোধরূপ আপনাকে নমস্কার ॥

আজ আমরা তোমার চরণতলে নতভাঙ্গ-  
শিরে কৃতজ্ঞলিকরে সমবেত হইয়া “মুক্তি”র  
কথা কহিতেছি। তোমার অচল বিমল ঐক্য  
ভূমাসুখ স্বেদনময় জ্ঞানচক্ষুর নয়দৃষ্টি আমা-  
দিগের শিরে বর্ষিত হউক। তোমার যে মহা-  
মহিম দৃষ্টির নিত্যবিকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জ  
সজীবিত—সচেতন, যে দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া  
অপৌরুষেয় ক্ষতি “স ঐক্যত” এই মহাসত্য  
বোধনা করিয়াছেন, তোমার যে ঐক্যকে এ  
ব্রহ্মাণ্ডজের একমাত্র প্রাণ বলিয়া ব্রহ্মহত্রে  
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সর্বভেদি ঐক্য  
আমাদিগের হৃদয়গ্রাহি ভেদ করুক; আমা-  
দিগের সংশয় ছিন্ন হউক; কর্কশ হউক;

আমরা অমৃত লাভ করি; তোমার প্রাণের  
প্রাণ আশ্রয় আশ্রয় বলিয়া বন্ধে জড়াইয়া  
ধরি। তোমার সিদ্ধার্থাধ্য চরণে মহাকাল  
দর্শন করিয়া কাগজের অতীত হই। তোমার  
ক্ষেম-পূণ্যবপুতে ত্রিগুণের লীলানর্জন দেখিয়া  
গুণত্রয়ের বাহিরে যাই। তোমার জিন্মনে  
অবস্থাত্রয় দর্শন করিয়া আমরা অবস্থাত্রয় অতি-  
ক্রম করি। তোমার অরূপ-সাগরে রূপতরঙ্গের  
স্নেহোচ্ছ্বাসময় অভিঘাতে নাচিতে নাচিতে  
আজ নিস্তরঙ্গ “ত্রিগুণ অমৃত” লক্ষ্য করিয়া  
কেটি প্রণাম করিতেছি, আমাদিগের ত্রিতাপ  
দূর হউক। প্রণাম গ্রহণ কর মা।

জানি—আমরা অনধিকার চর্চা করিতেছি,  
অনধিকার প্রার্থনা করিতেছি। মুক্তি দুয়ের  
কথা—“মুমুক্শু” বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার  
এখনও আমাদের আসে নাই—মুমুক্শু হইবার  
ইচ্ছাও এখন প্রাণে জাগে নাই; জন্ম-মৃত্যু নির-  
মিত বস্তু বোধাত্মক জীবতাবকে এখনও জালা  
বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; জাগতিক স্তরে  
এখনও পরম সুর বোধ আছে, তুচ্ছবোধ আসে

নাই; তোমাকে পাইবার মততা আনিবার জন্য যে প্রাণক সুখার সমুদ্র হইয়া তুমিই বিরাজ করিতেছ, আমরা এখনও তাহা দেখিতে না পাইয়া মাত্র প্রাণকের জন্য প্রাণক সেবা করিতেছি—প্রাণকের মততাতেই উন্নত হইয়া রহিয়াছি; তোমার সহী সত্তার শ্রদ্ধা এখনও আপে নাই; তোমার স্বাধীনতার আভাসই এখনও পাই নাই; কেমন করিয়া জীবনকে বন্ধন বোধ করিব? বন্ধন বোধ না করিলে কেমন করিয়া মুক্তির জন্য লাগায়িত হইব? যুদ্ধ না হইলে কেমন করিয়া মুক্তির চর্চা করিব? “জীব বন্ধনময়” ইহা যতক্ষণ বুকের কথা মাত্র থাকিবে, গ্রহীর মধ্যস্থ সংকীর্ণতায় যতক্ষণ আপনাকে স্তম্ভপ্রায় বলিয়া বোধ না করিব, ততক্ষণ “মুক্তি” জীবের পক্ষে একটি শব্দ মাত্র। যুগ্মী পুতলী এখনও প্রাণটুকু অধিকার করিয়া বলিয়া আছে, চিরমী পুতলী কেমন করিয়া বুকে ধরিব?

তথাপি তোমার চরণে কোটি নমস্কার; আমরা মুক্তির কথাই কহিব। তোমার দিকে নিমেষের জন্যও যখন চক্ষু ফেরে, তখন যে বড় যন্ত্রণা অনুভব করি। তোমার যে প্রাণ তরিয়া অত্যাধি দেখিতে পাইলাম না। দেখিতে পাওয়া দূরের কথা—প্রাণ ভরিয়া তোমার দেখিতে চাহিতে পারিলাম না।

যখনই তোমার মনে পড়ে, যখনই মনে পড়ে—তোমা হইতে আমাদের উৎপত্তি, তোমাতে আমাদের অবস্থান, তোমার ইচ্ছার আমরা ইচ্ছাময়, তোমার প্রতিবিম্বে আমরা বেদময়, ইন্দ্রিয়ময়, শক্তিময়, প্রাণময়, জ্ঞানময়,

চৈতন্যময়; যখন মনে পড়ে—তোমার লীলার অনন্ত এ চেতনাচেতনাস্রব সৃষ্টি বিস্তার বিস্তারিত—তোমারই স্নেহে পরিবৃত, তোমারই শক্তিতে অনুপ্রাণিত, তোমারই ভাতিতে অনুভাত; যখনই মনে পড়ে—এ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অবলম্বন, তুমি আপন সত্তার আমাদিগকে সত্তাবান্ করিয়াছ, আপন শক্তিতে শক্তিবান্ করিয়াছ, আপন প্রাণ দিয়া আমাদের প্রাণময় করিয়াছ, আত্মদানে আমাদের আত্মা গড়িয়াছ; যখন ঋষিবাক্য মনে পড়ে, “ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু অস্ত সত্যস্ত সর্বাণি ভূতানি মধু।” যখন মনে পড়ে—তুমি আমাদের গতি প্রভু জ্ঞাত। সাক্ষী শরণ লুপ্ত প্রভব ও প্রলয়ের একমাত্র স্থান, তখন—তখন যে মর্ষের মর্ষে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করি; এমন যে প্রিয়তম তুমি—এমন যে প্রাণের প্রাণ—আত্মীয়ের আত্মীয় তুমি—সেই তোমাকেই একবার দেখিতে পাইলাম না। দেখিতে চাহিলাম না। তোমার আত্মদানের বিনিময়ে হৃদয়ের একটা প্রাণভরা তাবের উচ্ছ্বাস দিয়া (ভালবাসা দূরের কথা) কোটি জীবনেও একবার—বেশী নয়, একবার মাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

অগতে কাহারও দ্বারা তিলমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলে, আজীবন তাহা তুলিতে পারি না, তাহার নিকট আজীবন হৃদয় কেমন খুঁতাই নত হইয়া পড়ে! আর এত ভালবাসা, এত স্নেহের বিনিময়ে—তোমার যুক্ত প্রাণে প্রবেশ করিয়া, যুক্তপ্রাণে একবার তোমার চরণে আত্মবোধটা ঢালিয়া দিব!—ইহা পারিলাম না?

আমরা হইরা জীবনে “কই তুমি” বলিতে পারিলাম না? এ যুগ—এ যুগে যুহুর্ভে যুহুর্ভে আমাদিগের সমস্ত সুখ সন্ধানকে তুলিয়া দেয়। বাহার জন্য এমন, যে মোহ বন্ধনের জন্য প্রাণ, সাময়িক ইচ্ছা সম্বন্ধে একবার মাত্র মুক্তভাবে দাঁড়াইয়া তোমার দিকে চাহিতে পারে না, তোমার জন্য কানিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না, সে বন্ধনের কবল হইতে মুক্তি চাহিব না? জানি—এ পরিণামময় সংসার অনিষ্ট, জানি—অনিত্য বস্তু লইয়া শরীর গঠিত করিয়াছি, সুতরাং ইহার কবল হইতে মুক্তিলাভই প্রেরণ। জানি অবিবৃদ্ধ গুরুরূপে—তোমার তুলনায় তুচ্ছ এ জগৎকে বা দেহাত্মবোধকে তুচ্ছজন করিয়া আত্মসংস্থিত হইবার বা তোমায় লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। জানি, পরিণামশীলা প্রকৃতির ভাবরঞ্জনায় ত্রিতাপভারে আমি আক্রান্ত, তীব্র বৈরাগ্যের অমূল্যনে বিবেক-খ্যাতির সাহায্যে এ তাপ হইতে উদ্ধার হওয়াই পুরুষকার। জানি—মায়া-বিভ্রান্তিতে মুহমান হইরা না থাকিয়া ব্রহ্মরূপে তোমার ভূবাস্থে অবৈততবে আপনাকে মগ্ন করিয়া অহংতত্ত্বকে ব্রহ্মতত্ত্বে মিলাইয়া দেওয়াই যজ্ঞোচিত ধর্ম।

বহুভাবে অবস্থানে যে যন্ত্রণা, যে ক্ষুদ্রত্ব, যে হাস্য ভোগ করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে না জানিলেও, প্রতি পদক্ষেপে অমৃতত্ব না করিলেও অমৃত-বৃত্তাময় সংসারপথে সময়ে সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি। তাই সময়ে সময়ে যুহুর্ভে হই। সুতরাং তোমার জীৱণ-ভলে মিসরা মুক্তির কথাই আলোচনা করা কর্তব্য; কিন্তু,

ওধু সেজন্য নহে, জানি—কর্ণান্বর্তনে, সদস্য বাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত হইতে হইতে একদিন না একদিন, মুক্তি না চাহিয়া জীবের থাকিবার উপায় নাই, জগৎ তুচ্ছ হইবেই হইবে, ব্রহ্মপদ প্রিয় হইবেই হইবে, জীব, আত্মাকে চাহিবেই চাহিবে। কিন্তু ওধু সেজন্য নহে, তুমি অবৈত-বাদ মতে খাঁর স্বরূপে মিলাইয়া লইবে, অথবা ত্রিশিষ্টাবৈতবাদীর ভাষায় তোমার মিত্য আনন্দলীলার সাহচর্যে অধিকার দিবে, অথবা সাংখ্যবচনে আমি স্বাণীন আপ্তকাম বিজু হইব, যুহুর্ভে হইবার ইহাই কারণ হইলেও, আমরা ওধু সেজন্য তোমার সম্মুখানে মুক্তিপ্রসঙ্গ করিব না।

আমরা বুঝি—তোমাতে আমাতে যে সম্বন্ধ সে মহাদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, সে সত্যসম্বন্ধ যথায় যথাবে ফুটাইয়া তুলিয়া তোমার সহিত ব্যবহার করিতে যদি না পারি, তবে মুক্তিস্বপ্ন দূরীভূত হউক। আমরা যদি এই-খানেই মুক্তপ্রাণে আমাদিগের প্রাণ বলিয়া তোমার জন্মে ধরিতে পারিতাম, যদি আত্মার আত্মা বলিয়া বারেকের তরেও মুক্ত-জন্ম তোমার চরণ-রজোদ্বারা চর্চিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এ ত্রিতাপের আলাস কান্তর হইতাম না, এ প্রকৃতির অকলে আবদ্ধ থাকিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। আমার মন্দিরার মুক্ত থাকিতে, অজ্ঞানে অচেতন থাকিতে ক্ষুদ্র হইতাম না, যে আত্মার ভাবের স্বরূপ সম্পর্কে জগতের ধূলি প্রাণের প্রতিমা হয়, সাক্ষাৎ সেই আত্মারূপে অবস্থিত তোমাকে প্রাণ দিয়া পূজা করিতে পারিলাম না, মুক্তি না পাইলে, মুক্ত-

প্রাণ, যুক্ত-কর, যুক্ত-চিত্ত না হইলে, যুক্ত-বশিষ্টের যুক্ত প্রাক্রমে না দাঁড়াইলে, তোমার সঙ্গে আমার আমার আলিঙ্গন হয় না। দেহের ব্যবধান—দেহাশ্রবোধের ব্যবধান, তোমার আমার নিগূঢ় আলিঙ্গনের মাঝে থত্তবোধের বিচ্ছেদ-পুল পাতিয়া রাখে। শুধু সেইজন্য—সেই জন্য শুধু—পরমাত্মন! আমরা যুক্ত চাহি। আমরা যুক্তির কাল, তাই আমরা যুক্তির আলোচনাই তোমার চরণে করিতে ইচ্ছুক।

আমর যুক্তি চাহি—তুমি যুক্ত বলিয়া। অঙ্গগতে দেখিতে পাই—যে আমাদের মতন, যে আমাদের মনের মত, তাহাকেই আমরা ভাল বাসি। মনের মতন না হইলে কাহাকেও হৃদয় কবাট উন্মুক্ত করিয়া প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায় না, তাই যে আমাদের মত তাহাকেই আমরা আশ্রয়ান করি অর্থাৎ আশ্রয় বলি। সুতরাং তোমার মত না হইলে কেমন করিয়া তোমার হৃদয়

অধিকার করিব? সবই তোমার স্বরূপ হইলেও তোমার যুক্ত-স্বরূপই সর্বত্র অব্যাহত। তোমার মত হইলে, তবে তোমার অব্যাহত প্রেমে অতিশিক্ত হইব। তোমার অব্যাহত প্রেমে প্রসিক্ত হইব সেই জন্য যুক্তি চাহি।

আম্মাতেই আশ্র-লাভ হয়, আম্মাতেই আশ্র-সিদ্ধি হয়, আম্মাতেই আশ্র-দর্শন হয়, সব না শুধুসে আশ্রয় হওয়া যায় না, তাই পরাম্বন! তাই প্রাণ-কুলিতে চাহি, যুক্ত হইতে চাহি। প্রাণ ও পরমাত্মার নিত্যবোধের জন্য আমরা তোমার চাহি না, আম্মাতেই বাহার প্রবন্ধী তাৎপর্যকে

আশ্রয়তা-বলে, সেই আশ্র-ধর্ম-তোমার প্রবন্ধে হান পাইতে চাহি—যুক্তি চাহি। আম্মার সবককে আশ্রয়তা বলে। আম্মার দ্বন্দ্ব সবককে অঙ্গগতে তাহাদিগের সঙ্গে আবদ্ধ হই, অনায়াসে অকাতরে নিজ নিজ প্রাণ দিয়া তাহাদিগের তুষ্টি বিধানে কুণ্ঠিত হই না—কত আদরে—কত প্রাণ দিয়া কত কুসুমন্তর বিস্তার করিয়া তাহাদিগের মত হৃদয়ে আসন প্রস্তুত করি, আর তুমি—তুমি সেই আশ্রা স্বয়ং, আশ্রয়তা সেই চত্রেয়র কোমলী, তুমি সেই চত্রে স্বয়ং, তোমার দিকে প্রাণ! একটা উচ্ছ্বাস চালিয়া দিতে পারি না। সহস্র বাসুকীর হর্ষহ তার শিরে বহন করিতাম, প্রকৃতির সহস্র ভাবব নৃত্য নিত্য এই বন্ধ বিমর্দিত হইতে দিতাম, মায়ায় সহস্র শৃঙ্খল কুলহার করিয়া গলদেশে পরিধান করিতাম, অজ্ঞানের অনন্ত মূর্ছায় অকাতরে ঘুমাইয়া থাকিতাম—যদি তোমাকে পাইতাম। তাই হে আমার পরমাত্মন! তাই যুক্তি চাহি।

যুক্তি কেন চাহিব, এবং যুক্তি কি, ইহা ভাল করিয়া না বুঝিলে যুক্তিকামী বা যুক্ত হওয়া যায় না, তাই তোমার চরণে প্রথম যুক্ত হইবার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলাম। প্রাণকে বন্ধিত করিয়া যে জ্ঞানের জমাট, সত্যদর্শী ভবিয়া অচল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, বেদান্তী ও শঙ্করী তাৎকার ও পণ্ডিতগণ বেদান্ত সাহায্যে তাহা শব্দ করিয়া তর্কের রাসি রাসি প্রস্তরবস্ত প্রস্তুত করিয়া পরস্পর নিত্য মত কেপ প্রতিক্ষেপ করিয়াছেন ও করেন, আমরা দুঃ হইতে তাহাদিগকে দূর

করিব, সে লোষ্ট্রাঘাত হইতে ধ্বাংসাধা হুয়ে থাকিতে চাই। আমরা তাঁহাদিগের ছন্দে, তাঁহাদিগের ভাবায় যুক্তি কি তাহা বুঝিতে বাইব না। তোমাকে পাওয়ারই যুক্তির ফল। সে পাওয়ার সাযুজ্যই হোক, সারুপ্যই হোক, সার্বাণ্যই হোক, কিংবা সালোক্যই হোক। সে পাওয়ার নাম—আত্মদর্শনই হোক, কৈবল্যই হোক, নির্বাণই হোক, তত্ত্বমজাদি-লক্ষ্য ব্রহ্মত্বই হউক, অথবা স্বগত ভেদমাত্রদর্শী অলৌকিক জীবত্বই হোক।

“জন্মান্তর্য যতঃ” সেই তোমাকে লাভ, অথবা পরমার্থতঃ যাহা আমি, সেই আমাকে লাভ, ইহাই যুক্তির ফল। সূত্ররূপে ঐ রূপে তোমাকে বা পরমার্থতঃ আমাকে অথবা আত্ম-বোধ পাওয়ার পথে যাহা কিছু অন্তরায় সেইগুলির কবল হইতে ঐকান্তিক পরিজ্ঞানের নামই যুক্তি।

এই যে তোমাকে লাভের কথা বলিলাম ইহা বিষয় লাভের মত লাভ নহে। বিষয় বিশেষ আমাদের অধিকারভূক্ত হওয়াকে আমরা লাভ বলি; কিন্তু তোমাকে লাভের সমুদ্র—তুমি আমাদের অধিকারভূক্ত হও না—আমরাই তোমার ঐকান্তিক অধিকারভূক্ত হই। আমাদের নিজেদের উপর যে জীব ভাবীর ঐকান্তিক অধিকার আছে—একান্তভাবে তাহা অগম্য হইয়া তোমার ভাবের বা নির্দিষ্ট আত্মবোধের যে অধিকার বিস্তার, তাহারই নাম তোমার অধিকারভূক্ত হওয়া—তোমার হওয়া বা তোমাকে লাভ করা। এইরূপ তোমাকে (বা কার্যতঃ আমাকে)

লাভ করিতে যতকণ অন্তরায় থাকিবে, যতকণ ইহা মাত্র অসম্পূর্ণতা থাকিবে ততকণ অধিকারভূক্ত হইতে পারিবে না।

তোমার হওয়া—তোমাকে পাওয়া বা তোমায় হওয়া, অথবা তুমিই আত্মা হওয়া; আত্মায় হওয়া, অর্থাৎ স্বরূপ লাভ করা ইহাই যুক্তি, এবং ইহার অন্তরায়কে প্রকৃতি-সংযোগ, অনাদি সংস্কার গ্রন্থি, অবিজ্ঞা ইত্যাদি বহুবিধ আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। নাম বাহ্যই হোক তাহাতে বড় একটা আপেক্ষার না, অন্তরায়ের আবরণ বা সংযোগ হইতে কোন প্রকারে যদি উদ্ধার পাই, তবেই আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে—তোমাকে প্রাণ ভূমি পাইব—আমাদের সেই আশা পূর্ণ কর—অন্তরায় ঘুচাইয়া দেও—আবরণ উড়াইয়া দেও। চক্ষু দাও—তোমার দেখি, প্রাণ দাও—তোমায় অর্পণ করি, আত্মদান কর—তোমার আত্মার আত্মা বলিয়া, একবার সম্পর্ক করা পরমাশ্র-স্পর্শ সুখে আত্মহার্য হই। স্রুতি, দর্শন-শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষির্গণ এবং ভাষ্যকার পণ্ডিতগণ এ অন্তরায়কে অনেক প্রকার নাম বা উপনামে উল্লেখ করিয়াছেন—অনেক প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। অনেককে অনেক প্রকারে ইহার শরীর ব্যবস্থার পরিচয় ইহার মর্ম, শিরা, প্রাণিরা, ধমনী, নাড়ী নির্ধারিত করিয়াছেন, এবং এইরূপে অনেক রকম ও বাধীর সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা বাক্য-বিসংলেশে না রাখ। তবে প্রধানতঃ এই দেখিতে পাই যে—এ অন্তরায় হওয়ার পক্ষি বিশেষই হোক, অথবা “প্রধান” নামে কোন শরীর ভব



বিশেষই হোক, কিংবা “বাহা” নামে কোন  
 সুবর্ণনির্মিত প্রস্তরাধারই হোক, অথবা  
 “অচিৎ” বলিয়া কোন আলোকরচিত অন্ধ-  
 কারই হোক, ইহা আমাদিগের অন্তরে ।  
 আমরা তাহাকেও ভ্রান্তদর্শী বলি না, দেখিবার  
 বা বলিবার তারতম্যে কতক বিসদৃশ বোধ  
 হইলেও, সকলের দর্শনই প্রাধান্যতঃ সত্যদর্শন  
 বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি ; কেন না—যেমন  
 করিয়াই দেখুক তোমাকেই দেখিয়াছে ।  
 তোমাকেই দেখিবার জন্য সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ  
 করিয়াছে । অন্তরই চৈতন্তরূপী বপ্রকাশ  
 তোমার ই আলোকে, তোমার দেখিতে পিয়া  
 “অন্তরায়” নামীয় সে অন্তরালকে বহুরূপে  
 নিক্ষেপ করিয়াছে । অনন্ত দিকে অনন্তরূপে  
 বিকসিত সে অন্তরায়ের স্বরূপ, তোমারই  
 অন্তরের মত নির্দেশ হইয়াও অনির্দেশ, বচনীয়  
 হইয়াও অনির্কটনীয়, নিত্য হইলেও অনিত্য  
 ভরসার, জ্ঞান-বৈচিত্র্য হইলেও স্বল্পতার জ্ঞান  
 বা অজ্ঞান, বিভা হইলেও অপরা বা অবিভা ।  
 উহা সত্য হইলেও সত্যে অবস্থিত, মিথ্যা  
 হইলেও আমাদের চক্ষুতে সত্যরূপে প্রতিভাত ।  
 তুমি এইটুকু আমরা দেখিতেছি যে, সে অন্ত-  
 রাল আমাদিগেরই অন্তরে, আর সে আমা-  
 দিগের অন্তরে থাকিরাই, আমাদিগকে সমাবৃত  
 করিয়া রাখিয়াছে—তরঙ্গ ঢকল করিয়া  
 রাখিয়াছে, নানা প্রকারে নানারূপে তোমার  
 দিকে আমার অন্তঃকরণকে ক্রিান্তে ধের না ।  
 তোমার প্রশ্ন ভরিয়া চিরকাল দেখিতে ধের  
 না, আমাকে তোমারই হইতে ধের না ।

পরাক্রম! অস্বস্তম আমায়! বর্ষাধ ই কি

একলি অন্তরায় ? অন্তরায় ঘটাইবার জন্যই কি  
 এ বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ? অন্তরায়  
 ঘটাইবার জন্যই তুমি অন্তরে অস্বাভি-সংস্কার-  
 পুঞ্জরূপে বিধিত হইতেছ ? আত্মা দিয়া  
 বাহাকে গড়িয়াছ, আত্মবিস্মৃতির অভুল গর্ভে  
 তাহাকেই নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্যই  
 কি, আবার অন্তরায় রচিত করিয়া তাহাকে  
 ত্রিতাপে দগ্ধ করিতেছ ? প্রচ্ছন্নভাবে তাহারই  
 অন্তরে সাক্ষীরূপে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিয়া  
 সে দহন-বহুলা দর্শন করিতেছ ? ক্ষুদ্র পতঙ্গকে  
 একদিকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছ, “অগ্নির  
 দাহিকা-শক্তি আছে—দগ্ধ করে” এ জ্ঞান  
 তাহাকে দৃঢ় করিয়া দাও নাই ; অথচ অন্তরালকে  
 রূপের মোহে—অনল-শিখার সৌন্দর্য্য-মোহে  
 তাহাকে মুগ্ধমান করিয়া রাখিয়াছ ; অনলশিখা  
 দর্শনে নিরীহ পতঙ্গ উল্লাসে তাহাতে পতিত  
 হইয়া বিদগ্ধ হইতেছে । ইহাই কি তোমার  
 আনন্দ-লীলা ? দহন দর্শনই কি তোমার আনন্দ-  
 প্রাচুর্য্য ? আনন্দময় যাহার নাম ইহাই কি তাহার  
 ব্যবহার-পরিচয় ? আত্মীয়তারূপে দৈব আত্মধর্ম,  
 যাহাতে ব্যাধিত হয় । স্বয়ং আত্মা তুমি—  
 তোমার কি তাহাই আনন্দ-কীড়া ? অন্তরায়  
 কি অন্তরায়তা-সাধনের জন্যই রচিত । কুল-  
 দৃষ্টিতে যে অন্তরায়ের এই ফল, যে বিচ্ছেদের  
 এই দহন সে বিচ্ছেদের—সে অন্তরায়ের  
 আবৃত করিবার কি অন্য উদ্দেশ্য নাই ? বৃষ্টি-  
 যাহি পরমাত্মন । উপস্থিত অন্তরায় বলিয়া  
 পরিচিত হইলেও, উহা অন্তরায় নহে ; উহাই  
 বহুতার জ্ঞান আমাদিগকে বন্ধে ধরিয়া ধেশ  
 হইতে—বেশভরে, অবহা হইতে অবহাকরে,

তুণ হইতে তুণান্তরে, শক্তি হইতে শক্তান্তরে, জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরে বহন করিয়া তোমার অব্যয় চরণতলের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দেয়। তাই ক্রটি কর্ণকে “অমৃত” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শস্ত্রের পক্ষে যেমন তুণ, ফলের পক্ষে যেমন কুলুম, গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে যেমন উষন, এই অনাদি কর্ণসংস্কার বা প্রকৃতি বা অবিস্মারূপ শক্তির সাহায্যে ঠিক তেমনি করিয়া তুমি আমাদিগের পরিবর্জন পরিপোষণ ও চৈতন্য বিকাশ করিয়া দেও। তোমার বেদন-গ্রহণোপযোগী ভাবে আমাদিগকে স্বচ্ছ করিয়া দাও। বহন হইতে আমরা স্বচ্ছ হইতে থাকি তখন হইতে ইহা অন্তরায়রূপে প্রতীয়মান হয়, তৎপূর্বে ইহা পরিপালিনী। ক্রত শরীরপোষণের জগত্ই যেমন শিশুর অঙ্গচাকলা, আমাদিগের জ্ঞান বেদনময় আধ্যাত্মিক শরীর পোষণকারী কর্ণ-চাকলা জগত্ইবার জগত্ই তদ্রূপ এ প্রকৃতি বা অবিস্মা। যৌবনে শারীরিক চাকলা লুপ্ত হয়, মনশ্চাকলা পরিবর্দ্ধিত হয়। মনের পুষ্টি ক্ষুটতর হয়, তখন বাল্যাকাচিত অঙ্গচাকলা তাহার অন্তরায়। তদ্রূপ আমাদিগের জ্ঞান-বেদন-চাকলা বা পুষ্টি আরম্ভ হইলে এ কর্ণাশয় চাকলা অন্তরায় হয়। তাই প্রকৃতিকে আমরা অন্তরায় বলিয়া দেখি। হে হির প্রব বটপত্র-শারী সনাতন-আশ্রয়! আমাদিগের এ অন্তরায় কিসে দূর হইবে? তোমার কেনন করিয়া পাইব? কেনন করিয়া মুক্ত হইব?

ভূমিও অন্তরে এ অন্তরায়ও অন্তরে, ভূমিও বাহিরে এ অন্তরায়ও বাহিরে। হে অন্তর্বাহ-ব্যাপী অনাদি অনন্ত জগত্! এ অন্তর্বাহব্যাপী

অন্তরায় দূচাইয়া দাও। “বহেরপার চকলে” তোমায় মহতী রমণীয় বৃত্তি দেখিয়া আমাদিগের অন্তরায়-গ্রহি ভেদ হইয়া যাউক।

শ্রুতি সহস্র যুগে সহস্র বার বলিয়াছেন ও বলেন—তোমাকে দেখিলে—তোমাকে জানিলে—তবে এ অন্তরায় দূর হয়। তবে কি অন্তরায় থাকিতেও তোমায় দেখা যায়—তোমায় জানা যায়?

যাঁহারা ভূমি ব্যতীত অন্ত এক প্রধান বা প্রকৃতি নামে তব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন—ঐকান্তিক অধ্যবসারে আত্মবিশেক উৎপাদে প্রয়ত্ন করিতে করিতে আত্মবর্জন সাক্ষাৎকার হয়, নেতি নেতি ভাবে প্রকৃতি বর্জন করিতে করিতে আত্মার বিষল জ্যোতি প্রকাশ পায়। তখন প্রকৃতি লাহিতা হইয়া প্রস্থান করে, আর আসে না। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীরা কর্ণের দ্বারা চিন্তাশুদ্ধি করিয়া বিচার যুক্তিসাহায্যে “ব্রহ্মাতীত অন্য কিছু নাই” ইহা জানিতে অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা তোমাকে লাভ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর এক প্রকারের অদ্বৈতবাদ আর একটু বিশেষ করিয়া বলেন—জ্ঞানের দ্বারাই জানা যায় বা পাওয়া যায় ইহা সত্য, কিন্তু সে জ্ঞান—বাহ্য বাচনিক জ্ঞান অথবা যুক্তি-বিচার-প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান নহে—সে জ্ঞান বেদনাকারে উপস্থিত করিতে হয়। তত্ত্বের আকারে তাহা ক্রমবৃত্তিরূপে প্রবাহিত করিয়া তোমার চরণ বিদ্যুত করিতে হয়, তবে অন্তরায় বার, ভূমি আস। যাঁহারা ব্রাহ্ম জ্ঞানাত্মনীরূপের কথা বলিয়াছেন—তাঁহারা এত খুলিয়া না বলিলেও—সে জ্ঞানের এত

অকর্তৃক এত প্রাণ-পরিগ্রাসিনী শক্তির কথা  
উল্লেখ না করিলেও বস্তুতঃ জ্ঞান যতকণ উক্ত  
প্রকার প্রাণময় চৈতন্যময় প্রেমময় না হয় তত-  
ক্ষণ উহা মুক্ত জ্ঞান মাত্র । সাধনা সম্বন্ধে  
বাহারী কথায় আলোচনাও করিয়াছেন, তাহা-  
রাই ইহা বহুক্ষেপে স্বীকার করিবেন ।

বাহা অপৌরুষেয় বেদ, তাহা সত্যবেদন  
সাধক ঋষিদিগের আবিষ্কৃত বেদনপুঞ্জ ।  
তোমার মায় বা মন্ত্রাদির অন্তর্গত যে জ্ঞান, সে  
জ্ঞান যদি বেদনময় না হয়, যদি তাহা প্রাণকে  
তোমার মায় না করে, যদি আমাদেরকে তৎজ্ঞানময়  
করিয়া দিয়া, আমাদের আত্মাকে সেই সেই  
মায় বা মন্ত্রাদি লক্ষিত তোমার স্বরূপে পরিণত  
না করে, যদি তোমার নাম-কীর্তন, অঙ্গুশয়ণ, চিন্তা  
বা আয়োচনা করিতে গিয়া আত্মা তোমার  
স্বরূপ লাভ না করে, তবে সে নাথোচ্চারণ,  
সে চিন্তা সে আলোচনা যথা-প্রয়োজন কার্য-  
কারী হইল না । ইহাই আমরা বুঝিতে বাধ্য  
এবং ইহাই সত্য । তুমি বলিতে তোমারময় হওয়া  
চাই । ইহাই প্রবাস্তবতা বা ভক্তির ফল ।  
এই যে মতে পুরোক্ত “অন্তরায়টী” বিদূষিত  
কল্পিত অল্প সাম্প্রদায়িকতা আনিয়া, একদল  
ইহাকে অনির্জনবীর্য মায় বলিয়া, কার্যতঃ  
বিখ্যাত করিয়া উড়াইয়াছেন । অন্য দল অভি-  
সম “অচিং” নামে এক তত্ত্ব স্বীকার করিয়া  
সমস্ত আবিষ্কৃতবাদের সার্বকতা সম্বন্ধে সাধিত  
অবিচ্ছিন্ন দ্বিধা কার্যতঃ তোমার ও আমাদের  
একান্তেই মনুষ্য অস্তরায় নির্ধারণ করিয়াছেন ।  
তোমার বাক্য ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই ।  
কার্যতঃ প্রধানবাদ, মায়াবাদ, বা অচিংতত্ত্ববাদ

যুক্তি-সাধন সম্বন্ধে সকলেই প্রধানতঃ একটা  
কথা বলিয়াছেন । সে কথা তোমা হইতে  
অতিরিক্ত বলিয়া বাহা বিবেচনা হয়, তাহা  
ত্যাগ করিয়া, অস্বীকার করিয়া, অথবা তোমা-  
রই অঙ্গ বলিয়া ধারণা করিয়া, যে কোন  
প্রকারেই হউক, মাত্র পরমাত্ম-স্বরূপ বোধে  
বোধময় হওয়া, তোমার জ্ঞানে জ্ঞানময় হওয়া,  
তোমার বেদনে সম্বন্ধিত হওয়া, ইহাই  
তোমার পাইবার বা মুক্ত হইবার মূলতঃ  
সর্বানুমোদিত উপায় । সেই তুমি আনন্দময়  
বিভূ সাক্ষী সর্বাস্তবধামী সর্বাত্মা সকলেরই  
একান্ত আশ্রয় । বাস্তবাবে হউক বা সমষ্টি-  
ভাবে হউক, হে পরমাত্মন ! “অহং” ভাবে  
হউক বা “ত্বম্” ভাবেই হউক, এইরূপ দেখিতে  
দেখিতে যখন আমরা তুমি ছাড়া আর কিছু  
দেখিতে পাইব না, তুমি ছাড়া আর কিছু  
আমাদের চক্ষু প্রতিভাত হইবে না—  
প্রকৃতি থাকিলে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে—মায়  
থাকিলে উড়িয়া যাইবে, অচিং থাকিলে  
তোমারই অঙ্গে বিজড়িত হইয়া যাইবে—সব  
তোমারময় হইবে । কিছু থাকিবে না—কিছু  
দেখিতে পাইব না—কিছু বুঝিতে পারিব না—  
তথু তুমি—তুমি তথু পরমাত্মন তুমি থাকিবে,  
যখন কিছু থাকিলেও থাকিবে না, না  
থাকিলেও থাকিবে না, তখন স্বতঃই বেদ  
ধ্বনিত হইবে “স এব সর্বং যদ্ব্যতঃ বস্তুতাব্যং  
সমানন্দম্” । তখন স্বতঃই অপৌরুষেয় স্বাক্ষর  
প্রত্য হইবে “ন তুমি রাণো ন চ বহিরন্তি ন  
চামি লো বৈহন্তি ন চাশরক” । তখন স্বতঃই  
প্রত্য হইবে “ন জগতে স্রিরতে বা কদাচিং,

নারংকৃত্য ভবিষ্যৎ বা ন ভূয়ঃ । অজ্ঞো নিত্যঃ  
 বাসতোহিহং পুরাণো” । তখন সর্বতঃ প্রসূত  
 তোমাকে আমারই পরমাত্মাকে দেখিয়া হৃতঃই  
 কষ্ট হইতে নিঃসৃত হইবে—“আত্মবান্ধবাং  
 আত্মোপরিষ্টাং আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরত্যাং  
 আত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মাবেদং সর্বং ।

( ছান্দোগ্য )

কিন্তু এই ভক্তাত্মক জ্ঞান, অথবা জ্ঞানাত্মক  
 ভক্তি, এই যে বিবেকাত্মক কর্ম অথবা কর্মাত্মক  
 বিবেক, ইহা লাভের উপায় কি ? জ্ঞান, ভক্তি  
 ও কর্ম, ইহা একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ  
 মাত্র ।। কিন্তু যে প্রাণধর্ম ইত্যাদিগের ভিত্তন  
 অনুপ্রবিষ্ট থাকিলে, তবেই ইহা কার্যকরী  
 হয়—তোমাকে হৃদয়ে আনিতে সক্ষম হয়, যে  
 শক্তিতে প্রাণময় হইলে, তবে ইহারা তোমার  
 চরণ বিধৌত করিবার উপযুক্ত হয়, সে শক্তি  
 কি ? যে শক্তি মূলে প্রতিষ্ঠিত হইলে—কর্মকে  
 জ্ঞানময় করে, জ্ঞানকে ভক্তিময় করে, ভক্তিকে  
 প্রাণরূপী তোমার প্রাণকে আর্দ্রভূত করিতে  
 সমর্থ হয়, সে শক্তি কি ? যে শক্তির অভাবে  
 আমাদিগের মত ক্ষুদ্র জীবের, সমস্ত জ্ঞান,  
 সমস্ত ভক্তি, সমস্ত কর্ম, কত কাল—অতো !  
 কতকাল ধরিয়া হৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে—হায় !  
 তোমাকে আনিতে সমর্থ হয় নাই, আমা-  
 দিগের সমস্ত পরিশ্রম, বাহার অভাব পণ্ড  
 করিয়া রাখিয়াছে, আমাদিগের সমস্ত গবে-  
 ষণাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমাদিগের  
 সমস্ত যুক্তি ও বিচারকে বিতণ্ডার পরিণত  
 করিয়া রাখিয়াছে, আমাদিগের সমস্ত ভক্তিকে  
 জীর্ণনোচিত দুর্বলতাহৃৎক অক্ষধারার পরিণত

করিয়া রাখিয়াছে, সে শক্তি প্রভা । তোমাতে  
 একান্ত বিশ্বাস । তোমার সর্বব্যাপী সর্বার  
 “সত্য-প্রতিষ্ঠা” বুদ্ধিযোগের সাহায্যে “ভূমি  
 রহিয়াছ” “দাক্ষিণ্যে জীবন্তরূপে সর্বত্র বিরাজ  
 করিতেছ” অচল ধ্রুপদরূপে বিরাজ করি-  
 তেছ, এই মহাসত্য বোঝে প্রতিষ্ঠা করা । এই  
 মাটিতে, এই জলে, এই অগ্নিতে, এই বায়ুতে  
 এই আকাশে, এই নয়নের সম্মুখে, এই অন্তরের  
 প্রাঙ্গণে ভূমি লীলাময়রূপে আনন্দময়রূপে  
 অবস্থান করিতেছ, এই বিশ্বাসে প্রাণকে বল-  
 য়ান্ করা । ইহাই সাধনার প্রাণ, ইহাই  
 তোমাকে আমাদিগের প্রাণ-সাগরে অনন্ত-  
 শয্যাগ শায়িত করাইবার বটপত্র ! এই  
 মহাসত্যের উপর আস্থা স্থাপিত করিয়াই মহা-  
 সত্য স্রষ্টি স্বাধি আধিকার করিয়াছেন—  
 “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভা, ন মেধয়া ন  
 বচনা স্রুতেন, যমেবৈবব্রহ্মণতে তেন লভ্যন্তসৌম  
 আত্মা ব্রহ্মণতে তস্মৈ স্বাম্ ।” প্রবচনের দ্বারা  
 নহে মেধার দ্বারা নহে, জ্ঞানের দ্বারা নহে—  
 শুধু ব্রহ্মের দ্বারা, যে তোমাকে ধারণ করে—  
 সেই তোমাকে পায়, যাহাকে ভূমি বরণ কর  
 সেই তোমাকে পায় । বুঝি ভূমি জ্ঞান চাহ না,  
 বুঝি ভূমি ভক্তির কাকাল নহে ? কর্মের ডোরে  
 বিজড়িত হইয়া বুঝি ভূমি আস না, বুঝি জ্ঞান  
 ভক্তি কর্মের ভিত্তন “ভূমি রহিয়াছ” এই  
 মহা সত্য কর্মের মানিয়াছি, কত জীবন্ত ভাবে  
 এ সত্যে আত্মবান্ হইয়াছি, জীবন-গতির  
 প্রতি পদক্ষেপনে, এই সত্যকে প্রত্যক্ষবৎ  
 মানিয়া কতটুকু চলিতে সক্ষম হইয়াছি, সেই  
 টুকু দেখ । অন্তরার দূর করিবার একমাত্র

শক্তি বিবাস । এই ক্ষুদ্রই তোমার অপৌরুষেয়  
বাণী জগতে পুরুষ-রূপে আসিয়া স্থানিত করিয়া  
গিয়াছে—“যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বং চ যদি  
পশুতি । তত্কাহং ন প্রণশ্যামি স চ যেন ন পণ-  
শুতি ॥” তাই আজ এইখানে আগার চক্ষুঃসমী-  
পস্থ ধরণীর ধূলির উপর সর্বত্র পাবিপাদ তুমি,  
তোমার চরণে শিব পূর্তাইয়া নিবেদন করিতেছি  
—আগে জ্ঞান চাহি না, আগে কর্ম চাহি না,  
আগে তোমার ভাল বাসিবার অধিকার চাহি  
না, শুধু মানিতে দাও, শুধু বিশ্বাস করিতে  
দাও—“তুমি বলিয়াছ ।” শুধু তোমার চক্ষে  
চক্ষু রাখিয়া আমায় চলিতে দাও, শুধু  
তোমার দ্বাপরীয় অভয় ঘোষণা আমার হৃদয়ে  
মুহুর্ভূতঃ ঘোষিত কর—“সর্বদৃষ্টান পবিত্রাচ্চ  
মামেকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সর্গং পাপেশো  
মোকশিত্যমি মাশুচ,” ইত্যেতৎ ই যেন তোমায়  
পাই, ইত্যেতৎ ই যেন মুক্তিলাভ করি, ইত্যেতৎ  
ই যেন জগৎ জিতাসা করিবে বলিতে পারি—  
আমি তোমাকে শুধু বিশ্বাসেব দ্বারা লাভ  
করিয়াছি । নমঃ পুরস্তাদন পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্মদে  
সর্বত্র এব সর্ব অনন্ত বীণা মিত বিক্রমঃ স্তুঃ  
সর্বং সমাপ্নোসি ততোহসি সর্ব ॥

শ্রীবিজয়রূপ দেবশংখা ।

## বঙ্গসৈন্য-সম্বন্ধনা ।

নিবিড়-নীরদময় ভারত-গগন-  
প্রান্তে, চর্ভেয় তিমির ঘোর ভয়ঙ্কর  
অপসুরি' দুরে, মনোরম অহুপম  
অপূর্ণ প্রভার দিগন্ত উজলি, হের

উদিত অরুণ-ছটা নক্সন-রঞ্জন ;  
অভিশপ্ত ভারতের চির অমানিশা,  
প্রভাহীন বিভীষণ বিকট-দশনা  
আঁধার-অঞ্চল-মাঝে আবরিয়া নিঃ  
করাণ বদন, ক্ষিপ্ৰপদে অধোমুখে  
পলাইছে পশ্চিম-অচলে মনোহঃং

এস বঙ্গবীরগণ বীর-অবতার,  
আধাবংশ অবতংস আর্ঘ্যকুলোত্তব,  
সদেধের যশোভাতি, স্বজাতি-গৌরব,  
জননী'র বুকভরা আশার আশ্রয়,  
ভারতের সুসজ্জন কীর্তির কেতন !  
জেগেছ যখন বীর, ঘুমা'ও না আর,—  
বাজাও বিজয়-ভেরী দন্তোলি-নির্বোধে  
বিকম্পিয়া দশদিশ কাঁপায়ে মেদিনী,  
জাগাও স্বজনগণে বীরত্ব-উরাসে,  
কাঁপাও অগতিহ্রদি ভীষণ তরাসে ।

কত দিন, কত মাস, সুদীর্ঘ বরষ,  
কত যুগযুগান্তর ভবিষ্যের গর্ভ  
হ'তে আশাপূর্ণ-প্রাণে আসি' ক্ষিপ্ৰপদে,  
প্রাণপণে অভ্রভেদী দারুণ চীৎকারে  
জাগা'তে নারিয়ে হায়, অলস নিদ্রায়  
সুপ্ত ভারতসন্তানগণে, 'মর্ষভেদী  
হাহাকাারে দিগন্ত মথিয়া, ভগ্নহৃদে  
খাঁপ দেছে অতীতের উত্তাল তরঙ্গে !—  
কি কাল-নিদ্রার ঘোরে ছিলে অচেতন,  
আধারে আবরি' হায় বীরত্ব-জীবন !

মধ্যাহ্ন-মার্গতপস জগন্ত বিক্রমে  
উজলিয়া দশদিশি স্তম্ভিয়; ভুলোক,  
অচল অটল সমুন্নত অভ্রভেদী  
হিমাদ্রির মত শৌর্যবীৰ্য্যপরাক্রান্ত-

উন্নতকিরীট যেই আর্ঘ্যকূল ভূজ-  
বলে অবহেলে রত্নপ্রস্থ সুবিশাল  
ভূবর্গ ভারতভূমি করিত শাসন,—  
সমাগরা বসুন্ধরা তর্জনী হেলনে  
যা'র হইত কম্পিত,—আততায়ীদল  
ত্রাসিত শঙ্কিত চিত্ত, হইত বিকল ।

বীরত্ব-আধার সেই আর্ঘ্যবংশধর  
কালচক্র-দুর্শ্লিপাক-আবর্তে নিকিণ্ড  
বলি', অনন্ত কালের তরে, অতিক্রম  
পরিত্যক্ত ভূগুণ্ডপ্রায় সোতমুখে  
রবে গুণ্যমান ?—দুর্ভাগোর সম্মোহন  
কঠোর শায়কে পরাভূত বিপর্যস্ত  
বিশ্বস্ত হইয়ে, দু'দিনের তরে কর্ণ-  
ক্ষেমে হতবীর্গ্য অচেতন ছিল বলি',  
চিরদিন রহিবে কি বিগত-চেতন  
পদাঘাতে নিপীড়িত জড়ের মতন ?

অসম্ভব !—অসম্ভব প্রলাপ-কল্পনা ।  
কর্তব্যের কঠোর আহ্বানে স্তম্ভ সিংহ  
জেগেছে এবার । প্রতাহীন দীপ্তিহীন  
বিস্মিত স্তম্ভিত নেত্রে হেরিবে জগৎ—  
সিংহবংশে নাহি জন্মে কভু কাপুরুষ  
বীর্গ্যহীন শশক-সমুত্তি !—দোর ঘন-  
ঘটা-আবরণে আবরিলে প্রভাকর,  
প্রতাহীন নাহি হয় সহস্র-কিরণ !—  
মোহবোরে ছিল বলী নিদ্রায় মগন,—  
মরে নাহি শুরশ্রেষ্ঠ আর্ঘ্যসুতগণ ।

বঙ্গমাতা-অঞ্চলের অমূল্য-রতন-  
রাজী বঙ্গবীরগণ ! সুবিশাল কর্ণ-  
ক্ষেত্র নেহার সম্মুখে ;—প্রদীপ্ত বীরত্ব-  
তেজে দিগন্ত উজলি, এবে বীরদত্তে

বীরপদভরে বিকম্পিয়া বসুন্ধরা  
হও অগ্রসর অরাতির ভাগ্যাকাশে  
উষক্লুদ, উন্মাপ্ত, ধুমকেতু সম !—  
প্রতীচ্য অপিহ অতি ঘৃণ্য কাপুরুষ-  
কলঙ্কপসরা পদাঘাতে ফেলি' দূরে,  
শোয়া-বোধ্য-কোত্তি-ধ্বজা উড়াও অঘরে ।

কি ভয় জন্মাণে ? হঃশাস দুর্জয় অরি—  
সে তো বীরগণ-বাজনীয় ধন ;—শক্তি-  
মান শত্রু তরে অধাবীর দেবপদে  
কারত কামনা ;—প্রার্থনীয় শুভযোগ  
পে'য়েছ হেলায়,—মাক্‌হ সময়-সাক্ষে ;—  
বৈরাগ্যে প্রমত্ত হইয়ে ছাড় ভীম-  
বজ্র সংহনাদ,—প্রলয়-ছকারসম  
প্রাণধনে হোক তা'র শত্রুর পরাণে ;—  
সমগ্র জন্মানী ত্রাসে উঠুক কাঁপিয়া,  
টেকসারের রাজদণ্ড পড়ুক শাসিয়া !

বঙ্গবীর ! এই তো সুযোগ ; বীরদায়ে  
দিগন্ত কাঁপায়ে, অক্ষয় অমিত বলে  
উন্নত হইয়ে, জীবন্ত-প্রগম-সম  
ধ্বংস কর নিপাক-বাহিনী,—অত্যাচারী  
অরাতির উত্তপ্তশোণিতসিক্ত হৃদ-  
পিণ্ড ল'য়ে গেছুয়া খেলহ রণাঙ্গনে ;  
প্রতীচ্যের সুবিশাল বক্ষঃস্থল হ'তে  
ভূজবলে উপাড়ি জন্মানী, পদাঘাতে  
বিচূর্ণ করিয়ে, অনন্ত কালের তরে  
ভূবাও অতলম্পর্শি-জলধি-মাকারে-।

অমরমর্দিনী মাগো দানবশাভিনী !  
রণাঙ্গনা রণচণ্ডী নৃমুণ্ডমালিনী !  
দশভুজ দশ প্রহরণ ধরি', রণে  
যেতে' আর গো মা শক্তিধরপিনী ! দে

মা অন্তঃস্বামী চতিকে, অভয়ে! হুতা  
যদি হয়, যদি যেন বীরের মতন;—  
বাজলীর প্রতি বিন্দু শোণিত-সংস্পর্শে  
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ লভিয়া জনম,  
অক্ষর কীর্তির স্তম্ভ স্থাপি' রণস্থলে,  
ঘোলায় বিজয়মালা রটনের গলে ।

শ্রীকান্তিকচন্দ্র দত্ত, বি-এস-সি

## শ্রাদ্ধকৃত্য ।

পরলোক সম্বন্ধে সন্দেহ চিরকালই বিজ-  
মান আছে। কঠোপনিষৎ গ্রন্থে যমের প্রতি  
নরকিকর্তার উক্তি (১) বেশ প্রতীয়মান হয়  
যে, বহু পুরাকালেও পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে  
সন্দেহ বিজয়মান ছিল। এবং এখনও যে এই  
সন্দেহ পূর্ণমাত্রায় আছে, তাহা বর্তমানকালের  
গ্রন্থাদি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।  
কিন্তু এই সন্দেহ সত্ত্বেও, আশ্চর্যের বিষয় এই  
যে, শ্রাদ্ধকৃত্যাদি পিতৃপূজা বৈদিক সময় হইতে  
সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। শ্রদ্ধার সহিত  
যে দান করা হয় (অথবা পিতৃপুরুষের  
উদ্দেশ্যে), তাহার নাম শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধা শব্দের  
অর্থ বিশ্বাস। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,  
পরলোক থাকুক বা নাই থাকুক, শ্রাদ্ধকৃত্য  
জাহাতে কিছু আসে যায় না। শ্রাদ্ধের মূল

ভিত্তি বিশ্বাস। যাহার বিশ্বাস আছে, তিনি  
শ্রাদ্ধের অধিকারী। যাহার বিশ্বাস নাই,  
তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই।

নির্নিবাদের যদি পরলোকের অস্তিত্ব মানিয়া  
লওয়া যায়, পরস্পরেই প্রশ্ন উঠিবে,—সেটা  
কি প্রকার অর্থাৎ হুতার পর জীব কি অবস্থা  
প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়েও আধ্যাত্মবিগণ এক মত  
হইতে পারেন নাই; এবং এই কারণেই,  
আমার বোধ হয়, পরলোকের অস্তিত্ব সন্দেহ-  
পূর্ণ। হিন্দুশাস্ত্রে সকল বিষয়েই মতবৈধ।  
কিন্তু এই বিভিন্ন মতের মধ্যেও একটা সাম-  
ঞ্জস্য আছে; একটা সর্ববাদিসম্মত সত্য নিহিত  
আছে। বেদ ও পুরাণাদিতে হুতার পর জীবের  
অবস্থা বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হইলেও, সর্বত্র  
প্রৈতলোক, পিতৃলোক ও জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকৃত  
হইয়াছে। সুতরাং শ্রাদ্ধকৃত্য সম্বন্ধে কোনও  
বিবাদ বিসম্বাদ করিবার হেতু নাই।

জীবের দেহ দুইটি; একটি স্থূল ও একটি  
সূক্ষ্ম। হুতার পর পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থূল  
দেহ ক্ষতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই  
পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় এবং জীবের আত্মা সূক্ষ্ম  
অতি-বাহিক দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান  
করেন। বৈদিক সময়েও এইরূপ ধারণা বিজ-  
মান ছিল। ঋগ্বেদে কথিত আছে:—

স্বধাং চক্ষুর্গচ্ছত্ব বাতমান্মা দ্যাং চ গচ্ছ

পৃথিবীং চ ধর্ম্মনা ।

অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোবধীসু

প্রতিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥

অলো ভাগতপসা তং তপস্ব তং তে

শোচিতপত্ব তং তে অচিঃ ।

(১) ঋগ্বেদে বিচিকিৎসা যজুসো—

হ'তীভ্যে নারমতীতি চৈকে ।

এতদ্বিত্যনুশিষ্টব্যাহঃ

যরণায়ে বরতীতিঃ ।

• (কঠো ১ম বরী ২০ শ্লোক)

বাস্তে শিখান্তে জাতবেদান্তি বৈনঃ

নৃত্যতাম লোকঃ ॥

( ১০ম মণ্ডল ১৬ সূক্ত ৩৪ ঋক )

হে মৃত, তোমার চক্ষু স্বর্গের সহিত মিশিয়া  
যাউক, তোমার শ্বাস বায়ু লয় পাউক,  
তুমি তোমার কর্ণফলে আকাশে ( স্বর্গে ) ও  
পৃথিবীতে ( মর্ত্যে ) যাও । জলে যাওয়াটা যদি  
তোমার হিতকর বিবেচনা কর, তবে জলে  
যাও ; তোমার শরীর ওষধির সহিত অবস্থান  
করুক ॥ হে অগ্নি এই মৃতের যে অংশ জন্ম-  
রহিত, তোমার তেজস্বারা সেট অংশকে উত্তপ্ত  
কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য ও তোমার শিখা সেই  
অংশকে উত্তপ্ত করুক । হে জাতবেদা,  
তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মৃতি আছে, তাহা  
দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিকে পুণ্যবান লোকদিগের  
ভূবনে বহন করিয়া লইয়া যাও ।

কথিত আছে—এই সূক্ত অতিবাহিক দেহ  
ধারণ অতি কষ্টকর । একারণ শাস্ত্রকারগণ  
অশৌচকাল মধ্যে দাহকারী দ্বারা দশ-  
পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । দশপিণ্ড  
দ্বারা কষ্টকর অতিবাহিক দেহ পূরণ হইয়া  
প্রেত-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দেহ পূরণ  
হয় বলিয়া দশপিণ্ডের অপর নাম পূরকপিণ্ড ।  
অতিবাহিক দেহে মৃত আত্মা কিরূপ ভাবে  
অবস্থান করে, তাহা দশপিণ্ডদানান্তর যে মন্ত্র-  
পাঠ করা হয় তাহা হইতে কতকটা আভাস  
পাওয়া যায় ।

আকাশহো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ ।

ইদংদীর্ঘনিম্নং কীরং নান্বা কীবা নুভীভব ॥

হে মৃত, তুমি আকাশে বায়ুভূত হইয়া

আছ ; তোমার কোনও অবলম্বন বা আশ্রয়  
নাই । তুমি এই জলে স্নান করিয়া এবং এই  
ক্ষীর পান করিয়া সুখী হও ।

অতিবাহিক দেহতাগ করিয়া দশদিনের  
পর জীব যে প্রেত-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে,  
তাহাকে একশ্রেণীর ভোগ-দেহ বলা যাইতে  
পারে । এই প্রেত শব্দটি কোনও কোনও  
পুরাণে অতি হেয় ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।  
পদ্মপুরাণে প্রেতের আকৃতি সৰ্ব্বদেহে লিখিত  
আছে,—

বিকরালমুখং দীনং পিশঙ্গনয়নং ভৃশম্ ।

উর্দ্ধমূর্ধ্বকৃষ্ণাঙ্কং যমদুঃখমিবাশ্রয়ং ॥

চলজ্জিহ্বক নাঘোষ্ঠং দীর্ঘজাশিরাকুলম্ ।

দীর্ঘাজিৎ শুকচুণ্ডক গর্ত্যাকং শুকপঞ্জরম্ ॥

অর্থাৎ প্রেতের আকৃতি দ্বিতীয় যমদুঃখের  
স্তায় করাল বদন, দীন ভাবাপন্ন, চক্ষু অত্যন্ত  
পিঙ্গলবর্ণ, মাথার চুলগুলি সব খাড়া, কৃষ্ণবর্ণ,  
জিহ্বা লকলকে, ঠোঁট লম্বা, জজ্ঞা দীর্ঘ ও  
শিরাকুল, দীর্ঘ চরণ, মুখ শুক, চক্ষু কোটরহ  
এবং পঞ্জর শুক ।

অগ্নিপুরাণেও প্রেতকে অতি অস্পৃশ্য পাপিষ্ঠ  
নরকস্থ জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত  
জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা  
ভাষার অভিধানে প্রেত শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন  
—“যথানিয়মে ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন না হইলে মৃত  
ব্যক্তির আত্মা প্রেত নামে কথিত হয় ।”  
স্বতিশাস্ত্রোক্ত প্রেত কিন্তু এই সকল অর্থে  
ব্যবহৃত হয় নাই । পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সকল-  
কেই প্রেতলোকে গমন করিতে হয় ।

সকলেই কোনও নির্দিষ্ট কালের অন্ত



শ্রাদ্ধাদিতে প্রেত নামে অভিহিত হইয়া থাকে । জগতে জীবসকল যেমন সমান অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, অদৃষ্ট ও কর্মফল অনুসারে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হয়, প্রেতলোকেও সেইরূপ সকল গত্যাত্মা একরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, পাপপুণ্য অনুসারে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকে । আমরা সাধারণতঃ ভুত বা evil spirit বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি—পুরাণে সেই সকল প্রেতদেহ বর্ণিত হইয়াছে, উহা সাধারণ প্রেতাক্রুতি নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস । সে সকল জীব অতি পাপী অর্থাৎ বাহারা নরকে যাইবার উপযুক্ত এবং যাহারা আত্মঘাতী বা অথ কোনও রূপে পাতক তাহারাই এই পুরাণ-বর্ণিত প্রেতদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; পুণ্যাত্মা বা সাধারণে যে ইহা-দেহ সহিত সমান অপস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । সাধারণ প্রেতদেহ নরকের জায় জগত না হইলেও, ইহা অশুচি প্রাপ্ত ; এবং এই কারণেই মৃত পিতৃককে, (যাহার পিতা বা মাতা মৃত হইয়াছে) তাহার পিতামাতার প্রেতদেহ ধারণ কালে অশৌচ গ্রহণ করিতে হয় । এই অশৌচের নাম কালাশৌচ ।

শ্রাদ্ধে প্রেতলোকের স্থান চন্দ্রমণ্ডলের নিম্নে নির্দিষ্ট হইয়াছে । চন্দ্রের একবার পূর্ণাবধি পরিবেষ্টন করিতে প্রায় এক মাস সময় লাগে বলিয়া, এক মাসে প্রেতলোকের একদিন হইয়া থাকে । প্রতি প্রেতলোকের দিনে অর্থাৎ প্রতি চান্দ্রমাসে একবার করিয়া প্রেতশ্রাদ্ধ করা আবশ্যিক । এই প্রেতশ্রাদ্ধকে দাসিকৈ-

কোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধ বলা হয় । ইহা “নিত্য” অর্থাৎ একান্ত কর্তব্যকর্মের মধ্যে গণ্য এবং না করিলে প্রেতের উদ্ধার হয় না ।

আত্মাব প্রেতলোকে অবস্থান কাল এক বৎসর । বৎসর পূর্ণ হইলে ( অর্থাৎ মৃত তিথি হইতে গণনার দ্বাদশ চান্দ্রমাসের মৃত তিথিতে ) সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের দ্বারা মৃতের প্রেতদেহ বিমোচন হইয়া পিতৃলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । এই সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধও নিত্য অর্থাৎ না করিলে পিত্রাদির প্রেতত্ব নাশ হয় না । পুত্রের বিবাহাদি কর্মে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধমুরোদে অনেক সময় বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই অপকর্ষ করিয়া পিত্রাদির সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে ।

এ সম্বন্ধে স্মৃতি রঘুনন্দন বলেন,—

যথাহপুরুষ্ট সপিণ্ডনজ্ঞাপূর্ব্বং পূর্ব্বসংবৎসর-  
কালং প্রাপ্য পিতৃপ্রাপকং । “কৃত্যে সপিণ্ডী-  
করণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরং । প্রেতদেহং  
পরিভ্যজ্য ভোগদেহং প্রাপত্যে ॥”

চিতি বিষ্ণুধর্মোত্তরীয়াৎ [ তিথিতত্ত্ব ৩০ ]

অর্থাৎ অপকৃষ্ট সপিণ্ডীকরণ করার ক্ষমতা যে অদৃষ্ট, তাহা বৎসর পূর্ণ হইবার পর পিতৃদেহ প্রাপক হইয়া থাকে । কেননা বিষ্ণুধর্মোত্তরীয়ায় কথিত আছে, বৎসরের মধ্যে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অসম্পন্ন হইলেও, মৃত্যু এক বৎসরের পর প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য হইলেও, উহা প্রেতত্ব বিমোচনের হেতু নহে, কালই গতান্বার প্রেতত্ব নাশ করিয়া থাকে । পাপাত্মাই হউক

আর পুণ্যস্বাই হউক, সকলকেই পূর্ণ এক বৎসর কাল প্রেতলোকে বাস করিয়া পিতৃলোকে গমন করিতে হয় ।

পিতৃলোকের স্থান চন্দ্রমণ্ডলের উপরে । চন্দ্র এক বৎসরে (পৃথিবী বেটন করিতে করিতে) একবার স্বর্গকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে । একারণ এক চান্দ্র বৎসরে পিতৃলোকের একদিন হইয়া থাকে । প্রতি পিতৃদিনে অর্থাৎ প্রতি চান্দ্র বৎসরে একবার করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে হয় । এই শ্রাদ্ধকে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বলা হইয়া থাকে ।

পিতৃলোক স্বর্গ-সদৃশ অতি পবিত্র স্থান । পিতৃপুরুষগণ দেবগণের সহিত যজ্ঞে আগমন করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন ও মনুষ্যের হিতসাধন করিয়া থাকেন । ঋগ্বেদে কথিত আছে ;—

বহিষদঃ পিতর উত্যবাগিমা বো হব্য ।

চক্ৰমা ভূষণঃ ।

ত আ গতা বসা শংতমেনাস্মা নঃ

শংযোররপো দধাতঃ ।

যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্মা ইজ্ঞেণ

দেতৈঃ সরথং দধানাঃ ।

আগ্নে যাহি সহস্রং দেববর্গৈঃ পৈত্রৈঃ

পূরৈঃ পিতৃভিক্ষমসদ্বিঃ ॥

[ ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৫ সূক্ত ৪:১০ শ্লোক ]

অর্থাৎ—হে ক্রোশোপবিষ্ট পিতৃগণ, আমাদের দিগকে আশ্রয় দাও, তোমাদের জন্ত যাহা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা এখন ভোগ কর । আমাদের রক্ষা ও আমাদের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলদান করিবার জন্ত আইস, আমাদের একে

কল্যাণভাগী, অকল্যাণরহিত ও নিষ্পাপ করিয়া দাও । যে সকল সত্যবান পিতৃলোক দেবগণের সহিত একত্রে হবি গ্রহণ করিয়া থাকেন ও ইজ্ঞের সহিত এক রথে গমনাগমন করিয়া থাকেন ; হে অগ্নি, সেই সকল দেবরাধনাকারী, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত আইস ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে পিতৃপুত্রাদি দেবপুত্রের স্থায় সমান পোকাহিতকর এবং আদ্যবীর্য । শ্রাদ্ধাদি কাণ্ডে কেবল যে পরলোকান্ত পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে—তাহা নহে, ইহাতে নিজ হিতসাধনও যথেষ্ট পরিমাণে হয় । দেবগণের নিকট হইতে আমরা যেমন পুত্র, আয়, যশ, ধন ও সৌভাগ্যাদি কামনা করিয়া থাকি, বৈদিক সময়ে আগ্নেয়াধিগণ পিতৃপুরুষগণের নিকটেও সেইরূপ কামনা করিতেন । ঋগ্বেদ হইতে এরূপ বহু শ্লোক দেখান যাইতে পারে ; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে বিবৃত হইলাম ।

পিতৃলোক হইতে জীব পুনরায় জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে । কতকাল পরে, এই জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, উহা জীবের কর্মফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে । পিতৃপুরুষ পিতৃলোকেই বাস করেন, অথবা জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীলোকেই পুনঃ প্রত্যাগমন করেন, শ্রাদ্ধকৃত্যে ইহাতে কিছু আসে যায় না । পিতৃপুরুষগণ যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাহারা সর্বদাই আমাদের পূজনীয়, তাহাদের লোকান্তরিত আত্মার তৃপ্তিসাধনের

কল্প শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ, ইহাই শাস্ত্রের বিধান। দৈনিক সময়েও পুণিনী-লোকগত পিতৃপুরুষের পূজা করা হইত। বেদে কথিত আছে,—

ইদং পিতৃভ্যো নমো অমৃতং যে পূর্বাসো

য উপগ্রাস দ্বিগুঃ।

যে পার্শ্বদেব রজস্তা নিষস্তা যে বা নুনঃ

সুতরজানাস্ত বিষ্ণুঃ।

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৫ সূক্ত ২ ঋক্]

অর্থাৎ যে সকল পিতৃপুরুষ পূর্বে অথবা পরে মৃত হইয়াছেন, ঐহারা পূর্ববীলোকে আছেন (অর্থাৎ জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন) অথবা ঐহার ঠাণ্ডাবান লোকদের মধ্যে আছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি অমৃত নমস্কার করিতেছি।

শ্রাদ্ধের স্বৰূপ উদ্দেশ্য মৃত পিতৃপুরুষগণকে ষাণ্ড্রব্যাদি ভোজনদান করা। এখন কথা হইতেছে যে, পিতৃ বা প্রেতলোকগত আত্মার শ্রাদ্ধকেন্দ্রে কবা (অর্থাৎ শ্রাদ্ধে পিণ্ডাদি দেয় ষাণ্ড্রব্য) ভোজন করিতে অগমন করা কতকটা সম্ভবপর হইলেও, যে আত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার শ্রাদ্ধে কবা ভোজন করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কোনও মৃত আত্মা কবা ভোজন করিতে শ্রাদ্ধকেন্দ্রে আসেন না, ব্রাহ্মণাদি প্রতিনিধি দ্বারা তাহার তৃপ্তি-সাধন করা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে বা কিছু দান করিলে যে মৃত পিতৃ-পুরুষগণের তাহা ভোজন করা বা পাওয়া হইবে, এ বিশ্বাসটি গ্রহণযোগ্য নয়; এবং এ

বিশ্বাস না থাকিলে শ্রাদ্ধ করাও একপ্রকার নিষ্ফল। “সর্বং সর্বাঙ্গকং” এই সমষ্টিজ্ঞান আর্ধ্যশাস্ত্রের অঙ্গীভূত। আমরা আবহমান কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ঘটাকাশ ও মাঠাকাশ যেমন এক, সর্বভূতে আত্মাও সেইরূপ এক; ইহার বিনাশ নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু কখনো কি আমরা অন্তরের সহিত অনুভব করি, অথবা সেরূপ অনুভব করিবার ক্ষমতা আমাদের সকলের আছে। সুতরাং শাস্ত্র বাক্যের উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে হয়। সকল আত্মাই যখন এক, তখন একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, প্রেত বা পিতৃলোক গত আত্মারও তৃপ্তি সাধন হইবে—এই ধারণাটা শ্রাদ্ধতত্ত্বের অত্যন্ত প্রধান ভিত্তি। এ বিশ্বাস তর্কনক, এই তত্ত্বটি এত উচ্চ আদর্শের যে, ইহা কেবল শ্রাদ্ধ কেন, সনাতন হিন্দু ধর্মেরও একটা মূল ভিত্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু হুঃখের বিষয়, এই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বটির উপর অনেকে কটুক্তি পর্য্যন্ত করিতে পশ্চাদ্দপন করেন নাই। কোন বাঙ্গালী নাট্যকার তাহার নাটকের একস্থানে লিখিয়াছেন “মরা গরুতে কি ঘাস খায়।” বর্তমান আর্ধ্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী, তাহার “সত্যার্থ প্রকাশ” নামক গ্রন্থে, এই শ্রাদ্ধসম্বন্ধে এরূপ হীন কটাক্ষপাত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণের বার্ষিকপত্রের উল্লেখ করিয়া, আর্ধ্যবিগণকে এরূপ জঘন্য কটুক্তি করিয়াছেন, যে তাহা বর্ষপ্রাণ হিন্দু শাস্ত্রেরই অপমান। আমি বলি কষ্টে পুস্তক খানির,

কিয়ৎশ যাত্র পাঠ করিয়া ঘৃণায় উহা দূরে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অবশ্য স্বীকার করি, আমাদের বর্তমান সমাজে অনেক স্বার্থপর পুরোহিত আছেন, যাহাদের কার্যে অনেক সময় ধর্ম্মকর্মে বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সেজন্ত হিন্দুশাস্ত্র বা আর্থা-ঋষিগণ দায়ী নহে; সে দোষ আমাদেরই, সে দোষ আমাদের সমাজের নেতৃবর্গের।

একণে প্রশ্ন হইতে পারে, সকল আত্মাই যখন এক, তখন পিতৃ-পুরুষগণের প্রতিনিধি ত্রাক্ষণ না হইয়া একজন দরিদ্র চণ্ডালও হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা যাউক, পূর্বে কি উপায়ে পিতৃপূজা করা হইত।

বৈদিক সময়ে অগ্নিকে পিতৃপূজার প্রতিনিধি করিয়া কব্যাদি আহুতি দেওয়া হইত। অগ্নি শ্রাদ্ধের কব্য (অর্থাৎ পরলোকগত পিতৃ-পুরুষগণকে দেয় খাদ্যদ্রব্য) বহন করিতেন বলিয়া, অগ্নির অপর নাম কব্যবহ (কব্য + বহ্ + অ)। বেদে কথিত আছে,—

যো অগ্নিঃ কব্যাবহানঃ পিতৃশ্রদ্ধদূতান্বনঃ।

প্রোহ হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যা আ ॥

উশ্বতস্বা নি স্বীমহ্যশ্বতঃ সমিধীমহি।

উশ্বশ্রুত আবহ পিতৃন হবিষে অন্তবে ॥

[ ঋগ্বেদ ১০ম : ৬ম স্কন্ধ ১১।১২ শ্লোক ]

অগ্নি শ্রাদ্ধের কব্য বহন করেন ও দেবগণকে এবং পিতৃগণকে আরাধনা করেন। তিনি হোমের দ্রব্য দেবগণের ও পিতৃগণের নিকট প্রেরণ করেন। হে অগ্নি, যত্নপূর্বক তোমার স্থাপন ও প্রজ্জ্বলিত করিতেছি।

তুমিও যজ্ঞকামনাকারী দেবগণ ও পিতৃগণের নিকট তাহাদের ভোজনার্থ হোমের দ্রব্য (ইবা ও কব্য) বহন কর।

আজ যাত্ন ও যাগ্নিক ত্রাক্ষণদিগের মধ্যে এবং মন্ত্রাজ প্রদেশীয় আযাত্রাক্ষণদিগের মধ্যে অগ্নিকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন সময়ে যে শ্রাদ্ধে অগ্নিকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা লোপ পায়, তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে মহুসংহিতা ও পুরাণাদিতে বেদজ্ঞ ত্রাক্ষণকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রশ্রু পাণ্যবেবোপপাদয়েৎ।

যো হ্যগ্নিঃ স দ্বিজো বিপ্রৈর্মন্ত্রদর্শিতিক্রিয়াতে ॥

[ মহু ৩য় অধ্যায় ২১২শ শ্লোক । ]

অর্থাৎ অগ্নির প্রভাবে ত্রাক্ষণের হস্তেই (পিতৃগণ) প্রদান করিবে। কেন না বেদজ্ঞ ত্রাক্ষণেরা বলেন, যিনি অগ্নি তিনিই ত্রাক্ষণ,— ইহাদের কোনও প্রভেদ নাই।

ইহা হইতেই বুঝা যায় পৌরাণিক যুগেই শ্রাদ্ধে অগ্নির পরিবর্তে ত্রাক্ষণকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

অধুনা আমরা উপযুক্ত বেদজ্ঞ ত্রাক্ষণ অভাকে কুশের ত্রাক্ষণ নির্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি এবং শ্রাদ্ধ শেষে দ্রব্যাদি পুরোহিত ত্রাক্ষণকে দান করি ও কয়েকটি ( ইচ্ছানু-রূপ সংখ্যক ) ত্রাক্ষণ ভোজন করাই। ৮ত্বদেব যুগোপাধার মহাশয় তাঁহার আচার প্রবন্ধান্ত-গত শ্রাদ্ধকৃত্য প্রবন্ধে বলেন যে, “আমার বিবেচনায় সর্বপ্রকার শ্রাদ্ধে এবং সকল স্থানে

এবং সকল অবস্থাতে দর্ভবহর নিয়োগ শাস্ত্র-সম্মত কার্য্য নহে। পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণ খুব ভাল ছিলেন, এখন তেমন ভাল নাই, একথা স্বীকার করিলেও এখন যে কেবল দর্ভময় ব্রাহ্মণেরই নিয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, একরূপ স্বীকার করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতার স্বরূপ মনে করিয়া যখন অনেকানেক ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতেছে, তখন যে পূর্ব-পুরুষদিগের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এমন মনে করা যাইতে পারে না।" তিনি এ সম্বন্ধে আবারও অনেক যুক্তির অবতারণা করেন। এখন দেখা যাউক, শাস্ত্রে কিরূপ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মন্ত্র বলেন,—

আনোৎকৃষ্টায় দেবামি কব্যানি চ বনীষি চ।

ন বি হস্তবহুদিকৌ কুধিরেনৈব শুভাতঃ ॥

আননিষ্ঠা বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠান্তথাপরে।

তপাঃ সাধার্য্যনিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠান্তথাপরে ॥

আননিষ্ঠেহু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যজ্ঞতঃ।

হব্যামি তু যথাভ্যং সর্কেষেব চতুর্দশি ॥

[ মন্ত্র ৩য় অধ্যায় ১৩২-১৩৪:১৩৫ ]

অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আনসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে হব্য ও কব্য প্রদান করা উচিত। কেন না রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বারা প্রক্ষালন করা যায় না। কোন বিজ্ঞ আননিষ্ঠ, কেহ তপোনিষ্ঠ, কেহ তপাঃ ও সাধার্য্যনিষ্ঠ আবার কেহ বা কর্ম্মনিষ্ঠ। ইহা-দের মধ্যে যাত্র আননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই পিতৃ-পুত্রদ্বয়ের উদ্দেশ্যে কব্য যজ্ঞপূর্বক প্রদান

করিতে হয়। দেবোদ্দেশ্যে হব্য অস্ত্র চারি প্রকার ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাইতে পারে।

মন্ত্র এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলেন। তাহার মূল মর্ম্ম এই,—ধর্ম্মজ ব্যক্তি পিতৃ-কার্য্যে যত্নের সহিত ব্রাহ্মণগণকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। যোগ্য চূরি করে, পতিত, ক্লীব, নাস্তিক, বেদাধারনশূন্য, ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগ-গ্রস্ত, দূতক্রীড়াপরায়ণ, বহুযাজনশীল, চিকিৎসক, প্রাতিমাপরিচারক, মাংসবিক্রয়ী, গ্রামের বা রাজার ভৃত্য, কুসীদজীবী, পঞ্চ মহাযজ্ঞামু-ষ্ঠানবহিত ব্রাহ্মণদেহী, মত্তপায়ী, আচারহীন, ধর্ম্মকাণ্ডে নিরুৎসাহ ইত্যাদি দোষযুক্ত তাহার দৈব ও পিতৃ উভয় কার্য্যেই পরিত্যজ্য। শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মন্ত্র একরূপ অতি বিস্তার ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে মন্ত্রসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশ সমস্তই উদ্ধৃত করিতে হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্র নির্দেশানু-সারে অধুনা শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ এক প্রকার দুপ্রাপ্য। যদি কচিৎ কোথাও একটি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, তিনি যে সর্বদোষবহিত সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না। এই কারণেই বোধ হয় আমাদের কুশময় ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হই-য়াছে। আমরা যখন কেবল কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হই না, সজে সজে যথা-সাধ্য ব্রাহ্মণও ভোজন করাইয়া থাকি, তখন কুশময় ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা যে দোষযুক্ত, একরূপও মনে হয় না। (ক্রমশঃ)

ঐজ্ঞানেন্দ্রনাথ বুধোপাধ্যায়

## অনুতাপ

( গল্প )

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে—নরেন্দ্রনাথ কলেজ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন—এমন সময় স্ত্রী বিমলা আসিয়া বলিল—“বলি কলেজ যে যাওয়া হচ্ছে—এদিকে যে সব বাপার ঘটেচে তার কি কিছু সংবাদ রেখেচো ?”

“না দরকার করে না—কলেজ যাবার সময় আর বিরক্ত ক’রো না । রাতদিন আর ওসব ভাল লাগে না” বলিয়া নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর মুখ প্রতি চাহিলেন ।

বিমলা স্বাক্ষর দিয়া বলিয়া উঠিল—“যদি ভাল না লাগে তবে আমায় এ বাড়ীতে রাখা কেন ? আমার বাপ, ভাই কি দু’মুঠো ভাতের কান্দাল যে, তারা আমাকে পুষ্কৃত পারবে না ? আজ ব’লে দিচ্ছি যদি এর একটা হেস্ত-নেস্ত না কর তবে কালই আমি বাপের বাড়ী চ’লে যাব ।”

“বিমলা, তুমি নেহাত অবুঝের মত কথা ব’লো না ।”

“বেশ আমি অবুঝ আছি,—আমিই আছি—তাতে লোকের কি ?”

“রাগ কর কেন বিমলা—আর ঢটো ক্ষুদ্র সবুর কর । যদি তগবান মুখ তুলে চান তবে কিছুই ভাবনা হ’বে না ।”

“আমার মুখ—তা আর এ ভাবনে হয়েচে ?”

“হবে না কেন বিমলা ! আমি যদি আর কখনো বি-এ পাশ করতে পারি তবে নিশ্চয়ই

একটা চাকরি জুটবে—তখন বিদেশে তোমায় নিয়ে গিয়ে সুখে রাখবো ।”

“তা যাই বল—আমি আর তোমার মা ব’নের মুখ নড়া সহ করতে পারবো না ।”

“ওসব কথা মুখে আনতে নেই, পাগলী” বলিয়া নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে স্নেহে সাজুনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

“যাও আর আদরে কাজ নেই ।” বলিয়া বিমলা রাগে গরগর করিতে করিতে গৃহ-ভাস্তরে প্রবেশ করিল ।

নরেন্দ্রনাথ অগত্যা কলেজ অভিযুখে অগ্রসর হইলেন ।

নরেন্দ্রনাথ বহরমপুর কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র । তাঁহার পিতা হরিহর দত্ত আজ দুই বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । সংসারে তাঁহার মাতা ও দুই বিধবা ভগ্নী । নরেন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন সেই সময় কলকাত্তা নগরের এক দলপান উকীলের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় । প্রথম বিবাহিত জীবন তাঁহাদের বেশ সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু বিমলার স্বামী-গৃহে পদার্পণ করিবার পর হইতেই তাঁহাদের সংসারে অশান্তির রেখা দেখা যায় । বিমলা দলীর কন্যা । সে আশ্চর্য্য সুখেই ব্যতিবাস্ত—সংসারের কাজে বড় একটা সে মনোযোগ দিত না । প্রথম প্রথম নরেন্দ্রের মাতা তাঁহাকে কিছু বলিতেন না ; কিন্তু দিন দিন বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়া মধ্যে মধ্যে ‘হু’ একটা শব্দ কথা শুনাইয়া দিতে লাগিলেন । ইহাতে বিমলার অভিমানের

সীরা থাকিত না। সে স্বামীকে শ্রষ্টাকু-  
রাগীর বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনাইয়া  
দিত। নরেন্দ্রনাথ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন—  
তিনি ত্রয় এতাবৎ কার্যকলাপ স্বচক্ষেই  
পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং  
ত্রয় অভিযোগ বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন  
না। অধিকন্তু ত্রীকেই বৃহৎ সৎসনা করিয়া  
বিদায় দিতেন। সেই হইতেই স্বামী-স্ত্রীতে  
সামান্য বসোমালিঙ্গ ঘটিল।

পরদিন প্রাতঃকালে বিমলা বাড়ীর ভৃত্য  
স্বাম সেবককে দিয়া গাড়ী ডাকাইল। তৎ-  
পরে শ্রষ্টাকুরাগীর নিকট গিয়া বলিল—“তবে  
আমি চলাম।”

নরেন্দ্রনাথের মাতা স্বামীর মৃত্যুতে বড়ই  
কাতয় ছিলেন—তিনি পুত্র-বধূর এ প্রকার  
ব্যবহার দেখিয়া মর্মে মর্মে আঘাত পাটগেন।  
হল হল নেত্রে কহিলেন—“বৌমা, এটা কি  
তোমার ভাল হচ্ছে?”

“না হ'লে আর আমি কি কোরব বল?”

“কোরবে আবার কি? তোমারই পরকর।  
—তোমারই সব। আজ আমি চোখ বুজলে  
সবই তোমাকে দেখতে হবে।”

“তা বলে কি আমি সকলের মুখ নাড়া সহ  
কোরবো?”

“সে কি কথা বৌমা! ঐ নরেন্দ্র আমায়  
সুখোজ একটা ছেলে—তার বৌ তুমি—  
তোমাকে কি আমায় মুখনাড়া দিতে পারি?”

“যাক্ অত কথার কাজ নেই—আমি আর  
এ বাড়ীতে থাকতে পারবো না” এই বলিয়া  
বিমলা বাড়ীতে উঠিল।

নরেন্দ্রের মাতা তখন চকুর অগ্নি মুছিতে  
মুছিতে পুত্রের নিকট গিয়া সমস্ত বিবৃত  
করিলেন। নরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ গৃহ মধ্যে হইতে  
সমস্তই শুনিতেছিলেন। মাতার বাক্যে  
বিমলার গাড়ীর নিকট গিয়া “বিমলা” এই  
কথাটা উচ্চারণ করিয়াই আর কিছু বলিতে  
পারিলেন না—হুই গণ্ড বহিয়া তাঁহার অশ্রু-  
ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিমলা তখন  
মুগ্ধ ফিরিয়া বলিল। নরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ  
পরে অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে বলিলেন—“বিমলা  
এটা কি ভাল দেখায়? তোমার এতদিন প্রাণ-  
ভরে ভালবেসে তারই কি এই প্রতিদান! যাক্  
—আমি তার কিছুই চাইনে—তুমি ভাল থাক,  
সুখে থাক এই চাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা  
করি।” এই বলিয়া তিনি দ্রুত গৃহমধ্যে প্রবেশ  
করিয়া অর্গলবন্ধ করিয়া দিলেন। বিমলাও  
ভৃত্যকে গাড়ী চালাইতে আদেশ দিল।  
কাঁচ কাঁচ শব্দে গোলকট অগ্রসর হইতে  
লাগিল।

প্রাপ্তান্ত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত  
হইয়া গিয়াছে। বিমলা প্রথমে পিতৃগৃহে বড়ই  
সুখে কাল যাপন করিয়াছে। মাতাপিতার  
আদরে সে এতদিন সংসারে কিছুই অভাব  
অনুভব করে নাই। হাসিয়া খেলিয়া বেশ  
সুখেই কাটাইতেছিল কিন্তু মাহুষের চিরদিন  
সময় যায় না। সুখ-দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্তন  
করিতেছে। সুতরাং বিমলার সুখের দিন  
কুরাইয়া দুঃখের দিন আসিল। চতুর্থ বৎসরে  
তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। সংসারে একটা  
ক্রন্দনের রোল উঠিল। চারিদিকে হাহাকার

পড়িয়া গেল। পিতা আর ভ্রমণ ভাবে কন্ডার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। ভ্রাতৃবধূ সুবোগ মুকিয়া নন্দদের সহিত অসহ্যবহার করিতে লাগিল। যখন তখন বিমলা বাক্য-যন্ত্রণায় জর্জরিত হইয়া উঠিল। গোপনে কত নয়ন-জল ফেলিল—কিন্তু তাহার প্রতি কেহ আর দৃকপাতও করিল না। হায় বিমলা! তুমি হিন্দুর কন্ডা—আজ যদি তুমি স্বামীর গৃহে থাকিয়া শাকার ভোজন পূর্বক স্বামীপদে মাত রাখিতে পারিতে তাহা হইলে তোমার এ চূর্ণশা ঘটিত না। বিমলার তখন পর্যাস্ত জ্ঞান হইল না। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ লাজনা সহ করিয়াও তাহাদের সংসারে পড়িয়া রহিল। কিছু দিন পরে পিতা উপযুক্ত পুত্র সুরেশ-চন্দ্রের হস্তে সংসারের ভারার্ণ করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। বিমলাও পিতার সহিত ঘাইতে চাহিল; কিন্তু “কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। নরেন্দ্রনাথ ত্রীর গৃহ-ত্যাগের পর হইতেই কলেজ ত্যাগ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে গ্রামে শিক্ষকতা করিতে লাগিয়া-ছিলেন। শব্দর মহাশয়ের কাশী-যাত্রার সংবাদ পাইয়া একবার বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখনও তাহার প্রতি বিমলার ক্রোধ প্রসমিত হয় নাই। রাগে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি নির্দিষ্ট শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে বিমলা আসিয়া অর্পণবদ্ধ করিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে শয্যা গ্রহণ করিল। হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথ ত্রীর লহিত বাক্যালাপ করিবার অল্প অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলকাল হইতে পারিলেন

না। অগত্যা তাহার একপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিলেন। কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। মণ্ডকের অধিক উত্তেজনা বশতঃ সমস্ত শরীর কিম্ব কিম্ব করিতে লাগিল। গাও একটু গরম বোধ হইল। কি করিবেন—পুনরায় নিদ্রায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটু তজ্জাবেশ হইল—অল্পক্ষণ পরেই কম্প দিয়া আর দেখা দিল। তিন কীপিতে কীপিতে ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—“বিমলা, একবার উঠে দেখ ত—আমার বোধ হয় আর এল।”

“গাও আর বিরক্ত ক’রো না। সারাদিন ষেটেধুটে এসে একটু শান্ত হয়ে শুতে এলাম—তাও প্রাণে সহ হবেন না। যম! তুমি আমাকে লও।”

“বিমলা, একবার দেখ—শরীরটা বড় ষাণাপ কচ্ছে। বোধ হয় তোমার সঙ্গে জীকেন আর দেখা হবে না।”

“তা আমি কি করব?” বলিয়াই বিমলা পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথ শয্যায় পড়িয়া আরের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে নরেন্দ্রনাথ একপানি গোগাড়ি ডাকাইয়া কীপিতে কীপিতে তাহাতে উঠিলেন। গাড়ী তাহাদের গৃহাভিমুখে রওনা হইল। বিমলা এ পর্যাস্ত একবারও স্বামীর অনুসন্ধান লইল না। ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“হীরে—নরেন হঠাৎ অমন করে কেন চলে গেল বলতে পারিস?”

তদুত্তরে বিমলা বলিল—“তা দাদা, আমি



কি ক'রে বলব—ওদের বাড়িই অম্মনি ।”

“তা মিথ্যে নয়” বলিয়া তিনি কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন । ইতিমধ্যে তাহার স্ত্রী আসিয়া হাজির হইল । সেও নরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা গালি বর্ষণ করিতে ছাড়িল না । এইরূপে দৈনিক দামীর নিন্দায় যোগদান করিয়া বিমলা আরও কিছুদিন পিতৃগৃহে বেশ শান্তিতেই কাশ্যাপন করিল । তৎপরে একদিন সে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপ্তা আছে এমন সময় সুরেশ বাবুর পঞ্চম বর্ষীয় এক পুত্র আসিয়া তাহাকে বড় বিরক্ত করিতে লাগিল । বিমলা তাহাকে সামান্য প্রহার করিল । পুত্র ক্রন্দন করিতে করিতে মাতাকে আসিয়া বলিল । সুরেশ-পত্নীও শুনিয়াই কোণে অগ্নিশর্মা । দ্রুত রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া মুখনাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল—“বলি ঠাকুর কি, ব্যাপারখানা কি ? আমার ছেলের গায়ে হাত তোলা কেন ?”

বিমলা বিনীতভাবে বলিল—“কই, তেমন ত মারি-নি ?”

“কি—তবে কি আমি মিথ্যে বলছি ? আমারই বাবি, আমার আনাকেই চোখ-রাঙাবি ! আজ ও বাড়ী আসুক—তারপর দেখাচ্ছি,—তোমার একদিন কি আমার একদিন ।”

বিমলা বেগতিক দেখিয়া চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল । যথাসময়ে সুরেশবাবু আসিয়া সমস্ত শুনিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—“বিমলা, আজ বলে দিচ্ছি যদি আর কখন প্রহার গায়ে হাত তোলা শুনতে পাই তবে তখনই তোকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ীর

বাহির করে দিব । সাবধান !”

বিমলা আর কি বলিবে ! চক্ষুর জলে বন্ধ : ভাসাইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহকার্য্যে মনঃ-সংযোগ করিল । সে দিন তাহার আর কিছুই আহার হইল না । রাত্রে শয্যায় শুইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে অসুখতাপ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল । স্বামীকে মনে পড়িল—স্বামীগৃহ মনে পড়িল—স্বামীর প্রাণ-ভরা ভালবাসা হৃদয়ঙ্গম হইল । তখন ভাবিতে লাগিল—“হায় ! কেন আমি তাঁকে ছেড়ে এখানে এলাম !—তিনি আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন । আমার একটু অসুখ হ'লে পাগলের মত ছুটে বেড়াতেন । আমি হতভাগী—তাই তাঁর ঘরে থাকতে পারলাম না । হায় ! এতদিন যদি সেই ঘরে থাকতাম তা হ'লে কি দাদা আমাকে এমন শেয়াল কুকুরের মত দেখতে পারতেন ! তখন বুঝি নাই যে, স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি । প্রভো, আমার ক্ষমা ক'রো । হায় ! তাঁর অসুখ হ'লে কেন আমি দেখলাম না ! কেন তাঁকে তাড়িয়ে দিলাম ! যখন তিনি চোখ ছলছল করে বলেন,—“বিমল, আমার একবার দেখ ।” আমি হতভাগী কেন তখন বুক দিয়ে তাঁর সেবা করলুম না ? আজ সাত আট দিন তিনি অসুখ নিয়ে বাড়ী গিয়েছেন—কেমন আছেন জানি না !”

বিমলা আর ভাবিতে পারিল না—তাহার চতুর্দিক অন্ধকার বোধ হইল । চক্ষু বুজিয়া প্রাণভরে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল । এইরূপ সবস্ত রাত্রি চিন্তাতেই তাহার অতি-

বাহিত হইয়া-গেল। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উদ্দাস মনে গৃহকর্ম করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার ভ্রাতা সুরেশ-চন্দ্র একখানি টেলিগ্রাম হস্তে বাটী প্রবেশ করিলেন ও ভগ্নীকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন—“বিমলা, নরেন্দ্রের অসুখ বেশী, তোর শাশুড়ী টেলিগ্রাম কছে।”

ভ্রাতৃবাক্যে বিমলার মাথা ঘুরিয়া গেল। পৃথিবী তাহার নিকট হইতে অল্পে অল্পে সরিয়া যাইতে লাগিল। “দাদা, দাদা” বলিতে বলিতে সুরেশ বাবুর পদতলে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িল।

কিয়ৎকণ পরে অনেক কষ্টে বিমলার মুচ্ছা ভঙ্গ হইলে সুরেশ বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে চলিলেন। তাহার যখন উপস্থিত হইলেন তখন নরেন্দ্রনাথ শয্যা পড়িয়া ছটফট করিতেছেন। পার্শ্বে মাতা ও ভগ্নীস্বর্য বসিয়া তাহার সেবা করিতেছেন। ডাক্তার বাবু মধ্যে মধ্যে নাড়ী টিপিয়া দেখিতেছেন। অবস্থা বড় ভাল নয়—সকলেরই নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। এমন সময় বিমলা উন্মাদিনীর জায় ছুটিয়া আসিল। তাহার চক্ষুস্বর্ষ রক্তবর্ণ—কেশরাশী আবুলারিত—বস্ত্র অবিজ্ঞত। এই সময় নরেন্দ্রনাথ একবার চক্ষু মেলিয়া বিমলার প্রতি চাহিলেন। ঐক্কাপ চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—বদনমণ্ডলে ঐবৎ হান্তরেখা কুটিয়া উঠিল। পরক্ষণেই চক্ষু মুদিত করিলেন। বিমলা তাহার পদতলে পড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে বলিল—  
“জ্বর-দেবতা, বল—বল—তুমি আমার কথা

করলে!” নরেন্দ্রনাথের নয়ন-প্রান্তে পুনরায় একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। বিমলা বলিতে লাগিল—“একবার কথা কও—এই দেখ, আমি এসেছি। আমার জ্ঞান হয়েছে, তুমি একবার ভাল করে দেখ। আর আমি অজ্ঞা-নের জায় তোমায় অবহেলা করব না। একবার তুমি আমায় আদর করে “বিমল” বলে ডাক। আমি আর কিছু চাইনে—কেবল একবার তোমার প্রাণভরা ডাকটী শুনবো! ডাকবে না—তবে এই আমি চললাম।” বলিয়া বিমলা স্বামীর বক্ষোপরি মুচ্ছিতা হইয়া পড়িল। এদিকে নরেন্দ্রনাথেরও জীবন প্রদীপ নির্ঝাপিত হইল।

ত্রীনলিনাক হোড়।

## অপেক্ষায় ।

আজি, বসে আছি নাথ! বিরহ নিদ্রাঘে

আশা-পথ-পানে চেয়ে,

তোমার পবিত্র প্রণয়-মুরতি,

পূজিতে আকুল হিয়ে।

বেখেছি যতনে, ভক্তি-প্রেম-প্রীতি—

সোহাগ-কুসুম-রাজি;

সিক্ত করিয়া অশ্রুর চন্দনে,

সাজায়ে জ্বর-সাজি!

এস হে আরাধ্য! এস হে বাহিত!

বাসনা করিতে পূর্ণ;

এস হে কিশোর! এস হে দয়িত!

মানস-মন্দির শূন্য।

অথরে মধুর হাসিটি টিপিয়া,

এস ওগো কালশশি !

নবজলধর বিলাসিত তব—

শ্রামল সৌন্দর্য্যে ভাসি ।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস ।

## তুমিই ।

তুমিই সখা, তুমিই প্রিয়, তুমিই আমার প্রাণ,  
তুমিই আমার বিশ্ব-মরুতে নির্মল-বারি দান ।  
তুমিই আমার আশার ঘরের স্বর্ণ-প্রদীপ খানি,  
তুমিই আমার সাধনার ধন হৃদয়-রাজ্যের রাণী ।  
তুমিই আমার শক্তিরূপিনী, ভয়ে অভয়দাতা,  
তুমিই আমার ভজন-সাধন, তুমিই দেবতা ।

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস ।

## বঙ্গের ভিক্ষুক ।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষীসুদর্শন কৃষিক্ষণি ।

ভদ্রকর্মে রাজ-সেবারাং ভিক্ষায়াম্ নৈবচ নৈবচ ॥

অপাত্রে দান শাস্ত্র-নিষিদ্ধ । অযোগ্য  
পাত্রে দান করিলে প্রত্যাবার্ত্ত ভাগ্যী হইতে হয়,  
কারণ তদ্বারা পাপকে প্রস্রয় দেওয়া হয় ।  
পাপ প্রস্রয় পাইলে সমাজে বিশ্রামলা উপস্থিত  
হয় । আমরা সামাজিক জীব । সমাজ  
লইয়াই আমাদের অবস্থিতি, সমাজের যাহাতে  
রক্ষা হয় ও পুষ্টিবিধান হয় এবং যাহাতে  
অন্ধাধো কোনরূপ দুর্নীতি বা অনাচার প্রবেশ  
করিতে না পারে তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টিসম্পন্ন  
হওয়া প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিরই  
কর্তব্য । তাই সমাজরক্ষার পাত্রাপাত্র

বিবেচনা করিয়া দয়া প্রদর্শন করা প্রয়োজন  
“দান, দয়ারূপিত অমূল্যলব্ধ । যে দয়ার  
পাত্র, তাহাকেই দান করিবে । যে আর্ত,  
সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে । অতএব যে  
আর্ত, তাহাকেই দান করিবে—অপরকে নহে ।  
সর্ব্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না  
যে, যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার  
দুঃখ যৌচনার্থ আয়োৎসর্গ করিবে । যাহার  
দারিদ্র্য-দুঃখ নাই, তাহাকে ধন দান বিধেয়  
নহে । ইহা বলা কর্তব্য, অমুচিত দানে অনেক  
সময় পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি পায় । অনেক লোক  
অমুচিত দান করে বলিয়া পৃথিবীতে যাহারা  
সংকাগো দিন যাপন করিতে পারে, তাহারাত্ত  
ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয় ।”—ধর্ম্মতত্ত্ব ।

বহুকাল হইতে আমাদের দেশে মুষ্টি  
ভিক্ষার প্রচলন আছে । রামায়ণে রাবণ কর্তৃক  
সীতাহরণ এই ভিক্ষারছলেই সম্পাদিত হইয়া-  
ছিল বলিয়া কথিত হয় । তাহা হইলেই দেখা  
যাইতেছে, এই প্রথা বহুকাল হইতে এ দেশে  
প্রচলিত রহিয়াছে । এক্ষণে উহা সমাজ-শরীরে  
বদ্ধমূল হইয়াছে । অতি দরিদ্র হিন্দুগৃহস্থও দ্বার-  
দেশ হইতে ভিক্ষুককে রিজহন্তে বিদায় দেওয়া  
পাপ জনক মনে করেন । ইহা হিন্দুগণের  
আজন্মপুট সংস্কার । এই মুষ্টি-অন্ন ইহার  
উপেক্ষাপত্র চক্ষে দেখিয়া থাকেন । কিন্তু এই  
মুষ্টি মুষ্টি অন্নের সমবায়ের শক্তি অসীম । ইহার  
দ্বারা একদিকে যেমন ভাল কাজ হইতে পারে,  
অপর দিকে তেমনি সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে  
পারে । এই মুষ্টি-ভিক্ষার অন্নভলি কেবলই  
যে সমাজের অনিষ্ট করিয়া থাকে একদল

দ্রম। ইহার দ্বারা দেশের অনেক প্রকৃত গরীব, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু ব্যক্তির জীবন-যাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। ইহারা দয়ার উপযুক্ত পাত্রও বটে। কিন্তু “বঙ্গের ভিক্ষুক” এই কথা আমাদের কর্ণগোচর হইবামাত্র এই দীন-দরিদ্র বিকলাঙ্গদের পার্শ্বে অনেক হৃষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ নর-নারীর মূর্তিও আমাদের মানস-পটে প্রতিফলিত হয়। ইহারা দয়া-লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই দয়ার অপাত্র, সামর্থ্য-বিশিষ্ট, পরিশ্রম-পরাজুত দীন ব্যক্তির কোনরূপ কাজকর্ম না করিয়া দলে দলে এই অন্নায়াম-সাধা ভিক্ষকের জীবন অবলম্বন করিয়া দেশটা উৎসর্গে দিতেছে; এমন সুখের, সহজ, সরল পন্থা বিচক্ষমান থাকিতে শ্রম-ভীরু বাবাজী কঠোর জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে যাউন কেন? তাই আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে “হরি বল্লে কাঁড়া চাল মিলে।”

রবিবার ভিক্ষুকের পক্ষে পরম শুভদিন—মহা উপার্জন্যের দিন। এই দিন দীন ব্যক্তির কেহ এক মণ, কেহ দুই মণ চাউল দান করিয়া থাকেন; সরকারী কর্মচারীদিগের ছুটির দিন। তাহারা এই দিন কিছু পয়সা দান করিয়া থাকেন। রবিবার দিন রাস্তায় বাহির হইলে ভিক্ষুকদের ভিড় ঠেলিয়া যাউতে হয়, এত ভিক্ষুক সেদিন আমদানী হয়। ইহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় শিশু, বালক, বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌড়া, বুড়-বুড়ী, সমর্থ-অসমর্থ সকল বসাই আছে। তবে অসমর্থ অপেক্ষা সমর্থ ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেশী। ইহাদিগকে খাটিয়া পাউতে বলিলে ইহারা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলে—“তোমার ইচ্ছা হয়, বাপু! তুমি ভিক্ষা দাও, না হয়, না দাও তোমার অত ‘কথার’ দরকার কি?” এসব কথা শুনিয়া অবাক হইতে হয়। আমাদের দেশে যতদিন না আত্ম-সন্মান-জ্ঞানের উদয় হইবে, ততদিন এ অবস্থা কাটিবে না। কবি বলিয়াছেন “ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড়

অপমান।” কিন্তু একথা এদেশের লোক বুঝিল কি? কবি শুধুই আক্ষেপ করিয়া গেলেন!

হিন্দুগণ অতি ভাবগ্ৰবণ ও ধর্মোন্মত্ত জাতি। হরিকথা শুনিতে পাইলে তাহারা সব ভুলিয়া যায়, অতি রূপণও মুক্তহস্ত হয়; পাত্রোপত্র তখন তাহাদের জ্ঞান থাকে না। লম্বাট বাবাজী ভিক্ষকের চরণে অনেক অশিক্ষিতা অপরিণামদর্শী গৃহস্থ কামিনীগণ ভাবে বিভোর হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়া কূলে কালিমা লেপন করে। পল্লীগামে সরল কুলবধূগণের মধ্যে তৎপাকপিত বাবাজী ভিক্ষুক-গণের (ইহাদের তুনা অলস, ধূর্ত ও পরিশ্রম-কাতর অন্যই দেখিতে পাওয়া যায়) “হরিনাম” ও গায়ে হরিনামের ছাপ সঞ্চল করিয়া ধারে ধারে গমন করিয়া ভিক্ষার তুলি পূর্ণ করে।

‘প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে যে সব বৈষ্ণব দেখিতে পাই, তারা শুধু ভিক্ষা পাবার জন্যই তিলকমালা ধারণ করে।’ (হিমাগয়) ইহাদের হরিনামকীর্তন কতখানি হরির জন্য, আর কতখানি ভিক্ষার জন্য তা বলা শক্ত নয়।

‘আমরা সংসারের মধ্যে থেকে হরিনাম অনেক সময় ভুলে যাউ, সুতরাং আমরা পাপী। কিন্তু এই বৈষ্ণবগুলো সংসারটাকে এতই ভালবাসে যে তাকে একদণ্ড কাছ ছাড়া কর্ত্তে পারে না; তাই তারা তাদের উনকুটি চৌবটি তুলির ভিতর পুরে দিনরাত কীংকরে, পিঠে তুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা এই ঝোলাই বইবে, না হরিনাম করবে। ইহাদের প্রাণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সংসার।’

অনেক সময় একজন বাবাজীকে টুই বা ততোধিক বৈষ্ণবী সঙ্গে লইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা বজ্রনি ও মন্দিরা বাজাইয়া সম্বরে গান গাহিয়া বেশ হুঁপয়সা রোজগার করে। বৈষ্ণবীরা অনেক সময় গানে শ্রোতাদের চিত্ত এরূপভাবে আকর্ষণ করে যে তাহারা “বক্শিশ” দিতে বাধ্য হয়। ইহারা পল্লীগামে শৌক্য করিয়া

এক গ্রাম হইতে অল্প গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এই নেড়ানেড়ীর দল, হরিনাম করিয়া হরিনামের অপমান করে। উহা-দিগকে দিলে পাপের প্রার্থ্য দেওয়া হয়। যে ভিক্ষা দেয় তাহারও পাপ হয়। তৎকালিত বৈষ্ণববৈষ্ণবীগণ সমাজের কলঙ্ক, দেশের ভার পদ্রুপ। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক ক্রীষ্ণক বতীন্দ্র-মোহন সিংহ নগরায়ের “দ্রবতারা”তে এ সম্বন্ধে উত্তর প্রত্যুত্তররূপে বেশ একটা আলোচনা আছে। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ গ্ধরণ করিতে পারিলাম না।

১ম ব্যক্তি।—তৎকালিত বৈষ্ণবগণ সমাজের কলঙ্ক সম্বন্ধে নাই, কিন্তু তবু ত তাহার সমাজের অঙ্গ।

২য় ব্যক্তি।—অঙ্গ বটে, সমাজরূপ অট্টালিকা-কার নর্দমা।

১ম ব্যক্তি।—নর্দমার দরকার আছে, অন্তএব উহার রক্ষার প্রয়োজন।

২য় ব্যক্তি।—রক্ষা করা আবশ্যক, আবার পরিষ্কারও করা উচিত। ইহারা রাতে বদ-মাইসি করিলে, আর দিনের বেলা অলসভাবে হরিনামের ছল করিয়া অস্ত্রের ষাড়ে চাপিয়া নিজেদের অস্ত্রের সংস্থান করিলে, ইহাও ভাল নহে। ইহাদিগকে নিজ নিজ উদর পোষণের দ্বি রীতিমত পরিশ্রম করিতে হইত তবে বোধ হয় ইহাদের স্বভাব এত ধারাপ হইত না। তাহা হইলে একজন বৈরাগীর পক্ষে একটা বৈষ্ণবী রাখাই কষ্টিন হইত—সে চারি পাঁচটা কোন ক্রমেই রাখিতে পারিত না। এখন এই ভিক্ষুক-দমনের উপায় কি? ইউরোপে কেহ ভিক্ষা করিলে বা কাহারও নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইলে তাহাকে কাগাগারে বাস করিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও যখন সে দেশের ভিক্ষুকের সংখ্যা হ্রাস হইল না, তখন সে দেশের লোক “আদর্শ ভিক্ষুক সংশোধনপ্রম” প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভিয়েনা নগরের কয়েক মাইল দূরে কোর্গাবুর্গ নামক একটা গ্রামে এইরূপে একটা আশ্রয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার

উদ্দেশ্য ভিক্ষুকদিগকে শাস্তি দেওয়া নহে—তাহাদিগকে সংশোধন করা, কার্যক্ষম করা। ‘এখানে সমস্ত কার্য ভিক্ষুকদের দ্বারা করান হইবে, কাজ করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে, এবং কাজের প্রতি একটা আগ্রহ জন্মাইয়া দেওয়া হইবে,—এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া আশ্রয় স্থাপিত হইয়াছে।’ (প্রবাসী, কৈষ্ঠ, ১৩২০) আমাদের বাঙ্গালা-দেশে কি এরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে না? \*

শ্রীরাধাচরণ দাস।

## বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা।

অল্প ভাসাচ্ছন্ন জন্মকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে, অল্পবুদ্ধি ক্ষমতাশীন মানবকে মার্জিত বুদ্ধিশালী করিয়া স্নানীয় ক্ষমতাশালী করিতে শিক্ষার তুল্য আর কিছু নাই—একথা সর্ববাদিসম্মত। মানুষ জন্মগ্রহণ অবধি প্রকৃতির হস্তে লাগিত পালিত হইয়া কতকগুলি সাধারণ গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তারপর বয়সসুতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গুণের উপর যদি শিক্ষাবারি সিক্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে মানব-তরু বিচিত্র ফলফুল-ভারে শোভিত হইয়া চারিদিকে দৌরভ বিতরণ করিতে সমর্থ হয়। অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগরিত করিতে হইলে মানবকে শিক্ষিত করা চাই। শিক্ষার দ্বারা যত জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকিলে, মানবের শক্তিও তদনুপাতে বৃদ্ধি হইতে থাকিলে। একজ্ঞ ইংরাজীতে বলিয়া থাকে knowledge is power অর্থাৎ জ্ঞানই শক্তি। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রমতে এই জ্ঞানকে বুদ্ধিত করিয়া মানব এতদূর শক্তিশালী হইতে পারে যে, কালে দৈবত্বের সমতুল্য হওয়া অসম্ভব হয় না। কতকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দ্বারা অল্প শক্তিকে এতদূর জাগরিত করিতে পারা যে,

\* এই প্রবন্ধের কিরংশ ইতিপূর্বে কোন সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পরিবর্তিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। লেখক/

তখন মানবকে পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন বলা যাইতে পারে; ইহা সেই অবস্থা যে অবস্থায় মানব আপনাকে “সোহহং” অর্থাৎ আমিই সেই— আমিই দৈশ্বর্য— আমিই সেই সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞানের অধীশ্বর, —ভগবান বলিয়া নিজেকে উন্নীত অবস্থায় পরিণত করিতে পারে। বাস্তবিক, এই সকল কথা শ্রবণ করিলে মনে হয়, মানব-জীবন অতিশয় অমূল্য। যাহারা এই অমূল্য মানবজীবনকে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত রাখিয়া কালাতিপাত করেন, তাহারা ভগবান-প্রদত্ত এই মহৎ দানের অপব্যবহার করিয়া থাকেন। মহামতি ইমার্সন সাহেব বলেন, “A man is the prisoner of his power”— অর্থাৎ মানব নিজের ক্ষমতাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখে। এই কারাবদ্ধ শক্তিকে উন্মুক্ত করিবার একমাত্র উপায়—মানবকে শিক্ষিত করা তাহার জ্ঞানকে বর্দ্ধিত করা।

শিক্ষা যে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির নিয়ামক তাহা নহে, জাতীয় জীবন ক্ষুরণের ইহা একটা প্রধান সহায়। এই উন্নতির যুগে চারিদিকে শিক্ষার আলোক পরিব্যাপ্ত হইতেছে, জ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সময়ে যদি কোন জাতি বা সমাজ কুপমত্তকের জায় বসিয়া থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে, তাহা হইলে তাহার যে পতন অবশ্যস্তাবী তাহা কেনা স্বীকার করিবেন? এই সংসারে যোগাতারই জয়; জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে সময়ের গতি অনুসারে চলিয়া নিজ সমাজকে অজ্ঞান সমাজের তুলা গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি যে বিভাগেই দেখা যায় তাহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশ অনেক নিম্নতরে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই যে মাকাতার আমল হইতে যেরূপ কৃষি-কাষ্যের প্রণালী, যেরূপ শিল্প-বাণিজ্যাদির প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার কি কিছুমাত্র আমরা উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছি? বরং পাশ্চাত্য প্রণালীর সংসর্ষে

আসিয়া প্রতিযোগিতার স্থলে আমরা অসমর্থ হইয়া জীবন সংগ্রামে দিন-দিন ক্ষীণ হইতে-ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছি। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের কথা মনে হইলে জ্বদরে ভয়ের সঞ্চার হয়। এমন একদিন ছিল যখন তাহারা সমগ্র মহাদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে জ্ঞানালোকের যুগে তাহারা অসমর্থ হইয়া পড়িয়া এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, সে মহাদেশে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অনেক মনীষী ব্যক্তি আশঙ্কা করেন যে, অজ্ঞান পাশ্চাত্য জাতির, জায় আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা যদি অবাধ প্রচলিত না হয়, তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামে আমরাও ক্রমশঃ পশ্চাতে পড়িয়া আমাদের জাতীয়ত্ব হারাইয়া বসিব।

জন-সাধারণের জন্ত অবাধ প্রাথমিক শিক্ষার যে অত্যাশঙ্ক হইয়া পড়িয়াছে তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। অজ্ঞান দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ শিক্ষা, বাণিজ্য, বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। জন-সাধারণের উন্নতিতে দেশের উন্নতি, রাজ্যের উন্নতি,—রাজ্যের উন্নতি, সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়া থাকে। যাহারা মনে করেন যে, অজ্ঞানলোককে শাসন করা সহজ তাহাদের ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। বস্তুতঃ শিক্ষার জন্ত আমাদের সদাশয় গভর্ণমেন্ট প্রথম হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, সেই সময় সংস্কৃত টোল ও মুসলমান মক্তবের জন্ত যে সকল লাণগ্রাজ জমী ছিল, তাহাতে গভর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করেন নাই। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিনের সময় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সাধারণের শিক্ষার সৎক্ষেপ বিশেষ অনুসন্ধান হইয়াছিল; মিঃ এ্যাডামের উপর এই অনুসন্ধানের ভার পড়ে। এই সময় তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, বঙ্গে একলক্ষ পাঠশালা ছিল, এবং সাধারণের মধ্যে আরও শিক্ষার বিস্তারের জন্ত তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা যে বিস্তার লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৭০-৭১ সালের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, মাত্র ৬৮৫০০ জন ছাত্র তখন প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল। ১৮৮১-৮২ সালে প্রায় ২০০,০০০ ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল। ১৯১৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, ১১২৪১০৯ গুলি ছাত্র বৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, তন্মধ্যে ৫৫৮০৬ গুলি হিন্দু এবং ৫৫২৫৮৯ গুলি মুসলমান। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৩২.৭ হিন্দু ছাত্র এবং শতকরা ২৮.৯ মুসলমান ছাত্র বৎ প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং বাকী পাঠক-গণ একেবারে নিরক্ষর থাকিয়া যাইতেছে। ইহাদের শিক্ষার জন্য যে একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যিক তাহা ব্যবস্থাপক সভায় বহুবার আলোচিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে যে অচিরে আমাদের আশা ফলবতী হইবে তাহা অনুমান করা যায়।

তবে কথা হইতেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপ ভাবে প্রদান করা আবশ্যিক তাহা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। বর্তমান সময়ে যেকোন ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে পুঁথিগত বিজ্ঞানাতীত অজ্ঞ কোন কাৰ্য্যকরী বিজ্ঞা শিক্ষা হয় বলিয়া মনে হয় না। ইহার ফলে কৃষকের ছেলে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া আর লাভল ভরিতে পারে না, কামারের ছেলে লোহা পিটিতে লক্ষ্য বোধ করে, ছুঁতারের ছেলে বাটারি পরা ভূমিয়া বাচ, বণিকের ছেলে ব্যবসা ছাড়িয়া চাকরী প্রায় মনে করে। যে শিক্ষার বালকগণের কাৰ্য্যকরী বিজ্ঞা বর্জিত হয় সেজন্য কোন শিক্ষা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে নাই। কৃষকের ছেলেকে আধুনিক প্রণালীমতে কৃষিবিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া, শিল্পীর ছেলেকে শিল্প শিক্ষা দেওয়া, বণিককে বাণিজ্যের রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়া, প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইলে

দেশের গরীব দুঃখীর ছেলেদের অনেক উপকার হয়, তাহা না হইলে কতকগুলি পুঁথিগত বিজ্ঞা বালকের কোমল মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহার স্মৃতির অমুপযুক্ত করিয়া দিলে তাহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে বাধা হইয়া অন্তর ভ্রান্ত লাগায়িত হইবার পথে বসাইয়া দেওয়া হয়। কি প্রণালীতে চাষ করিলে অল্প ব্যয়ে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, কোথায় ভাল বীজ পাওয়া যায়, কি প্রকারে সার প্রস্তুত করিতে হয়, কলের লাঙ্গল কি প্রকারে চালান হইতে হয়, প্রাথমিক শিক্ষায় কি একরূপ শিক্ষা প্রচলন করা অসম্ভব? এই বন্ধের ভিতর নানা স্থানে নানা প্রকারের শিল্প কার্য্য হইয়া থাকে, সেগুলির বিশেষ বিবরণ শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত নয় কি? বহির্বাণিজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বন্ধের অন্তর্বাণিজ্যের বিশেষ ধরনের আমরা কয়জন রাখিয়া থাকি বা সে সম্বন্ধে কি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি? গতদিন না আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা গরীব দুঃখীর ছেলেদের কাৰ্য্যকরী শিক্ষার উপযোগী হয় ততদিন প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা দেশের উপকারের আশা করিতে পারা যায় না। আজ যে শত শত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র উপার্জনক্ষম হইয়া চাকরীর জন্য লাগায়িত হইয়া বেড়াইতেছে তাহার প্রধান কারণ কাৰ্য্যকরী শিক্ষা তাহাদের কিছু মাত্র হয় না, কেবলমাত্র অল্পশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কতকটা আত্মপ্রতিমানে ক্ষান্ত হইয়া কতকটা সামর্থ্য-ভাবে স্বস্তি ছাড়িয়া দেয়া জীবনকে দুর্ভাগ করিয়া তুলিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে কাৰ্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া হয় না; এই জন্য সে সকল দেশের শিল্প, বাণিজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে আমাদেরকে টিকিয়া থাকিতে হইলে, আমাদেরও তাহাদের মত অবাধ প্রাথমিক শিক্ষা ও তৎসহ কাৰ্য্যকরী শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া চাই।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্।

আলোচনা, দ্বাবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২২ সাল।

## আগমনী

( ১ )

এস গো জননি বন্ধে, ঢালি শান্তি স্নান-রাশি,  
তব আগমনে মাগে পুলকিত বঙ্গবাসী,  
বিপুল পুলক-রঙ্গে,  
এস মা শিবানি বন্ধে,  
উজল তরল বিভা ছড়া'য়ে অধর-পথে,  
করুণা-ভকতি-প্রীতি লয়ে এস তব সাপে।

( ২ )

এস মা হৃদয়-বীণে তুলিয়া পূরবী তান,  
অশীষের ঝারি হাতে, পুগকে নাচায়ে প্রাণ,  
এস মা করুণা-রাণী,  
পূজিব ও পা হু'খানি,  
অক্ষয়ল মিশাইয়ে ভকতি-কুসুম সাপে,  
পূজিত তোমারে মাতা আজি এ শরৎ-প্রাতে।

( ৩ )

হুড়িয়া হুইটি কর তোমার চরণ-তলে,  
দাঁড়াব আজি মা শিবে!—জীবনের আলা তুলে,  
গুলিয়া অশান্ত প্রাণ,  
করিব তোমার ধ্যান,  
সাজাব চরণ-চাক ভকতি-কুসুম-বারে,  
আর মা, বাঁধানী তোরে ডাকে আজ সন্ধ্যাতরে।

( ৪ )

চরণ পরশে তব হাসিয়া উঠুক ধরা,  
শোক-তাপ দূর করি মুছা মা' নয়ন-ধারা,  
দৈন্ত সব নাশ পা'ক,  
অভাব ঘুচিয়া যা'ক,  
হাহাকার ডুবে যা'ক আনন্দের কোলাহলে,  
নাচুক সারাটি বঙ্গ আজি নব কুতূহলে।

( ৫ )

বরণ করিতে আজি তোমারে মা গীরিবালা,  
বঙ্গবধু সাজায়েছে বতনে বরণ-ডালা,  
মণিময় কর্ণহার,  
শোভে গলে অদনার,  
শিমস্তে শোভিছে সিঁধি, শোভে হু'টি কানে ছল,  
পূজিতে তোমারে তারা এনেছে ভকতি-ফুল।

( ৬ )

হৃদয়ে হৃদয়ে আজ কি পবিত্র সন্নিধান,  
প্রীতি, ভক্তি, মেহে বর্ণে পশ্চিমত এ ভুবন,  
অতীত হুড়িয়া সবে,  
কি আনন্দ কলরবে,  
এবাসী-বাঁধানী আজ আবার ফিরিছে ঘরে,  
আর গো জননি বন্ধে তিনটি দিনের তরে।



( ৭ )

গরম-মন্দার হ'তে তুলি পুষ্প ভকতির,  
লয়ে এস বজ্রবাসী দিতে পদে জননীর,

পুত অক্ষরাশি দিয়ে,

শ্রীচরণ ধোয়াইয়ে,

নসাব ঝায়েরে আজ হৃদয়-কুসুমাসনে,  
পুলাঞ্জলী দিব সবে জননীর শ্রীচরণে,

( ৮ )

এস মা অপরাধিতা হৃদয়-বাহনে এসি,  
প্রভায় উজলি বদ অমা-তাম্রায় নাপি,

পুত-খান্ড-দুর্ভাগারে,

শেফালি-কুসুম-হারে,

সাজাব জননী তব চরণ-কমল আজি,  
পুলাঞ্জলি দিব মাগো ভকতি-প্রস্থন-রাজি।

( ৯ )

মিলন-রাগিনী মাগো হৃদয়ে উঠিছে বাকি,  
হুয়ে গেছে আজ শত-ভীতি-বাণা-বিঘ্নরাজি,

রজনী হয়েছে তোর,

ভেঙ্গে গেছে ঘুম-ধোর,

জেগেছে বাঁজালী আজ বাঁজালার বরে বরে,  
পুজিতে মাতারে তা'র সারাটি বরষ পরে।

( ১০ )

শরৎ-প্রভাতে আজ বিহগ বেহাগ গায়,

পরিমল-গন্ধ লয়ে বহিছে মলয় বায়,

এস মা হৃদয়-বৃন্তে,

একটি বরষ অভ্যে,

আবার পুজিব তারা চরণ দু'খানি তোর,

আর গো শতরী বঙ্গে যুঁহা মা নয়ন-লোর।

ঐবিলকান্তি বুঝোনাথায়

## ভাবের পূজা।

বাঁজালী কবি—বাঁজালী ভাবুক। ভাব-

সাগরে অবগাহন করিয়া সে পূজায় বসিল—  
ব্রহ্মভাবে ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে  
আপনহারা হইয়া সমাধিস্থ হইল, ব্রহ্মময় হইয়া  
ভাব-সাগরে সাঁতার দিতে দিতে কূল পাইল ;  
সমাধি একটু একটু অপসারিত হইল, মনোবুদ্ধি  
আবার বিষয়-রাজ্যে ফিরিয়া আসিল কিন্তু  
তৃষা মিটে নাই, নেশা ছুটে নাই। প্রাণ যে  
সেই বস্তুকে মনোবুদ্ধির সাহায্যে চক্ষের সম্মুখে  
দেখিতে চায়। তখন সাধক ভাবে বিভোর,  
সে ভাব গাঢ় হইয়া একটা অমুভূতি তখনও  
ভাবেতে মেশামিশি হইয়া পড়িয়াছে ; সেই-  
অমুভূতির সাহায্যে কল্পনা-সুন্দরী ভাবুকের  
প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সেই অমুভূতিকে  
লইয়া কল্পনা ভাবের উপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া  
একটা আদর্শ খাড়া করিতে লগিল। ধ্যান-  
সমাধিতে যাহা, যে মাতৃভাবের অমুভূতি  
জাগিয়াছিল। সমাধিভঙ্গে সাধক কল্পনার  
সাহায্যে সেই মাতৃরূপ গড়িয়া তাঁহাকে মনের  
মত সাজাইয়া ফেলিল। পরের জন্ত, পরকে  
দেখাইবার জন্ত নয়, তখন প্রাণ যে প্রাণময়ী  
ছাড়া থাকিতে পারে না—তাই প্রাণের দ্বায়ে,  
প্রাণে পারতৃপ্তির-জন্ত, সেই ব্রহ্মময়ীর রূপ  
মাতৃভাবে গড়িতে লাগিল। ভাবুক বাঁজালীর  
ভাবসমাধি ভক্তের পর ভাবের ঘোরে এইভাবে  
মাতৃ-প্রতিমার উৎপত্তি হইল—ইহাই তাহার  
প্রতিমা-পূজা, এই প্রতিমা-পূজাই বাঁজালীর  
বিশেষত্ব,—বাঁজালী হিন্দুর হিন্দু,—তাহাদের

পূজা-পার্বণের মহা-মহত্ব। আপনাদের অন্তরের প্রান্তরতম প্রদেশস্থিত ব্রহ্মবস্ত্র অমৃতভূতি-সাহায্যে চক্ষের সম্মুখে দেখিবার জন্ত; সর্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অতীত তাঁহাকে চক্ষুচক্ষে অবলোকন করিবার জন্ত, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সন্তোষ করিবার জন্য তখন তাঁহার মানস-মূর্তির কল্পনা করা হইল। যিনি যথার্থ ভাবরাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছেন—ভক্তিভাব বাহার নিত্য প্রগাঢ়, সেইরূপ একনিষ্ঠ নিরাকারবাদীও ভক্তি-প্রাবল্যে তাঁহার প্রাণের দেবতার পদকল্পনা করিয়া তাহাতে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া ফেলেন, তাহার মধুর অধরে মৃদু হাসির রেখা দেখিয়া প্রাণে আনন্দলাভ করেন, ব্রহ্মের মানসমূর্তি কল্পনা করিয়া কখন মা বলিয়া, কখন পিতা বলিয়া কাদিয়া বুক ভাসাইয়া দেন। এ সকল ভাব মানসকল্পনা সমুদ্ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। মাতৃত্ব, পিতৃত্ব বা স্বামীত্ব সাকার পিতামাতা বা স্বামীর বাদ দিয়া কখন নিরাকারে প্রকাশ পায় না। এইজন্ত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে গেলেও কেহ কখন এই মানসকল্পনার হাত এড়াইতে পারেন না—এড়াইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে তত আনন্দ বা তৃপ্তি উপলব্ধি হয় না।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞান বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া বাদ্যলী এই ভাবে ব্রহ্মময়ীর রূপ কল্পনা করিয়া থাকে। ভাব-ভক্তি ও রসের দ্বারা বাদ্যলী প্রতিমাপূজা করে, কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার সৃষ্টি হয় নাই। এইভাবে প্রতিমাপূজা করিয়াই বাদ্যলী সাধনমার্গে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ

হইয়াছে। অস্ত্রান্ত দেশে এবং অস্ত্রান্ত জাতিতে মথো মূর্তিপূজার ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু যে সকল মূর্তি বহুকাল হইতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা তাহাই পূজা করেন; প্রতিমা গড়েন না, ভাব ও সমাধি-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা প্রতিমাপূজা করিতে অনভ্যাস—ইহা বাদ্যলীরই নিজত্ব। বেদান্তাদি শাস্ত্রে ত্রিবিধ উপাসনার ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে—স্বরূপ সম্পৎ ও প্রতীক। আত্মার উপাসনা—অর্থাৎ নিজের স্বরূপেতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করাকে স্বরূপ উপাসনা বলে। এই উপাসনা উচ্চ অধিকারীর জন্ত নির্দ্ধারিত। একটিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা অর্থাৎ কমলালেকুর আকার ভাবিয়া পৃথিবীর গোলম চিন্তা অথবা সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মত্বের ধারণা করাকে সম্পদ্রূপাসনা কহে। আর দৈবরত্ন বা ব্রহ্মত্ব অথ প্রকারে উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে সেই ভাব ঘটপটাদিতে উপলব্ধি করার নাম প্রতীকোপাসনা। মূর্তি কল্পনা করা এই সাধনার প্রাণস্বরূপ, যেমন সর্পে রক্তভ্রম।

আমাদের এই প্রতিমাপূজার উক্ত তিন প্রকার উপাসনার মধ্যে একটীও ঠিকভাবে হুটিয়া উঠে নাই; তিনটী বেন একজ মিশ্রিত হইয়া আমাদের এই পূজার ভাবে বিশদভাবে হুটিয়া উঠিয়াছে। এই পরিস্ফুটনে বাদ্যলী কৃতবিদ্য বলিয়াই, বাদ্যলী কবি, বাদ্যলী ভাবুক, তাবের ভাবে বিস্তার হইয়া তাহারা বাহ্য করে, তাহারা বাহ্য গড়ে—তাহার ভুলনা এ জগতে নাই। পূর্বে বলিয়াছি—অমর্য্য যে সকল মূর্তি পূজা করি, তৎসমস্তই তাবের পরি-

পূরণ, সাধকও এ বিষয়ের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন “সে যে ভানের বিষয়, তাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্মে পারে।” ব্রহ্মবত্ত লাভ করিতে হইলে ভাবের মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হইবে কারণ তাঁহার কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই। তিনি সকল রূপ বা সকল গুণের আধার এই জন্য যে তাব আমাদের ভাল লাগে, যে ভাবে আমরা বিতোর হই, যন যে ভাবে মজিতে ভাল বাসে, আমরা সেই ভাবেই তাঁহাকে গড়িয়া ছন্দররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি।

দেহাত্মবুদ্ধি বা সংসার-ভাব আমাদের মধ্যে জড়িত, সংসারের যেটা ভাল, যে ভাবের আভাস পাইলে আমরা গলিয়া যাই, ঠিক সেই ভাবেই আমরা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করি এবং তাহাতে সফলকামও হইয়া থাকি। শিশু-মাতা, কন্যা প্রভৃতির ভাব আমাদের নিকট বড় মধুর, বড় প্রীতিপ্রদ, ছন্দয়ের বড় সন্তোষজনক, তাই আমরা ব্রহ্মকে উহার এক-রূপ বা একরূপ ভাবে ধারণা করিয়া তাহার সহিত বেলা করি। শান্ত, দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে হৃদয়বনে একদিন ভগবানের দীপানামধুরী প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মবাসীকে ধস্ত করিয়াছিল। আর এখন সাধক তাঁহাকে যে ভাবে আহ্বান করেন, তত্তপ্রাণ ভগবান তাহাকে সেইভাবেই দর্শন দেন। জাগতিক বিপদাপদে পিতামাতার মত, শোক দুঃখে বন্ধু-বাকবের মত, আনন্দ-আনন্দে আত্মীয়-বন্ধনের মত দর্শন দানে আমাদেরকে চরিতার্থ করেন। এই জন্য তিনি কন্যারূপে আসিয়া তক্ত রায়প্রসাদের বেড়া বাঁধিয়া-

ছিলেন। পুত্ররূপে আসিয়া বহুদেব : দেবকীর কারা-যজ্ঞায়া মৌচন করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র ও ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তপস্তার পর সাধকের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে, বরপ্রদানে অভয় দিতে ত তিনি সাকার রূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

ভগবান এক, অদ্বিতীয়; তবে সাধকের ভাব অনুসারে তাহাকে পৃথক পৃথক রূপে সংপূর্ণিত হইতে হয়। এক ব্যক্তি যেমন রত্নমন্ডলের অভিন্নর সময়ে নানাপ্রকারে ‘আবির্ভূত হইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করে, ভগবানও সেইভাবে কখনও সৃষ্টিশক্তি, কখনও পালনী-শক্তি, কখনও সংহারশক্তির দ্বারা আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। একই সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম এইভাবে লীলাবিস্তার করেন। উপাদান কারণে তিনি মাতৃরূপা, নিমিত্ত কারণে তিনি পিতৃরূপ। ব্রহ্ম—পুরুষ-প্রকৃতাশ্রয়; পুরুষ অংশটি নিগুণ, নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি অংশটি যাবতীয় ক্রিয়া এবং গুণসম্পন্ন। ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় চৈতন্যাত্মক বক্ষে থাকিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী শক্তি জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন—ইহাই শিবের উপর শ্রামাশ্রিতির অধিষ্ঠান।

যা কথাটা নাকি আমাদের বড় মধুর, শোকের দুঃখের সাজনা, বিপদাপদের সহায়—এইজন্য ব্রহ্ম মাতৃভাবে আরোপ করিয়া তাঁহার পূজা করি, আজ আমাদের সেইদিন, যা বিশ্ব-জননী কতভাবে মাতৃভাবে বাল্যলীর চিত্তগটে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, এতদিন এ চিত্তভূমি কত প্রকার মালিন্য রেখার বিচিত্রিত ছিল—এখন তাবের বস্তার তাহা ধুইয়া ধুইয়া এক প্রকার

পবিত্র নিকলক হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাহা হইতে মাতৃমূর্তির বিকাশ এত উজ্জ্বল, এত শোভাময় ! এস তাই ! শান্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভক্তগণ আজ ভাবের ঘোরে অন্তরের অন্তস্থল হইতে ভাবকূপের উৎস তুলিয়া ভাবময়ী ভব-ভবানীর পূজায় ত্রতী হই। মহিষাসুর, শুভ, নিশুভাদি দৈত্য বিনাশের জন্য একদিন দেবতাবৃন্দ নিজ নিজ শক্তি প্রদানে ভাবের প্রভাবে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ত্রেতার জীরামচন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে রাবণ-বধের জন্য বেকালে দেবীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

আজ শরৎকালের সেই শুভ বাসর সম্মুখে সমুপস্থিত, কর, বাজালী, মহামায়ার উদ্বোধন কর, বজ-বরাদণা অঙ্গনে আলিপনা প্রদান করিয়াছেন, মঙ্গলঘট সম্মুখে সুসজ্জিত, আজ মঙ্গলময়ী মাকে কাতরে আবাহন করিয়া মণ্ডপে অধিষ্ঠিত কর। চির চৈতন্যময়ী মা—তোমাদের ভাবে অচৈতন্য ছিলেন—তোমরা চৈতন্য লাভ করিয়াছ—তোমাদের চির প্রসন্নময়ী মাও আজ অমূল্য হইয়াছেন, হৃদয়-গৃহঘারে আসিয়াছেন—ভক্তি-অৰ্ঘ্য দানে, স্বাগত সস্ত্রাষণ—মণ্ডপে বসাত্ত, পূজা কর, ধন্য হও, তাপত্রয় হইতে পরিশুদ্ধি লাভ করিয়া বল—প্রপন্নার্থী হরে দেবি—প্রসাদ প্রসাদ পরমেশ্বর।

সম্পাদক।

## দেবতত্ত্ব ।

(শেবাংশ)

দেবগণ নিত্যভাবে জ্বলোক বাতীত আর সকল লোকেই থাকেন। আমাদের যেমন

যতবার মানবজন্ম হইবে প্রত্যেকবারেই এই পৃথিবীতে জন্ম লইতে হইবে, দেবতাদের পক্ষে সেরূপ বিধি নাই। তাঁহাদের পক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাৎ পৃথিবী বাতীত চন্দ্রলোক, মঙ্গললোক, বুধলোক, বৃহস্পতিলোক, শুক্রলোক, শনিলোক ও সূর্য্যামণ্ডল সর্বত্রই তাহাদের অবধিগতি ও বাসস্থান আছে এবং কার্য্য-বশতঃ যাতায়াতও করিতে হয়। আমাদের পক্ষে অর্ধাৎ মানবজাতির পক্ষে পৃথিবী মাত্র মানবদেহে অর্ধাৎ স্থলদেহে বাস করিবার নির্দিষ্ট স্থল, দেবজাতির পক্ষে সপ্তগ্রহ সম্বন্ধিত ব্রহ্মাণ্ড নির্দিষ্ট বাসস্থল বলিতে হইবে।

যে সকল দেবতাগণ সৃষ্টিকার্য্যে ও পৃথিবীর পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি, ইহারা বাতীত আরও অসংখ্য দেবতা আছেন, তাঁহাদের সংবাদ আমরা পাইতে পারি না, ক'টি কখনও কোন সাধক এরূপ কোন দেবতার দর্শন পাইয়া থাকিবেন, ইহাদের সঙ্কে বিশেষ জ্ঞান লাভের উপায় নাই, ইহারা এত উচ্চলোকে থাকেন যে, মানবজাতির কেহই এখন সেইস্থান সঙ্কে জ্ঞানলাভের যোগ্য হয় না।

চলিত কথায় দেবতাদের সংখ্যা তেজস্বী কোটি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সংখ্যা আরও বেশী হইবে। সৃষ্ট-পদার্থ মধ্যে পদ-জাতি যেমন অসংখ্য, মানবজাতির যেমন পূর্ণা করিয়া শেষ করা যায় না, সেইরূপ দেবজাতির সংখ্যা পাওয়া দুষ্কর, তবে তাঁহারা যে তেজস্বী কোটিরও বেশী হইবেন, একথা তাঁহারা সাক্ষাৎ

মার্গে উন্নতি লাভ করিয়া দেবগণের সহিত দেবাসাক্ষাৎ করিতে পারেন, তাঁহারা তাঁহাদের দর্শনজনিত জ্ঞান হইতে বলিতেছেন।

মানবজাতির ক্রমে ক্রমে কিরূপে উন্নতি হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে যাইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথম তিনটি অবস্থায় মানবজাতির তিন শ্রেণীর মৌলিক ধাতুরূপে (elements) পুনঃপুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। চতুর্থ অবস্থায় এই আত্মা যৌগিক কোনরূপ দানাবদ্ধ (crystal) খনিজ পদার্থ অবস্থায় উন্নতি লাভ করে, ইহার পর এই আত্মাকে উত্তীর্ণ অর্থাৎ লতা-বৃক্ষ অবস্থায় জন্ম লইতে হয়, তৎপরে বহু জন্মের পর ঐ অবস্থা ত্যাগের সময় মানব আত্মা পশুজন্ম লাভ করে। এই পশু অবস্থায় এক এক পশুর এক এক আত্মা থাকে না। অনেকগুলি এক জাতীয় পশুকে লইয়া একটা আত্মা থাকে। বহুকাল পুনঃপুনঃ তিন্ন ভিন্ন পশুজন্ম লাভ করিয়া শেষে গৃহ-পালিত পশু হইয়া মানবের তত্ত্বাবধানে আসিয়া কয়েক জন্ম লইবার ফলে পশুর

ব্যক্তিত্ব, বা আদিবৃত্তাব লগ্নাইলে তবে তাঁহাদের মানবজন্মে উন্নতি হয়। তখন এক এক মানব এক এক আত্মাযোগে থাকে। আমাদের বর্তমান মানবজাতির অধিকাংশই যখন পশু জন্মে ছিল, তখন আমাদের পৃথিবীতে প্রাণশ্রোত প্রবাহিত ছিল না। তখন চন্দ্র-লোকে মানবজাতির বাস ছিল অর্থাৎ প্রাণ-শ্রোত তখন চন্দ্রলোকে, এবং আমরা পশু অবস্থায় চন্দ্রলোকে ছিলাম। পৃথিবীতে মানব-সৃষ্টির সময় আমরা মানবত্ব লাভ করিয়া অতি

অসভ্য ও মনহীন তরল মায়াবর দেহ লইয়া এই পৃথিবীতে প্রথম মানব-জাতিরূপে আমরা জন্ম লইতে থাকি। ক্রমে মানবদেহের দৃঢ় হইতে লাগিল, গঠনের সৌষ্ঠব বাড়িতে লাগিল। মানসপুত্রগণ ও চন্দ্রলোক, শুক্র-লোক প্রভৃতি স্থানের উন্নত মুক্ত মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিবার জন্য কৃপা করিয়া, নিজের সাধন-ফলের অক্সান্ত সুখ ভোগ অনায়াসে ছাড়িয়া দিয়া মানবজাতির মধ্যে জন্ম লইলেন।

কেহ নির্মাণকায় গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে ফিরিতে লাগিলেন, মানসপুত্রগণ মানবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানবের মন হইয়া রহিলেন। এইরূপে আমরা মানবজাতি ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় উঠিলাম, আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অনেকই মুক্তিলাভ করিয়া ঐরূপে নিজের সুখভোগের সুযোগ ত্যাগ করিয়া মানব-জাতির জন্য অক্সান্ত পরিশ্রম করিতে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

কল্যাপ্তকালে আমাদের মানবজাতি হইতে অনেক মুক্ত ঋষি প্রভৃতি উন্নত অবস্থায় মানব হইয়া উঠিবেন। ইহাদের মধ্যে অনেককে অপর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্য ও পালনকার্য্যে সহায়তা জন্য নিযুক্ত করা হইবে। ব্রহ্মাণ্ড অধিপতিত্ব, পৃথিবী অধিপতিত্ব, সৃষ্টি সহায়তা-কারী ও জগৎব্যাপার পরিচালনে নিযুক্ত দেবত্ব, ঋষিত্ব, এই সকল পদ আমাদের মানবজাতির মধ্যে অনেককেই তখন সেই নূতন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বাইরা লাভ করিবেন। মানব-

জাতির মধ্যে ষাঁহারা মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে গতি হইতে থাকিবে। মানবজাতির উন্নতিমার্গে এইরূপ এতদূর পর্য্যন্ত অধিকার।

দেবজাতির সম্বন্ধে এইরূপ উন্নতির ক্রম আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা নিজেদের হীনাবস্থা বশতঃ বড় বেশী তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি নাই, উচ্চ উচ্চ লোকের দেবগণ ও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জানা মানবের পক্ষে দুরাশা মাত্র। তবে যতদূর জানিবার উপায় আছে—তদনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, দেবগণ সৌরমণ্ডলের পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য লোকের মানবজাতি হইতে দেবতা-শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন। এই সকল মানবজাতির মধ্যে কোনটার উন্নতি আমাদের অপেক্ষা কম কোনটার বা আমাদের অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই দেবতালোকের উপযোগী অবস্থায় উঠিয়াছেন। আবার ইহাও সত্য যে, অনেক দেবতা কখনও মানব জন্ম দেবতা হইবার পূর্বে লাভ করেন না, তাহাদের ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে ষাঁহারা ধাতু হইতে মানব পর্য্যন্ত এই লাভ শ্রেণীর মধ্য দিয়া দেবত্ব লাভ করেন না। মানবের উন্নতির সীমা অনেকটা জানা গিয়াছে, কিন্তু দেবগণ আরও বেশী উচ্চে উঠিবেন অসম্ভব করা যায়, কিন্তু সে সকল উচ্চ অবস্থা যে কি তাহা ধারণার আনা যায় না! দেবযোনি হইতেও সত্তর সত্তর দেবত্ব লাভ হয়। মানবদের মধ্যেও কেহ কেহ

দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবযোনি দেবত্ব লাভ করিয়া কামদেব শ্রেণীতে থাকেন। কিন্তু মানবগণ মুক্তিসাধনের অধিকারী হইলে তাঁহাদের পক্ষে সাতটা পথ মুক্ত থাকে, তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোনটি লইতে পারেন। যিনি দেবত্ব ইচ্ছা করেন, তিনি দেবগণের নিম্ন শ্রেণীর উপর চতুর্থ শ্রেণীর দেবত্ব একবারে প্রাপ্ত করেন।

দেবগণ যেমন ভুলোক ব্যতীত অন্ত সকল লোকে বাস করেন তদনুসারে তাহাদের সেই লোক-সংক্রান্ত পদার্থ গঠিত দেহও থাকে। ভুবলোকে ষাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের ভুবলোকীয় জলতত্ত্ব-ঘটিত পদার্থ নির্মিত দেহ। ভুবলোককে কামলোক কহে, একারণ এই লোকবাসী দেবতাদের কামদেব-শ্রেণী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গলোকের নিম্নতম ষাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের রূপদেব কহে, স্বর্গলোকের উচ্চতরে এবং মহ, জন, তপঃ, সত্য প্রভৃতি লোকের দেবতাদের অরূপদেব আখ্যা, ইহাদের উপর দিকপাল নামক দেবগণ আছেন কামদেবগণের মধ্যে সকলেই মানবজাতির অপেক্ষা অধিক উন্নত নহেন। তবে গড় হিসাবে ধরিলে ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মানবজাতির অপেক্ষা অধিক উন্নত। অনেক মানবও ইহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে উঠিয়াছেন। কামদেবগণ পৃথিবীতে বড় একটা প্রকাশ হন না, তাহারা আমাদের পৃথিবীর ব্যাপার বড় একটা ধরবে আনেন না। দৈবাৎ কোন বিপন্ন ব্যক্তির বিপদে ষাঁহারা দয়াক্ষ হইয়া পড়িয়া কোন কোন কামদেব

কাহারও কাহারও উপকার করিয়াছেন। আমরা যেমন কোন পণ্ডকে বিপন্ন দেখিলে কোন সময় তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকি, সেইরূপ ভাবে কামদেব কর্তৃক কচিং আমরা উপকৃত হইয়া থাকি। বর্তমান সময়ে আমরা যে অবস্থায় উঠিয়াছি তাহাতে কামদেবগণ কর্তৃক আমাদের কার্যে হস্তক্ষেপ হইলে অনিষ্ট ভিন্ন ইহা হইবে না, এইজন্যই উক্তরূপ বিধান। সঙ্কটরূপ কামদেবগণের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন, ইন্দ্রজাল ও ভৌকি ইত্যাদি অমুর্তান দ্বারা ইহাদের আকর্ষণ করা যায়। দিকপালগণের উপর আরও তিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে, তাঁহাদের উপর আমাদের পূর্বকথিত আধিপতি দেবতাসমূহ।

দিকপালগণকে শাস্ত্রে দেবরাজ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা দেবতাদের উপর রাজত্ব করেন বলিয়া ইহাদের দেবরাজ নাম নহে। ইহারা ক্ষিতি, অগ্নি, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের এবং এই পঞ্চভূতবৃষ্টি লোকসমূহের উপর শাসনকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

দিকপালগণের অধীনে এক এক শ্রেণীর দেবদেবী রহিয়াছেন। পূর্বদিকের দিকপাল তাঁহার নাম দ্বতরাষ্ট্র—তাঁহার দেবদেবী গন্ধর্গগণ, তাঁহার বর্ষ খেত। লিপিকা নামক দেবদেবী স্ত্রী ব্যক্তির ভুবলোক বাস শেষ হইবার পর তাহার শুভাশুভ কর্ম সকল ওজন করিয়া ভবিষ্যৎ লিখিয়া দেহের হাঁচ প্রভৃতি করেন। দেবরাজগণ অর্থাৎ দিকপালগণ পঞ্চভূতের আধিপতি সুতরাং আবৃত্তক মত পঞ্চভূত দ্বারা ভাবিলেই মানবের লিখিয়া

যে রূপ হইবে সেইরূপ গঠন করেন। ইহারা ইচ্ছামত মানবদেহধারণ করিতে পারেন ও অনেক সময় এইরূপ দেহ ধরিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে যে সকল দেবগণ জগৎ ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন বলিয়াছি, অগ্নিপ্রজ্বলন হইতে নদীবহন, শস্য উৎপাদন, জীবজন্তুর বর্ণবৈচিত্র্য করণ প্রভৃতি কার্য যে সকল দেবগণ করিয়া থাকেন তাঁহারা এই দিকপালগণের আদেশে ও অধীনস্থ কর্মচারী ভাবে করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কার্যের জন্য দায়িত্ব এই দিকপালগণের হইতেছে।


লোকপাল বলিয়া আর এক শ্রেণীর দেবতাগণ আছেন। ইহারা এক এক লোকের শাসনকর্তা। ভূবলোকের কর্তার নাম বিষ্ণুদেব। ইনি ভূবলোকে জীবগণকে কর্মফল ভোগ করাইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধে এই বিশ্বদেবের পূজা হয়, পার্শ্ব-শ্রাদ্ধ পর্কদিনে করিতে হয়। পর্কদিনে বিশ্বদেব মানবদের প্রার্থনা শুনিবার জন্য দিন দ্বারা করিয়াছেন। এইজন্য এইদিনে শ্রাদ্ধ করিয়া বিশ্বদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, আপনি আমার অমুককে রূপা করিয়া ভূবলোকের কষ্টদায়ক প্রেতলোক হইতে ভূবলোকের সুখদায়ক অংশ পিতৃলোকে পাঠাইয়া দিন, অথবা !উহাকে ভূবলোক হইতে স্বর্গলোকে যুক্ত করিয়া দিন। পার্শ্ব-শ্রাদ্ধের এই উদ্দেশ্য, এইজন্যই এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

আমরা বর্তমান আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে জানিতেছি যে, দেবগণ ভুলোকে থাকেন

না। ভুলোকে থাকিতে হইলে ভুলোকবাসীদের মত দেবগণের স্থলদেহ থাকি চাই, স্থলদেহ-ধারী দেবদেহ নাই, কাজেই ভুলোকে দেবগণের বাসস্থান হইতে পারে না। তবে স্থানে স্থানে মন্দির আদিতে দেবতাদের পূজাদি হইয়া থাকে ও তাঁহাদের মূর্তি গঠিত থাকে দেখা যায়, এসকল কাহার স্থান, এই সকল স্থানে কি কোন দেবতা থাকেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, দেবগণ মন্দিরাদি মধ্যে ও তীর্থাদি স্থলে লীলারূপে রহিয়াছেন। তাঁহারা উচ্চলোকস্থিত তাঁহাদের স্বরূপ লইয়া উচ্চলোকেও রহিয়াছেন, সেই স্বরূপটী তাঁহার নিত্যরূপ, আবার ভুলোকে মন্দিরাদি মধ্যে একটী লীলারূপ ধরিয়া এখানে চিরবিরাজ করিতেছেন। এক সময় একের অধিক স্থানে থাকিবার শক্তি দেবগণের আছে—এক সময়ে নানা মূর্তি ধরিয়া নানা স্থানে তাঁহারা প্রকাশ হইতে পারেন। ঐয়জ্ঞিককাল সোসাইটীর মধ্যে কোন কোন মহাত্মাদের শিষ্যগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সন্ধ্যা সময় এমন ঘটিয়াছে যে তিনি ঘরের ভিতর চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছেন, অথচ দেখিতেছেন যে তিনিই আবার নিজমূর্তিতে বাটীর সংলগ্ন বাগানে দাঁড়াইয়া একটী ফুলগাছের ফুল দেখিতেছেন, তিনি কি তবে দুইটী হইলেন? অথচ বাগানে দাঁড়াইয়া বাহা দেখিতেছেন তাহা চেয়ারে বসিয়া তিনি নিজে দেখিতেছেন মনে হইতেছে। এইরূপে একই সময়ে একাধিক স্থানে থাকিবার ও দৃষ্ট দেখিবার ও কার্য্য করিবার শক্তি উচ্চ অবস্থার উদ্ভিলে সাধকদেরও হইয়া থাকে।

এইরূপেই জ্ঞানশক্তির প্রসার হইয়া থাকে।

দেবভাগ্য নিত্যরূপে অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিকরূপে, অর্থাৎ কোথায় কোনরূপ ধরিয়া না থাকার সময় যেভাবে তাঁহারা থাকেন সেইরূপে তাঁহারা আমাদের পৃথিবীতে আসেন না ও থাকেন না। পৃথিবীতে কোন একটি মূর্তি নিজে সৃষ্টি করিয়া তাহা দেহরূপে ধারণ করিয়া তন্মধ্যে থাকেন। যাহুদে কাষ্ঠ প্রভৃতির প্রভৃতি দ্বারা যে মূর্তি গঠন করে তাহার মধ্যেও থাকেন, অথবা কেবল তাঁহাদের মূর্তি দেহের কণামাত্র অংশে অলঙ্কিতে দেবমূর্তি-মধ্যে থাকিয়া যান, সেইস্থলে শিলা, ঘট প্রভৃতিকে সেই শক্তির আধার বলিয়া পূজা করা হয়, তাঁহারাও পূজা গ্রহণ করেন।

এখন কথা হইতে পারে তাঁহারা কেন উচ্চলোক ছাড়িয়া এই স্থল পৃথিবীমধ্যে এক প্রকার আবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া বাইতে ইচ্ছুক হন, এ তাঁহাদের কিরূপ ইচ্ছা, কিরূপ লীলাধেয়া? যে স্থানে মন্দিরাদিতে লীলাভাবে দেবশক্তি রহিয়াছেন, অহুসস্থান করিলে দেখা যাইবে বহুপূর্বে কোন না কোন সাধক তথায় উগ্র সাধনার দ্বারা সেই দেবতার শক্তিও সেই দেবতাকে সেইস্থানে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে আবির্ভাব কালে সাধক বর প্রার্থনা করিয়া দেবতাকে  হানে নিত্য থাকিবার জন্ত প্রতিক্রিয়া করিয়া লইয়া থাকিবেন, সেই প্রতিক্রিয়া জন্ত অনেক অনেক স্থানে দেবভাগ্যকে এক অংশে ভুলোকে থাকিয়া বাইতে হইয়াছে, এইরূপ আংশিক থাকার তিনি



পূর্ণরূপে উচ্চলোকে যেমন ছিলেন তথায় কিছু শক্তির কম পড়ে নাই, কাজেই এরূপে থাকার দেবতাদের ক্ষতি কিছুই হয় না।

কোন দেবতার দেহ বা তাহার অংশ কোন স্থানে থাকার জন্য সেই স্থানে দেবশক্তি সর্বদাই প্রকাশ থাকে। সতীদেহের অংশ সকল নানাস্থানে পড়িয়া বাহার স্থানে পীঠস্থান হইয়াছে। স্থান বিশেষের অবস্থা ভাল বলিয়া তথায় অতি অল্প চেষ্টায় দেবশক্তির প্রকাশ করা যায়। এই সকল স্থানে সাধক-মণ্ডলী ক্রমাগত সাধন করিয়া দেবশক্তি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া এই সকল স্থান ভীর্ণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। নিয়ত সাধু, মহাত্মা গৃহস্থ সকলেই এই স্থানে সাধন তপস্বী করিয়া জ্ঞানমের শক্তি সর্বদা জাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছে। কোন কোন দেবতা দয়ার্জী হইয়া জীবের উপকার জন্য ইচ্ছা করিয়া কোন স্থানে থাকিয়া যান। সিলোন দ্বীপে Adam's Peak নামক স্থানে জৈনক উচ্চ-শ্রেণীর দেবতা বহুকাল হইতে বসিয়া রহিয়াছেন। গঙ্গানদীর জল এরূপ দেবশক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে যে, হরিবার হইতে সাগর পর্যন্ত সমুদ্র স্থানের জল আজ পর্যন্ত অতি অল্প দেবশক্তিতে মিশ্রিত রহিয়াছে এবং এইভাবে কতকাল থাকিবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কালীঘাটে দেবীদর্শন করিয়া একদিন মনে ভাব আসিল এখানে আসায় কি ফল, লোকে এই কৃত্রিম মূর্তি দেখিতে কেন আসে। একটা

নিকট যুগু বসান, তলদেশে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছে। সৌন্দর্য্য কোথায়, আর ইহাতে ফলই কি? এইরূপ ভাবিয়া মনে স্থির করিলাম এখানে আসা উচিত নয়, এইরূপে লোকে অর্থ উপায় জন্য সাধাইয়া যে মূর্তি খাড়া করিয়াছে তাহাতে দেবত্ব কেন আসিবে এই ভাব লইয়া প্রায় একবৎসর থাকিলাম, কেহ কালীঘাট যাইবে শুনিলে তাহাকে উক্ত-রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। এমন সময় আমার ভূতপূর্ব গুরুদেব আমাদের বাটীতে আসিলেন। তিনি বলিলেন আমি বুদ্ধাবন হইতে কলিকাতায় আসিয়া কালীঘাটে কালী-মাতাকে দর্শন করিয়া বরাবর আসিতেছি। পরে আহাতি করিয়া বিশ্রামান্তে আমাকে বলিলেন, দেখ, কালীমাতাকে দর্শন করিয়া বাহিরে বারাতায় বসিয়া নাম করিতেছিলাম এমন সময়ে কালীমাতা আমাকে বলিলেন যে “তুই বলিস আমি এখানে আছি।” আমি বলিলাম “মা তুমি এখানে আছ একথা কি কেহ জানে না, যে আমাকে প্রচার করিতে হইবে।” মা বলিলেন “তুই বলিস।” ইনি হাকোলায় আমার বাটীতে আসিবার ইচ্ছা করিয়া কালী দর্শনে গিয়াছিলেন। তখন সময় তিনি এই যে মার আদেশ পাইলেন তাহা আমাকে বলিবার জন্যই তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন আমি বুঝিতে পারিলাম, এবং মার নিকট এতদিন অবিশ্বাস থাকার জন্য কমা প্রার্থনা করিলাম। মার আদেশে বিশ্বাস করিতে হইল যে, কালীঘাটে তিনি আছেন। প্রত্যেক পীঠস্থানেই মা বিরাগ করিতেছেন,

একথা কানেই বিশ্বাস করিতে হয় ।

পাবনা জেলায় তড়াসের জমিদার ভক্ত বনমালীবাবুর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন । ইহাদের বাটিতে রাধাবিনোদ নামে একটি পৈতৃককালের বিগ্রহ ছিলেন, এক্ষণে নাকি বনমালী বিগ্রহটিকে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছেন । এই বিগ্রহটী নাকি একটি ব্রাহ্মণ নদীগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । নদীতে স্নান করিবার সময় ব্রাহ্মণটী স্নানিতে পাইতেন “তুমি আমাকে তোল ।” এইরূপ কয়েকদিন স্নানিবার পর ব্রাহ্মণটী একটি কাঠময় বিগ্রহ নদীগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইলেন । কোনরূপে এই বিগ্রহটী বনমালী বাবুদের পূর্বপুরুষ বাটিতে আনিয়া স্থাপন করেন । পরে এই বিগ্রহের পাশ্বে একটি জীলোকের কাঠমূর্তি গড়াইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন । এই মূর্তিটিকে বিগ্রহের জীর্ণপে পূজা করা হইত । আমার ভূতপূর্ব গুরুদেব যে সময় বনমালী বাবুর বাটিতে অতিথি হইয়াছিলেন, তৎকালে বিগ্রহ দুইটি বেশভূষায় সজ্জিত কাঠনির্মিত দুইটি জী-পুরুষ মূর্তিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন । তিনি রাজে ঠাকুর বাটির উঠানে ধনী জালাইয়া বসিয়া আছেন, অধিক রাজে দেখিলেন ঠাকুর ঘরের ভিতর একটি চেলির কাপড় পরা জীলোককে ঠাকুরটী কোলে করিয়া লইয়া শয়ন করিলেন । পরদিন তিনি বনমালী বাবুকে দেবমূর্তি উত্তরূপ দর্শন করার বিষয় বলিতে বনমালী বাবু বলিলেন আপনি ঠিকই দেখিয়াছেন । পূর্বে আমাদের বাটির জীলোকগণ প্রত্যহ রাজে বিনোদ বিগ্রহটীকে শয্যার উপর

শয়ন করাইতেন এবং পার্শ্বস্থিত রাধা মূর্তিটিকে বিনোদের কোলে শয়ান করান হইত, তৎকালে উহাদের বেশভূষা খুলিয়া শয়ন করান হইত ও ভিতরে যে ঢেলী পরাণ আছে তাহাই মাত্র থাকিত । ইদানীং আর কেহ প্রত্যহ ওরূপ করিতে সময় পায় না । বোধ হয় উহারা আপনাদিগেই শয়ন করিয়া থাকেন । এইখানে বনমালী বাবু বলিলেন বিনোদের পাশ্বে যে রাধামূর্তি রহিয়াছেন উনি আমাদের বংশেরই কণ্ঠার মূর্তি । কণ্ঠাটী কুমারী অবস্থায় ঠাকুর ঘরে যাইলেই ঠাকুর তাঁহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিতেন ও বলিতেন “আমি তোমাকে বিবাহ করিব । এক্ষণ কিয়ৎকাল যাইলে একদিন দেখা গেল যে বালিকাটী মৃত্যুবস্থায় ঠাকুর ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে । রাজে স্বপ্ন হইল, বিনোদঠাকুর বলিতেছেন “আমি বালিকাটিকে বিবাহ করিয়াছি, তোমরা একটী কাঠের মূর্তি গড়াইয়া আমার পাশ্বে বসাইয়া দিও ও আমার সহিত উহার নিত্যপূজা করিও । সেই অবধি বিনোদের মূর্তির পাশ্বে এই বালিকাটির মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে, এবং রাধা ও বিনোদ ভাবে উভয়ের নিত্য পূজা হইতে বাটির ঘরেরা সক্ষা । আরতি ভোগের পর বিনোদকে রাধার সহিত শয়ন করাইয়া দেয় ।

বুঝা গেল ঠাকুরকে বাটির জীলোকগণ শয়ান করাইয়া না দিলেও তাঁহারা আপনাদিগের উপরে পোষাক খুলিয়া ঢেলী বাজ দেহে রাধিরা জী-পুরুষ ভাবে রাজে শয়ন করিয়া থাকেন, বামীজীকে দয়া করিয়া ইহা দেখাইয়া ছিলেন । পরদিন রাজে রাধা এবং বিনোদ

হইলমেই উঠানে বামীজীর সম্মুখে আসিয়া-  
ছিলেন ও বামীজীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম  
করিয়াছিলেন। বামীজী বলিলেন, আপনারা  
দেবতা, আমি মানব, আমাকে আপনাদের  
প্রণাম করা উচিত হয় না। বিনোদ বলিলেন,  
আপনি সন্ন্যাসী, আদরা পৃথী, এ কারণ আমা-  
দের আপনি নমস্। দেবতাগণ নানা স্থানে  
এইরূপে লীলাভাবে থাকেন। আমরা আমার  
গুরুদেব বামীজীর নিজ ঘূষে এই কথা  
তুলিয়াছি, ঘটনা সত্য।

বুদ্ধগয়ার বেহানে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ  
করেন তথায় সংপ্রতি আনিবেশান্ত ও একজন  
মাত্রাজী ব্রাহ্মণ বালক গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ  
বালকটি লিখিতেছেন, এইস্থানে একটা প্রস্তরো-  
পরিষিয়া স্থিরভাবে বুদ্ধদেবের বিষয় একটু  
চিত্তা করিতেই আমার দুটি খুলিয়া গেল, আমি  
দেখিলাম যে এই স্থানটি কতদূর ব্যাপিয়া এক  
প্রকার জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়াছে, এই জ্যোতিঃ  
উজ্জ্বল ও নানাবর্ণের। এই জ্যোতিঃতে  
অনেক দেবগণ স্থান করিতেছেন। সেই  
মহাপুরুষ এই স্থানে মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া-  
ছিলেন বলিয়া এই জ্যোতিঃের শক্তি এইস্থানে  
ভদ্রবধি রহিয়া গিয়াছে, এই জ্যোতিঃমধ্যে  
কেহ সাধাজ একটু মনঃস্থির করিয়া বসিতে  
পারিলেই অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে  
পাইবেন ও তাহার সাধনপথে অনেক উন্নতি  
হইবে, অনেক গুণবান খুলিয়া বাইতেও পারে।  
মহাপুরুষের তপস্‌সাহান এইরূপে তীর্থ বলিয়া  
পণ্য হইলছে ও সেই স্থানের সাহায্য সাহায্য  
বুদ্ধিবার চেষ্টা আছে তিনিই বুঝিতে ও দেখিতে

পারেন, ইহী সকল স্থানে দেবতাগণও বাস  
করেন।

ঐকান্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল।

## কবি-জীবন ।

বাহুগতের অসার অতুল ধনৈশ্বৰ্য্যের  
ঐকান্তিক অধিপতি ধনী। সাহিত্যরূপ কাব্য-  
রস্ত্রের সারভূত পরমৈশ্বৰ্য্যের চির অধিপতি  
একমাত্র দীন ভিখারী। ইহার প্রত্যেক প্রমাণ  
একমাত্র ইতিহাস আমাদেরকে অতুলি নির্দেশে  
অতীতের অলস্ত কাহিনী জ্ঞাপন করিয়া  
দিতেছে। প্রাচীন যুগ হইতে অস্তাবধি যত  
কবির আবির্ভাব হইয়াছে প্রত্যেকেই পর্ণকূটর-  
বাসী ভিক্ষার-জীবী ও পরান্ন-পোষিত। কবির  
সহিত দরিদ্রতার যেন চির মিত্রতা, কতই যেন  
নৈকট্য সম্বন্ধ।

সংসারে দারিদ্র্যের দাবানলরূপ অসহ  
যন্ত্রণার মধ্যেও কবিগণ বেক্রপ শাস্তিতে অবস্থান  
করেন, সেক্রপ শাস্তি সঙ্গায় পৃথিবীর অধীশ্বর  
অমৃতব করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। যখন  
কবিগণ কল্পনারাজ্যে প্রবেশপূর্বক অনির্জননীর  
ভাব-সাগরে স্নেহে সত্তরপ করিতে থাকেন,  
তখন তাহারা বাস্তবিক জড়জগতের অস্তিত্ব  
হারাইয়া যেন কোন এক নবীন বর্ণ-রাজ্যের  
শান্তিময়-ধামে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন,  
এইরূপ শান্তি, এপ্রকার সুখবর সংচিত্তা কবি  
ভিন্ন কাহার স্বপ্ন অধিকার করিতে পারে ?

সাহিত্যিক জীবনে মুখ বড় অল্প নয় । সাহিত্যিকের জীবন বড়ই মধুর আনন্দময় । রাজাধিরাজ সম্রাটের বর্ষ সিংহাসন অপেক্ষাও কবি ও সাহিত্যিকের আসন উচ্চে অবস্থিত । ধনিগণ অমূল্যবী ও তোবামোদকারী কর্তৃক পরিচরিত হইয়া থাকেন,—কিন্তু প্রকৃতি দেবী স্বয়ং বাচিয়া কবি ও সাহিত্যিকের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়েন । ধনী রসনা পরিতৃপ্তিকর নানা উপাদেয় ভোজনে ও বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি পরিধানে এবং নানা স্বর্ণলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দুঃক্ষেপননিত শয্যায় শয়নে সুরমা হর্ষে বাস করিয়া বত না আনন্দ প্রমত্তত্ব করেন, কবি বা সাহিত্যিক তিকালক কদম্ব শাকার ভোজনে তরুতলে বাস করিয়া ততোধিক আনন্দাত্মত্ব করিয়া থাকেন । নানা ঠেজসপূর্ণ বিবিধ রত্নখচিত আসবাবে ধনীর মন যেমন আকৃষ্ট—প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে কবির প্রাণ ততোধিক উৎফুল্ল । সংসারের কৃত্রিম বস্ততে ধনীর মন যেমন মুগ্ধ, স্বভাব জাত অকৃত্রিম প্রব্য নিচর দর্শনে কবি ততোধিক বিতোর । ধনী যেমন কৃত্রিমের উপাসক, কবি তরুণ প্রকৃতির পূজক । বাহা হউক—অতি বৃদ্ধ দরিদ্র বাজিকী হইতে বাশা, কালিদাসের ভবভূতি, আধুনিক হেমচন্দ্র, মধুসূদন, প্রত্যেকই ভোগমুখবিতৃষ্ণ দীন দরিদ্র ।

সংসারে যে ব্যক্তি প্রকৃত গরীব—তিনিই কবি—অথবা যে ব্যক্তি প্রকৃত কবি—তিনিই গরীব । পরন্তু কেবল লোকতঃ গরীব হইলেই কবি হওয়া সম্ভবপর নহে । কেন না সংসারে গরীবের অপ্রভুল নাই—কিন্তু প্রকৃত গরীব

অথবা প্রকৃত কবির অভাব অত্যধিক । বিবিধ বিলাস-ভোগ্য-বস্তু পরিপূরিত মনোহর সংসাররূপ পণ্য-বীথিকার অধিকারী হইয়াও যে ব্যক্তি অকাতরে অন্নান বদনে ঐহিক ভোগ-সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারেন, দুঃখিসহ বৃত্তকা বস্তির অমূল্য তৃপ্তি বিধান না করিয়া যিনি সহস্র বদনে সমুখের অন্নগ্রাস অন্নক্ষুধাত্বের বিষয় বদনে তুলিয়া দিতে অণুমাাত্র কুণ্ঠিত না হন, মূল কথা—এত সুখের ভোগদেহ ধারণ করিয়া যিনি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া কামভোগ বিদর্জন পূর্বক মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে গরীব হইতে ইচ্ছা করেন, নিরন্ন নিরসনে শরীর বিশীর্ণ করিয়াও যে ব্যক্তি মধুকর সদৃশ প্রতিনিয়ত পরার্থপরতাকে জীবনের একমাত্র মহাত্ম্য মনে প্রাণে সঞ্চল করিয়া তদ্-উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হয়েন তিনিই ত প্রকৃত গরীব—সেই ব্যক্তিই ত যথার্থ কবি । সেই ব্যক্তিই মানব-সমাজের আদর্শ-স্থানীয় । ধন্য কবি-জীবন ! তোমার কল্পনা-প্রসূত কাব্য-স্থধা অতি মাত্র অধমাত্মাকেও অমরত্বের অধিকারী করিয়া তুলে ।

এইরূপে বহুবিধ কবি বাহু জগতের একান্ত অল্পগত হইয়াও অন্তর্জগতের রাজাধিরাজ সম্রাট সদৃশ । মরণশীল হইয়াও চির জীবিত আরাধ্য অমর । সত্ত্বঃ প্রাণসংহারক হলাহল হইয়াও মৃত সজীবনী-স্থধা, স্বাক্ষরজনক পূরীষ-কুণ্ডের নিষ্ঠুৰতম ক্রিমি-কীট হইয়াও অপার্থিব নন্দন-কাননের অমরানন্দবর্ধন পরিপ্রাপ্ত মধুকর । যে ব্যক্তি বাহু জগতে

অত্যধিক সংলিপ্ত অথচ প্রত্যেক বিষয়ে উদাসীন, সেই ব্যক্তি লৌকিক কবি। আক্ষর্য্য তাহার নিকট চির-ঋণী। তিনি লোক-সমাজের প্রকৃত নিয়ন্তা—শিক্ষাদাতা। তাহার কাব্যরূপ নিরূপণ শিল্প চাতুর্য্যময় দিব্য যন্ত্রে অল্পে পরিচালিত হইয়া মানব-সমাজ অব্যাহত থাকে, মতেঃ সমাজ দূরে থাক, সংসার হইতে মানবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কবিত্ব বা কল্পনা-শক্তি অতি সাধনসাপেক্ষ চুল্লভ বস্তু, কিন্তু উহা একান্ত সাধকের নিকট অতি মূল্যবান। দর্পণে যেমন অবাধে পরিস্ফুট-রূপে পদার্থ নিচয়ের প্রতিবিম্ব প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ কবিত্বও প্রকৃত সাধকের হৃদয়-মুহুরে অবলীলাক্রমে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। কবিত্ব-সাধনার অভীষ্টসিদ্ধি স্বতঃসাধ্য, এ সাধনার গুরুদেবের দীক্ষা নাই। উপগুরু শিক্ষা নাই, স্বপ্ন-দীক্ষিতের জ্ঞান নিজেই শিক্ষিত হইতে হয়, এ সাধনার যন্ত্র যন্ত্রাধার, জগৎমালা লেখনী,—মূলমন্ত্র পরার্থে আত্মোৎসর্গ। এ সাধনার আরম্ভ আছে নিবৃত্তি নাই—কিন্তু তৃপ্তি অনন্ত। বিলাস-ভোগের অশেষ প্রকার প্রবর্তী-লীলা আছে, আসক্তি নাই, উত্তপ্ত মহিরাধিক মাদকতা আছে, চিত্ত-বিস্কলিত নাই। চিত্তবৃত্তি নিরোধ আছে, যুক্তি আছে কি না জানি না—কিন্তু জীবমুক্তি প্রকৃত কল্যাণের সন্ধে সন্ধে বিরাজ করে। ফলতঃ, বাহ্য জগতে অচিরান্তক বিলাস বিজয় বিষয়া-কর্ষণকে লক্ষ্য অতিক্রম করিতে না পারিলে বিশ্ব-ক্রিয়োদয় কাব্য-সাধনার দিব্যাসনে সমারোহ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। প্রতি-

পদবিক্ষেপে ভোগ-বিলাসিতার অনুসরণ করিয়া কবি হইবার কল্পনা যেচ্ছাকৃত অশান্তি আনয়ন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যাহা হউক, দুঃখই কবিতার মূল প্রকৃতি। বোধ হয়, এই জন্যই চির কৌমার্য্যশালিনী জগন্মনোহারিনী কবিতা-সুন্দরী প্রাসাদ ভবনস্থ কনকাসনাসীন কুবেরকল্প ধনপতিকে অকা-তরে উপেক্ষা করিয়া চির-সেবিতা চিরানুগতা প্রকল্পযুগী কামিনীর জায় অবিরত পর্ণ কুটীর-বাসী নিরশন বিনীত দীন দরিদ্রজনের আশ্রয় লইয়া থাকে।

তজ্জন্মই বোধ হয়, ধনবানের অমরধাম সদৃশ মনোমোহক বিলাস ভবন পরিহার করিয়া দরিদ্রের তৃণ নির্মিত অপরিচ্ছন্ন কুটীরে কবি চির-বিরাজিত। বাস্তবিক কবিতা স্বভাবতঃই দীনজ্ঞাপন। তাই প্রাচীনকাল হইতে দীন দরিদ্রের সঙ্গেই তাহার অপার্থিব সখ্য ও চির-মিত্রতা। গরীব কবি তাহার পূর্ণ রসাদ করিয়া বৈষয়িক অভিজ্ঞতার মুক বিক্রপঙ্কলে নিজের হৃদয়বুগ চালিয়া দেয়। বর্তমান কালে বহুতম বিলাস-সাগরে নিমজ্জ-মান। বহু ভোগ-বিলাসের অনন্ত ধারা অনুমত্তভাবে বিলাসিত। ধর্ম-সম্প্রদায় ভেদে তদ্রূপ নানাবিধ সাধনা-পদ্ধতির মুহুর পরিণাম এক সর্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরেই পর্যাবসিত হয়, তদ্রূপ বঙ্গীয় শিক্ষা-দীক্ষা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ধর্ম-দান ও পরার্থপরতা ইত্যাদি বাবতীর বানবীর বৃত্তিই যেন অব্যক্তভাবে স্বার্থকৃতে পরি-চালিত। জ্ঞান দয়া ধর্ম সকলেরই একমাত্র সাধ-উদ্দেশ্য যেন ভোগ-বিলাস-মূলক স্বার্থোচ্চার!

ইহা দ্বারা অল্প কোন বিষয়ের ক্ষতি হউক আর নাই হউক—কিন্তু বঙ্গীয় সুরুচি-কাব্য-কুঞ্জের অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় দশায় পরিণত হইয়া যথেষ্টাচারিতার পক্ষিল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। হুশীকীতা গৃহিনী ব্যতীত যেমন গৃহ-রচন ও গৃহের সুসম্পাদিত হয় না, প্রকৃত কবি অভাবে কাব্য-কুঞ্জের স্নিগ্ধ গভীর মাধুরিও দিন দিন নিশ্চ্যুত হইয়া যাইতেছে। ইহা কি নিতান্ত হুঃখের বিষয় নহে? যে দেশে জাতীয় কাব্যের উৎকর্ষ নাই,—সেই দেশ বল-সমৃদ্ধিশালী হইলেও প্রাণিজনবিরহিত—ভরকর মরুস্থলী, অথবা স্বাপন সমাকীর্ণ ভীতিময় স্তিমিত বনস্থলী। যে জাতির কাব্য নাই সে জাতি অকৃতিভাজন, মৃত ব্যক্তির অসার নামের স্তায় নাম মাত্রে পথ্যবসিত। সুতরাং তাহার অস্তিত্ব যজ্ঞপ, নাস্তিত্বও তজ্ঞপ। ভোগ-বিলাসিতার মাত্রা পরিমিত না হইলে কাব্যোৎকর্ষের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং জাতিয় উন্নতির আশাও ভবিষ্যতের কোন নিষ্ঠুর অন্তরালে অবস্থিত আছে—কে বলিতে পারে? এই পরিদৃষ্টমান সংসারের যে কোন বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিয়া আমরা প্রতিনিয়ত দুইটি স্থায়ীভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি।—প্রথমটি সুখ—দ্বিতীয়টি হুঃখ। বস্তুতঃ এই হুঃখই সংসারের বৈচিত্র্য সাধনের মূল্যতম উপাদান। সুখ অপেক্ষা হুঃখের ভাগ অনেক অধিক। অসার সুখের অনুরূপ অপেক্ষা হুঃখের অনুরূপ অত্যধিক। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহা জীবনে কখন হুঃখের বেদনা অনুভব করেন না তিনি কেমন করিয়া কবিতা-ভাব ভাবাবত্ব করিতে

সক্ষম হইবেন?

যে ব্যক্তি জীবনে হুঃখ-নিপীড়ন সহ করেন নাই, তাহার সুখময় হৃদয়ে হুঃখের ভাব স্বল্প-সমৃদ্ধ। বাস্তবিক অপরূপ জীবন লইয়া তিনি কি কৌশলে সুখ হুঃখের পূর্ণতাময়ী বিশ্ব-বিনোদিনী কবিতা দেবীর কঠোর সাধনায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন? যদি কাহারও হওয়ার অভিলাস থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে বিলাস-ব্যসন-পরিত্যাগ করিয়া গরীব হওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে। এ সংসারে গরীব বিনা কে কোথায় কবি হইতে সমর্থ হইয়াছেন?

যদি কেহ হইয়া থাকেন তবে তিনি প্রকৃত কবি নহেন। ধনিগণ স্বাৰ্পণ চাটুকারগণের অসার বাক্যপটুতার হস্ত নিশ্চিত, কবি তাহা হইতে স্বতন্ত্র—পৃথক, তাহার দ্বার দিয়াও যান না। সংসারে তিনি ধন্ত ও নমস্যা যিনি স্বাৰ্পণতা, চাটুকারিতা, চাটুপ্রিয়তা, অসার প্রভুত্ব বাসনা, পরজীৱিতারতা ও অহম্ম প্রভৃতি নিকট প্রভৃতির নীরব লাজনাগুলিকে হৃদয়-পটল হইতে জ্ঞান-গজাঙ্গলে সম্যক প্রক্ষালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সেই ব্যক্তি ধন্ত যে ব্যক্তি মরিয়াও পরকে ভুলিতে পারেন না। নিরুপম শিল্প-চাতুৰ্য্যময় কাব্যরূপ দিব্য লাঞ্জে অক্লেশে কর্ণণ করিয়া যিনি জ্ঞানাক্রমের চিরপতিত হৃদয়কে কৌশলে বীজবপন করেন তিনিই ধন্ত। আর কত বলিব, তিনিই সেই দরিদ্র কবি বাজীকি, তিনিই সেই গরীব ব্যাস, তিনিই প্রকৃতির স্বয়ম্ভুত গরীব তবস্তুতি, কালিদাস, বাণভট্ট,

তিনিই সেই মাখ, ভারবি, মুরারি, ভরুহরি, জিহ্বা, ভট্টনারায়ণ, তিনিই সেই দরিদ্র অন্নদেব, খিঁচাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কুন্তিবাস, কান্দীদাস, তিনিই সেই গরীব বনরাম, ভারতচন্দ্র।  
শ্রীহটবিহারী চক্রবর্তী।

## প্রাণের কথা ।

স্বাধীকৃত মানব আমরা; প্রাণের কথা মনের আবেগ কিছুই যেন প্রাণে আগে না। যখনই কোনও কিছু প্রাণে আগে, যখনই মনে ব্যাকুলতা আসে, যখন সংসারের আগায় বাতিবালু হইয়া কাতর প্রাণে ভগবানকে ডাকিতে যাই, তখনই যেন কোথা হইতে শত বাধা ছুটিয়া আসে, শত বিঘ্ন যেন কোথা হইতে আসিয়া চুলের খুঁটি ধরিয়া বলে—ও পথে যেও না, ও পথে বড় কষ্টকর, ও পথে যাইলে আর আসিতে পারিবে না। ওপথে তোমার কোনও স্বার্থ সিদ্ধ হইবে না। স্বার্থে ভরা—স্বার্থ দিয়া গড়া মানব। আমাদের মন তৎক্ষণাৎ সোদক হইতে ফিরিয়া যে পথে অসার আনন্দ আছে, সে পথে প্রেধাবিত হয়। ভগবানের চরণে ছোটো প্রাণের কথা বলিয়া এই দুর্লভ জীবনটাকে, ভৌতিক দুঃসহ মনটাকে একটু হালকা করিব, তাহা ত কই প্রাণে আসিল না! আমাদের সে একাগ্রতা কই! পূর্বের সেই উদারভাবের কণামাত্রও কি থাকিবে না? একলবোর একাগ্রতার গল্প কি উদাহরণ হইয়াই থাকিবে? কার্যো কি কেহ তাহা করিবে না? আর কি আমরা সেদিন পাইব না? হায় সে

কাল! কাল-সমুদ্রের কোলে গিয়া মিশিয়াছে—তার চিহ্নও নাই; আছে কেবল সেই সকল ঘটনা। পুণ্ডকে বিবৃত হইয়া—যাহা আমরা পাখীর “রাধাকৃষ্ণ” বুলিরাজ্য পড়ি—পড়িবার মতন করিয়া পড়িতে পারি না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যে সম্রাটন হিন্দুধর্ম; যে ধর্মের বলে ধার্মিক মুষ্টিরি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিয়াছিলেন, সে ধর্ম কোথায়? হায় সেকাল! সে কালের মত সবই আছে, নাই কেবল প্রাণ! মানুষ হামুহই আছে নাই—কেবল মন, সেকালের ব্রাহ্মণ প্রত্নবে উঠিয়া একমনে প্রাণ খুলিয়া বায়ু কম্পিত করত শ্রামবেদ স্তোত্র পাঠ করিতেন, পশুপক্ষী যে যেখানে থাকিত, একত্রে আসিয়া ভয়শূন্য প্রাণে বিভোর হইয়া তাহা স্তবিত, বাতাস শুদ্ধ হইয়া সে শব্দ, সেই প্রাণ বিমোহনকারী শব্দ, বহন করিয়া লইয়া গিয়া ঈশ্বরের কাছে পৌছাইয়া দিত। শব্দ ভগবানের শ্রীচরণ চূষন করত ফিরিয়া আসিয়া নিম্পন্দনে তক্তের মাথায় আশীর্বাদ ঢালিয়া দিত—ভক্ত ধ্যত হইত। এখন আর প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের কণ্ঠে সে দিনের মত প্রাণমাতান, মনগলান সুর বাহির হইয়া জগৎকে মাতাইয়া তোলে না; শব্দ এখনও প্রাতঃকালে হয় তবে তাহাতে একটা প্রাণীরও মন গলেনা। শব্দ এখনও হয় তবে সে শব্দ গলা হইতে মধুর স্বরে বাহির না হইয়া চায়ের পিয়ালার টুং টুং কর্কশ শব্দে মনটাকে যেন দুর্দ্রাস্ত্রে ভগবানের কাছে হইতে কত নীচে নামাইয়া লইয়া যায়। শান্তিভ্রমের মধ্যে সে আশ্রম আর নাই, এখন তাহা বিজন বনে পরিণত হইয়াছে।

পার্শ্বিক দেবতা ভূদেব ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে  
 সূর্য্যর লতাগুণ্ডে পরিবেষ্টিত ও অলঙ্কৃত  
 আশ্রমে না গিয়া এখন ছড়ি হাতে লইয়া স্বাস্থ্য  
 লাভের জন্য মাঠে হাওয়া খাইতে যায় ;  
 নদীতীরে বসিয়া ভাবুক তখন যে ভাবে মাতিয়া  
 যাইতেন সে ভাব আর নাই। কলকল করে  
 জাহ্নবীর জল আপন সাগরের সহিত মিলিত  
 হইবার জন্য ছোট ছোট গুণ্ডে, বড় বড় বৃক্ষে  
 বাধা পাইয়াও তাহা অগ্রাহ্য করত ছুটিয়া  
 চলিয়াছে, নদী-নীর উল্লাসে বহিয়া যাইতেছে,  
 ভাবুক ভাবে মগ্ন হইয়া তাহা দেখিতেছে—  
 এইরূপ কত স্থানে পবিত্র ভাবের ছড়াছড়ি ছিল  
 —এখন আর তাহা নাই—সেই নদী এখনও  
 বহিতেছে, কিন্তু এখন আমাদের আর প্রাণে সে  
 ভাব নাই, সে সজীবতা নাই, সব যেন নীরব  
 হইয়াছে, সব যেন ঘুমাইয়াছে। কে জাগাইবে,  
 কে এই সর্ব্ব বিষয়ে নিদ্রিত জীবকে আবার  
 জাগাইবে! কে আর আমাদের প্রাণে  
 সজীবতার একটা সাড়া আনিয়া দিবে! কবে  
 সেই সজীবতার প্রাণ পাইয়া প্রাণময়কে  
 চিনিতে পারিব! তাঁকে চিনিবার নির্দিষ্ট দিন  
 তো নাই! তবে চিনিব যে দিন, যে দিন  
 জন্মের সমস্ত ময়লা মুছিবার জন্য চক্ষুজল—  
 মনের ভিতরের ময়লা ধৌত করিয়া অবিরল  
 ধারায় তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে, কল্লনার  
 নৈরে তাঁহার মূর্তি দেখিতে দেখিতে, বন্ধঃস্থল  
 প্রাণিত করিয়া পড়িতে থাকিবে সেই দিন  
 সেই চক্ষুজলের ভিতর দিয়া নিজ প্রাণের  
 মধ্যেই তাঁকে দেখিতে পাইব। কিন্তু কখন  
 জীবনের কোন্ সময়ে সে শুভ মুহূর্ত আসিবে?

“বাল-স্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,

তরুণ-স্তাবৎ তরুণীরক্তঃ,

বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ,

পরম ব্রহ্মণিকোহপি ন লগ্নঃ।”

তাঁরই নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া, তাঁরই  
 বাড়ীতে বাস করিয়া, তাঁরই কাছে বাইবার  
 জন্য পাথের সংগ্রহ করিতে সময় আসে না।  
 সে চিন্তা মনে উদয়ও হয় না! হয় কেবল  
 তিনি বিহীন কথা চিন্তা। সেই কথা চিন্তা  
 হইতে নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্য “সময়  
 নাই” রূপ মিথ্যা কথা বলিয়া পাণের মাত্রা  
 আরও এক পর্দা বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁর কাছে  
 হইতে আরও একটু দূরে সরিয়া বাই,—

“দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে

না ভজিছ রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে—

সত্য তাই! একটুও কি সময় পাই না!  
 সংসারটাকে সুখের আকর ভাষিয়া, তাহাতেই  
 রত থাকিয়া সেই আকরেই যখন ডুবিয়া দম  
 আটকাইয়া গিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
 কষ্টের মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়া তুলি;  
 কিন্তু অশ্রু রকমে কাঁদিয়া, ঘেরপে কাঁদিলে  
 প্রাণে বিমল আনন্দ, মনস্তরা শান্তি পাইব সে  
 ভাবে তো কই কাঁদিতে পারি না? মন—তুমি  
 কি কাঁদিতে জান না? যদি জান, তো সব  
 তুলিয়া কাতর প্রাণে চেঁচা করিয়া, মনের সব  
 কথাট বন্ধ করিয়া একপ্রাণে কান্না শিখিবার  
 জন্য প্রার্থনা কর। তিনি বিরূপ হইবেন না—  
 কিছুতেই তোমার মনোবাসনা অপূর্ণ রাখিবেন  
 না—

“অরি ভাবেহপি তুষ্টিার সর্ব্বমঙ্গল কারক



ইহুক গুণবতো পেরং হরেন্নামৈব কেবলম্ ॥”

তবে আর ভয় কি ! যেখানে হউক তাঁকে  
তাবনা কর—আর যুখে বল—

“পাপোহং পাপ কর্ম্মহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ  
ত্রাহিমাং পুত্তরীকাকঃ সৰ্ব্বপাপো হর হরি”

আরও বল, তৃণাদপি সূনীচ হইয়া বল—

“কৃতং ময়া হুটাবিধা মায়া মোহিত চেতসা  
ক্ষমস্যা মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমা সারাহি সাধকঃ”

এতো ! আমি সকল ভাবিয়া নিরুপায় হইয়া  
জীবনের অবেলার তোমার ডাকিতেছি ;  
কোথার এতো শান্ত, স্নিগ্ধ শ্রামল মূর্তিতে  
আমার নয়নের সমক্ষে আবির্ভূত হও, আমি  
এাণ তরিয়া তোমার দেখি আর কেবল  
কাঁদি,—আর কিছু চাই না ।

ঈশশাকমোহন ভট্টাচার্য্য ।

## সুখাশ্বেষণে ।

(গল্প)

“নান্তি রাগ সময়ঃ স্থঃ”

নান্তি ভ্যাগ সময়ঃ স্থঃ ॥”

(মহাঃ, মোক্ষধর্ম্ম পঃ)

(১)

সে বৎসর বিশ্বচিকা রোগে বৈগুনাধ-  
দেওঘর ও ভগ্নপার্শ্ববর্তী স্থানের সমস্ত লোক-  
জনগুলি প্রায় জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে,  
তবুও কিছুকি মহা গোল পড়িয়া গিয়াছে । জন-  
প্রবাহের মত বহু বেচ্ছাসেবকের দল সেখানে  
গিয়া উপস্থিত হইল । আমরাও তিন বন্ধুতে  
বেচ্ছাসেবক প্রেরিত হইয়া তথার উপস্থিত  
হইলাম । এক দিকে লোল-দমনা, করাল-

বদনা বিশ্বচিকা-রাকসী—আর অন্য দিকে  
পর্যর্থে উৎসর্গীকৃত জীবন বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ।  
উভয়ের মধ্যে মানবজীবন লইয়া এক মহারণ  
বাধিয়া গেল ।

সমস্ত দিন সেই জীবন-যুদ্ধে অত্যন্ত পরি-  
শ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার একটু পূর্বে ক্লান্তি দূর করি-  
বার মানসে আমরা তিনজনই বৈগুনাধের  
উপকণ্ঠস্থ ত্রিকূট নামক পর্ব্বতের পাদদেশে  
উপবেশন করিলাম । আমাদের মধ্যে এক-  
জন একটু তত্বাধেয়ী ছিল । আমরা তাহাকে  
রহস্ত করিয়া “দার্শনিক” বলিয়া ডাকিতাম ।  
সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—“আচ্ছা বল দেখি,  
কেন আজ আমরা এত লোক আপনাপন সুখে  
জলাঞ্জলি দিয়া বেচ্ছার এতদূরে, এমন এক  
বিপুল কষ্টের মধ্যে এসে পড়লুম ?”

আমি তাহার এই অদ্ভুত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে  
কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বিক্ষিপ্তস্বরে বলিলাম—  
“ভাল, আমি মনে করেছিলুম, তোমার স্বভাব-  
সিদ্ধ Philosophyটা বাড়ীতেই রেখে আসবে,  
কিন্তু এখন দেখছি এখানে এত গোলমালের  
মধ্যেও সেটাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছি ॥”

তৃতীয় সঙ্গীটা কেমন যেন একটু ভাবাবিষ্ট  
হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—“না হে না, কথাটা  
ভাববার বটে । মানুষ সুখ খোঁজে ত সুখ  
ত্যাগ করে কেন ? আর সুখ জিনিষটা কি ?”

আমি তাহার উপর নিক্ষেপ করিব বলিয়া  
ক্ষিপ্ৰগতিতে মনের মধ্যে একটা বিক্ষিপ্ত-বাণ  
বোজনা করিতেছিলাম, এমন সময় সহসা  
সন্ধ্যার সেই ধূসর আলো তেজ করিয়া একজন  
পুরুষ আবাদিপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ।

আমরা বিম্বিত-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি তখন আমাদের তৃতীয় সজ্জিত হস্তে একখানি ভালপত্রের পুঁথি দিয়া বলিলেন—“সুখাধেবী সুবক! সুখ কি, তা’ যদি জানতে চাও, তবে আমার অতীত জীবনের কাহিনী ইহাতে পাঠ কর। উঃ! সে একটা প্রলয়—মহাপ্রলয়! ত্রাস্ত মন সুখের প্রেরণায় একদিন যে বিষের আগুন জ্বলিয়াছিল, এখনও আমি মাঝে মাঝে সে আগুনের অসহ্য তাপ ভোগ করি। পড়, পড়ে যাও, সব বুঝতে পারবে। না, আর আমি থাকতে পারি না। ঐ স্বর্গলোক হ’তে সেই দেবপত্নী ও দেবশিশু রোষ-কষায়িত-নেত্রে আমাকে ত্যাগ করছে। ঐ অন্তরীক হ’তে ভোলা ও নির্মলা আমাকে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ’বার জন্য সম্বরণে বসছে—ঐ গুরুদেব সাধন-ভূমি থেকে যুদ্ধভের জন্য অপসারিত দেখে আমাকে অলক্ষ্যে তিরস্কার করছেন। আজ যে আমার ব্রত পালনের এক মহাদিন উপস্থিত।” এই বলিয়া সে নিষ্কিণ্ত লোষ্ট্রের মত সেই গাঢ় অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

আমরা তখন এই আকস্মিক ঘটনার বিষয় কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বিষয়ে অধচ ভর-চকিত নেত্রে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রথম সজ্জি বলিল—“আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই এ কোন উন্মাদের প্রলাপ অথবা কোনও হেবতার ছলনা।”

তৃতীয় সজ্জি বলিল—“সে বাহাই হউক, এই পুঁথিখানা পড়ে দেখা যাক না, ইহাতে কি

লেখা আছে।” এই বলিয়া সে সেই পুঁথিখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। আমার পকেটে বৈজ্ঞাতিক আলো ছিল, আমি তাহা জ্বালিলাম। আলোর সাহায্যে পুঁথির অক্ষরগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। তাহার আরম্ভেই লেখা আছে,—

“পাঠক! জানি না কতকাল পরে আমার আমার স্মৃতি সেই সুখ অতীত জীবনের উচ্ছ্বসিত কোলাহলকে জাগাইয়া তুলিল—আবার সে কোলাহলের উদ্দাম উচ্ছ্বাস সর্বদেহে আঘাত করিয়া আমার ক্রমঃ ক্রমঃ-বারংবার উদ্ভাটিত করিল। তাই—তাই আজ তোমার সমক্ষে আমার হৃদয়রক্ত দিয়া সেই পুরাতন আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।”

আমরা অক্ষরগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সত্যসত্যই সেগুলি রক্তে লিখিত। তখন আমাদের সর্বজন শিহরিয়া উঠিল। পুঁথিখানি আবার পড়িতে লাগিল—

“সেই সবেমাত্র জীবনের প্রত্যাত কাল। মনে হইতেছে, তখনও যেন একখানি জীব অন্ধকার আমার জীবনটাকে ঘিরিয়া রাখিয়া ছিল। সেই সময় আমার মাতৃবিয়োগ হয়।”

“আমার পিতা খুব বড় একজন জমীদার। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র বলিয়া তাঁহার সেই সুবিশাল ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধীকারী। সুতরাং যাতার মৃত্যুর পর আমি পিতার বিত্তপরিমাণ আয়ের বহু হইয়া উঠিলাম। আমার সামান্য পীড়া হইলে তিনি পৃথিবী শূন্যরূপে দেখিতেন, আমার ক্রন্দন শুনিতে তিনি আহাঃ নিঃশব্দে ত্যাগ করিতেন। আমি তাঁহার এক-

মাত্র নয়নের আনন্দদায়ক ছিলাম বলিয়া বোধ হয়, তিনি আমার নাম মরনানন্দ রাখিয়া ছিলেন।

“যখন আমার জ্ঞানের প্রথম উদ্বোধন হয়, তখনই দেখিলাম যে, পিতার মনোচ্ছন্ন কেবল আমার সুখেরই অঙ্কের উপর দিবারাত্র ঘুরিতেছে। তাঁহার স্বস্তি, শান্তি, ভাবনা, কামনা সবই কেবল আমার সুখ। অতএব, আমার সুখকেই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া, ক্ষুদ্র শ্রোতবতীর মত সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সুখ-সাগরের অশেষেণ আত্মলটিতে ছুটিয়া চলিলাম। হায়! কে তখন জানিত যে, অচিরে সাগর ভ্রমে এক দুর্গন্ধ কর্দ্দমযুক্ত ক্ষুদ্র জলাশয়ে আপনাকে ঢালিয়া দিব।

“সুখের প্রথম অন্তরার দেখিলাম—সাধারণ ছাত্রের মত প্রত্যহ স্নেহে বাঁওয়া। এ কাজটা যে আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টদায়ক, এই কথা একদিন রমা কাকাকে জানাইলাম। রমাকাকা পিতার কেবলমাত্র দাওয়ান ছিলেন না, একান্ত অহুগ্রহের পাত্রও ছিলেন। তিনি আমার কথাটাকে মানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পিতার নিকট মিবেদন করিলেন। তিনি বাজিতে একজন সুবিজ্ঞ শিক্ষক রাখিয়া পড়িবার অহুমতি ছিলেন। শিক্ষক নির্বাচনের ভার রমাকাকার উপরই পড়িল। তিনি যিকের নামের মত বাছিয়া একটা মব্যশিক্ষিত যুবককে আমার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার নাম বিমল বাবু।”

“বলা বাহুল্য, আচার্য্য বিমলানন্দ শিক্ষক-

তার ভার পাইয়া প্রথমে ‘চুফট’ পরে ‘তাম্বুট’ তৎপরে জুরাদেবী ও তাঁহার অহুসজিনী হান্স-শুদার-রসালিতা, বাগ্ন-গীতির আরাধনায় আমাকে দীক্ষিত করিলেন। জন্মের কেমন যেন এক নূতন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাহিলাম,—‘ধন্ত ধন্ত বিমলানন্দ, ধন্ত তুমি! এ জগতে এত আনন্দ আছে, তা আমি জানিতাম না। এই কি তবে আমার সেই সুখের সাগর!’

“সেই সময় কোথা হইতে আর একটা অপূর্ব মধুর ভাব আসিয়া আমার সমস্ত চিন্তকে অধিকার করিয়া বলিল। তাহার প্রভাবে সমস্ত জগৎটা যেন আমার নিকট কাব্যময় হইয়া উঠিল। সেই কাব্য-সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি যেন একটা অজ্ঞাত মধুরস পান করিবার জন্ত অন্তরের মধ্যে এক সুগুপ্ত পিপাসা ধীরে ধীরে জাগিতে লাগিল। বোধ হয় পিতা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই, অল্পদিনের মধ্যেই আমার বিবাহ দিতে উত্তত হইলেন। অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া সর্ব্বমূলঙ্গমযুক্ত একটা পাত্রীওঁঠিক করিলেন। একদিন শুভযুক্তিতে মহা ধুমধামের সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল।

( ২ )

“আমার বিবাহে পিতা যতদূর সুখী হইলেন, আমি ততদূর সুখী হইতে পারিলাম না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বড়লোকের মেয়ে অপেক্ষা গরীবের মেয়ে অধিকতর সরল ও শান্তিপ্রিয়; সুতরাং একটা গরীবের মেয়েকেই তিনি পুত্র-বধু করিলেন। পুত্রবধূটা তাঁহার এতই মনোজ

হইরাছিল যে, লোকের কাছে এতাহ তাহার প্রকাশ্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না । প্রায়ই বলিতেন, ‘তুখু নামে নির্মলা নয়, সত্য সত্যই নির্মলা’ ।

কিন্তু হায় ! আমি ত নির্মলার মধ্যে চিত্তাকর্ষক কোন ভগ্নই দেখিতে পাইলাম না । তাহার মধ্যে রূপ-লাবণ্যের কিছু কম ছিল না বটে কিন্তু আমি বাহা চাই, তাহা কই ? আমি চাই নাটক নাটিকার নাস্তিকার মত সুখাবধিণী কণ্ঠ-বীণার সুললিত স্বর, মদন মথন চরণ-যুগলের মনোহারিণী নর্তন-ভঙ্গিমা আর সযত্ন-প্রণীত বচন-মালায় জ্বলন-রঞ্জনা প্রণয়-ছটা কিন্তু হায় ! নির্মলাতে যে সে সব কিছুই নাই ! সে যে কেবলমাত্র একটি বৃত্তিকাত্তপ ! এ বৃত্তিকাত্তপকে কি কখনও সারাজীবনের সজিনী করিতে পারা যায় ?

এইরূপে কেমন যেন একটি ঘোরতর অশান্তি আসিয়া জুটিল । আমার স্নেহের পথে সে অশান্তি যেন একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত দাঁড়াইল । আমি দ্বিষ্টারাত্রি অন্তবিধ আয়োদ-প্রয়োদে মনটাকে ডুবাইয়া রাখিয়া ঐ অব-রোধকে অলক্ষ্যে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম । বিবাহের পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই নির্মলার কাছে আসা বন্ধ করিলাম ।

একদিন আমি ভাবিলাম, বাটা হইতে কিছু দূরে একটি উজানের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র বাড়িকা নির্মাণ না করাইলে পূর্ণমাত্রায় আয়োদ উপভোগ করিতে পারিতেছি না । আচার্য্য বিদ্যালয় এবং অস্তিত্ব অহুচরবর্গও আমার এই ইচ্ছার সমর্থন করিলেন । রমা কাকা ব্যতীত

ইহার আর কোন উপায় নাই । সুতরাং শীঘ্রই তাহাকে এ কথা জানাইলেন ।

রমা কাকা বলিলেন,—“এটা আর বেশী কথা কি ? যত শীঘ্র পারি তোমার এ অভি-আমি পূরণ করিবার চেষ্টা করি।” এই বলিয়া তিনি অনতিবিলম্বেই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পিতাকে বলিলেন যে, আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিস্তৃত বায়ু সেবন করা নিত্য আবশ্যক; অতএব একটা উন্মুক্ত স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করান তাহার নিত্য কৰ্তব্য । তিনি ইহাতে সম্মত হইয়া রমা কাকার উপরই এ বিষয়ের ভারপাল্প করিলেন ।

অল্প দিনের মধ্যেই আমার মনোমত এক খানি উজান বাড়িকা প্রস্তুত হইয়া গেল । মহানন্দে তাহাকে বহুমূল্য সাজসজ্জায় সজ্জিত করিয়া নাম দিলাম “নন্দন-কানন” ।

এখন নন্দন-কাননে আমার সেই চিত্ত-কাঞ্চিত স্নেহের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আমি তাহার রাজা হইব, এইরূপ সঙ্কল্প করিলাম । সহচরগণ সে রাজাগঠনে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল । যে যেখানে যে অভাবটী দেখিতে পায়, আমাকে জানায়, আমিও—রমা-কাকার সহায়ে তার সে অভাবটী দূর করিতে সমর্থ হই । এইরূপে এক মাসের মধ্যেই নন্দন-কানন এক অপূর্ণ ঐ ধারণ করিল । তখন একদিন গরু তরে সহচরসমূহকে বলিলাম,—‘আচ্ছা, বল দেখি এবার আমার নন্দন-কানন সত্য সত্যই স্নেহের রাজ্য হইয়াছে কি না ?

একজন উত্তর করিল,—‘হাঁ,—হ’য়েছে বটে—কিন্তু নন্দন-কাননে পরিজ্ঞাতেরই অভাব ।’

আমি ক্ষুধা বরে বলিলাম,—সে কি! বল, সে পারিজাতটা কি?

সে বলিল—‘রমণী’।

যুগপৎ অজ্ঞাত পারিষদবর্গও তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিল। আমি তখন আগ্রহ সহকারে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘বল, বল, কেমন ক’রে, কোথায় বল রমণীকে পাওয়া—যাবে? তারপর—

উঃ! আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে! না, পাঠক! আর না—আর আমার এ লেখনী পাপের সে বিভীষিকাময়ী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে সাহস করিতেছে না, দেখ আমার ক্ষুদ্র-রক্তও ভয়ে শুকইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু না—কে যেন আমাকে অন্তরের অন্তরতম প্রবেশ হইতে সেই কথা বলিবার জন্ত তাড়না করিতেছে। তবে আজ আমি নিজের লেখনীতে নিজের পাপের কাহিনী লিখিয়া যাইতেছি। পাঠক! তুমি ধৈর্যের সহিত পড়িয়া যাও।

তারপর একজন সন্ধান দিল যে কিয়দূরেই এক অসামান্য রূপপ্রাণ্যবতী ব্রাহ্মণী আছে। তাহার পর্যবেক্ষণের জন্ত এ জগতে স্বামী তির্যক্সি কেহ নাই। স্বামীও বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় প্রবাসে থাকে। কোথায় কি কাজ করে, তাহা কেহ জানে না। তবে শুনা যায় নাকি ব্রাহ্মণ খুব ধার্মিক ও তপস্ধারমত, অর্ঘ্যের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। হুতরাং দারিত্র্যের দারুণ পীড়নে ব্রাহ্মণী উৎপীড়িত। এ সময় যদি তাহাকে অর্ঘ্যের প্রলোভন দেখান যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই

সে নন্দন-কাননে দাসীহৃদি পর্য্যন্তও অবলম্বনে কুণ্ঠিত হইবে না।

ঐ কুপারামর্শে আমার মন এতদূর মাতিয়া উঠিল যে, তৎক্ষণাৎ সেই মুক্তিমান পাপ সহচর-গণের সহিত ব্রাহ্মণীর কুটীরান্তিমুখে চলিলাম, পথে যাইতে যাইতে শুনিলাম যে, সেই ব্রাহ্মণীর স্বামী আমার পরিচিত। কিন্তু তাহাতেও পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া চলিতে লাগিলাম। কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে ব্রাহ্মণী অসুস্থস্থিত; তাবিলাম, বোধ হয় বা বিধাতাই আমাদিগের ভাগ্য-বনিকার অন্তরালে বসিয়া এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। হায়! মানবের মুঢ় মন এইরূপে স্বয়ং গুণ-পতিকেও অধর্মের সহায় করিতে চায় বটে!

ব্রাহ্মণী আমাদিগকে দেখিবামাত্র কেমন যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া ত্রাস্তে একখানি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই দেখিয়া আমাদিগের মধ্যে একটা নরকুল-কলঙ্ক লক্ষ্য ও স্রীলতাকে পাপ লালসার পঞ্চিল হ্রদে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া আরও ত্রাস্ততার সহিত তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইল। তখন সেই পুণ্যভোজ্য-গর্জিতা রমণী কি যেন এক দেবশক্তিবলে হৃৎবরে তর্জনী নির্দেশে বলিয়া উঠিল, ‘সাবধান, সত্যান! আর এক পাও অগ্রসর হ’রে আমার অঙ্গস্পর্শ করিস্নি।’ কথাগুলি যেন সজোরে আসিয়া আমাদিগের নুকের মধ্যে আঘাত করিল—আমরা কাঁপিয়া উঠিলাম। আর কেহ তাহার কাছে যাইতে সাহস পাইলাম না।

পরক্ষণেই অপূর্বনোরণ হওয়ার আশা-

দিগের সকলকার চিন্তেই কেমন যেন এক দুর্জয় ক্রোধের উদ্রেক হইল। মনে করিলাম, 'কি সামান্য নারী! তার আবার এত ভেজ!' আমি একেবারেই বিবেকহীন প্রতিশোধের উপায় খুঁজিতে লাগিলাম। সে অস্ত্র বেশীদূর যাইতে হইল না। দেখিলাম সেই ব্রাহ্মণীর একটা তিন বৎসর বয়স্ক শিশু মাতার উপরোক্ত অবস্থার বোধ হয়—কারণ বুকিতে না পারিয়া আপনা আপনই কাঁদিতেছে। তখন শোণিত পিরাসী কবন্ধের মত একজন শিশুটার উপর লাফাইয়া পড়িয়া হস্তস্থিত—যষ্টির দ্বারা নির্দয় ভাবে প্রহার করিতে লাগিলাম। আহা! বোধ হইতে লাগিল শিশু যেন প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু বরণা অনুভব করিতেছে। উঃ! সে কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! পাষাণের কি পাশবিক অত্যাচার!

তারপর? তারপর হস্ত বৎসা বাজীর মত সেই শিশু মাতা কি যেন এক বিকট চীৎকার করিয়া নক্ষত্র-বেগে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল। আমরা সবকিহে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম, যেন সমস্ত পৃথিবীকে ভস্মসাৎ করিবার জন্য বিসহস্র প্রবল সূর্য—তাহার দুই নয়নে উদ্ভিত হইয়াছে। আমরা সত্তরে সেস্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

পরদিন—প্রভাতে উঠিয়াই—অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে সেই অত্যধিক—প্রহার বরণা সহ্য করিতে না পারার শিশুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়—শিশুর মাতাও হঠাৎ সেই দারুণ পুন্ড্র-শোকের আঘাত পাইয়া জীবন ত্যাগ করে—আর বহু দিন পরে সেই রাত্রে—সেই

ব্রাহ্মণ সহসা বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত দারাপুত্রকে একই চিতায় দাহ করণান্তর আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

কতদিন চুলিয়া গিয়াছে—কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—কিন্তু সেই দিনের সেই চিত্র কি আমি কখনও মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিব? কখনও না। সেই অনাশ্রয়িত দুঃখ পূর্ব দেব শিশুর মরণ-বেদনা পাতুর বদন-মণ্ডল—সেই দিব্য-জ্যোতি বিভূষিতা দেব রমণীর শোক-ক্লিষ্টা জ্বালাময়ী 'মৃতি' যে আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে খোদিত হইয়া গিয়াছে! আমি মৃত্যু!মুহূর্ত্য!পর্যন্ত সেই চিত্র—দেখিতে থাকিব, আর কৃত পাপের প্রারম্ভ করিব।

“আমার বহু যত্ন সত্ত্বেও পূর্ব কথিত ঘটনাটী নন্দনকাননের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে করিতে ইহা প্রথমে পৌছিল রমা কাকার কাছে। তিনি যেন অন্তরে সাদরে ইহাকে অভিতাষন করিলেন। লোকে দেখিল,—তিনি যেন একটু দুঃখিত হইয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি যেন কোন একটা দূর উদ্দেশ্যের সাধনপথ কিছুটা স্মৃগম হইতে দেখিয়া সেই দুঃখের আচ্ছাদনের মধ্যে একটু সাকল্য-জ্ঞপ্ত অনুভব করিলেন।

তারপর পৌছিল পিতার কাছে। ইহাতে তিনি স্ত্রিয়মান হইয়া উঠিলেন। মনে হয় যেন সেই দিন তাহার সেই প্রথম ও মন্থন ললাট বেশে চিত্তার কুটিল রেখা প্রথম অঙ্কিত হইল—তাহার সেই দর্পণ-ভুল্য নির্মল চিত্তে বিবাদ কালিমার কালছায়া এই প্রথম পতিত হইল

তিনি বিষয় চিন্তে রম্যাকাকে ডাকিয়া কহিলেন,—‘দেখ, রম্যানাথ, আমার বিশ্বাস বিষয় কার্যে ওর মনটা বাধা পড়লে আর ঐ সব কুৎসিত কাজের ইচ্ছা ওর মনে জাগবে না। তাই বলি কি যে তুমি এখন থেকে ওকে নিয়ে বিষয় কার্য কর।’ রম্যাকাক উত্তর করিলেন,—‘আপনি একেবারে এতটা ওর সম্বন্ধে নিরাশ হবেন না। তরলমতী বালক একটা আশটা স্রষ্টাচরণ করে বৈ কি। ওই ছেলে আবার পরে এত ভাল হবে যে সকলে ওর পানে চেয়ে থাকবে। আর এক কথা হ’চ্ছে যে ওর স্বাস্থ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে ভাল হয় নি সুতরাং এ সময় যদি বিষয় কাজের ভার দেওয়া যায়, তা হ’লে নিশ্চয়ই ওর দেহ একেবারে মট হইয়া যাবে।’ রম্যাকাক যাহা বলিলেন—পিতাও তাহাই বুঝিয়া নীরব রহিলেন।

সর্বশেষে পৌছিল নির্মলার কাছে। পিতার শিক্ষাধীনে থাকিয়া নির্মলা কতকগুলি গুণ অর্জন করিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান সুদূরদর্শিতা। এই শক্তির বলে সে ছয় ভবিষ্যন্দের গর্ভনিহিত বনতিমরাবৃত চিত্রাবলী কতকাংশে দেখিতে সক্ষম হইত। তাই আজ আমার উক্ত কাহিনী শুনিবামাত্র সে একবার নিম্নে নিজ্ঞে বসিয়া আমার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে চেষ্টা করিল; দেখিল, সে এক কি বিভীষিকা ময়ী ছবি। দয়া, মার্য, মমতা, মধুরতা এমন কি মানবতা পর্যন্তও আমার জীবন পথ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—আছে কেবল এক ভীষণ দর্শন, কঠোর, কর্কশ মহা-অশ্রাব্য আর সেই মহাঅশ্রাব্যের

উপর আমার পৈশাচিক—উগ্রাসের সহিত ভাঙব নৃত্য! এ ছবি আর সে দেখিতে পারিল না। ভয়ে ও কষ্টে তাহার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন সে কাতর চিন্তে—করুনাময়ের করুণা ভিক্ষা করিল আর মনে করিল এক বার সে আমার কাছে ছুটিয়া আসে—একবার আমার পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িয়া ঐ ছবি দেখাইয়া বলে ওগো! ঐ পথে যেওনা—ও যে অশানের পথ! ও যে প্রলয়ের পথ! ও যে ধ্বংশের পথ!”

“তারপর কিছুদিন চলিয়া গেল। আমি পূর্বের মত অক্লান্তভাবে আমার কলিত সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু, কি মজা! সেই সুখ খুঁজিতে যাইয়া—স্বাস্থ্য লাভ করা ঘুরে থাকুক—স্বাস্থ্য ক্রমশই হারাইতে বসিলাম। দেখিতে দেখিতে শরীর ব্যাধি মন্দির হইয়া উঠিল। অচিরেই চলৎশক্তি হীন এক জড় পদার্থ হইয়া পড়িলাম। কেমন যেম একটা ঘোর অবসাদ আসিয়া মনকে জুড়িয়া বসিল। সুখান্বদনের শক্তিটুকু পর্যন্ত লুপ্ত হইল।

পিতার দৃষ্টি আমার উপর পূর্ণ মাত্রায় আসিয়া পড়িল। তিনি সুদক্ষ চিকিৎসক আনাইয়া আমার রোগ নির্ণয় করাইলেন। চিকিৎসকগণ সকলেই বলিলেন যে নন্দন-কানন’ই আমার রোগের জন্মভূমি, অতএব সে স্থানে যাওয়া একেবারে বন্ধ না হইলে আমার রোগ-মুক্তির আশা অতি অল্প। বাধ্য হইয়া কিছুদিনের জন্ত পিতার আদেশে নন্দন-কাননের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

কিন্তু রোগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। এমন কি, শেষে জীবনের আশাও ভিরোহিত হইল। চিকিৎসকগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। প্রতি বহুভেঁই আমার জীবনের আশা ভাবিয়া পিতা অত্যন্ত শোকাবুল হইতে লাগিলেন। তাঁহার ছই নয়ন হইতে তপ্ত অশ্রুজল দিবারাত্রি আমার কপোলদেশে প্লাবিত করিতে লাগিল। নির্মলা লজ্জা, ভয়, আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। আমার রোগ যতই প্রবল হইতে লাগিল, নির্মলার বদনমণ্ডলও ততই যেন কেমন এক অচঞ্চল প্রতিজ্ঞার উজ্জ্বল কিরণে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। যাহার কিছুমাত্রও বুঝিবার শক্তি ছিল, সেই বুঝিল সে প্রতিজ্ঞার অর্থ কি। তাহার অর্থ সাবিত্রী বা বেহলার মত পাতি-ব্রতের পবিত্র অগ্নের দ্বারা নারীর পরম শত্রু বৈধবাকে জয় করা।

সহসা একদিন আমার এই জীবন-মরণের মিলন-ভূমিতে দিবা-নিশার সন্ধিক্ষণে এক সন্ন্যাসী দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা সন্ন্যাসীকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন বলিয়া সংবাদ পাইবামাত্র এই সন্ন্যাসীর নিকট ছুটিয়া বাইলেন। গলগলবাসে কুতাজলিপুটে আমার রোগের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি আমার কক্ষ হইতে সকলকে নিষ্কাশ্য হইতে বলিলেন। সকলেই কক্ষের বাহিরে গেল, কেবল রহিলাম শয্যার উপর শুভ্রা পথবাড়ী আমি। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে আমার শয্যার পার্শ্বে আনিয়া বসিলেন। দর্শনশক্তির দ্বার হইলেও

অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম যেন তাঁহার মুখস্থি প্রশান্ত মহাশাগরের মত গভীর অগভ পূর্ণ বিকসিত চন্দ্রালোকের মত শীতল ও শান্তিপ্রদ।

সন্ন্যাসী স্থিরনেত্রে আমার আশ্রয়মস্তক কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তটা মুহূর্ত্তাবে আমার উস্তপ্ত ললাটের উপর রাখিলেন। আহা! কি স্নেহময়—কি শান্তিময়—কি অমৃতময় সেই সংস্পর্শ! নিমেষের মধ্যে রোগের সেই প্রাণবাতিমী বাতনা কোথায় দূরীভূত হইল—মনে হইল তৎক্ষণাৎ যেন আমি নিরাময় হইলাম।

সন্ন্যাসী তখন অর্দ্ধোচ্চারিতভাবে বলিতে লাগিলেন,—

‘স্থলের কাকাল। স্থখ চেননা, তাই খুঁজছ স্থখ আর নিছ অস্থখ। স্থখের ভূমি এখন বহুদূরে।’

এ কথাগুলি শুনিবামাত্র, বলিতে পারি না কেন, কেমন যেন সহসা একটা হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। আমি সত্তরে অর্দ্ধোচ্চারিতভাবে ডাল করিয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাইলাম। সেই সময় সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল এক অপূর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাঁহার দীপ্ত নয়নদ্বয় আরও দীপ্ত হইয়া আমার অন্তরের অন্তরতম কোণে প্রবেশ করিল। আমার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—মস্তক ঘর পর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কি সর্বনাশ!—এ বে সেই ব্রাহ্মণ, যার দ্বারা পুত্রকে হত্যা করিয়া তিরদিনের জন্য সসোর-স্থখ কাড়িয়া লইয়াছি। তবে কি—তবে



কি, তাহারই প্রতিশোধের জন্য আমি এ সন্ন্যাসী এখানে! আমি তখন চীৎকার করিয়া উঠিলাম—‘দূর হও, সন্ন্যাসী! তুমি আমার শত্রু!’ প্রতিধ্বনির মত তৎক্ষণাৎ যেন কাণে আসিল,—‘কাছে এস, সুখাবেবি! আমি তোমার মিত্র!’ আর কিছু শুনিতে পাইলাম না—জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম। সন্ন্যাসীও তদগোঁই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

( ৭ )

“কিছুদিন মধ্যে আরোগ্যলাভ করিলাম। কিন্তু এক মাস কাল চিকিৎসকগণ বাটীর বাহির হইতে নিবেশ করিলেন। পিতা এবার “নন্দন-কাননের” উপর সুপিত হইয়াছিলেন। পাছে বাটীর বাহির হইলে আমি তথায় বাই সেজন্ত তিনিও আমার বাটীর মধ্যে থাকিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে “নন্দন-কাননের” সহচরগণ যেই সংবাদ পাইল যে, আমি রোগমুক্ত হইয়াছি তৎক্ষণাৎ আচার্য্য বিমলানন্দকে গুপ্তভাবে আমার নিকট পাঠাইল। তিনি আমার শিক্ষক বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইলেন না। এতদিন নন্দন-কাননের মারা-মুখল কোনরূপে কাটিয়া কেদিয়া ফুট ছিলাম কিন্তু আজ আবার সেই মুখল আচার্য্য বিমলানন্দ আমার গলদেশে ফুলাইয়া দিলেন। নন্দন-কাননের দিকে আমার টান পড়িল। আমি তাঁকে বলিলাম, ‘বেশ ক’রেই হোক্‌ আজ হপুরবেলা আহারের পর সেখানে যাব। এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকবেন।’ এই আশ্বাসবাণী পাইয়া

যেন কতই আনন্দ-ভঞ্জে তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই রমা কাকা আমাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন,—“বাহিরে বেড়াইলে যদি তোমার মন ভাল থাকে তা তুমি একটু একটু এখন বেড়াতে পার। মন ভাল থাকলেই দেহ ভাল, আর মন খারাপ থাকলেই দেহ খারাপ। মনের সঙ্গে দেহের খুব নিকট সম্বন্ধ। তোমার বাপের ভয় ক’র না—আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবো এখন।’ আমি আনন্দ-ব্যঞ্জক স্বরে অতি তাড়াতাড়ি বলিলাম—‘যে আজ্ঞে!’ তিনিও যেন পুলকভরে মনে মনে ‘কৃতার্থোহস্মি’ বলিয়া চলিয়া গেলেন। নন্দন কাননে আমার বাইবার সঙ্গ আরও প্রবল হইল।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে তথায় লাইব বলিয়া আমার ঘর হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় নির্মলা আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—‘কোথা যাবে?’ তাহার সেই প্রশ্নের জ্বরে যেন একটা দৃঢ় সম্বোধের তাব মিশ্রিত ছিল। বোধ হয় সে পাশের ঘর হইতে আচার্য্য বিমলানন্দ ও রমা কাকার সহিত আমার কথোপকথন শুনিয়া থাকিবে। বাই হোক্‌, রোগের পূর্বে হইলে আমার এরূপ প্রশ্ন করিতে তাহার সাহসে কুলাইত না। রোগের পরে সে সাহসটুকু তাহার ক্ষয়িয়াছে। কেন তাহাও বলি। রোগের সময় সে প্রাণপণে অকাতরে আমার সেবা করিয়াছিল, সেইজন্য উপকৃতের কৃতজ্ঞতার আবরণে তাহাকে সাধারণ একটুকু ভালবাসা দিয়াছিলাম, ইহা সে জানিতে পারিয়াছিল; তদ্ব্যতীত আর ৩৪ মাস কাল

তাহার সন্নিধানে থাকার আমার প্রতি তাহার পূর্ব-ভর অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।

নির্মলার ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমি একটু হাসিয়া বলিলাম,—“বাহিরে একটু দরকার আছে।”

নির্মলা।—দরকার বা তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার সেই নন্দন-কাননে বাবে।

আ।—যদিও যাই এখনই ফির্ব।

নি।—না, সেখানে কিছুতেই যাওয়া হবে না।

আমার মন্ত-মন বারণ শোনে না। নির্মলাও কিছুতেই যাইতে দিবে না। তখন হঠাৎ আমার ক্রোধ অগ্নিয়া উঠিল। তাহার প্রতি আমার পূর্ব-যুগা পূর্ণমাত্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলাম,—

‘আজি বা ইচ্ছা তাই করব। তুমি আমার গুরু নও যে তোমার আদেশ আমার মাথার তুলে নিতে হবে! আমার কাছে তোমার নিবেদন করবার কি অধিকার আছে?’

নি। স্বামীর শুভাশুভের লজ্জা স্ত্রী দায়ী—স্বামীর পাপ-পুণ্যের স্ত্রী অংশী, অতএব স্বামীর প্রত্যেক কাজে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার আছে। আমি কিছুতেই তোমাকে তোমার সেই পাপ-রাজ্য নন্দন-কাননে যেতে দেব না।

আ।—কি! তুমি আমার যেতে দেবে না?

আজ সহসা নির্মলার এত সাহস দেখিয়া আমি একেবারে ক্রোধাক্ত হইয়া পড়িলাম। দুর্বল মস্তক কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান হারা হইয়া ফেলিল। আমি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সজোরে তাহাকে পদাঘাত করিলাম। উঃ—মাত্রার মন ক্রোধ রিপূর বশে কি এতই গভীরাঘাত হয়!

নির্মলা পড়িয়া বাইরা মাথার দারুণ আঘাত পাইল। মাথার একস্থান ফাটিয়া রক্তও বাহির হইতে লাগিল। আমি তাহা দেখিয়াও দেখিলাম না। রূপের তরে তাহার

উপর কত কি গালি বর্ষণ করিতে লাগিলাম। এই নির্মলা নয় কিছুদিন পূর্বে আমার ভক্ত তাহার সমস্ত মূল্য বিসর্জন দিয়া প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিল! সে কথা তখন আমার মনে আনৌ স্থান পাইল না।

এমন সময় পিতা হঠাৎ আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পাশের ঘরে কি ছিল, সেই নির্মলার ঐরূপ অবস্থা অন্তরাল হইতে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, নির্মলা যেক্ষের উপর পড়িয়া ছটফট করিতেছে আর আমি কাঁড়াইয়া তর্জন গর্জন করিতেছি। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি আর ধীরতার সীমার মধ্যে থাকিতে না পারিয়া ক্রোধরক্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন, ‘দেখ, নয়নানন্দ, নির্মলা একটি দুর্ভাগ্য-রত্ন। তাকে এক দরিত্রের বলিন কুঠীতে দেখে-ছিলুম—সেখান থেকে আমার ঘর আলো করবার লজ্জা নিয়ে এনেছি। তুমি বিভ্রান্ত-হীন, তাই মাহুব চিন্তার ক্রমাতীত হও তোমার নেই। তা যদি থাকিত তাহা হ’লে চিন্তে পাঠে নির্মলাকে? সে পিতৃমাতৃহীনা হ’লেও আমিই তার পিতামাতা। আমার অলঙ্কা তুমি যে তাকে একরূপ নির্দয়ভাবে নির্যাতন করো—তা আমি কণ্টে দেব না। আমার বাবতীর সম্পত্তি তার নামে লেখাপড়া ক’রে দিয়ে যাব। আর তোমার দৈনন্দিন যে রকম অবনতি দেখছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস তোমার হাতে বিবর পড়লেই নষ্ট হয়ে যাবে। এখনও যদি তুমি ভাল না হও, তা’ হলে কেনো আমি তোমার নিষ্ঠুরই ত্যাগপূজ করো!’ এই বলিয়া নির্মলার উবধের ব্যবহার লজ্জা তাহাকে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ঐগদাধর সিংহ রায় এম্-এ, কিংএল্।

## বিরহ চিন্তা ।

কে যেন আসি' মরমে পশি'  
কহিছে ধীরে ধীরে—  
এখনও সে বসি' আছে বাতারনে  
আশাহীন আধিনিরে ।  
অমল ধবল অঙ্গে এখনও  
পরেনি' গোলাপী সাটী,  
এলায়িত কালো কুঙ্কল রাশি  
এখনও বাঁধেনি আঁটি ।  
আঁধার ছুটির দ্বারে এখনও  
আলেনি' সন্ধ্যাধীপ,  
ভক্ত মলাটে পরেনি' এখনও  
উজল সিন্দুর টিপ ।  
এখনও রুচেনি নিশীথ শয্যা  
কুহু ছুটির মাঝে ;  
বিহবল ছুটি সজল নয়ন  
কঙ্কল মাথা লাজে ।  
ঐশ্রবণনাথ ভট্টাচার্য্য ।

## কবির গান ।

কণ্ঠে বীণা কায় উঠিল বাজিয়া  
কে সে গাহিল গান ?  
লাজে অধোমুখ কুমুম-শরনে  
কে সে ধরিল তান ।  
ইন্দু সম কার শোভরি সে মুখ  
হতেছে অধির পরাগ ।  
ওঝারে ভরিয়া ধরনী কাহার  
মিলায়ে দেয় গো প্রাণ ॥  
আবেশ আঁধি গোলাপের মত  
(সে কোন্) কাননের আশালতা ।  
শারদ কুহুর্ষে চুমিয়া রচে  
অমির বিভূর গাঁথা ॥  
লঙ্ঘিত কে সে আসিতে মন্দিরে  
পূজিতে চরণ বাহিত ।  
তরল হাস্য কাহারি অধরে  
দিয়া অর্থ্য অভিসবিত ॥  
ঐবলাইলাল মুনসী ।

## মেয়ে মহলে তুলসুল ।



এবার পূজার কি চাই ? জিজ্ঞাসা করলেই বলে উঠে—  
“এবার অস্ত তেল না এনে ব্যানার্জির নিয়ে এসো—তেলটা  
খুব ভাল, অথচ সস্তা—দেখ, যেন ভুলে নকল টকল কিনে  
এনো না। এই দেশ তার খালি বোতল—চিনে রাখ, এর  
নাম “নিরুপমা”। কবে খালি হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও  
বোতলে যেন ফোটা তুলের গন্ধ রয়েছে।”

এবার ৬পূজা পর্য্যন্ত নিরুপমার প্রত্যেক ক্রেতাকে

বিনামূল্যে “নিরুপমা পুরস্কার”

নামক প্রায় দেড় শত পৃষ্ঠার পূর্ণ, উৎকৃষ্ট এস্তিক ডবল ক্রাউন  
কাগজে ছাপা, সুন্দর গর-পুস্তক উপহার দেওয়া হইবে।  
পুস্তক সংখ্যা মাত্র এক সহস্র, সুখর আবেদন করুন।

সোল এজেন্ট—শ্রী ব্যানার্জি এণ্ড কোং ।

৪০নং ট্রাণ্ড রোড, বড়বাড়ার, কলিকাতা ।

## প্রতিমা বিসর্জন।

(১)

দিনু বিসর্জন আজি স্নেহময়ী মায়।  
বাও মাগো, এসো ফিরে পুনঃ এ ধরায় ॥  
রহিব বরষ-বাপি তব প্রতীক্ষায়।  
আবার এমনি দিনে এসো মা হেথায় ॥

(২)

আকুল পরাণ মাগো! হারিয়ে তোমায়।  
বালিছে বিবাদ-দূর হৃদয়-বীণায় ॥  
বহেনা আনন্দ-ধারা, আর এ ধরায়।  
এসো তুমি, হেথা মাগো! ফিরে পুনরায় ॥

(৩)

ঢেকেছে ধরণী আজি গাঢ় কালিমায়।  
ডুবিছে নিখিল বিশ্ব, ঘোর শুকুতার ॥  
ঘন বিবাদের ছায়া, পড়েছে ধরায়।  
এসো তুমি হেথা মাগো, ফিরে পুনরায় ॥

(৪)

করি বিসর্জন মারে আজি বিজরায়।  
ক্রীতি, স্নেহ-সম্ভাবণ দিতেছি সবায় ॥  
কাদিছে পরাণ মাগো, হারিয়ে তোমায়।  
আবার এমনি দিনে, এসো মা হেথায় ॥

ঐশ্বৰ্য্যলক্ষণাৎ চক্রবর্তী।

## সাধন-সঙ্গীত।

(বিতীয় লহর)

“ভক্তি পাকিলে প্রেম হয়” একথা  
অনেকেই বুঝে শুনা যায়। নারদ-মুখে ভক্তি  
সম্বন্ধে এই কথা লেখা আছে—“সা কন্ঠৈ  
পরম প্রেমরূপা,” ইহার অর্থ তগবানের প্রতি  
একান্ত প্রেমকেই ভক্তি বলে। আবার  
শীতল্য মুখে লেখা আছে—“সাপরাধুরক্তি-  
রীকরে” অর্থাৎ তগবানে পূর্ণ অহুরাগ থাকি-

লেই তাহাকে ভক্তি বলে। কেহ কেহ বলিয়া  
থাকেন—ভক্তির পরিণতি ভাব, ভাবের পরিণতি  
প্রেম। পরাভক্তি তত্বকে ভাবরাজ্যে পৌছিয়া  
যেয়; আবার ভাবের উৎকর্ষ লাভ না হইলে  
প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করা হুঙ্কর। প্রথম থেকেই  
অবৈত জ্ঞানের সাধনা হয় না, বৈতজ্ঞানের  
ভিত্তর দিয়া অবৈতজ্ঞানে পৌছিতে হয়।

বৈভবজ্ঞান নিয়ে উপাসনা করিতে বলিলে উপাসক বলে থাকেন “আমি তোমার অর্বাং হে প্রভো! আমি তোমার শরণাগত ভক্ত বা দাস; আমাকে তুমি চরণে ঠেলিওনা।” আবার সাধক-বধন তীব্র অত্যাগে প্রেমের প্রেরণাতে বলে ফেলেন- “দে মা আমার তহবিলদারী। তারা! তুমি ত আমার মা, আমাকে বৃত্তি দিবি না।” এখানে দুই শ্রেণীরই কথা বলা হইল, দুজনেই সাধক, তবে একজন ভক্ত আর একজন প্রেমিক। “আমি তোমার” এটা ভক্তি রাজ্যের কথা; “তুমি আমার” এটা প্রেম-রাজ্যের কথা। যিনি ভক্ত, তিনি কুণ্ঠিত; তিনি ভয়ে ভয়ে কথা কন, পাছে প্রভুর চরণে অপরাধ করে ফেলেন। আর যিনি প্রেমিক, তিনি কুণ্ঠিত হবেন কেন? তিনি যে মার আবদারে ছেলে; তাঁর মার উপর জোর আছে আর সে জোর খাটে। সাধন পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন, উপাস্য দেবতার সঙ্গে বিশিষ্টরূপে পরিচিত, তাই প্রেমিকের আবদার। তাবের আধিক্য না জন্মিলে প্রেম রাজ্যে বাওয়া যায় না; যে সে এরাভ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রেমিক সাধা যায় না, হয় বলিলেই প্রেমিক হওয়া যায় না; প্রেমিক হওয়া বড় সহজ কথা নয়। প্রথমতঃ উন্মত্ত ক্রোধের আবৃত্তক; দ্বিতীয়তঃ অধিকারী হওয়া চাই, তৃতীয়তঃ গুরু করা প্রয়োজন, চতুর্থতঃ সাধনা করা আবৃত্তক। কোন বিষয় না বিবিলে কি অভিজ্ঞতা লাভ হয়? সকলের থাকে ভবিষ্যৎ প্রেম নয় না। প্রেমিকের মন এক বস্তুই হাঁচি চালা, তার গড়নই আলাহিনা

রকমের; তাই প্রেমিক কবি গাহিতেছেন—

“প্রেম কি সকল থাকে সর  
প্রেম জানতে হয়, শিখতে হয়,  
প্রেম কথার কথা নয়।  
আবার প্রেমের গড়ন মন না হলে  
প্রেম কি তাতে রয়।”

প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিলে অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, ইহা বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়—এক অবস্থার পর অন্য অবস্থা আসে। অর্বাং সাধককে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রথম উন্মাদ, দ্বিতীয় যুক্ত, তৃতীয় নৈমীকী, চতুর্থ বশী, পঞ্চম প্রভু, ষষ্ঠ বিভূ। প্রেমে লোককে মাতোয়ারা করে ফেলে, লোক হিতাহিত জ্ঞান ব্রহিত হয়ে পড়ে; প্রেমিকের ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আদৌ থাকে না। এমন কি দেবতার পর্ষাও প্রেমে পাগল হন, সাধারণ জীবের কথা আর কি বলিব। তাহার দৃষ্টান্ত পুরাণে পাওয়া যায়—

“প্রেমে-পাগল পশুপতি  
প্রেমের দ্বারে রম্যপতি  
গোলক ভাঙে বৃন্দাবনে  
নন্দের বাধা মাগার বর।”

প্রেমে পাগল করে সত্য কিন্তু প্রেমের মহা গুণ এই যে প্রেমে ভেদজ্ঞান রহিত হয়, আর সমদর্শন এনে দেয় যথা,—  
সম হৃৎ স্বঃ স্বঃ স্বঃ সমনোষ্টাঙ্গ কাকনঃ  
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োবীর তুল্য নিন্দাঙ্গ সংকতিঃ।  
মানাপমানয়োঃ স্যাদলোম্যাদিরিপকরোঃ  
সর্কারন্ত পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।  
সহঃ শকৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ

দীতোক হুং হুংখের সমঃ সঙ্গ বিবর্জিতঃ ।

ভেদ জ্ঞানটা যারারই কাজ ; যাগাতে  
আত্মজ্ঞানকে তিরোহিত করে, আত্মাই আত্মাকে  
অনান্য দেখে ; আপন পর ভাব আনা যারার  
খেলা । প্রেমিক যিনি, তিনি যারার অতীত  
হয়েছেন ; তিনি সুখ-দুঃখ, লোষ্ট্র-কাঞ্চন, প্রিয়-  
অপ্রিয়, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, মিত্র-অমিত্র,  
শীত-উষ্ণ সব সমান দেখেন—তিনি গুণাতীত,  
গুণি অনাসক্ত, তিনি সর্কারস্তু পরিত্যাগী,  
তিনি বীর । তাই কবি গাহিতেছেন—

“প্রেমে রয় না ভেদজ্ঞান, স্থান কি অস্থান  
কল কি অনল, সুখা গরজ হয় সমান ।  
প্রেমে মান অপমান জ্ঞান থাকে না  
সমান ভাব তার সব সময় ॥”

প্রেমের রাজ্যে তর্ক যুক্তি নাই ; প্রেম  
তর্কের অতীত । সাধারণ লোক যুক্তি চায়,  
প্রেমিক যুক্তি চাহেন না । পঞ্চম পুরুষার্ধ  
পাইলেই প্রেমিক কৃতার্ধ । প্রেমিকের চক্ষে  
পাপ-পুণ্য নাই, সুখ-দুঃখ সমান । প্রেমিকে  
হিতপ্রাজ্ঞ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় । তাই প্রেমিক  
কবি গাহিতেছেন—

প্রেম যুক্তি মানে না, প্রেম যুক্তি মানে না,  
নিকি ধরে ছোট বড়র ওজন করে না,  
প্রেমিক পাপ পুণ্য সমান গণ্য  
করে দুখে-সুখে সমধর ॥”

প্রেমের স্বভাব গূঢ়রহস্য পূর্ণ, প্রেমের ধর্ম  
বিচিত্র । প্রেমিক তাঁর প্রেমময় প্রিয়দর্শনকে  
সর্বত্র দেখেন । প্রেমিকের মূখে শুনা যায়  
“সর্বত্র বসিহং ব্রহ্ম” । প্রেমিকই ভগবানের  
প্রিয়, তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত ; তিনি

ব্রহ্ম দর্শন করিতে করিতে এবং ব্রহ্মচিন্তা  
করিতে করিতে ব্রহ্ম হইয়া যান । শীতাই সেই  
কথা প্রমান করিতেছেন—

সর্বভূতস্বমাত্মানাং সর্বভূতানি চাত্মনি  
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ।

দুঃখেষু হৃদয়মনা সুখেষু বিগতানুহঃ  
বীতরাগভয়ক্রোধঃ হিতবীমূনিক্রচ্যতে ।

জ্ঞেয়ঃ সনিত্য সন্ন্যাসী যোনবেষ্টিন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ।

মাক্ষোহব্যতিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে  
সত্ত্বগান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ার কল্পতে ॥

“প্রেমের ধর্ম চমৎকার, ও তার মর্ম বুঝা তার  
প্রেম জড়তে চটতরু দেখে, আলোকে আঁধার  
প্রেম নিরাকারের আকার দেখে

আবার সাকার দেখে শূন্যময় ॥”

“প্রেম বিন্দু মাঝে সিদ্ধ দেখে

এই বিশ্ব দেখে ব্রহ্মময়

যে প্রেমেতে হুটি হিতি

সেই প্রেমেতে হয় প্রলয় ॥”

বিন্দু মাঝে সিদ্ধ দেখে, কে তাই ? বীর  
কেবল দিব্য দর্শন হুটিয়াছে, তিনিই কেবল  
বিন্দু মাঝে সিদ্ধ দেখিতে পান । যিনি আন্দের  
পর্যবহার উঠিয়াছেন, যিনি পঞ্চম পুরুষার্ধ  
লাভ করিয়াছেন, তিনিই কেবল বিন্দু মাঝে  
সিদ্ধ দেখিতে পান । হুটি হিতি ও প্রলয়  
কাহার কার্য্য ? এ কার্য্য ভগবদ্রী প্রকৃতির,  
স্ব, রজ, তমোগুণের দ্বারা প্রকৃতি এই খেলা  
খেলিতেছেন । ঐ তিনি গুণ—ব্রহ্ম, বিহু,  
মহেশ্বর নামে অভিহিত । মহামায়ার শক্তিতে  
ব্রহ্ম-বিহু-মহেশ্বর শক্তিবান্ । যারার খেলার

ভিতরে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি  
অথবা চিংশক্তি ও মাদ্রাশক্তি অন্তর্নিবিষ্ট  
রহিয়াছে। বিশ্বশক্তি বা প্রাণশক্তি খেলি-  
তেছে, তার ফলে সৃষ্টি হইতেছে, স্থিতি  
হইতেছে ও প্রলয় হইতেছে। যা তাঁর  
সন্ধানকে বড় ভালবাসেন; সে ভালবাসার  
ওণে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হইতেছে।  
বিনি প্রেমিক, তিনিই কেবল বুঝেন—সৃষ্টি  
প্রেমের খেলা, স্থিতিও প্রেমের খেলা, আবার  
প্রলয়ও প্রেমের খেলা। প্রেমিকের বোণে  
আসে “যে প্রেমের সৃষ্টি স্থিতি, আবার সেই  
প্রেমেরই প্রলয়।”

নিম্নে সমস্ত সঙ্গীতটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;  
পাঠক পড়িয়া এই সঙ্গীতের মধুর রস আবাদন  
করিতে পারিবেন।

রাগিনী হাখীর—তাল একতাল।

প্রেম কি সকল খাতে সয়।

প্রেম জান্তে হয়, শিক্তে হয়

প্রেম কথার কথ্য নয়।

আবার প্রেমের গড়ন মন না হ'লে

প্রেম কি তাতে রয় ॥

প্রেমে পাগল পণ্ডপতি, প্রেমের দ্বারে রম্যপতি  
পৌলক ত্যজে বন্দাবনে, নব্বের বাধা বাধার বয়।

প্রেমে রূপনা ভেদজান, হান কি অহান  
জন্ম কি জনল, সুখা পরল, হয়-সমান ॥

প্রেমে মান অপমান জ্ঞান থাকে না  
সম্মান ভাব তার সব সময়।

প্রেম-বুজি মানে না, প্রেম-বুজি মাঝে না  
সিদ্ধি করে ছোট বড়র ওজন করে না।

প্রেমে পাগপুণ্য, সমান গণ্য

করে, দুঃখে সুখে সমন্বয় ॥

প্রেমের ধর্ম চমৎকার, তার মর্ম বোঝা তার  
প্রেম জড়তে চৈতন্য দেখে, আলোকে আধার।

প্রেম নিরাকারের আকার দেখে

আবার সাকার দেখে শূন্যময় ॥

প্রেমের জন্ম ধরাতে, ধরা দেয় না ধরাতে

বিরটি ব্রহ্মাণ্ড দেখে ধূলি মৃষ্টিতে।

প্রেম বিন্দু মাঝে সিদ্ধ দেখে

এই বিশ্ব দেখে ব্রহ্মময় ॥

কারে বলব একথা, কেবা বুঝবে একথা,

বাধার ব্যাধিত নৈলে কেবা বুঝবে এ ব্যাধা।

দেখ যে প্রেমের সৃষ্টিস্থিতি

সেই প্রেমেরই প্রলয় ॥

ঐশ্বর্যশানচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ।

## আমার সুখ ।

( গল্প )

গৌরীদানের ফলশাভের আশায় জমিদার  
মনোরঞ্জন বাবু পরীগ্রামের এক ধনবান গৃহ-  
স্থের ঘরে নবম বর্ষীয়া মেয়ে কমলার বিবাহ  
দিলেন। কিন্তু হায়,—বিবাহের এক মাস  
পরে তিনি যে সংবাদ শুনিলেন, তাহাতে বেশ  
হইতে ভীষণ অশনি-সম্পাতের ভীরু তাঁহার  
বক্ষপত্র বিদীর্ণ করিয়াছিল। তিনি শুনি-  
লেন,—“জামাইটী কলেরা রোগে জীবনীলা  
সম্বরণ করিয়াছে।” কভার সুখের দিকে  
চাহিয়া তাঁহার প্রাণ বেশ কাঁচিয়া বাহির  
হইতে লাগিল। তিনি কভার সুখের দিকে  
চাহেন আর অজ্ঞানে আসেন। হায়, তাঁহার

এত স্নেহের—এত আদরের নদীর পুতলী কমলার আজ এই দশা। হায় অত্যাগিনী আজ চিরতরে দুঃখ-সাগরে ডাঙ্গিল,—তার মুকুল-জীবনেই সুখ-শান্তি সব ছুরাইয়া গেল। নিষ্ঠুর নিরস্তির এক নিশ্চয় বিধি—শোক-সন্তপ্ত মনোরঞ্জন বাবু মেরেকে বুকের মধ্যে টানিয়া অশ্রু-উচ্ছসিত কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—  
“মা ভাবনা কি ? আমার বিশাল জমিদারী আছে ; তুমি যাঁতে সুখী হও, আমি তাই করবু।”

হায়, অত্যাগিনী কমলা বুঝিতে পারিল না যে আজ তার কি মহা সর্বনাশ হইয়া গেল। সে জানহীনা বুঝিবেই বা কিরূপে ?—সে শুধু ধুলাখেলা করিতে জানে, স্বামী যে ইহকালের দেবতা, পরকালের সর্বস্ব, অনন্ত কালের সুখ তাহা তো আর সে জানে না ? পিতাকে কাদিতে দেখিয়া সে-ও উচ্চরবে কাদিতে লাগিল।

পিতা স্নেহার্জবেরে বলিলেন,—“কৈদো না মা ! কৈদোনা, যাঁতে তুমি সুখী হও, আমি তাই করবো।”

কমলা বালা-জীবনেই বৈধব্যকে আলিঙ্গন করিল বটে, কিন্তু স্নেহময় পিতা তাহাকে বৈধব্যের আচার-নিয়ম পালন করিতে দিলেন না।

একমাত্র হুহিতা ব্রহ্মচারিণী বেশে সাজিবে, সে শোচনীয় দৃষ্ট তিনি পিতা হইয়া কেমন করিয়া চোখে দেখিবেন ?—সুতরাং কমলা কিছুই ভোগ করিল না ;—সাকী, সেবিজ, বকি, স্বর্ণালকার, সুগন্ধি তৈল ও তরল

আলুতা সবই ব্যবহার করিতে লাগিল। কেবল ললাটে সিন্দূর-বিন্দু এবং মনিষকে লোহার খারো ব্যবহার ভোগ করিল ;—বাকী সর্ব্বাঙ্গেই সধবা-বেশ। সে পঞ্চ ব্যঞ্জনের সহিত দুইবেলা আহার করিতে লাগিল। এক কথায় সে সধবার বেশে বিধবা হইয়া রহিল।

মনোরঞ্জন বাবু কমলাকে সুখী করিবার জন্য ভাবিয়া আশ্রয় হইলেন ;—কি করিলে কমলা সুখী হইবে ? কমলাই যে ভাঁহার সব। অবশেষে স্থির করিলেন ;—যে প্রকারে হউক কমলার পুনরায় বিবাহ দিবেন। যদি কমলা তাহাতে সুখী হয়, তিনিও তাহাতে সুখী।

( ২ )

নদীর স্রোতের স্তায় জীবন-স্রোত ক্রমাগত বহিয়া চলে ; কোন বাধা-বিঘ্ন মানে না—ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। এইরূপে কমলার জীবনের পাঁচটি বৎসর চলিয়া গেল। কমলা এখন আর তেমন ক্ষুদ্র বালিকাটি নাই ; ভবার ললাটে তরুণ-অরুণের প্রথম কিরণছাটাত স্তায়, তাহার কমলীয় দেহে নব যৌবনের লাবণ্য-বিভা ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইতেছিল। এ-হেন কিশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষেপে নগ্নায়মান। বিধবা কিশোরীর সধবার বেশ দেখিয়া পাছার হৃদয়টানালিনী রমণীগণের অঙ্গুলিৎসু হৃদয় তাহার উপর পড়িল। ধর্ম্মপরায়ণ রমণীগণ হুঃখ করিয়া বলিল—“কলিকাল ! একবারে ঘোর কলিকাল !!—ঘোর কলিকাল !!!”

পিতার আদেশ অঙ্গুলারে কমলার প্রত্যহ কেশবিন্যাস করিতে হয় ; সুগুণের স্নেহ



মেয়ে সরলা আসিয়া কমলার কেশবিন্যাস করিয়া দিয়া বার। কমলা ও সরলার মধ্যে খুব সখীস্ব ভাব। উভয়ে উভয়কে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসে।

বৈকালে সরলা আসিয়া কমলার কেশ-বিন্যাস করিতে বলিল; কেশবিন্যাস করিতে করিতে সরলা বুখিল—কমলা কাদিতেছে। সরলা বলিল—“ছি, সই! কাদ্‌ছিস্।”

কমলা বজ্রাকলে অশ্রুজল মুছিয়া বলিল—  
“সই! মেয়ে মানুষ বিধবা হ'লে মরে না কেন?—তুখু নীরস-বিশুদ্ধ ব্যর্থ জীবন-ভার বহিয়া লাভ কি? আমি-বদি মরতুম।”

কমলার দুইগুণ বহিয়া অশ্রুজল করিতে লাগিল। সরলাও কাদিয়া ফেলিল।—অনন্তর বজ্রাকলে কমলার চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া সরলা বলিল—“কাদিস্ না সই। কাদিস্ না, কেঁদে কি হবে? সেই অনাথের নাথ জগত-স্বামীকে ডাক্; বিরহ-বাধিত প্রাণে শান্তি পাবি।

কমলা—“সই যে রমণী বিধবা, তার ভোগ বিলানিতা কেন? বিধবা,—বিধবা-বেশেই থাকিবে, বিধবার আচার-ব্যবহারই করিবে।—বিধবা সখবার আচার-ব্যবহার করিলে জীবন কলুষিত হয়, মন কুপথগামী হয়,—অন্তে স্তম্ভিত নরক ভোগ করে।

সরলা—“সই! তুই এত জানিস্ তবু কণ-স্বারী ঐহিক পথে মুক্ত হয়ে পরকাল নষ্ট করছিস্?”

কমলা—“এতদিন তা জানতাম না।”

সরলা—“আর এক কথা শুনছিস্ সই?”

কমলা—“কি?”

সরলা—“সারা পাড়ামর টি টি গয়ে গেছে।”

কমলা—“কিসের?”

সরলা—“তুই সখবা-বেশে থাকিস্, রোল হু'বেলা মাছ খাস্, একাদশী করিস্ না—  
“আর—”

কমলা—“আর কি সই?”

সরলা—“আর তোর বাপ নাকি ভোরে আবার বিয়ে দিবেন?”

কমলা—“তা'ও কি হয়?—আমি হিন্দু রমণী—হিন্দু রমণীর এক বই দুই ভাবাই পাপ। সই! আমার কপালে যদি স্বামী-সুখ থাকত তা হ'লে তিনি আমার ছেড়ে যেতেন না। জানিস তো সই! আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে আছে—  
—‘বিবাহিতা নারীর জীবনে-মরণে স্বামীই সব—চিন্তা-ধ্যান-জ্ঞান স্বপ্ন।’”

সরলা—“তিনি তোমার স্বপ্নের জন্ত আবার তোমার বিয়ে দিবেন।”

কমলা—“হিন্দু নারীর ক'বার বিয়ে হয় সই? তুই মাকে বলিস্, মা যেন বাবাকে ওরূপ ভয়ঙ্কর বিপরীত কাজ করতে মানা করেন। তুই আর আমার চুল বাঁধতে আসিস্ না। এ চুল পুড়িয়ে ফেলব, হাতের চুড়ী ভাঙব, পেড়ে কাপড় ছাড়ব, তৈল-আলতা নদী-জলে ফেলে দিব। আমি বিধবা, ব্রহ্মচারিণী-বেশই আশ্রয় মানাবে ভাল।”

সরলা—“সেই ভাল।”

( ৩ )

কমলা নিজের ঘরে গিয়া অলঙ্কার খুলিল, হাতের বেলোয়ারী চুড়ী ভাঙিল, কাঁচি-স্বারা

হুলেন-সিদ্ধ অলক'-গুহ কাটিল, পার্শ্বসীড়ী  
ছাড়িয়া একখানি নূতন ধান কাপড় পরিল।  
এতদিনের পর বাল-বিধবা কমলা প্রকৃত  
বিধবা-বেশ ধারণ করিল।

মনোরঞ্জন বাবু তাঁহার সাধের মেয়ে  
কমলার বৈধবা-বেশ দেখিয়া বিশেষ মৰ্ম্মাহত  
হইলেন—অশ্রু-আবেগ-কণ্ঠে কহিলেন—“এ  
সাজ আজ তোমার কে সাজালে মা ?”

কমলাও কাঁদিয়া ফেলিল,—বস্ত্রাকলে  
নয়ন জল মুছিয়া বলিল—“এ সাজ আমি  
নিজেই সেজেছি বাবা !”

পিতা—“কেন, কেন মা ! তোমার ঐ  
সুন্দর দেহে এ সাজ কি ভাল দেখায় মা ?”

কমলা—“বাবা ! আমি যে বিধবা ;—  
বিধবার এ সাজ-ই ত ভাল দেখায় বাবা !  
—বাবা বিধবার পোষাক-পরিচ্ছদের কি দর-  
কার ? শরীরের সৌষ্ঠব-সাধনাপেক্ষা, আত্মার  
সৌন্দর্য্য-বিধানে অধিকতর যত্ন করা উচিত  
নয় কি বাবা ?—আত্মা-পাখী, দেহ-পিজরা,  
হুইয়ের মধ্যে কোনটি ভাল হওয়া উচিত ?  
প্রাণীটি না পিজরটি ?”

পিতা—“না ! তুমি এখনও যে ছোট -”

নির্মলা—“না বাবা ! আমি আর এখন  
ছোট নই, এতদিন ছোট ছিলাম, তাই বুঝতে  
পারি নাই। এখন বড় হয়েছি—জ্ঞান-বুদ্ধি  
হয়েছে, এখন সব বুঝতে পেরেছি। এতদিন  
কেবল পাপ সঞ্চয় করেছি।” কেন বাবা !  
তুচ্ছ বিলাসিতা-সুখে পরকাল নষ্ট করবো ?—  
ঐহিকের সুখ ক’দিন ?”

মনোরঞ্জন বাবু মনে মনে বলিলেন—“তাই

ত ক’দিন ?”

কমলা—“বাবা !”

পিতা—“কি মা ?”

কমলা—“এক কথা শুনলুম, সত্যি কি ?”

পিতা—“কি কথা মা ?”

কমলা—“আমার নাকি আবার বিয়ে  
দিতে চান ?”

পিতা—“হাঁ, মা ! তোমার সুখী করিতে  
আবার তোমার বিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছি।”

কমলা—“তাতে আমি সুখী হবো না।”

পিতা—“কেন মা ?”

কমলা স্থিরনেত্রে পিতার মুখের দিকে  
চাহিয়া কল্পিত-কণ্ঠে বলিল—“বাবা ! এক  
আকাশে দুই সূর্য্য থাকে না, এক হৃদয়ে দুই  
জনের স্থান হ’তে পারে না। হিন্দু-রমণী এক  
জনকে হৃদয় দান করে, পরে তাহা অস্ত্রকে  
সমর্পণ করলে, ঘিচারিণী হয়, এ উপদেশ ত  
বৈশবে আপনার কাছেই পেয়েছি ! আর  
আপনিই তো বলেছেন—“বধূর্থে নিধনং  
শ্রেয়ঃ পরবধূর্থে ভয়াবহঃ।” তবে কেন বাবা !  
তুচ্ছ সুখের জন্য নারী-বধূর্থে জলাঞ্জলি দিব ?

পিতা—নীরব ?

কমলা—“বাবা ! আমি বেমোহে এতদিন  
আছর থেকে হিন্দু-বিধবার আচার-নিয়ম পালন  
করি নাই। আজ আমার সে মোহ  
কাটিয়াছে। এখন বেশ বুঝতে পেরেছি—  
“বিধবার ব্রহ্মচারিণী-বেশে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-  
এত পালন করাই উচিত।”—ভোগ-স্পৃহা,  
লালসা-বাসনা সব ত্যাগের অনলে পোড়াবো,  
—আজ হ’তে কঠোর সংযম পালন করবো !

—এক লজ্জা হবিষ্যি করবো, একাদশীর দিন একাদশী করবো, কখনাঙ্গনে শুবো। আর

—আর ভক্তি-কুসুম অক্ষ-চন্দন মাখিয়ে স্বর্গগত স্বামী দেবতার স্মরণগোন্ধে অর্ঘ্য দিব।”

শিতা—“মনীর পুতলী যা আমার! তোমার কপালে এত দুঃখ-কষ্টও ছিল?

কমলা—“দুঃখ কষ্ট কি বাবা! বিধবা-জীবনে ইহাই—আমার পরম সুখ।

ঐযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

## গয়ার ইতিহাস।

(মুসলমান যুগ)

বিহারে মগধরাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আফ-গণ বিজয় ভারতবর্ষকে সহজেই জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিরার খিলিজি বহবার ভারত জুটন করিয়া রাজত্বগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া হিন্দুশক্তিকে এককালীন ধ্বংস করিতে পারিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অপরিজ্ঞাত নাই। কালিঙ্গর, দিল্লী, কাম্বুজ, বারিকা প্রভৃতি বার-বার জুটন ও হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিগুলি ভগ্ন করিয়া দেবদ্বান হইতে বহু ধনরত্ন পাইয়া বক্তিরার বলে করিয়াছিলেন যে গয়ার বহু বৌদ্ধ বিহার ও জুপ ভগ্ন করিয়াও সেইরূপ প্রভুত ধনরত্ন পাইবেন; কিন্তু তাহার সে আকাঙ্ক্ষা কারণে ফলবতী হয় নাই; বগধে যে সত্বল বৌদ্ধ বিহার, চৈতক, জুপাদি ছিল তাহাই তিনি ভগ্ন করেন কিন্তু আশাহরুপ

ধনাদি প্রাপ্ত হন নাই। তাহার অশাহুরী জিহাংসা ও অত্যাচারে বহু বৌদ্ধাশ্রম ও নিরস্ত্রশ্রমীর বৌদ্ধ অধিবাসিগণ হত হইলেন, কেহ কেহ নেপাল, দক্ষিণদেশ বা তিব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং অপরে কোন উপায় না দেখিয়া বিজয়গণের ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহা আমরা তাত্‌কালিক সমসাময়িক ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি। এই হইতে গয়া বা মগধের ইতিহাস মুসলমানরাজগণের সুবা বিহারের ইতিহাসের সহিত জড়িত হইল। খৃষ্টীয় তের শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেস্তার রাজগণ বহবার গয়া তাঁর ভূমিটিকে যখন ও তুর্কীগণের হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া অক্লান্তকাধ্য হইলে শেষে রাণা সজ তাহা পাঠানগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেকথা আমি ইতিপূর্বে মোহর চৌধুরীর পূর্বলিখিত প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়াছি। বক্তিরার খিলিজি এবং তাহার পরবর্ত্তী মুসলমান রাজার শাসন কালে বিহারের দক্ষিণ ভাগকে (যাহা প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যকে আলিঙ্গন করে) বজ সুবেদারির অধীনে স্থাপিত করা হয়। দাস বংশীয় সম্রাট আলতাশশের শাসন কালে ১২২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহার সিংহাসন আলাউদ্দিন জানি নামক এক সাহসী শাসকের অধীনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর পুন্ডরার দক্ষিণ-বিহার বজের সহিত যুক্ত হয় এবং পরে সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলক ইহাকে পূর্বক শাসকের অধীনে রাখেন। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর

সম্রাটের আদেশ মত মগধ রাজ্য কোনপুর  
সুবার সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে। এই  
সময় অনেক মুসলমান পাঠান ভরলোক গয়ায়  
জাইগীর প্রাপ্ত হন। এবং ষোড়শ শতাব্দির  
প্রথম ভাগে ইহা সাসেরাম নিবাসী ইতিহাস  
প্রসিদ্ধ পাঠান সামন্ত শেরসাহের অধীনে  
রাখা হয়। এই শেরসাহ ভূপতি যোগল সম্রাট  
হুমায়ুনকে দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিয়া  
অন্ততঃ কিছুকালের জন্য তাড়াইয়া দিতে  
ক্রী করেন নাই, তাহা ইতিহাস-পাঠকের  
অবিদিত নাই। ক্ষণস্থায়ী শেরসাহ বংশের  
অধঃপতনের পর হুমায়ুন দিল্লীর যোগল  
সম্রাজ্যে দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইলে পর বিহার  
পুনশ্চ পৃথক “সুবার” বিভক্ত হইল এবং ইহার  
শাসনবিধি পরিচালন জন্য দিল্লী হইতে একজন  
করিয়া শাসক নিযুক্ত হইয়া আসিতেন এবং  
পরবর্তী যোগল সম্রাটগণের অধীনে ইহাকে  
বঙ্গ সুবেদারীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়,  
অতঃপর গয়া জেলার ভাগ্যচক্র মুর্শিদাবাদের  
নবাবীর সহিত ঘূর্ণিত হইতে থাকে। বিহারে  
একজন মুর্শিদাবাদের সুবেদারীর অধীনে  
সহকারী শাসক থাকিয়া রাজকাৰ্য্য সুশৃঙ্খলার  
সহিত পরিচালন করিতে থাকেন। যোগল  
সম্রাটগণের রাজত্ব কালে কেবল গয়া জেলা  
নহে, বর্তমান ছোটনাগপুর প্রদেশের কত-  
কাংশ অর্থাৎ বর্তমান পালামু ও হাজারিবাগ  
জেলার অংশ বিশেষ গয়ার অধীনে ন্যস্ত ছিল ;  
পরে সাসেরাম বা রোহতাস সরকারের অধীনে  
পরিবর্তিত হইয়া স্থাপিত হয়। সেইজন্য  
গয়ার ইতিহাস লিখিতে বাইলে গয়াজেলার

সংলগ্ন জাগলা, ডেবা, পাহাড়ি, বিমোজা,  
ডালটনগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটা পরগণার সংশ্লিষ্ট  
ইতিহাস প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয়। জাগলা  
প্রভৃতি পরগণা পূর্বে গয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত  
ছিল, তাহা ক্রমশঃ পরে বর্ণনা করিব। ছোট-  
নাগপুরের প্রাচীন নাম “কোকরা”। ছোট-  
নাগপুর অতি প্রাচীন কাল হইতেই বহু অসত্য  
চেরো, কোল, খরোয়ারদের আবাস-ভূমি  
হইয়াছিল। রামগড় ইহা র রাজধানী ছিল।  
মুসলমান বিজয়ের পর হইতে এগুলি ক্রমশঃ  
ক্ষত্রিয়বাসভূমি হইয়া উঠে। সম্রাট আকবরও  
হুমায়ুনের সময় হইতেই এদেশে ক্ষত্রিয় বোদ্ধা-  
গণ আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়া পার্শ্বত্যা  
উচ্চপ্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করিয়া  
তাহার মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করত বলবিক্রম  
প্রকাশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সামন্তরাজ্যরূপে  
দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ইহার সঙ্ক্ষে  
এই সকল প্রদেশ অধিকার করিতে সক্ষম হই  
নাই। এই সকল দেশের আদিম কোল, ভীল,  
চেরো, ভরোও, খরোয়ার অধিবাসীগণকে বহু  
যুদ্ধ-বিগ্রহের পর এই দেশ হইতে আরও  
দক্ষিণে সিরগুজা, হটর, কোটীকুন্দা, বিশ্বরাম-  
পুর প্রভৃতি অঞ্চলে তাড়াইয়া পরে ইহাদিগকে  
এই দেশ অধিকার করিতে হইয়াছিল। এই  
সকল সামন্তরাজ্যগণের সোনপুরা, নগর-উটানি,  
দেওর রাজবংশ, পাণ্ডুয়াইর সামন্তরাজগণ,  
পালামুর নাগবংশী রাজগণ এবং রুহাটেনপুরা-  
দির রাজবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোনপুরার  
সুফয়ার (সরসু পারসু রাজপুত ক্যাস বা বংশ)  
হইতে কাথোরানের বাহুমান এবং ভোগ

পরীর পর্বসম্বৃত সাঁড়কীর বাসুয়ান বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। রক্তাক্ত সোনপুরার জাতি। চৈনপুর আদীম পালায়ু হুর্গের অধিকারী রাজা গোপাল রায়ের ভাণ্ডারিবংশ সম্বৃত। এই সকল রাজবংশ সমূহের সংগৃহীত বিস্তৃত ইতিহাস পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

ছোটনাগপুর প্রদেশের রঙ্গ সন্তোরের যশ ও গুণগরিমা অতি প্রাচীন কাল হইতে উপনীত হইয়া আসিতেছে। সিদ্ধভূমি ও মালভূমি প্রভৃতি জেলার মধ্যে খনিজরত যেমন বেশী ও অধিক যাত্রার আছে, পালায়ু ও হাজারিবাগ জেলায় সেরূপ না হইলেও এ জেলা দুইটির মধ্যে হাজারিবাগ ও গয়া জেলার অন্তর্গত সকলের কথা পূর্বেই বলিয়াছি এবং পালায়ু জেলার মধ্যে কয়লা এবং হীরকখনির কথা শুনা যায়। হীরক সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে মোগল সম্রাটগণের সময়ের ছোটনাগপুর প্রদেশের অন্তর্গত পালায়ুজেলার বিখ্যাত হীরকখনির কথা জানিতে পারা যায়। ইহা এখন লুপ্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে। ইংরাজ শাসনাধিকারে পালায়ু জেলাটিকে প্রথমে গয়া জেলার অধীনে এবং পরে মোহরদাঙ্গা জিলার অধীনে একটি সহস্রাবার্ষিক স্থাপিত করা হয়, কিন্তু ১৮৯২ সাল হইতে ইহাকে রাঁচির অধীনে রাঁচি কমিশনারীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি সিভিলিয়ান ডেপুটি কমিশনার, সবজজ, কলেটর ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে সম্পূর্ণ শাসন ভার তত্ত্ব করিয়া

একটি স্বতন্ত্র জিলার পরিণত করিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে। মোগল শাসনকালে এই জেলার ইতিহাস আর স্বতন্ত্র থাকে নাই। সে সময়ে এই প্রদেশ বনে পরিপূর্ণ ছিল, অধিবাসীরও সংখ্যা খুব স্বল্প ছিল বলিয়া এই দেশের ভাগ্যচক্র গয়া জেলার ইতিহাস ও ভাগ্যচক্রের সহিত যুক্ত হইতে থাকে। \*

পাঠান ও পূর্ব মোগল সম্রাটগণের শাসন কালে গয়ার সম্বন্ধে যৎ সামান্য কথা পূর্বে গয়ালাী এবং শোহরচক্রে চৌধুরীর উপাখ্যান প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে সময় গয়া বা মগধ বঙ্গের স্বেচ্ছাচারের অধীনে ছিল—তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সময়ে সময়ে স্থানীয় সামন্তগণ প্রবল হইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব মাজুম বাহাদুরকেও অগ্রাহ্য করিয়া নিজেরা ক্ষুদ্র পার্বত্য হুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে ক্রটি করিত না। কালেই অনেক সময়ে গয়া এবং পালায়ুর সামন্ত রাজগণ নামে যাত্র মোগল সম্রাটের অধীন ছিলেন; বখন মোগল সৈন্য ইহাদিগকে পীড়াপিড়ী করিয়া ইহাদের পার্বত্য হুর্গ সকল অবরোধ করিত, তখনই বশতাখীকার করিয়া ২৫ বৎসর কর ও রাজস্ব দিতেন এবং সুবিধা পাইলেই “যে কে সেই” হইয়া দাঁড়াইতেন। বাদশাহ আকবর সাহের রাজত্ব কালে গয়া ও পালায়ুজেলা প্রকৃত মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে আইসে।

\*। কলিকাতা ই এক জালটনের ভিত্তিকৃষ্টিত প্রদেশ।  
\*। মাজী অব. বেঙ্গল, ২। স্যার এই. ইলীজের ভাষ্যত ইতিহাস চতুর্থ ভাগ, ৩। রক্ষাণী স্যারের বোটি J. A. S. B. Vol. I Part I বঙ্গ-পাঠীর।

পালানুজেলার মধ্যে ফোকরা খনি এখন কোথায় তাহা স্থির করা কঠিন হইলেও সে সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যে মতামত তাহা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। গয়া জেলার মধ্যে দেওর রাজ তৈরবচন্দ্র দেব ও ভানুসিংহ দেব, রামগড় রাজ, মালী ডালী ও পাওয়ারইর পূর্ব রাজগণ, সোনপুরা রাজের পূর্ব পুরুষগণ, ছোট নাগপুর কিলার মহারাজা মধু সিংহ প্রভৃতি সামন্তগণ মোগল সম্রাট আকবরকেও রাজস্ব দানে বঞ্চিত করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে ক্রটি করেন নাই। অবশেষে বাদসাহ শুব্বা বেহারের শাসক সাইফা খাঁকে এই সামন্তগণের দমনের জন্য তরুণ দিয়া স্বয়ং মহারাজা মানসিংহকে উদ্ভিষ্ট। বিজয়ের জন্য পাঠাইয়া দিয়া, বিহার ও পালানু হইয়া সারৈস্তা খাঁকে পথে শত্রু দমনে সাহায্য করিয়া লইতে আদেশ প্রদান করিলেন। ছোট নাগপুর দুর্গে এই সময়ে ১৫৭০-৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মধু সিংহ, দেও-উম্মা দুর্গে মহারাজ তৈরবচন্দ্র দেব, পাওয়ারই গড়ে মহারাজ ভানুপ্রতাপ সিংহ, সোনপুরা দুর্গে মহারাজ দধর নাথ সাহী দেব, রামগড় দুর্গে মহারাজ দেবেন্দ্র বিজয় প্রতাপসিংহ দেব প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ গয়া, বাজারিবাগ এবং পালানু জেলার দক্ষিণ অংশ টুকু নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া মোগল শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন রাজ্যের মত শাসন স্বত্ব পরিচালন করিতেছিলেন। সারৈস্তা খাঁ মহারাজ মান সিংহের সহিত সংযোজিত হইয়া প্রথমে পাওয়ারই রাজকে শাসন করিয়া

১৫৮৫ সালে পালানু রাজ মধুসিংহকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহার সহিত আকবরপুর ঘাটের নিয়ে একটি বড় যুদ্ধ হয়, তাহাতে পালানু রাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এই সময়ে উৎকল প্রদেশে সমুদ্র গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার মহারাজ মানসিংহ এই অভিযানের সম্পূর্ণ ভার সুবাদার সারৈস্তা খাঁর হস্তে দিয়া উদ্ভিষ্টার পাঠান বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বর্ধমানাভিমুখে সাসেরামের পথে প্রায়ান করিলেন, সাসেরাম হইয়া তিনি আওরঙ্গাবাদ দিয়া রাণীগঞ্জের সন্নিকট পাকী ইন্দারার মহলে “সৈন্তকুচ্চ” করেন। এই স্থানে “তাম্রপাতার” কথা শুনিয়া দেও-উম্মা রাজ তৈরবচন্দ্রের পুত্র রাজা ভানুসিংহ বহু উপঢৌকন ও স্বর্ণরৌপ্যাদি সহ আসিয়া মহারাজ মানসিংহের অধীনতা স্বীকার করিয়া যোগদান বাদসাহ সাহসসাহ সম্রাট আকবরের বশত্বা স্বীকার করিয়া করদ হন। মহারাজ মানসিংহ তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বাদসাহের নিকট হইতে ফারমান আনাইয়া দেন। এই হইতে দেও রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। এই রাজ্য রাজা হুদায়া সিংহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহা উম্মার প্রভুর কলক হইতে জানিতে পারা যায়। এ সময়ে বিদ্রুত বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। ভানুসিংহ দেব হইতে পঞ্চদশ পুরুষ অবন্তন রাজা জগন্নাথ প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর দেও সিংহাসনে বর্তমান অধিকারী হইতেছেন, ইংরাজ দ্বারা বংশের শাখা সিনোদীয়া পরিবার তুচ্ছ রাজ্য-

পুত হইতেছেন । দেও দমন করিয়া মহারাজ মানসিংহ সেরসাহর “বাদসাহী সড়ক” হইয়া দাখুয়া ডালুয়া অতিক্রম করিয়া ১২ দিনে বর্তমান পহুছিয়া, সেখান হইতে সূতানতি গোবিন্দপুর হইয়া তথাকার মাহিষ্ठा মণ্ডলের পথ প্রদর্শনে \* এক সুদর্শন শ্রেষ্ঠীর কমিশেরিয়েট বন্দোবস্তে হাবড়া জেলার সীমা প্রদেশে গড় মান্দারন জুর্গের সরিকট পাঠান রাজ কতলু খাঁর সহিত তিন দিন তুয়ল যুদ্ধের পর নবাব কতলু খাঁকে নিহত করিয়া উড়িষ্যা দেশ পুনরায় মোগল করায়ত্তে আনয়ন করিয়া রাজ প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

এ দিকে সাইন্তা খাঁ পালায়ুর দিকে অগ্রগর হইয়া বর্তমান লেশলি গঞ্জ ও ছেছারির সরিকট স্থানে বিপক্ষ দলের সহিত যুদ্ধে রত হন, কিন্তু ঐ যুদ্ধে মোগল বাহিনী না গটিলেও নবাব সাইন্তা খাঁ (বিহার সুবার গভর্নর) বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইলে গয়া হইয়া পাটনায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন । তাঁহার পরে নবাব অবরুদ্ধ খাঁ দিল্লীর সম্রাটের ফারমানে বিহারের সুবাদার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন । তিনি ১৮৮৫ সালের শেষ ভাগে পালায়ুর্জগৎ অবরোধ করিলে রাজা মধুসিংহ মোগল রাজের সন্তোষ আঁকার করিয়া করদ হইলেন । তিনি একদল সৈন্ত লইয়া মহারাজ মানসিংহের দখিত উড়িষ্যার বিজোহ দমনে ১৮৯১ সালে জাহাঙ্গীর অধীনে একহাজারি মনসব্দ ন্যাকপে খুৎসাহসের পরিচর দিয়াছিলেন । বাদসাহ

আকবরের ১৬০৫ সালে যুদ্ধের পর, মোগল সম্রাজ্যে কে সম্রাট হইবে ইহা লইয়া দিল্লীতে সামাজ্য গোলযোগ উপস্থিত হইলে গয়া ও পালায়ুর সামন্ত রাজগণ পুনরায় মোগল শক্তিকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে বিশ্বস্ত হয় নাই ।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, বি-এল ।

## গুরুমন্ত্র ।

আজ আমরা বিদেশে—পরবাসে । স্বদেশের মায়া-মমতা ভুলিয়া প্রবাসের মায়া-মোহে মুগ্ধ হইয়াছি । কাম-কান্তার মোহবশে দিশাহারা হইয়া ঘরের পথ বিশ্বস্ত হইয়াছি, ভুলেও একবার সে পথের অনুসন্ধান করি না । মোহমুগ্ধ ঘুড়িলেও—সময়ে সময়ে প্রাণের চমক ভাঙিলেও এখন গৃহে বাইবার ইচ্ছা হইলেও বাইতে পারি না, এমনি ভুল, এমনি ভ্রান্তি, এমনি মোহ, এমনি ক্রান্তি । পৃথিবীর মায়া মোহ, এখনকার কামনা-বাসনা, এখনকার সুখ-সৌন্দর্য্য আমাদিগকে এতই মোহিত করিয়া রাখিয়াছে যে আমাদের বাড়ী বাইবার ভাবনা ভাবিতে দেয় না, এখনকার প্রলোভন মুগ্ধ হইয়া আমরা একেবারে আপন-হারা, ঘরের মায়া-মমতা ছাড়া হইয়াছি ।

পাণ্ডিত্য গৃহ বে আমাদের গৃহ নয়, ইহার সুবৈখর্য্য যে আমাদিগকে চিরদিন সজোবে রাখিতে পারিবে না ; একদিন না একদিন বে ইহার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া ঘরের দিকে ছুটিতে হইবে, তারা আমাদের মধ্যে অনেকেরই

ভাবেন না, ভাগ্য ক্ষমে যদিও কখন সে ভাবনা  
কাহার কাহার মনে উদয় হয়—কিন্তু এমনি  
ভ্রমভ্রান্ত হইয়াছি, দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া  
যরে যাইবার পথ এমন ভাবে আমরা ভুলিয়া  
গিয়াছি, যে তাহার আর কিছুই মনে নাই, ঠিক  
বিদেশীর বেশে নিতান্ত দীন দুঃখীর মত এখানে  
ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছি। আমরা যে অমৃতের  
সন্তান, রাজরাজেশ্বরী যে আমাদের মা, নিত্য  
স্বপ্নপূর্ণ আনন্দধাম যে আমাদের গৃহ, সেখানে  
ধাকিলে যে কোন অভাবই থাকে না, সময়ে  
সময়ে তাহা আমাদের মনে পড়ে কিন্তু উপায়  
ত নাই, যাইবার ত শক্তি নাই, পথ যে একে-  
বারে ভুলিয়া গিয়াছি। কামনা-কাম্তার প্রেমে  
মজিয়া অশান্তি, অধর্ম পুত্রগণের জ্বালাতনে  
ইতোনষ্ট, ততো-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, পদে পদে  
ভুল, পদে পদে ভ্রান্তি আসিয়া আমাদের গকে  
জড়িত করিতেছে, সময়ে চমক ভাকিলেও পথ  
খুজিয়া পাই না—এমনি দিশাহারা হইয়াছি।

ভারত যুদ্ধের সময় হইতে মহারাজ প্রা-  
কৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর অর্থাৎ বংশের  
ধ্বংসাবশেষের সময় হইতে আমাদের এইরূপ  
অধঃপতন হইয়াছে, বিদেশের পথে পথে  
আমরা নিতান্ত দীন দরিদ্রের ছায় ঘুরিয়া  
বেড়াইতেছি। তখন ইচ্ছা করিলেই গৃহান্তি-  
যুখে ফিরিতে পারিতাম, এখন আর তাহা  
পারি না। প্রবাস-প্রেমে আমাদের সর্বনাশ  
কুরিয়াছে—সব ভুলাইয়া দিয়াছে, আমি  
কে, আমার কি ; কোথায় আসিয়াছি, যাইব  
কোথা, কিছুই মনে নাই।

বন্দ্য রাগ ভুলিয়াছি—তখন একজন পথ-

প্রদর্শক ত চাই—নতুবা বন্দ্য রাগে  
যাইবার ত উপায় নাই ? একজন জানাত্মা,  
শক্তি-সামর্থ্য-বান পরিচিত লোক পথ  
দেখাইয়া না দিলে ত যাওয়া যায় না ? কবি  
বলিতেছেন—

“মন চল নিজ নিকেতনে ;

সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে

ভ্রম কেন অকারণে ।

সত্য রথে মন কর আরোহন—

প্রেমের আলোক জালি চল অহঙ্কণ

সঙ্গেতে সখ্য রাখ পূণ্য ধন

যতনে অতি গোপনে ।

সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম,

শ্রান্ত হলে তাহে করিও বিশ্রাম,

পথ ভ্রান্ত হলে শুদ্ধইও পথ

সে পান্থ নিবাসী জনে ।

এই পান্থ নিবাসীজন গুরু রূপে, পথ-  
প্রদর্শকরূপে পান্থ ধামে অহরহঃ বিরাজ করিতে-  
ছেন ; আমরা যেরূপ পথ ভুলিয়া গেলে-  
ইহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার কিসায়া-  
হইবে, ইহারা মহাশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদা  
স্থানের পথ-বাট ইহাদের জানা আছে, কুন্নি  
অসমর্থ অজ্ঞ হইলে—ইহারা তোমাকে নিকের  
শক্তির দ্বারা শক্তিমত্ত করিয়া পথের কথা  
কহিয়া দিবেন, তোমার অবস্থা জানিয়া,  
তোমার শক্তি সামর্থ্য বুঝিয়া এমন একটা মন্ত্রের  
বাবস্থা দিবেন, যাহা তোমাকে সোজা পথ  
লইয়া তোমার গন্তব্য স্থানে, তোমার ইচ্ছিত  
আলয়ে, তোমার চির-পরিচিত গৃহে পৌছাইয়া  
দিবে। অজানা পথে গিয়া আর খুজিয়া



কিরিয়া মরিতে হইবে না। যিনি ঐ শক্তি সম্বিত মন্ত্র দিবেম—তিনি স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ, আর যাঁহা তোমাকে বলিয়া দিবেম—যে মন্ত্রে তোমার প্রবৃত্ত করিবেন—তাহাই গুরুমন্ত্র। গুরু প্রাণ খুলিয়া তোমায় সজীব মন্ত্র প্রদান করিলে ত্রিজন্যে তোমার আর ভাবনা কি ? ভূমি যে খানে ইচ্ছা বাইতে পারিবে, যাঁহা ইচ্ছা করিতে তোমার ক্ষমতার অভাব হইবে না। যে বীজটি তিনি মন্ত্ররূপে তোমার কর্ণে প্রদান করিবেন—তাহাই তোমার ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্র ; গুরু ও ইষ্টদেবতার অভেদভাবে ভাবিতে পারিলেই মনের ইষ্ট প্রাপ্তি অনিবার্য।

পূর্বে ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র মন্ত্র গ্রহণের আবশ্যক ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে কেবল ব্রাহ্মণ-ভ্যক্ত জাতিই দীক্ষিত হইতেন, ব্রাহ্মণের সাবিত্রী দীক্ষাই যথেষ্ট ছিল—অস্ত্র মন্ত্র গ্রহণের তত আবশ্যক হইত না। তারপর কলির প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মণ কথঞ্চিৎ শক্তিহীন হইলে ভগবান সদ্ধর্ষিষ জীবের মঙ্গলের জন্য তাত্ত্বিক দীক্ষার প্রচলন করিয়া মঙ্গলময় নামের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। সেই সময় হইতে ব্রাহ্মণ ও অজ্ঞাত জাতির দীক্ষা বিনা কোন কার্য রূপস্বরূপ হয় না, এমন কি অদীক্ষিত নর-নারীর হস্তের জল শুদ্ধ নহে। অদীক্ষিত অবস্থায় হস্ত হইলে যৌরব মরকে বাইতে হয়।

সে দিন হইতে শক্তি কব হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, বেদিন হইতে অধর্ম-অশান্তি, পুত্র ক্ষোভে কান কাড়ার বশীভূত হইয়া আমরা প্রায়সবাসী হইয়াছি, যেরূপে বাইবার ইচ্ছা, যেরূপে

বাইবার পথ ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতে সর্বমঙ্গলময় দেবাদিদেব আমাদের উদ্ধারের জন্য নূতন পন্থার আবিষ্কার করিয়া পুত্র বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতকে ধস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে এই সদ্ধর্ষিষ প্রদর্শিত তাত্ত্বিক যতে গুরুকরণ, দীক্ষাগ্রহণ আপামর সাধারণ সকলেরই কর্তব্য।

সত্যযুগে বেদবিহিত, ত্রেতাযুগে স্মৃতির মতে এবং দ্বাপরযুগে পুরাণের বিধিমতে কার্য্য করিতে হইত। এইজন্য তখন ব্রাহ্মণগণকে সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলেই যথেষ্ট হইত—স্বতন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবার আবশ্যক হইত না, কলিতে সে শক্তি ক্ষয় হওয়ায়—শূত্র যজ্ঞাদির দ্বারা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায়, বৈদিক কার্য্য কার্য্যকরী হয় না, এইজন্য তদ্রমতে দীক্ষাগ্রহণ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার।

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক সময় না এক সময় মুক্ত হইবে, তবে সে কতকাল পরে, কত মনস্তরের অন্তরে; কত প্রলয়ের প্রলয়ে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। আমরা যেমন কর্ম্ম ও যেমন চিন্তা করিতেছি, তেমনি দেহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার ফলভোগ করিতেছি। গত জন্মে যাঁহা করিয়াছি, এক্ষণে তাহা ভোগ করিতেছি, এজন্মে যাঁহা করিব, পরজন্মে তাহা ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফলে আমরা উচ্চগতি লাভ করিতে পারি—আবার অধোগতিও লাভ হওয়া সম্ভব—সকলেই আমাদের ইচ্ছাকৃত। স্মৃতির জীব যাত্রাই সংসারের অধীন কিন্তু মাহুদ সংসারের অধীন হইলেও প্রজাবল্লভ আপন

ইচ্ছার চলিতে পারে। সেই ইচ্ছাশক্তিকে সংগে চালিত করিবার জন্য এখন আমরা অপারক বলিয়া কোন শক্তিমান ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক, যখন আমরা এই সাহায্য প্রাপ্ত হই—তখনই আত্মার উচ্চতর শক্তি ও অব্যক্ত ভাবগুলি কুটিয়া উঠে। আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হয়, ব্রহ্মিত গতিতে উহার ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া সাধক গুরু স্বভাব ও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

আত্মার এই শক্তি সঞ্চার এই ক্রমোন্নত অবস্থা কেবল বই পড়িয়া কিবা দর্শন-বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব খাটিয়া সঞ্চয় করা যায় না। লেখা-পড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইতে পারা যায়—সুসজ্জা জানী হইয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা যায় কিন্তু আত্মার উন্নতি করিতে হইলে অপর আত্মার সাহায্য আবশ্যক। যাহার সাহায্যে এইরূপ উন্নতি, এইরূপ শক্তি লাভ হয়—তিনি গুরু আর যিনি সাহায্য লাভ করেন—তিনি শিষ্যপদবাচ্য। গুরু আধ্যাত্মিক বলে সম্পন্ন না হইলে শিষ্যের আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইবার উপায় নাই। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। অভাবে ক্ষত্রিয় গুরু, বৈশ্য ও শূত্রের মন্ত্রদাতা হইতে পারেন, বৈশ্য গুরু শূত্রের মন্ত্রদাতা হইতে পারেন, শূত্র গুরু সজাতীয় শূত্রের গুরু হইতে পারেন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি গুরু হইতে পারে না।

নিজ নিজ কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণই কর্তব্য—কারণ তাহারা পুরুষাঙ্কুরে কার্য করিয়া শিষ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব যতদূর অবগত হইয়াছেন—ততদূর নূতন গুরু কখনই জানিতে

পারেন না। এইজন্য কুলগুরু কখনই পরিভ্রাজ্য নহে। তবে মন্ত্র গ্রহণ আত্মার উন্নতির জন্য—সমাজে বাহবা লইবার জন্য নহে। গুরু উন্নার্গগামী, ব্যাধিগ্রস্ত হইলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য নাই। এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—সদৃশক নিরীচন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

নিজ নিজ কুলমন্ত্র কুলগুরুর নিকট গ্রহণ করিতে হয়। অহমিকার বশবর্তী হইয়া মন্ত্রাস্তর গ্রহণ করিলে অধোগতি, এমন কি জীবন নাশের সম্ভাবনা। বিষ্ণুমন্ত্র বাহ্যিক কুলমন্ত্র তিনি বৈষ্ণব কুলগুরুর নিকট উহা গ্রহণ করিবেন। যিনি শৈব তিনি শিবমন্ত্র; যিনি শাক্ত তিনি শাক্তগুরুর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন। গুরু যে মন্ত্রে দীক্ষিত, শিষ্যও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন। কেবল শাক্তগুরু সকল প্রকার শিষ্যকে দীক্ষিত করিতে পারেন।

ঋতি স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্রজ্ঞ আৰ্য্য ঋষিগণও উত্তর কালের জন্য হিন্দুর সাধনোপায় বিধানের জন্য এইরূপ বিধি নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। এক সময় আৰ্য্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে চরমোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহারা আধ্যাত্ম রাজ্যের অধীশ্বররূপে তুর্যোদর্শন দ্বারা দীক্ষা সঞ্চয় যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—তাহার বর্নস্তোত্র করা পান্থবধর্মী মানবের সাধ্য নয়। কাম্য আত্মার প্রজ্ঞাচক্ষু বা বোনের নয়ন নাই, কর্তব্যভিত্তি আমাদের ঋতুভেদে আবরণে আবৃত—কাজেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের স্পষ্টতর আনন্দ কেমন করিয়া

অবগত হইব ? তাঁহারা সাধন বলে, যোগবলে  
ক্রিয়াবলে, ভূয়োদর্শনের ফলে বাহ্য করিয়া  
গিয়াছেন—তাহা অন্যথা হইবার নহে।  
বাহ্য সাধনার সিদ্ধ হইতে চাহেন—তাঁহারা  
তাঁহাদের প্রদর্শিত দীক্ষা প্রণালী অনুসারে  
সাধনা করিয়া ধন্য হউন।

পূর্ব সংস্কারের বশবর্তী হইয়া মানব ধরা-  
তলে জন্মগ্রহণ করে। সেই সংস্কার উৎকৃষ্টত্বের  
ফলস্রাবের জন্য তাহাকে যেতকালে, যেই  
তিমিতে, যে ক্ষেত্রে, যে লগ্নে জন্মগ্রহণ  
করায় ঠিক সেই সকলের শুভাশুভ গণনা  
করিয়া এবং তাহার নিকট যে দেবতা,  
যে মন্ত্র অঙ্গুল—যে দেবতার যে মন্ত্রের  
সহিত তাহার প্রাণের মিলন হইতে পারে,  
বিচক্ষণ গুরু সেইরূপ রাশিচক্র, অক্ষরচক্র  
ঐক্যের দ্বারা গণনা স্থির করিয়া মন্ত্র প্রদান  
করিলে শিষ্টির নিশ্চয়ই শুভ ফল লাভ হইবে,  
সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মন্ত্র চৈতন্য করিতে  
পরিবে, মান্য প্রকার সিদ্ধি ভূষিত হইয়া  
ইষ্ট-দর্শনে মানবজন্ম সার্থক করিতে পারিবে।

আমাদের সমস্ত গিয়াছে কিন্তু এখন যদি  
আমরা প্রগাঢ় বিশ্বাসভরে গুরুকে সাক্ষাৎ  
ঈশ্বর ভাবিয়া তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ মন্ত্র  
গ্রহণ করিতে পারি, যদি এক্ষণ দীক্ষায় দীক্ষিত  
হইয়া আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারি, তাহা  
হইলে আমাদের জীবনের পথ মুক্ত করিতে  
আর হতাশ হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে  
হইব না। তত্ত্ববিরি বরষণে হৃদয়ক্ষেত্র  
উজ্জ্বল করিয়া, বিমুক্তাচ্ছা ঈশ্বররূপী গুরু কৃপকের  
নিকট নিজ নিজ ইষ্টবীজ বপন করিয়া লইলে

সরস ক্ষেত্রে বীজ আপনি অঙ্কুরিত হইবে।  
ইষ্টবীজ জপ করিতে পারিলে, বিশ্বাসের  
সহিত মন্ত্রার্থ ধারণা করিয়া জপ করিতে শিখিলে  
সিদ্ধিলাভের আর ভাবনা কি ? জপের সংখ্যা  
ক্রমশঃ বাড়াইয়া প্রাণের আকাজক্ষা পূর্ণ কর।  
৮।১০।১০৮।১০০৮ সংখ্যা নির্দিষ্ট ; উদয়ান্ত বা  
উদয়োদয় জপ করিয়া হোম, তর্পণ, অভিষেক  
ও ত্রাঙ্কণ ভোজন করাইয়া পঞ্চাঙ্গ পুরস্চরণ  
সমাপ্ত কর। সাধক, তোমার মঙ্গল হইবে—  
তুমি ইহকালেই অনন্ত সুখলাভ করিয়া অস্তে  
পরম গতি লাভ করিবে। জীবনহীন শরীর  
যেমন কোন কাগাক্ষম নহে, পুরস্চরণহীন মন্ত্রও  
তজ্জপ সিদ্ধি প্রদানে অক্ষম। অতএব জপ-  
সিদ্ধির জন্য পুরস্চরণ বিশেষ আবশ্যক।

“জপাৎসিদ্ধি” সাধনার মূলমন্ত্র। মন্ত্র জপে  
যত একথা একচিত্ত হইতে পারা যায়—এত  
আর কিছুতেই নহে। “গুরু কৃপাহি কেবল”  
গুরু কৃপায় আমরা এই সিদ্ধিলাভ করিয়া  
পুনরায় শক্তিশালী হইব, আমাদের চির পরি-  
চিত গৃহের পথ জানিয়া, আবার মা মা বরে  
মাতৃকোড়ে আশ্রয় লইতে সক্ষম হইব। স্মৃতি  
আবার জাগিয়া উঠিবে, বিশ্বাসিত বিশ্বস্ত হইয়া  
আবার জাতিময় মহাপুরুষরূপে ভারতের  
ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া দেবদেবিত দেশকে  
আবার দেবতার আবাস ভূমে পরিণত করিতে  
সক্ষম হইব।

সম্পাদক।

## সাধ না মিটিল

কি পাইলে প্রাণের পিপাসা মিটে, বালা-  
কাল হইতে তাহা খুঁজিতেছি, কিন্তু কই  
পিপাসাত মিটিল না। এতকাল ধরিয়া  
জীবনের কত স্তর উল্লঙ্ঘন করিলাম, কিন্তু কই  
সাধত পুরিল না। দিনের পর দিন গেল,  
বৎসরের পর নূতন বৎসর অতীতের অনন্ত  
ক্রোড়ে মিশিয়া পড়িল, কিন্তু আমার বাসনাত  
পুরিল না। শৈশবের সাধ, বাল্যকালের সাধ,  
যৌবনের সাধ সকল সাধই মিটাইবার চেষ্টা  
করিয়াছি, কিন্তু হয়! প্রাণের শূন্যতা মিটিল  
কই? বাল্যকালের পঠদশার কোমলতার সঙ্গে  
যৌবনের কুটিল কঠোরতার তরঙ্গ-ভঞ্জে জীবন  
কত বিচিত্র রেখার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিল,  
কিন্তু হয়! হৃদয় শান্ত হইল কৈ? নিমন্ত্রণে  
ভরপুর ভোজন করিয়া পেটুক ব্যক্তি যেমন  
আসন হইতে উঠিয়া তৃপ্তোহসি বলিয়া যে  
ভাবে আনন্দের ধারায় মগ্ন হয়, সে তৃপ্তির  
কণিচামাত্রও এ জীবনে যদি পাওয়া যাইত,  
তবে ত এ জীবনের সাধকতা আছে বলিয়া  
মনে হইত। তাস খেলায় বসিয়া খেলার  
মদিরায় উন্মত্ত পুরুষ পঞ্জা, ছকা ধরিয়া অপর  
পক্ষকে হারাইয়া যে উল্লাসের লহরী-লীলায়  
নাচিয়া উঠে, সেই ভাবের আনন্দের কিঞ্চি-  
ত্মাত্রও যদি পাওয়া যাইত, সেই ভ্রান্তিময়  
আনন্দের রেখামাত্রও যদি জীবনের দর্পণে  
প্রতিফলিত হইত, তাহা হইলে স্বীকার করি-  
তাম, মহত্ত্ব জীবন পাইয়া একটা মোটা  
রকমের গৌরব করিয়া ফেলিয়াছি। সেরূপ

লাভ মনে করা ত ঘুরের কথা, মহত্ত্ব-জীবন  
প্রাপ্তিটা যে বিষম লোকসানের মধ্যে, ইহাই  
আমার দিন দিন ধারণা হইতেছে। এমন  
লোকসান আর নাই, এমন ক্ষতি আর নাই,  
এই চিন্তাই আমাকে চিরদিন ব্যাকুল  
করিতেছে।

এত লেখা-পড়া শিখিয়াই কি বুদ্ধির গোল-  
যোগ বটিল, তাহা ত বুদ্ধি না। নচেৎ সংসারের  
সুখময় অমৃতত্ব করিতে পাই না কেন?  
রসগোষ্ঠা খাইতেছি, অথচ তাহার মিষ্টতা,  
তাহার সুস্বাদ কিছই পাইতেছি না, এ কিরূপ  
বিচিত্র জীবন, পাঠক! তাহা ভাবিয়া দেখুন!  
যে সংসার কত ললিত-ললম হইয়া সংসার-  
সেবকের চক্রে প্রতিভাত হয়, যাহার উন্মাদিনী  
মদিরায় মত্ত হইয়া মাতুষ জীবন-সংগ্রামে  
অবিরত ধাবিত হইতেছে, তাহার মোহন মূর্তি  
ছুই ছুই করিয়া, কতবার দৌড়াইয়া যাই,  
কিন্তু হয়! সে অপূর্ণ চন্দ্রমা আমার নিকট  
হইতে ক্রমশই সরিয়া দাঁড়ায়, তাহার ছায়াও  
স্পর্শ করিতে পারি না, এমন বিড়ম্বনা আর  
আছে কি? তগবান্ সংসার-সেবার উপকরণ  
—সমস্তই প্রচুর পরিমাণে আমাকে দিয়াছেন,  
সকলেই সেই সমস্ত উপকরণ পাইয়া  
যেমন তন্ময় হইয়া তদেকাগ্র-চেষ্টে তাহার  
রস আশ্বাদ করে, সেরূপ স্বাদিকাবৃত্তি আমাতে  
নাই কেন? কেহ বা বিদ্বান্ হইলেই মনে  
করে, আমার কামনা-পুরিয়া গেল, কেহ বা  
ধনী হইলেই মনে করে, প্রাণের-আশা মিটিল,  
কেহ বা সুন্দরী যুবতী জীর ভালবাসা পাইলেই  
জীবন কৃতার্থ হইয়া গেল—মনে করে; কেহ

বা সামাজিক, কেহ বা রাজ-নৈতিক, কেহ বা আবিষ্কারক হইলেই সকল সাধ মিটিগ এইরূপ ভাবে। কোন না কোন ভাব লইয়া জীবনের একটা গন্তী ঠাকিয়া লোকে সেই সীমার মধ্যে বলিয়া জীবন যথ বলিয়া মনে করে, কিন্তু হয়! এইরূপ একটা ভাব লইয়া এ পতিত দক্ষ-জীব জুড়াইবার অধিকারী নহে কেন, এ মরুময় জীবনে ঐ একটা লক্ষ্য-স্থিরতাময় তৃপ্তির অমৃত-নির্কারী প্রবাহিত হয় না কেন? প্রকৃতির নিয়মে সকলেই যে স্রপের অধিকারী, প্রকৃতির দাস আমি, আমাতে তাহার অভাব হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

লোকে যখন বলে, “আমি পাগল নহি,” তখন আমি নিজে “আমি পাগল হইয়াছি” এরূপ সিদ্ধান্ত করি কিরূপে? আমি যদি পাগল নহি, তবে সাধারণ লোকের চিন্তার সহিত আমার চিন্তা মিলে না কেন? সংসারের ভোগ স্বখ-ইন্দ্রিয় স্বখ, সাধারণ লোকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, আমি তেমনটি দেখিতে পাই না কেন? তোমার জিহ্বায় চিনির মিষ্টতা যদি অনুভব হইয়া থাকে, তবে অগ্নের জিহ্বাতে ত তাহাই হইবে, অগ্নের জিহ্বাতে চিনি তিক্ত বলিয়া ও পরিগণিত হইবে না। যদি হয় তবে বুঝিতে হইবে, জিহ্বায় কোন রোগ জন্মিয়া জিহ্বার বাদিকা শক্তি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ তুমি সংসারকে যে চক্ষে দেখিয়া থাক, অগ্নে যদি সে চক্ষে না দেখিয়া অন্তরূপে দেখিয়া থাকে, তবে কি সে ব্যক্তির অমুভূতি-শক্তি বিকৃতি-ভাপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে? তুমি আস-

ক্তির চক্ষে—মমতামাখা দৃষ্টিতে এই পুত্র পরি-বারপূর্ণ সংসারকে যে চক্ষে দেখিয়া থাক, অগ্নে যদি অন্তরূপে দেখিয়া থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে—বুঝিতে হইবে? এই-রূপ একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বিলাতে একজন বণিক দশ হাজার টাকা মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করেন। তিনি ঐ মূলধন খাটাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জীবনে সঞ্চয় করিয়া যুহার পূর্বকালে এক লক্ষ টাকা নিজের একমাত্র পুত্রের নামে উইল করিলেন। বাকী উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থ দানের উইল করিলেন। পুত্র যুযুপিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতৃ-দেব! আমি আপনার একমাত্র পুত্র, আমাকে মোটে এক লক্ষ টাকা দান করিলেন, আর বাকী উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা অগ্নের জন্ত দান করিয়া গেলেন, এ কিরূপ বিচার হইল? আমি কি তবে আপনার পুত্র নহি? পিতা উত্তর করিলেন—তুমি আমার প্রকৃত পুত্র বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিলাম। আমার পিতৃদেব আমার জন্ত দশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়া-ছিলেন, আমি তাহা খাটাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জীবনে উপার্জন করিয়াছি, সে হিসাবে আমি তোমাকে যে এক লক্ষ টাকা দিয়া গেলাম, তাহা খাটাইয়া জীবনে পঞ্চাশ কোড় টাকা তোমার রোজগার করা উচিত। কেন না তুমি যে আমার প্রকৃত পুত্র। অতএব দেখ! তোমাকে বেশী ভালবাসি বলিয়াই দশ হাজার না রাখিয়া এক লক্ষ টাকা রাখিয়া গেলাম। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাখিলে তুমি

বাবু হইয়া উড়াইয়া দিতে, তাহা অপেক্ষা পাঁচ জন দীন-দুঃখী প্রতিপালিত হয়, সে আমার পক্ষে স্বর্গ, এই বলিতে বলিতে মুমূর্ষু বণিক প্রাণত্যাগ করিলেন। উদ্ভুক্ত পুত্রও পিতার সেই উত্তর শুনিয়া অসম্বল হইলেন না, পিতার যথার্থীতি সংকারান্তে ব্যবসায় মন দিলেন।

তুমি আমি পুত্র পরিবারকে ভালবাসিয়া আসক্তির টানে যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকি, বিলাতী বণিক্ তে সরূপ চক্ষে দেখিলেন না। তবে কি ঐ বিলাতী বণিক্ আমাদের চক্ষে পাগল? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা বড় কঠিন। সংসারের এক একটি চিত্র সম্মুখে থুলিয়া থুলিয়া ধরিলে কে পাগল, তাহা স্থির করা বড় শরু হইয়া পড়ে। কলিকাতার একজন ধনী দাক্তি জীবনে অনেক টাকা রোজগার করেন। জীবিতাবস্থাতেই তিনি সেই সমস্ত টাকা পুত্র-কন্যা-পরিবারের হস্তগত করিয়া দিয়াছিলেন। যখন তাঁহার শেষ অবস্থা উপস্থিত হইল, যখন তিনি অক্ষম হইয়া পড়িলেন, তখন সেই বার্কাক্য অবস্থায় শয্যায় পতিত হইয়া তাঁহাকে ক্রমাগত কিছুদিন রোগ ভুগিতে হইল। সেই শয্যা-শায়ী বৃদ্ধের সেবা করিবার জন্য পুত্র কন্যাগণ প্রথম প্রথম বন্ধ করিল বটে, কিন্তু শেষে সকলেই অদৃশ্য হইল। বৃদ্ধ যে গৃহে শুইয়া থাকিতেন, সে গৃহে কেহ পদার্পণও করিত না। এ অবস্থায় সেবা অভাবে বৃদ্ধের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এক দিন তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। বন্ধুকে বৃদ্ধ সকল কথা থুলিয়া বলিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন—দেখ বন্ধু! এমন কোন উপায়

বলিয়া দাও, যাহাতে পুত্র কন্যাগণ আমার এ অবস্থায় একবার দেখে। বিজ্ঞ বন্ধু তখন এক উপায় স্থির করিয়া কতকগুলি টাকা বৃদ্ধের হাতে দিয়া কতকগুলি বথো তাঁহার কানে কানে বলিয়া গেলেন, বৃদ্ধ সেই টাকাপূর্ব বাক্সটি দিবা রাত্রি নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন, যখনই তাঁহার ঘরের কাছে কোন পদশব্দ শুনিতে পান, অমনই বৃদ্ধ বাক্স লইয়া সজোরে নাড়িতে চাড়িতে থাকেন, সেই মাড়া চাড়ার দরুণ টাকার শব্দ তাঁহার পুত্র কন্যাদের কানে গেল। তখন কন্যা বৃদ্ধের গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, তাই ত বাবা! তোমাকে কেহ দেখে না, সেবা অভাবে তোমার বড়ই কষ্ট হইতেছে, আর কেত না দেখুক, আমি আজ হইতে তোমার সেবা বিশেষরূপে করিব। বৃদ্ধ বলিলেন,—দেখ মা! এই বাক্সস্থিত সমস্ত টাকাই তোমাকে দিয়া যাইব, তুমি আমার এই শেষ দশায় বেশ করিয়া সেবা কর, এই কথা শুনিয়া কন্যা দৃষ্টমনে পিতৃ-সেবায় বিলক্ষণরূপে মনোযোগ দিলেন। তারপর পুত্র আসিলে নিষ্কণে বৃদ্ধ তাঁহাকেও ঐরূপ বুঝাইলেন। জ্যৈষ্ঠ ও বাড়ীর অজ্ঞাত আত্মীয় পরিবারবর্গকেও বৃদ্ধ বেশ করিয়া ঐরূপ বুঝাইয়া দিলেন। তখন বাড়ীতে বৃদ্ধের সেবার ধূম পড়িয়া গেল। বাড়ীর প্রত্যেক লোকে সকল কাজ ফেলিয়া বৃদ্ধের সেবার জন্য তৎপর হইল। শেষ দিন বন্ধু যখন পুনরায় উপস্থিত হইলেন, তখন বৃদ্ধ বঙ্কটিকে বলিলেন, প্রিয়তম বন্ধু! এই তোমার চাচি লও, বাক্স থুলিয়া তোমার টাকাগুলি হইয়া যাক। তোমার

পরামর্শে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন বন্ধু আশীর্বাদ কর, শীঘ্রই যেন এ সংসার ছাড়িতে পারি ! এতদিনে বুঝিয়া লইলাম এ সংসার কি ? জানিয়া লইলাম এ সংসার নাট্য-শালায় কি বিচিত্র ব্যাপার ! আর বেশী কথা কি বলিব ? বন্ধু টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন । যোগে বৃদ্ধের যখন দেহান্ত হইয়া গেল, তখন জ্ঞানপুত্র সকলেই তাড়াতাড়ি বাস্তব চাবি খুঁজিতে লাগিল, চাবি না পাইয়া বাস্তব ভাঙ্গিয়া ফেলিল, দেখিল বাস্তব ভিতর টাকার পরি-বর্তে কতকগুলি ইষ্টক খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে । তখন সকলেরই চমক ভাঙ্গিল, বুঝিল ব্যাপারটা কি ?

এই ত তোমার সংসার ! বন্ধু পাগল, না তাঁহার বন্ধু পাগল, না, পুত্র কন্ডাগণ পাগল ? বলিয়া দাও পাগল কে, সেয়ানাই বা কে, আর চতুরই বা কে ? সংসারে এই চিত্র বিরল নহে । যেরে যেরে এই চিত্র অন্তঃসংলীলা ফন্ড নদীর মত বিরাগ করিতেছে । এই চিত্রের অবগুণ্ঠন যদি উন্মোচন করিতে যাই, তাহা হইলে কি ইহা তোমার অপ্রিয় হইবে ? যদি অপ্রিয় না হয়, যদি তুমি ইহার জন্য আমাকে পাগল না বল তবে আরও চিত্র দেখাইব কি ? সংসা-রের আবরণ উন্মোচন করিয়া সংসারকে ভালবাসিতে যদি চেষ্টা করা যায়, তবে সে চেষ্টা কতদূর কলবতী হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না সুতরাং আবরণ উন্মোচন না করাই ভাল । আসক্তির বোর নেশা যতক্ষণ না ছুটিয়া যায়, ততক্ষণই সংসার সুমিষ্ট লাগে । মাতালের নব্বয় নেশা ছুটিয়া গেলেই বোর কষ্ট উপস্থিত

হয় । নেশাটি যতক্ষণ—ততক্ষণই প্রাণটা স্ফুর্তিবৃত্ত থাকে, কত আমোদের ফোয়ারা নেশার সময় খুলিয়া যায়, কত অজ্ঞাত সুখের দীপপুঞ্জ মাতালের প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিতে থাকে । সুতরাং যদি সুখ উপভোগ করিতে চাও, তবে নেশাটি জাগাইয়া রাখা প্রয়োজন । নেশা ছুটিলেই ত বোর বিপদ । যদি এইরূপ নেশার ভিতর দিয়াই সংসারের সুখ পাইতে হয়, তবে সে সুখে আমার প্রাণের বাসনা মিটিল কৈ ? আমার মর্শ্বতলে যে অভাব-রেখা জাগিতেছে, নেশার সুখে সে অভাব মিটিবে কিরূপে ? তাই ত অহর্নিশ অতৃপ্তির অনলে হৃদয় জ্বলিতেছে, তাই ত আমার অন্তর হইতেও অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন সদাই বলিতেছে—“সাধ মিটিল না ।”

সংসারের ভোগ সুখেও ত সাধ মিটিল না, সুরসাল সুস্বাদু দ্রব্য ভোজনে আমার রসনার সাধ মিটিল বটে, কিন্তু তাহাতে “আমার” সাধ মিটিল কৈ ? “আমি” ও “রসনা” ত এক জিনিষ নহি । নিজাবব্ধায় বা তজ্জাবব্ধায় রসনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না হইলেও “আমি” ত তখন বিদ্যমান থাকি । সুতরাং রসনা হইতে “আমি” যখন বিভিন্ন পদার্থ, তখন রসনার সুখকে আমি “আপনার জিনিষ” বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিব না ? ইন্দ্রিয়সুখকে আমি নিজের সুখ ভাবিতে পারি কৈ ? কেন না ইন্দ্রিয় হইতে আমি যে বিভিন্ন পদার্থ । ইন্দ্রিয় ও আমি-বদি এক জিনিষ হই-তাম, তাহা হইলে চক্ষুরিঞ্জিয় নষ্ট হইলে—অন্ধ হইলে “আমি মরিয়াছি” এইরূপ অসুতব হইত,

তাহা যখন হয় না, তখন চক্ষুরিজিয়াদি হইতে “আমি” যে স্বতন্ত্র জিনিষ, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। “আমি” শরীর বা ইঞ্জিরাদি হইতে যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু, সে বিষয়ে আরও যুক্তি আছে। শরীর বা ইঞ্জির পরিণামী পদার্থ। অর্থাৎ ইহাদের সর্বদা পরিবর্তন হইয়া থাকে। শরীর কখন মোটা, কখন ক্লশ হয়, চক্ষু কখন ভাল থাকে, কখনও বা কানা হইয়া যায়। যদি “আমি” এই শরীর বা ইঞ্জির হইতে বিভিন্ন পদার্থ হইতাম, অর্থাৎ এক জিনিষ হইতাম, তাহা হইলে এই “আমিরও” কখন না কখন কোনরূপ পরিবর্তন হইত। শরীরের ক্লশ অবস্থা পরিবর্তনের জায়, চক্ষুরিজিয়ার অন্ধতা অবস্থা পরিবর্তনের নায় “আমিরও” ঐরূপ একটা অবস্থা পরিবর্তন হইত, কিন্তু তাহা ত হয় না। “আমিরও” সৰ্বদে অবস্থা পরিবর্তন কাহারও অমুভব হয় না। “আমি আছি কিনা”, অথবা “আমি নাই” ইত্যাকারও কি অমুভব হইয়া থাকে? “আমিরও” জ্ঞান সর্বদা একই রকমে দেদীপ্যমান থাকে। সুতরাং এই অপরিবর্তনশীল “আমি” পরিবর্তনশীল শরীর বা ইঞ্জির হইতে যে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং এই ইঞ্জিরাদির সাধ বাহাতে মিটে, “আমার” সাধ তাহাতে মিটিবে কেন? “আমার সাধ বাহাতে মিটে তাহার উপায় কেহ কি বলিতে পার?

ইঞ্জিরের সাধ মিটিয়াছে। শরীরের সাধ মিটিয়াছে, কিন্তু “আমার” সাধ মিটিল না। বালাকালে বিজ্ঞা উপার্জন করিয়াছি, যৌবনে অর্থ উপার্জন করিতেছি, সংসারের ভোগ-

বাসনা যথাসক্তি মিটাইতেছি, কিন্তু আমার সাধ পুরিল কৈ? হৃৎখীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বালাকালে মনে করিতাম, বিজ্ঞা উপার্জন করিয়া অর্থ উপার্জনে লক্ষ্য হইলেই সকল কষ্ট দূর হইবে। বিজ্ঞা ও উপার্জন করিলাম, বিজ্ঞার সুখ্যাতিও পাইলাম, আবার যৌবনে অর্থরোজগার করিয়াও ইঞ্জিরের বোড়শোপ-চারে পূজা করিলাম, মান, যশ, পাণ্ডিত্য, অর্থ, কথঞ্চিৎ নিজের চেঁচায় সকলই পাইলাম, সংসারের উপকরণ সামগ্রী সকলই আরজ করিলাম। কিন্তু যাহা পাইলে আমার প্রাণ পরিভূত হয়, তাহা ত পাইলাম না। ইঞ্জিরের সেবা করিয়া যাইতে পারিলেই এ জীবনের সমস্ত সাধ মিটিয়া গেল, এইরূপ চিন্তা লইয়াই যদি যুগে কাল কাটাইতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমি ধন্য হইতাম। কিন্তু শাস্ত্র পড়িয়া চিন্তা যে বড় হইয়া গিয়াছে। হৃৎখীর সন্তান বড়লোকের সংসর্গে থাকিলে তাহার মেজাজ যেমন বিগড়াইয়া যায়, সেইরূপ উচ্চ চিন্তাপূর্ণ শাস্ত্রের সংসর্গে থাকিয়া চিন্তা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। চিন্তা বড় হইলে কি হইবে, সামান্য যে নিতান্তই ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র সামর্থ্যের ভিতরে উচ্চ চিন্তার সমাবেশ হইলে সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? তাই বলিতেছি,—এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন এ জগতে আর নাই।

সাঙ্খ্যের প্রকৃতিবাদ পড়িয়াছি। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছি। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের প্রাণায়ামের ব্যাপারও দেখিয়াছি। আবার স্মৃতিশাস্ত্রের কর্মকাণ্ড



আলোচনা করিয়াছি। তত্ত্বের সিদ্ধি-সাধনার কথাও বিচার করিয়াছি, হিন্দুধর্মের এতগুলি পথ সমুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত আলোড়ন করিয়া বিগত কয়েক বর্ষ হইতে বিশেষ চিন্তা করিয়া জীবনের সন্ধিস্থলে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চাই।

বর্তমান কলিযুগে ইঞ্জিয়-পরায়ণ মানবের পক্ষে শঙ্করাচার্যের মত বৈদান্তিক জ্ঞানী হওয়া বড়ই শক্ত কথা। শঙ্করাচার্যের বেদান্তদর্শন বর্তমানকালের উপযোগী নহে। শঙ্করের বেদান্তে ভক্তির সম্পর্ক যাত্রা নাই। আবার স্মৃতিশাস্ত্রের কর্মকাণ্ডও সকলের পক্ষে উপযোগী নহে। কেমনা সেজন্য কর্মসম্বন্ধে নিষ্ঠাবান হওয়া অসম্ভব। পক্ষে অসম্ভব। এই পাশ্চাত্য সভ্যতা-দীপ্ত যুগে কীণ-শক্তি হিন্দুর পক্ষে কর্মী হইয়া ধর্মসাধন করা নিতাই অসম্ভব। আবার বিবাহিত গৃহস্থের পক্ষে যোগসাধনা বা প্রাণায়ামাদি সম্পূর্ণ-রূপে অবিহিত। গৃহস্থ প্রাণায়াম করিলে নিশ্চয়ই উৎকট রোগে আক্রান্ত হইবেন। আবার তাত্ত্বিক হইতে গেলে ব্যাভিচার দোষে লিপ্ত হইবেন। সুতরাং কর্মী, যোগী, জ্ঞানী, বা তাত্ত্বিক হওয়া বর্তমানকালীন হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব। রামানুজাচার্যের দর্শন-শাস্ত্র পড়িলে জ্ঞানীভক্তের সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শঙ্করাচার্যের মত নীরস বৈদান্তিক নহেন। তিনি ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই উভয়েরই অভিন্নভাবে উপাসক। তিনি বিশিষ্টাট্মভাববাদী। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই সম্মিলিত

যুগলমুষ্টির উপাসক। তিনি বৈদান্তিক অথচ ভক্ত, তিনি জ্ঞানী, অথচ ভোগী। জ্ঞান ও ভক্তির সুন্দর সামঞ্জস্য তাঁহার দর্শনে যেমন আছে, এমন আর কোথাও নাই।

ধর্মরাজ্যে যদি সাধ মিটাইতে হয়, তবে জ্ঞানী ভক্তের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত কর। জ্ঞানের ক্ষটিক নির্মল পাত্রে যদি ভক্তির কুটুস্ত কুল সংগ্রহ করিতে পার, তবে তাহার মত সাধের জিনিষ জগতে আর নাই। যে জ্ঞান ভক্তিকে বিদূরিত করে, আমি সে জ্ঞান চাহি না, আবার যে ভক্তি জ্ঞানের সম্পর্কে থাকিতে চাহে না, আমি সে ভক্তিরও ভিখারি নহি। শঙ্করাচার্য একমাত্র ব্রহ্মেরই উপাসক। প্রকৃতিকে তিনি অকিঞ্চিৎকর বলেন। ব্রহ্ম ছাড়া তাঁহার মতে সমস্তই অলীক। রামানুজাচার্য বলেন—ব্রহ্ম ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি আদি কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং প্রকৃতি ও ব্রহ্ম উভয়ই উপাসনার লক্ষ্য।

দ্বৈতজ্ঞানী আমরা, ব্রহ্ম ও প্রকৃতি অর্থাৎ পিতা ও মাতা এই উভয়েরই চরণে শরণ চাই। যে পিতা-মাতার স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধাবৃত্তি অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই ভক্তি শ্রদ্ধা কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহাদের চরণে সমর্পণ করা আমাদের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, যেমন সহজসাধ্য, তেমন আর কিছুই নহে। ঈশ্বরকে পিতৃ শক্তি বা মাতৃ শক্তির ভিতর দিয়া উপাসনা করা সাধকের পক্ষে সহজ সিদ্ধ সাধনা। যে ভাব আমাদের মর্মগত, ধর্মরাজ্যে তাহারই পরিণতি

আমাদের সহজ উপায়। শঙ্করাচার্য্যও এই সহজ ভাবের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি নিজরচিত বেদান্তশাস্ত্রে ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ বিপাকে পড়িয়া সেই ভক্তিকে আবার আশ্রয় করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় তিনি যখন জ্ঞান স্বরূপ মহাদেবের উপাসনা জগৎ বিষপত্র সঞ্চয় করিতে যান, তখন বিধ-কটকে বিদ্ধ হইয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জগৎ ভক্তিপূর্ব্বক তিনি মহাশক্তি স্বরূপিনী ভগবতী মূল প্রকৃতির স্তব করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মপ্রাজ্ঞা ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই মিলিত মূর্ত্তির ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনাই প্রকৃত ব্যবস্থা।

যাহা পাইলে এ জীবন চরিতার্থ হয়, সেই ভক্তির নিমল সুখা ভক্ত নতিলে কে বৃষ্টিতে পারে? কেবল ইঞ্জিয় সুখে মত্ত হইয়া আমরা ভক্তির আশ্বাদে বঞ্চিত থাকিতে চাই, এ কি কম নিড়ব্বনা। চীনদেশে যদি আমাদের জন্ম হইত, তবে না হয় মনকে প্রবেদ দিতে পারিতাম। যে দেশে ভগবদ্ ভক্তির স্রোত বহিয়া গিয়াছে, মাতৃ-পিতৃ চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া যাহাদের গোড়ার শিক্ষা, সেই দেশে ভগবদ্ভক্তি শিখাইবার জগৎ যদি স্থূল প্রস্তুত হয়, তবে কি ছুঁড়াগোর কথা নহে? ইঞ্জিয়-সুখ পশুরাও তা ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে আর নুতন কি আছে? বিষয়-সুখের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির তৃপ্তি যদি অসম্ভব করিতে পারি, তবেই তা মানব-জীবন সার্থক হইল। বাহার কুপার এমন

ছুপ্ত মানব জন্ম, এমন সুখের ভোগারতন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, একবিন্দু কৃতজ্ঞতার অশ্রুবারি তাঁহার চরণে যদি ঢালিতে প্ররুত্তি না হয়, দিনান্তে তাঁহার নাম লইতেও যদি সাবকাশ না পাই, তাহা হইলে আমাদের জন্ম হতভাগ্য আর কে আছে? কত সময় হাই তুলিয়া, বাজে কথা কহিয়া, পরনিন্দা করিয়া কাটাইয়া দিই, অন্ততঃ সেই সময়টা না হয় একবার ভগবানের নাম লইতে তোমার আপত্তি কি? যদি পরকাল থাকে, ঈশ্বর থাকেন, তোমার সে পরিশ্রম তা পার্শ্ব যাইবে না। আর ঈশ্বর যদি নাই থাকেন, তবে বৃথা সময় কাটান অপেক্ষা ভগবানের নাম লইয়া সময় কাটান ভাল নয় কি? একজন দার্শনিক বলিয়াছেন, আমরা যখন নিদ্রা যাই, তখনই জগতের উপকার করি, অর্থাৎ মানুষ এতই হিংস্র জন্ত যে জাগিয়া থাকিলেই পয়ের কোন না কোনরূপে অনিষ্ট চিন্তা করিবে। সুতরাং আমাদের নিদ্রাকালটাই জগতের পক্ষে শাস্তদায়ক। সে হিসাবে ঈশ্বর চিন্তাশ্রাব্যদেশে মানব! তোমার অজ্ঞানত্ব পাকাও তা জগতের পক্ষে মঙ্গলকর।

যাহা পাইলে এ হৃদয় জুড়াইয়া যায়, সাধক! তাহা বলিয়া দাও! সংসারকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিব না। সংসারের লোক আমার প্রাণের জালা বৃষ্টিতে পারে না। আমি যাহা চাই, পৃথিবীর সেবক যারা, তারা তাহা মিটাইতে পারে না। আমার মর্শ্বতলে যে তুচ্ছ জাগিতেছে, পৃথিবীর ময়লা মাটি-মাথা জল সে তুচ্ছ দূর করিতে পারে না। আমি বাহার জগৎ পালারিত, তাহার সন্ধান কে

আনিয়া দিবে? এ সংসার-মরুভূমে হৃদয়  
 যাহার জন্ত চির পিপাসু হইয়া রহিয়াছে, কি  
 জানি কোন্ পথে গেলে তাহা পাইব? যাহা  
 পাইলে আর আমার কিছু চাহিবার থাকে না,  
 আমি তাহারই ভিখারি। সে গুপ্তধামের  
 বার্তা ভক্ত সাধক ভিন্ন কেহ বলিতে পারে না।  
 জগতের নিকট আমার কিছু চাহিবার জিনিষ  
 নাই। জগতে যে জিনিষ পাই, তাহা  
 পাইয়াও আকাঙ্ক্ষা ত মিটিয়া আসে না। যে  
 জিনিষ পাইলে আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্ত  
 মিটিয়া যায়, যদি তাহাই না পাইলাম, তবে এ  
 জীবনে করিলাম কি? এ সংসার-নাট্যশালায়  
 হাঁসিলাম, নাচিলাম, গাহিলাম, কিন্তু যাহা  
 পাইবার জন্ত আসিয়াছিলাম—তাহা পাইলাম  
 কৈ? যে সাধ মিটাইতে আসিয়াছিলাম—তাহা  
 মিটিল কৈ? সেইজন্ত আমার হৃদয়ের কেন্দ্র-  
 স্থল হইতে কে যেন সদাই ধ্বনি করিতেছে,  
 “আমার সাধ মিটিল না, আমার প্রাণের  
 বাসনা পূরিল না।”

## বিকৃত ।

### প্রাণের গাথা ।

( ভৈরবী )

কোথা শিব-সৌমন্তিনী !

কি হবে দীনের গতি বলে দে জননী

অকূলে অকূল তারা,

দুকূল হয়েছি হারা,

অকূলেতে দে মা কূল,

ওমা কূল-কুণ্ডলিনী ।

বিলাস-বিতবে বিভোর প্রাণ,

রক্তরসে দিন বুথা অবসান,

আরাম-শয়নে, বিরাম ধোয়ানে

অশনে, বসনে মত্ত নিত্য নিস্তারিণী।

কামনা সতত কামিনী কাঞ্চে,—

এ ভাব অভাব হবে কত দিনে ?

ভাবময়ী-ভাব—সে ভাব বিহনে

ভবের এ ভাব যাবে না ভবানি !

ভব-ভাব-বোর কবে হবে ভোর,

সে ভাবে বিভোর হব ভব-রাণী ?

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, বি-এস সি,

### কণা ।

সমগ্র ভুবনে সৃষ্টি বিতরে কিরণ—

চন্দ্র তারা উদ্ভাসিত আলোকে তাহার

কণারাম লাভে পূর্ণ কমল জীবন

পবিত্রতা সৌন্দর্যের সুন্দর আধার।

প্রাবৃটে জলদল ঢালি বারিধারা

উত্তপ্ত ধরণী বক্ষ করিছে শীতল।

চাতক মাগিছে জল সদা শান্তিহারা

বিন্দু বারি লাভে তার জীবন সফল ;

হে নাথ ! অনন্ত তুমি মহিমা তোমার

হীন বুদ্ধ মানবের চিন্তার অভীত

কত দানে দি'ছ ভরি শূণ্য প্রাণ তার

এক এক করি নিত্য গণিবে সে কত ?

অমর আশ্রয় ক্ষুদ্র এ জীবন মম

বস্ত্র হবে লভে তব এক কণা প্রেম।

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী ।

## আমিত্ব ।

ব্রহ্মাণ্ড তোমারি নাথ ! তুমিই সকল হরি,  
জলে জলবিশ্বসম মোরা হেথা বাঁচি মরি ।  
সকল তোমারি নাথ ! তুমি দেব বিশ্বময়,  
তোমারি রচিত বিশ্ব গায় সদা তব জয় ।  
সুখমা আধার তুমি—তুমি হে সুন্দরতম,  
তব রূপ-কণা পেয়ে এ দেহ সুন্দর যম ।  
তোমারি হে কীৰ্ত্তি যশঃ ঐশ্বৰ্য্যের অভিমান,  
নিন্দা-ঘৃণা সবি তব তোমারি হে অপমান ।  
সফলতা বিফলতা ক্রুতিত্ব মাধুর্য্য তব,  
যত্নী তুমি যত্ন মোরা বৃথা করি কলরব ।  
আকুলি-ব্যাকুলি তব তোমারি হে হাহাকার,  
তব স্নেহ-ভালবাসা তোমারি হে অত্যাচার ।  
তোমারি নয়নে হরি ! তোমারি এ অশ্রুজল,  
হাসি-কান্না সবি তব, মোরা ভাবি কক্ষফল ।  
কত যে দিয়েছ তুমি কিরি নিছ আরবার,  
সাম্বনা অভয় বাণী সবি তব উপহার ।  
সুখ শান্তি শ্রীতি হরি ! তোমারি স্নেহের দান,  
শোক-দুঃখ-বাথা সবি তোমারি হে অভিমান ।  
দীনতা ক্রীণতা আর অপূৰ্ণ অমূল্য নিধি,  
সকলি তোমারি প্রভু ! তুমিই দিয়েছ বিধি ।  
কাচ-বিরচিত গেহ আমার আমিত্ব হরি,  
দয়া করি ফেল নাথ ! পদাঘাতে চূর্ণ করি ।  
দূর হোক সুখ-দুঃখ মায়া-মোহ ক্ষুদ্র জ্ঞান,  
বিশ্বময় বিশ্বেশ্বর ! তুমি, করি তব দান ।  
কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ষ কবিরত্ন ।

## কাহার ?

কাহারি সে গান শুধু গাহিতে শিখিয়া  
পুলকিত করে আমার হিয়া ।  
কাহারি মহিমা বৃথাতে আমারে  
ব্রজের সে লীলা দিল জানাইয়া ॥  
কাহারি চরণ চুম্বিতে ছোটো সাক্ষ্য সমীরণ  
শিহরি শিহরি উঠে এ পরাণ ।  
কাহারি ভরে, হুয়ে আছি পড়ে চাহিনা বাইতে  
পরশিতে সে চরণ মহান্ ॥

কাহারি মরণ শাস্তি, যধু আলাপনে  
পুলকিতে মোরে আগিগে উঠে ।  
কাহারি অলস কাদনি কাতরতা প্রাণে  
শোভিছে (প্রভু) হৃদয়-বধূনা-ভটে ॥  
কাহারি সে বাঁশির স্বর দূর হ'তে আসি  
আধ ভাঙ্গা স্মৃতি লয়ে যায় দূরে ।  
(তখন) কাহারি ভরে হুয়ে উদ্মনা, উদাস পরাণ  
ভীত আঁধারে ভাবে কাহারে অদূরে ?  
শ্রীবলাইলাল মুন্সী ।

## স্বপনে ।

যবে প্রভাতের পিক গায় নাই গীত,  
পাতার আড়ালে বসিয়ে,  
যবে বন উপবনে ফোটেনিক ফুল  
প্রভাত আবেগে ভরিয়ে,  
যবে কাননের কোলে সেই-মধু-বোলে ;  
ধরেনিক' পাপিয়া তান,  
যবে ফুলের রেণুটী মাখিয়া লম্বর ;  
হয় আশ্রয়ান ।  
যবে কুসুমের কুসুমে জড়িয়ে প্রণয়  
ধূমায়ে ছিল'লো লুটিয়ে  
তুমি সেই বেলা প্রিয়ে, দেখা দিয়ে মোরে  
বলেছ কতই বুঝিয়ে !  
তুমি কতই আশায় ভাবায় হৃদিরে  
করেছিলে যে অর্ধাদান ;  
ওগো, বিধি বিড়ম্বনায় প্রভাতে সে ত  
হয়ে গেল আবার স্নান ।  
শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস ।

## ধূলির সঙ্গ ।

একদিন ওহে ধূলি ! অবোধে তোমায়—  
দলিয়া করেছি নত চরণ তলায় ,  
সুজনের পাদস্পর্শ করিয়াছ বলি'  
শিরস্ লুটায়ে আলি শিরে লই তুলি ।  
শ্রীব্রজচন্দ্র নাথ ।

## সুখান্বেষণে ।

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

এতদিন যিনি আমার শুধু আদরের মিষ্ট-মধু পান করাইয়া আসিতেছিলেন, আজ তিনিই আমার তিরস্কারের তিক্ত রস পান করাইলেন। ইতিপূর্বে কখনও আমি তাহা পান করি নাই, তাই আজ তাহার কটু আখাদন আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া সমস্ত গ্রন্থিলিকে যেন শিথিল করিয়া ফেলিল। ঘরের যে দিকে চাহিতে লাগিলাম, সেই দিকেই যেন সেই ভৎসনা তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; চতুঃপার্শ্ব হইতে সেই নীরব আচারগুলি যেন আমাকে তীক্ষ্ণভাবে বিক্রপ করিয়া বলিতে লাগিল,—“কেমন, আর পিতৃ-আদরের অহংকার কর্কে? এখন ত তুমি ভীষণপুত্র হতে বসলে।” বলিতে পারি না, লহসা আমার মর্ম্মস্থলে কি যেন এক অবাস্তব বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, উঃ! সত্য সত্যই ত পিতা আমাকে ত্যাগ কর্কেন বলেছেন। আমি তাঁর কে?—ছেলে। আর নির্মলা?—সে ত কেউ নয়; কিন্তু সে কি না আজ তাঁর সকল আদরের আদরিনী! আর আমি কি না আজ তাঁর সকল লাজনার পাত্র। নির্মলা কাল অতুল ঐশ্ব্যের অধিকারিণী হ’বে। আর আমি কাল পথে পথে কাকালের মত ঘুরে বেড়াব। বেশ তাই হোক। তবে আর আমার এখানে থাকবার কি অধিকার আছে? না, এই যুহুর্ভেই আমি চলে যাব। দেখিতে দেখিতে ঘরখানি যেন অশান্তির অমল-নিখাসে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

আমি আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না। ছুটিয়া ঘরের বাহির হইলাম, অন্দরমহল, বহির্বাটী ত্যাগ করিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। কোথায় বাইব? আমার মত হতভাগ্যের স্থান কোথা আছে? ভাবিতে ভাবিতে নন্দন-কাননের দিকে ছুটিলাম।

( ৮ )

নন্দন-কাননে উপস্থিত হইবামাত্র আচার্য্য বিমলানন্দ প্রমুখ সচিববৃন্দ সসম্মান অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে সেই রাজাসনের উপর বসাই-লেম। দীর্ঘকাল আমি সেই আসন গ্রহণ করিতে অসমর্থ ছিলাম বলিয়া তাঁহারা অনেক হুঃখ করিতে লাগিলেন এবং আবার যে আমি সেই আসন পুনরায় গ্রহণ করিয়াছি, সেইজন্য তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এইরূপ হর্ষ-বিষাদের অভিনয় শেষ হইলে, আমি আমার সমস্ত কথা আত্মপূর্ব্বিক তাহাদের নিকট বলিয়া দ্বিজ্ঞাসা করিলাম—এ অবস্থায় আমার পুনরায় বাড়ী যাওয়া উচিত কি না? তাহাতে সকলেই সম্মত্রে উত্তর করিল—না, কখনই না। তখন আমি মনে মনে নন্দন-কাননের উদ্দেশে বলিতে লাগিলাম—নন্দন-কানন! আমার বড় সাধের নন্দন-কানন! দীর্ঘকালের পর আবার তোমার অঙ্গে ফিরে এলুম। হৃদয় বড় উত্তপ্ত, তোমার ঐ স্নেহের কোরারা খুলে দাও, আমি তার সহস্র ধারার নীচে একবার বসি। আমি বড় হতাশ—তোমার ঐ আদরের স্মৃতিতে বাহ প্রসারণ কর, আমি ক্রুর তার মাঝে মিছেকে জড়িয়ে ধরি। আমি যে তোমারই—তুমি যে আমারই।

আর বাটীতে ফিরিলাম না। নন্দন-কান-  
নেই থাকিতে লাগিলাম। যেদিন বাটী হইতে  
চলিয়া আসি, সেইদিন সন্ধ্যার সময় রমাকাকা  
একবার আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।  
মনে করিয়াছিলাম—বুঝি আমাকে বাটী লইয়া  
বাইবার জন্য পিতা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।  
কিন্তু যখন শুনিলাম যে, নন্দন-কাননে আসার  
পর হইতে পিতা আমার নাম পর্য্যন্ত মুখে  
আনেন নাই, তখন বুঝিলাম—পিতা সেই দিনই  
আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। রমাকাকাও  
যেন সেইরূপ কি একটা কথা আমায় ঈর্ষিতে  
বলিলেন। তবে তিনি এটুকুও বলিলেন যে,  
পিতার পরিত্যাজ্য হইলেও আমি রমাকাকার  
পরিত্যাজ্য নহি। ইহাতে রমাকাকার উপর  
আমার ভক্তির ভাব অনেকটা বাড়িল বটে  
কিন্তু পিতার উপর ভক্তিভাব সমূলে নষ্ট হইয়া  
গেল। আর নির্মলা? তার উপর দারুণ  
ঘৃণার ভাব আসিয়া পড়িল। কারণ সেই ত  
এই সব অনর্থের মূল। আমার পদাঘাতে  
পীড়িতা হইয়া সে যে কেমন আছে—এ কথা  
জানিবার ইচ্ছাও আমার মনে আদৌ হইল না।

একদিন, দুই দিন, তিন দিন—ক্রমশঃ তিন  
মাস অতীত হইয়া গেল। রমাকাকাও আর  
আসেন না। বাটীর কোনও সংবাদ আর  
পাই না। সে জন্য দুর্ভাবনা আমার মনের  
প্রাণীমানার প্রবেশ করিতে পারে না। তখন  
যে আমার সেবকগণ দিবানিশি আমার মনকে  
ষোড়শোপচারে ইঞ্জির সুখের ভোগ দিতেছে,  
সে সময় কি সে মন অসুখকর কোনও চিন্তা  
গ্রহণ করিতে পারে?

একদিন অপরাহ্নে মুক্ত বাতায়নপথে বসিয়া  
আছি। পাপ পার্শ্চর্যগণ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা-  
বশতঃ সকলেই অসুপস্থিত। জানি না কোন  
পুণ্য যুহুর্থে কোন দেবতার আশীর্ব্বাদে কেমন  
যেন এক নূতন বায়ুর তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া  
মৃদুভাবে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল—সহসা  
চিস্তের দীর্ঘ ব্যাপী উদ্দাম উদ্গাদ চাক্ষুষ ধীরে  
ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল—হৃদয় কেমন যেন এক  
নূতন বিষাদ রাগিনীতে ঝঞ্ঝা করিয়া উঠিল  
—সহসা কোন এক সুদূর প্রদেশ হইতে যেন  
কাহার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম।  
একি! এ কার ক্রন্দন রোল! কোন যুযুর্ধ্ব  
কাতর ধ্বনি! আমি চকিত নয়নে গবাক্ষের  
ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম,—  
দেখিলাম, সুন্দর পশ্চিম গগনের এক প্রান্তে  
প্রকাণ্ড তেজঃপুঞ্জ প্রচণ্ড মার্ব্বও—সমস্ত দিবস  
সমরাজনে মাতিবার পর এখন হতবীৰ্য্য হইয়া  
ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িতেছে; ভাবিলাম,  
ও ত সূর্য্য নয়, ও যে আমার প্রতিকৃতি! আজ  
আমি আমার জীবনের প্রথম আলোক-যৌগেন  
তেজে তেজিয়ান হ'য়ে সংসারের সংগ্রাম-  
ভূমিতে বীরের মত মেতে চলেছি, কিন্তু যখন  
মরণ নিশার কাল ছায়া জীবন সন্ধ্যার দেখা  
দিবে, তখন যে ঠিক এই সূর্য্যের মত সকল তেজ  
হারিয়ে ফেলে আমাকেও এক অজাত দেশের  
বুকে ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়তে হ'বে।'

এইরূপ সহসা এক অহেতুকী আত্ম-চিন্তা  
আসিয়া আমাকে বিভোর করিয়া ফেলিয়াছে,  
এমন সময় পিতার বহুদিনের কৃত্য—তোলা  
ছুটিয়া আসিয়া আমার পদতলে পড়িয়া কাঁদিত

লাগিল আমি সবিস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে তোলা দাদা ?

সে মাথা চাপড়াইয়া বলিল—“সর্বনাশ হতে ব’সেছে দাদাবাবু, আর কি হয়েছে ! কর্তা বাবু আর বোধ হয় বাঁচেন না।”

এই কথা শুনিবামাত্রই আমার মনের মাকে পূর্বের জোশ ও অভিমান পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল, বলিলাম—তাতে আমার কি ? তিনি আমার কে ? আমি তাঁর ত্যাক্যপুত্র ! তখন তোলা গলদশ্রুণয়নে রাগ ভরে বলিতে লাগিল—“সে কি ! একদিনের একটি ছোট কথায় তোমার বাপের ভত মায়া, তত স্নেহ একবারে ভুলে গেলে ! তাঁর মরণে তোমার কিছু নয় ! তিনি তোমার কে ! বলি, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কে তোমায় প্রাণ দিয়ে লালন-পালন ক’রেছিল ? তাঁর স্নেহের যদি একটুকু অভাব, হ’ত দাদাবাবু ! তা হ’লে তুমি কি আজ আমার সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলতে পার্ভে ?”

বুড় ভোলার এই কথা কয়টির মধ্যে কোথের আঘরণে এরূপ একটি শিঙ ভাব ছিল যে তাহার দ্বারা আমার উদ্ভত হৃদয় একটু বিনত হইল। আমি তখন অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলাম,—সে বাই হোক, এখন ত আমি তাঁর আর স্নেহের পাত্র নই—এখন আমি তাঁর বিষমুষ্টি। তাঁর যা কিছু স্নেহ, সমস্তা নির্মলাই সব নিয়ে ফেলেছে, তা না হ’লে, তুমিই বল দেখি তোলাদাদা, আমি আজ এতদিন এখানে এসেছি, কই, একদিনও ত তিনি আমার খোঁজে একটা লোক ও পাঠান নি ?

তোলা বিস্মিত-লোচনে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ‘সে কি ! বিমলবাবু কি তোমায় একদিনও কোন কথাই বলেন নি ?’

আঃ। কই না।

ভোঃ।—এ কি রকম হ’ল ! তুমি যে দিন বাড়ী থেকে চ’লে এলে, সেদিন থেকে রোজ রোজ তিনি তোমার খোঁজে বিমলবাবুর কাছে লোক পাঠিয়েছেন, তুমি যাতে বাড়ী যাও—সেজ্ঞ তাঁকে কত ক’রে ব’লে পাঠিয়েছেন। বিমলবাবু তার উত্তরে বলেছেন যে, তুমি তাঁর কথার একান্ত অবাধ্য—কিছুতেই বাড়ী বাবে না। এ সব কথা কি তুমি আদৌ জান না ?

আঃ।—না।

ভোলাদাদা তখন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—ভাই, আমি তোমায় অনেক দিন ধ’রে কোলে পিঠে ক’রে মানুষ করেছি। এ সময় একবার এ বুকের কথা শোন। তুমি ছেলে মানুষ, আপনার খেয়ালে আপনি ছুটে চলেছ, তাই দেখতে পাচ্ছনা কি ব্যাপার ঘটেছে। আমি নিশ্চয়ই বলছি, হুঠেরা কি একটা হুরভিসন্ধি ক’রে বাপ-ছেলের মাঝে যে একটা মায়ার বাধন আছে—সেটাকে কাটতে চায়। ভাই ! আর ছেলে মানুষি ক’রো না—একবার ভাব ; ঘুমিয়ে না থেকে একবার চেয়ে দেখ। না—না—আর ভাববার ও সময় নেই, দেখবার ও সময় নেই। চল—তোমার বাপের কাছে ছুটে চল। আর দেবী করে ঐ রাগ, ঐ অভিমান নিয়েই থাকতে হবে। তোমার সঙ্গে ভেবে ভেবেই—তোমার বাপের রোগ হ’য়েছে—সেই

রোগেই আজ তাঁর মৃত্যুর দিন নিয়ে এসেছে।  
বোধ হয় একবার তোমাকেই দেখবার জন্য  
তিনি অপেক্ষা ক'রছেন। চল, ভাই, এবার  
শেষ দেখা কর্কে চল, এ জন্মের মত তাঁর কাছে  
যত দোষ ক'রছ, তার ক্ষমা চাইবে চল—চির-  
দিনের মত তাঁর চরণে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে  
তাঁর সেই আশীর্বাদ মাথায় নেবে চল। এক  
বার চ'লে গেলে আর ফিরাতে পার্কে না।  
একটা অমৃতাপ শেষে তোমার সারাজীবনটিকে  
পোড়াতে থাকবে। হায়! হায়! বাপ-মায়ের  
মত সামগ্রী কি আর এ জগতে কিছু আছে রে  
ভাই!' ভোলাদাদা আর বলিতে পারিল না  
—বাপুরুদ্ধকণ্ঠে ধামিয়া গেল। তখন আমার  
চমক ভাঙিল।

আমি যেন এতক্ষণ অজ্ঞান, অচেতন, অচল  
একখানি প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়াইয়াছিলাম।  
হৃদয়ের মধ্যে দাবানলপ্রায় কেমন যেন একটা  
অশুশোচনায় আগুন নিরাশ্বাস-ঝটিকার সহিত  
যাতিয়া শিরা-নিচয়কে আরণ্যপাদপের তায়  
পুড়াইতেছিল। এতক্ষণ নয়নের কোণে এক  
বিন্দুও জল ছিল না। এইবার জল দেখা  
দিল—ক্রমে ক্রমে উথলিয়া উঠিয়া বৃষ্টি-ধারার  
মত পড়িতে লাগিল।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—  
ছুটিলাম। যতই ছুটিতে থাকি ততই প্রতি  
পদ-বিক্ষেপে মনে হইতে থাকে, ঐ—ঐ—বুঝি  
নির্ম্মলার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা যায়। হায়! হায়!  
ঐ বুঝি সকলই ফুরায়ে গেল! অমনি আরও  
ক্রতবেগে ছুটিতে থাকি। হায়! আজ কত-  
দিন পরে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য,

শেষ আশীর্বাদ যাচ'রার জন্য পিতার নিকটে  
ছুটিয়া চলিলাম।

পিতার কক্ষ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম  
তাঁহার সেই কাস্তিময় দেহ অস্তিম-শয্যায়  
অর্জুণায়িত। নির্ম্মলা তাঁহার সেই চূর্ণল  
মস্তকখানি নিজ অঙ্গের উপর রাখিয়া সজল  
নয়নে কাতর দৃষ্টিতে বিশ্বনিরন্তর করুণা  
ভিক্ষা করিতেছে। অহো! সে কি অপূর্ণ  
দৃষ্ট! কালশ্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমি  
আজ কতদূর চলিয়া আসিয়াছি কিন্তু আজও ত  
আমার মানস-দপণে সেই চিত্র তেমনি প্রতি-  
ফলিত।

আমি নির্ম্মলক নিম্নকৃতভাবে যুহুর্ন্তকাল ঐ  
চিত্র দেখিলাম, তারপর হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে  
কেমন যেন একটা আবেগ-ভরঙ্গ উচ্ছ্বসিত  
হইয়া গর্জন করিয়া উঠিল—আমি কম্পিত  
দেহে পিতার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলাম।

তিনি তখন তাঁহার সেই রোগাক্রান্ত কণ্ঠে  
একবার ডাকিলেন,—“নয়নানন্দ! বহুদিন পরে  
পূর্কেরই মত সেই আত্মান শুনিয়া আমার  
চিত্তবেদনা যেন দ্বিগুণতর বর্ধিত হইয়া কণ্ঠ-  
রোধ করিল। আমি উত্তর দিতে পারিলাম  
না। পিতা বোধ হয় ইহা বুঝিতে পারিয়াই  
অশ্রুটন্তরে সান্থনার স্বরে বলিতে লাগিলেন—  
'তুমি আর মনোকষ্ট বহন ক'রো না। তোমার  
আমি মার্জন করিয়া। আশীর্বাদ করি তোমার  
যেন আর কখনও কুপথে যতি না যায়।  
নির্ম্মলাকে আর কখনও ভাঙিয়া ক'রো না।  
তার উপদেশ নিয়ে কার্য্য ক'রো। তারপর  
কি বলিলেন আর বুঝিতে পারিলাম না।



তখন আমি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম যে অত্যন্ত দিনমণি মুক্ত গবাক পথে প্রবেশ করিয়া স্বীয় দ্বিধা, শাস্ত ক্রিয়ণ-সলিলে যেন পিতাকে স্নান করাইতেছে—তিনি অর্জুনিমী-লিত নয়নে যেন তাঁহার কোন অভীষ্ট দেবতার আরাধনায় নিমগ্ন। আমি ভয়চিন্তে ঐ ধ্যান-চিন্তা দেখিতে লাগিলাম। সহসা নির্মলা ও ভোলাদাদার ক্রন্দন-রোল আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমার তখন চমক ভাঙ্গিল। বুঝিলাম পিতা আর ইহধামে নাই।—তিনি তাঁহার সেই অভীষ্ট দেবতার সন্নিধানে বোধ হয় কোন এক সুদূর সুন্দর অমর-নিবাসে চলিয়া গিয়াছেন।

( ২ )

“যে মুহূর্ত্তে বুঝিলাম পিতা এ জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই মনে হইল বুঝি এত দিন পরে আজ সহসা একটা প্রকাণ্ড শিলা-খণ্ড আমার মাথার উপর হইতে ঝরিয়া গেল আর সুগপৎ এক ধারণাতীত অতি বিস্তৃত মহাশূন্য মুখব্যাধান করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। আমি স্প্রাংবিষ্টের মত ভীতি-বিহ্বল চিন্তে ছই চক্ষু বুজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম—‘আমার আর কে আছে ? কে আমার বাঁচাবে ?’

অন্তর্দর্শিনী নির্মলা যেন আমার সেই গভীর হৃদয়-বেদনা জানিতে পারিয়াই ত্র্যস্তে আমার কাছে আসিয়া তাহার স্বতাব-স্বলভ শাস্ত বয়ে বলিল—‘ভয় কি, রমাকাকা আছে।’

হায়! আশা! তুমি প্রভাবশালী হইলেও শাস্তিদায়িনী। নির্মলার এ কথায় আমার

নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। সেই আশা শাস্তিময় কর প্রসারণ করিয়া আমার ক্ষুব্ধ চিত্তকে প্রশমিত করিল। আমি ভাবি-লাম ‘বাঁচবিকই ত, আমার রমা কাকা আছে।’

আমি তখন ভোলা দাদাকে বলিলাম, ‘ভোলা দাদা, একবার তুমি রমা কাকাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস। এ সময় তাঁকে একবার দেখতে পেলেও আমার মনে অনেক বল পাবে।’

ভোলা অঙ্গ সংবরণ করিয়া বলিল, ‘দাদা বাবু, আমি শু আজ সকাল থেকে তাঁকে এখানে দেখতে পাইনি।’

বলিতে পারি না কেন ভোলার এ কথা-গুলি শুনিবামাত্র মনে এক ঘোর সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্কোচ্চারিতভাবে আপনার মনে বলিয়া উঠিলাম, ‘তাইত কেন বল দেখি?’

সে ‘কেন’র উত্তরের প্রতীক্ষায় বেশী ক্ষণ থাকিতে হইল না। আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই রমা কাকার তৃত্য সিদ্ধ বয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে একটা সেলাম করিয়া দাড়াইল। আমি উৎকণ্ঠিতচিন্তে তাহাকে রমা কাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাইতেছি, এমন সময় সে একখানি পত্র আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পত্রের উপরি-ভাগে রমা কাকার হস্তাক্ষর দেখিয়া আমার অনুরাগী হৃদয় কঁপিয়া গেল। হা! ভগবান! আমার অদৃষ্টে আরও দুঃখ আছে না কি।

তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগি-লাম। যাহা পড়িলাম তাহাতে আমি যেন

হঠাৎ যত্না-যত্না অল্পভব করিলাম। উঃ এ  
যে গুপ্ত ছুরিকাখাত অপেক্ষাও নিদারুণ !  
মানব-হৃদয়ে এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা !  
এ যে অনন্তুভবনীয়, অবিশ্বাসনীয়, অচিন্ত্যনীয় !

আমি ক্রোধে, দ্বেষে, হত্যাশে মুহমান  
হইয়া নির্মলাকে বলিতে লাগিলাম, কি দেখেছ  
নির্মলা ! আমি যা বলব তা তুমি বিশ্বাস কও  
পারবে ? পিতৃ-অগ্নে প্রতাপালিত - যে রমা  
কাকা, তিনি আজ পিতার যত্নের অব্যবহিত  
পরেই কি লিখেছেন জান ? লিখেছেন যে  
রাজেশ্বর দ্বারা জমিদারী আর দেনার দ্বারা  
বাস্তুভিটাটা নীলাম হ'য়ে গেছে, আর ক্রেতা  
হচ্ছেন তিনি স্বয়ং। তবে যদি ইচ্ছে করি  
তাহলে কিছুদিন আমরা এবাড়ীতে থাকিতে  
পারি। সর্বস্বাপহারক বিশ্বাসঘাতকের  
প্রসাদভোজী হ'য়ে আজ নিজের বাড়ীতে দীন  
অতিথির মত থাকতে হবে ! উঃ এ যে অসহ-  
নীয় ! হা ! ভগবান ! এ সময় যদি তুমি  
আমার যত্না-ভিক্ষা দিতে তাহ'লে তোমার  
দয়াদান নামের সার্থকতা হ'ত ! আমি মাথায়  
হাত দিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলাম।

নির্মলা স্থির স্বরে বলিল, 'স্থির হও। দৈর্ঘ্য  
ধর। তুমি পুরুষ মানুষ ; বিপদের সময় দৈর্ঘ্য  
হারান কি তোমার উচিত ?'

- আমি নির্মলার মুখের দিকে শোকার্তের  
মত কাতর-বৃত্তিতে চাহিয়া বলিলাম—'এতকালে  
আমি সত্যসত্যই পিতৃহীন হ'লাম। এইবার  
বল দেখি, এখন আমার কে আছে।'

নির্মলা দৃঢ়স্বরে বলিল,—'আমি আছি।'  
তোলাদায়া আরও দৃঢ়স্বরে বলিল, 'আমি আছি।'

আর পরক্ষণেই ঠিক যেন আমার মাথার  
উপর হইতে আরও দৃঢ়স্বরে একটা উক্তর  
আসিল, 'আর আমি আছি।'

আমরা সকলেই চমকিত হইয়া চাহিয়া  
দেখিলাম, সম্মুখে এক দীর্ঘ কলেবর লটাজুটধর  
সন্ন্যাসী। সর্বনাশ ! নিমিষের মধ্যে আমার  
হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত কে যেন শোষণ করিল !  
এ যে সেই সন্ন্যাসী ! আমি কাঁপিতে কাঁপিতে  
উঠেঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম, 'এ সব তোমার  
অভিশাপ, সন্ন্যাসী ! তুমি সরে যাও।'

'এ সব আমার আশীর্বাদ। আমি সরে  
যাচ্ছি বটে কিন্তু আমি আবার আসব।'  
জলদগন্তীরস্বরে সন্ন্যাসী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত  
হইলেন। আমি ভয় হৃদয়ে নির্মলাকে  
বলিতে লাগিলাম,—'নির্মলা, আমি এ  
সন্ন্যাসীকে বিশেষরূপে চিনি। এ আমার শত্রু।  
নিশ্চয়ই আমার আবার কোন নূতন বিপদ  
আসছে।

নির্মলা অবচলিতচিত্তে বলিতে লাগিল,  
'আমুক নূতন বিপদ, তাতে ভয় কি ? তাঁর  
সঙ্গে বিবাদ করুন না, বরং তাহাকে বরণ করে  
মাথায় তুলে নেব। আজ যে স্নেহের সিংহা-  
সনে ব'সে আছি, কাল সেই সিংহাসন একটা  
দম্ভক বাতাসের ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে দ্বেষের  
অগাধ সমুদ্রে ডুবে যাবে, এত জানা কথা।  
এত জগতের রীতি। এত জগদীশ্বরের  
নিয়ম। এত মঙ্গলময়ের মঙ্গলোচ্ছা। সে  
রীতি সে নিয়ম, সে ইচ্ছা পালন করুন এত  
খুব আনন্দের কথা। এতে আর কট্টই বা  
কি আর ভয়ই বা কি।'

আমি হিরমেত্রে নির্মলার ঐ কথাগুলি ভুলেছিলাম আর ভাবতেছিলাম, 'নির্মলা! তোমার মধ্যে এত জ্ঞান, এত শক্তি, এত বৈধা। এত আমি পূর্বে বুঝতে পারি-নি।'

নির্মলা চুপ করিলে আমি তাহাকে বলিলাম, 'নির্মলা, তোমার উপদেশ নিয়ে কার্য্য করবার জন্য পিতা আমাকে আদেশ ক'রে গেছেন। অতএব তুমিই এখন আমার একমাত্র উপদেষ্টা। তবে বল, নির্মলা, এখন আমার কর্তব্য কি?'

নির্মলা। তোমাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যদি দয়া করে আমার কথা শোন তাহ'লে চল আজ ঐ মহা আশ্রানে স্বত্তরের পবিত্র শবদেহের সঙ্গে আমাদের এতদিনের সুখ-দুঃখের পুঞ্জীভূত স্মৃতিরাশি ভস্মীভূত ক'রে অন্তর চ'লে যাই। কাল প্রভাতে তপনদেব যখন নূতন রাগে পূর্ব গগনে দেখা দিবেন, তখন আমরা নূতন প্রাণে নূতন দেশে নূতন লোকের মত পথ পর্যাটন করিতে থাকিব। এত বড় পৃথিবী, এতে কি আমাদের মত দীন আশ্রয়শীনের স্থান নেই? নিশ্চয়ই আছে। তা না হ'লে অগৎ মিছে, অগদীশ্বর মিছে, তাঁর সৃষ্টিও মিছে।'

ভোলা দাদা এতক্ষণ নীরব ছিল। নির্মলার কথায় যেন অল্পপ্রাণিত হইয়া বলিয়া উঠিল, বৌদিদি, তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। ঐ বাড়ীটা পর্য্যন্ত যখন আর দাদা বাবুর নেই তখন বিশ্বাসঘাতক রমামাধ বাবুর অল্পগ্রহে এখানে থাকা আমাদের মরণ-সমান।'

রমা কাকার বিশ্বাসঘাতকতার কথা

কিছুক্ষণের জন্য আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু ভোলায় কথায় আবার তাহা আমার মনে পড়িল—বুকের মাঝে নির্দোষিত আঙণ আবার জলিয়া উঠিল।

আমি ভোলা ও নির্মলাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমার সেই সাধের নন্দন কাননে ছুটিয়া গেলাম। সেখানে বাইয়া শুনিলাম, আমার পাপ-বদ্ধগণ মূর্খাবান সাল সরঞ্জাম-সহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তখন আমার নন্দন-কানন যেন প্রেত-ভূমি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি অচিরেই স্বহস্তে তাহাতে অগ্নি লাগাইলাম। আমার সাধের নন্দন-কানন আজ ধূ ধূ করিয়া আমারই সম্মুখে পুড়িতে লাগিল। আমি সে দৃশ্য দর্শনে কতকটা যেন তৃপ্তিলাভ করিলাম। তারপর যে স্থলে বড় বড় অক্ষরে "নন্দন-কানন" লেখা ছিল সে স্থলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অগ্নি-গর্ভে নিক্ষেপ করিলাম এবং পার্শ্বস্থিত ভস্মভূপের এক প্রান্ত হইতে কিছুটা ভস্ম লইয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলাম "প্রেতভূমি"।

আর তিলার্দ্ধমাত্রকাল বিলম্ব না করিয়া বাটী ফিরিলাম। বলিতে পারি না আমার মৃষ্টি দেখিয়া ভোলা ও নির্মলা কেন সবিস্ময়ে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল।

অবশেষে নির্মলা যাহা বলিয়াছিল তাহাই হইল। আমার শৈশবের ক্রীড়া-নিকেতন, কৈশোরের বিলাস-কানন, যৌবনের বিহার-ভবন, নন্দনপুরের এক প্রান্তে সেই উন্মুক্ত আশ্রান-বক্ষে পিতার চিত্তাঙ্গি নির্দোষিত করিয়া সেই ক্রুরময়ী রজনীর শ্রাবাকলের অন্তরালে আমরা তিনটি প্রাণী জীবনের নূতন পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন আমার জীবনের মধ্যাহ্নকাল।

ঐশ্বর্য্যবর সিংহ রায়, এম্-এ, বি-এল্।

## শ্রীভগবানের রাসলীলা।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথাটা শুনিলেই আজ কাল শিক্ষিত মহলে সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, ভগবানের এই সর্বশ্রেষ্ঠ লীলাকে একটা অলীল বীভৎস ব্যাপার বলিয়া কত প্রতিবাদ উত্থাপন করিবেন। যে ধর্ম্মে এইরূপ চূর্ণাতি প্রদ্রব্য পাইয়াছে—তাহা যে নিতান্তই অসত্য ও বর্জ্যের ধর্ম্ম—এবং যে ধর্ম্মে এইরূপ উৎকট আদি রসের অভিনয় হইয়াছে—তাহার উচ্ছেদ সাধন এবং যে রাস রসিক রসময় পুরুষ ইহার নায়ক, তাকে দেবতা হইতে বরখাস্ত করা আধুনিক সভ্যতাপ্রিয় ব্যক্তিগণের একান্ত অভিপ্রেত।

ভগবানের রাসলীলা যে অলীল ব্যভিচার নহে—তাহা সাধাভাসারে কতক কতক দেখাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা

করিতেছি—ভালবাসা নামক একটা বৃত্তি লইয়াই জগতের হারীষ স্তুত হইয়াছে। এই হারীষের মূলে যদি ভালবাসা ভালরূপে লংঘন না থাকিত, তাহা হইলে জগতের অস্তিত্ব এতদিন লোপ হইয়া বাইত—ইহার বিন্দুবিসর্গও কেহ দেখিতে পাইত না—ভালবাসাবিহীন হইলে বিশ্বরাজ্য এতদিন যে মরুভূমিতে পরিণত হইত—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ভালবাসাই এই দুঃখদাবিদগ্ন সংসারকে মধুর করিয়া রাখিয়াছে—দুঃখময় সংসারকে ইজের সুখময় নন্দনে পরিণত করিতে ভালবাসার প্রভাবই নিত্য বর্তমান। এককথার স্মৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—একমাত্র ভালবাসা, ভালবাসা না থাকিলে এতদিন ইহা শূন্যভূমে পরিণত হইত। পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য, স্বামী-স্ত্রীতে,

গ্রাহকগণের প্রতি —“আলোচনা” যে মাসের কাগজ তাহার পর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সকল গ্রাহকগণের নিকট আমার নিজের তত্ত্বাবধানে ডাকে পাঠান হয়, অতএব ইহাতে ভুল-ভ্রান্তি বা না পাঠাইবার কোন কারণ নাই। গ্রাহকগণ কাগজ না পাইলে পোষ্ট-আফিসের ঘোষ মনে করিয়া নিজ নিজ ডাকঘরে সংবাদ লইবেন, কিংবা পোষ্টমাস্টারকে ইহার জিজ্ঞাসাইবেন। সেই মাসের ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের জানাইলেও প্রতিকার করিতে পারি। ১৫ দিন অতীত হইলে আর কোন উপায় করিতে পারা বাইবে না। আর এই দুই মাসের দিনে আমরা কাহাকেও পুরাতন সংখ্যা বিতরণের পাঠাইতে বাধ্য নহি। আশঙ্ক্য হইলে প্রতি সংখ্যার চারি আনা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। নিমেষন ইতি।

বন্ধুত্ব-বন্ধুত্ব ভালবাসার সূক্ষ্ম সূত্র জগতের  
 শিরায় শিরায় নিবদ্ধ। মানবের যত প্রকার  
 মনোবৃত্তি আছে, ভালবাসাই তাহার মধ্যে  
 সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এ বৃত্তি অপূর্ণ থাকিলে মানুষ  
 অপূর্ণ—তাহার জীবন অপূর্ণতাময়, একরূপ জীব-  
 জীবন জগতের কোন কাজে লাগিবার নহে।  
 স্বামী শ্রী পরম্পর ভালবাসা বৃত্তি চরিতার্থ  
 করিয়া সুখাত্তর করেন, পিতাপুত্র ইহার  
 দ্বারা জীবন ধৃত করেন; বন্ধু-বন্ধুতেও সেইরূপ,  
 সূত্রে চরম উপলব্ধি করিতে হইলে ভালবাসার  
 ভিতর দিয়া না বাইলে উপায়ান্তর নাই। এই  
 ভালবাসা স্বরূপত একই পদার্থ হইলেও আধার  
 ভেদে নাম ভেদ বা শ্রেণীভেদ হইয়া থাকে।  
 ইহা শুদ্ধজনের প্রতি অপিত হইলে “প্রজ্ঞা” পুণ্ড্র  
 অপিত হইলে “বাৎসল্য” বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব হইলে  
 বন্ধুত্ব এবং ভৃত্যের প্রভুর প্রতি ভালবাসা হইলে  
 দাস্ত, স্বামী শ্রীতে হইলে “দাম্পত্য-প্রণয়” মূলে  
 জিনিসটা কিন্তু একই—আধার ভেদে নাম ভেদ  
 হয় মাত্র—নতুবা কোন বিভিন্নতাই। সংসারে  
 আমরা ভালবাসাটিকে যেরূপভাবে প্রয়োগ  
 করি—ভগবানের উপাসনা করিতে গেলেও  
 আমাদেরকে ঠিক সেই ভাবেই প্রয়োগ করা  
 উচিত। ভগবানকে কেহ মাতৃভাবে, কেহ  
 পিতৃভাবে—কেহ প্রভুভাবে—অর্থাৎ শাস্ত্র,  
 দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার  
 ভাবে তাহার উপাসনা প্রশস্ত। এই সকল  
 ভাব আমরা সংসারে নিত্য ব্যবহার করিয়া  
 থাকি, অতএব এই সকল নিত্য অভ্যাস তাই  
 ইহাও প্রয়োগ করা উচিত। সংসারের যে  
 ভাব আমাদের নিত্য পরিচিত, আমরা

সেই ভাবে সেই ভাবের ঠাকুরকে ভাবনা  
 করিতে বাধা—অকৃতভাবে তাবিলে কোন কল  
 হইবে না। ভগবানকে পিতা বলিয়া, মাতা  
 বলিয়া তাহার উপাসনা করা বাইতে পারে,  
 আবার তাহার দাস হইয়া, তাহার সখা হইয়া,  
 তাহার কান্তা হইয়া ভালবাসিবার অধিকারও  
 ভক্তের আছে। যদি প্রাণকান্তরূপে ভাবিয়া  
 সাধক প্রেমময় ভগবানের চরণে আপনার  
 জীবন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন—তবে সেই  
 ভালবাসার নাম প্রেম-স্বরূপ ভক্তি মা বশোদা।  
 শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে ভালবাসিয়াছিলেন—সে  
 বাৎসল্য স্বরূপ ভক্তি, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে “প্রাণ-  
 সখা” রূপে স্বরূপ ভক্তি করিয়াছিলেন; ব্রজ-  
 বালকগণও একরূপ, অকুরাদির ভাব পরম দাস্ত-  
 ভাব। আর ব্রজগোপিকাগণ তাঁহাকে কান্ত-  
 ভাবে ভাবিয়াছিলেন—তাহাদের ভালভাসা  
 অভেদাত্মক পরমভক্তি। জিনিসটা এক কিন্তু  
 পাত্রভেদে নামভেদ হইয়া—তাহা ভগবদ্ভক্তি-  
 রূপে পরিণত হইয়াছে—ফলতঃ সবই এক,  
 এইজন্য ভগবান গীতার অর্জুনকে বলিয়া-  
 ছেন—“যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব  
 ভজাম্যহং” যে আমাকে যে ভাবে ভজনা  
 করে, আমি তাহার সেইভাবে মনোবাঞ্ছা  
 পূর্ণ করিয়া থাকি।

ব্রজবাল্যগণ যদি তাঁহাকে পাইবার জন্য  
 স্বামী ভাবেই উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রাপ্তের  
 ধনকে পাইবার জন্য “প্রাণনাথ” বলিয়াই  
 যদি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া থাকেন—তবে  
 তাহা ব্যভিচার হইল কিরূপে? যদি

কর তাহার সহিত সঙ্গত হইতেন, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দর্শিত হইতে পারিত। গোপিকাগণ ত্রিকুঞ্জে মানব বলিয়া ভাবিতেন না, রাসের সময় তাহাদের স্তব পাঠ যথা—  
“ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান, বিখন-  
সাবিতো বিশ্বলুপ্তয়ে, সখ উদোধবান্ সাহ তাং  
কুলে” হে অনাথের নাথ প্রিয়সখা ত্রিকুঞ্জ!  
তুমি গোপকুলে জন্মিয়াছ বলিয়া আমরা  
তোমাকে সামান্ত গোপপুত্র ভাবি না। তুমি  
জগৎপতি, দেবগণের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া  
জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ।  
রাসের এই সকল কথা বাহারা ভাগবতে পাঠ  
করিয়াছেন—যাতারা ইহার মর্ম বুঝিয়াছেন—  
তাহারা কখনই ইহাকে ভ্রষ্ট বলিবেন না।  
গোপিকাগণ যাহাকে ঈশ্বর বোধে স্তব করি-  
তেন, সেই পূজনীয় দেবতার কাছে কাম-  
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন—ইহা  
কি কখন সম্ভব? কেত কি কখন দেবতার  
কাছে কৃত্যব লইয়া যাঁতে পারে? যাতাকে  
পরব্রহ্ম জানে পূজা করিতেছেন—তাহাকেই  
উপপত্তি বোধে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে  
বসিয়াছেন—ইহা কি কখন সম্ভব? অতি  
বড় পণ্ডিত্রুতিও ভগবানকে ডাকিবার সময়  
একটু পবিত্র ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া তবে  
উপাসনার অগ্রসর হয়। আর এক কথা, মনে  
যে সময় এক ব্যক্তির উদয় হয়—ঠিক সেই সময়  
সেই মনে অজবৃত্তি উদয় হইতে পারে না—ইহা  
দার্শনিক সত্য। শিরোবিজ্ঞা-বিশারদ ব্যক্তি-  
গণ বলেন—বুদ্ধ্যাবৃত্তি, প্রেমবৃত্তি যেমন মানব  
স্বভিৎ, স্বভাবান আছে—তেমনি শ্রেষ্ঠব্যক্তির

পূজা করিবার ক্ষমতা এক বৃত্তি ভবীর মতক  
আধারে অবস্থিত আছে। এই বৃত্তি চরিতার্থ  
করিবার কোন ক্ষেত্রও দ্রুপতে আছে। আশ্রয়  
পাঁচটা বাহ ইন্দ্రిয় লাভ করিয়াছি—জগতে ইহার  
যদি আবশ্যক না থাকিত—তাহা হইলে ইহার  
সৃষ্টি হইত না। জগতে দেবতার দরকার  
আছে বলিয়াই যেমন চক্ষুর আবশ্যক বোধে  
সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি পূজা করিবার  
“পুপূজবা” বৃত্তির ক্ষেত্র আছে—যিনি জগতের  
সর্বশ্রেষ্ঠ—এই বৃত্তি তাহারই প্রতি অর্পিত  
হইতে পারে—তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীভগবান।  
এই পুপূজবা বৃত্তি চরিতার্থের ক্ষেত্র যখন  
ভগবান, গুরু গুরু, পরম পুরুষ, পূজা  
হইতেও পূজ্যতম, তখন তাহার কাছে ইন্দ্రిয়  
ব্যাপার, যাহা সামান্ত বালকের কাছেও  
প্রকাশ করিতে পারা যায় না, সেই ব্যাপার  
লইয়া অভিসারিকা বা কামভাবে ঈশ্বরের  
নিকট উপনীত হওয়া কি ভক্তশ্রেষ্ঠা গোপিকা-  
গণের পক্ষে সম্ভব? তোমরা ভালবাসা বৃত্তি  
লইয়া সংসারে পিতৃমাতৃভাবে, গুরুভাবে  
উপাসনা করিতে যাও, গোপিকাগণও তেমনি  
কান্তভাবে প্রাণের দেবতাপদে প্রেম—ভক্তি  
ভালবাসার অঞ্জলি প্রদান করিয়া পরমাত্মভাবে  
পরমাত্মা-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন—স্বর্ভব  
তাহা অসীল কিসে? ঈশ্বরে বাহা ভক্তি—  
“তাতা হনীতি হইবে কেন, দেবতার বাহা  
অমূর্ত্তি—তাহা ব্যতিচার হইবে কোন্  
হিসাবে?

রস শব্দ হইতে রাস হইয়াছে। কবিরাজী  
শাস্ত্রে রস হইতে রাসায়ন হইতে দেবা

বার। বাহার বায়া শরীর খাত্তর পরিবর্তন করিয়া রোগের বিনাশ করতঃ নবজীবন আনিয়া দেয়, সেই রস খাত্ত হইতে রাস হইয়াছে। রসে দৈহিক পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। রাস লীলার পুরুষে পুংষ জীভে জীষ ছিল না। রাসের সময় ঐক্যের পুংষ বিকাশ হয় নাই এবং যে সকল জী রাস মণ্ডলে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের জীষের বিকাশ ছিল না। পিতৃৎ এবং মাতৃৎ বিকাশের পূর্বে এই লীলা বিস্তার হইয়াছিল। ঐক্যক বৃন্দাবনে বাদশ বৎসর অবধি অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার পরেই ভগবানের মথুরা লীলা, অতএব ইহাতে তল্লীলতা কোথায়? ইহার পর ঐক্যক মথুরায় মরুভাবে পরিবর্তিত হইয়া নবলীলা বিস্তার করেন অর্থাৎ বিবাহাদি করেন।

ঈশ্বর মাতা কি পিতা, সখা কি স্বামী এ প্রবন্ধে তাহার অবতারণা করিব না। তবে তিনি যাছাই হউন, কি বলিয়া উপাসনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তাঁহাকে সন্তুষ্ট বা তুষ্ট করিবার জন্য আদরা তাঁহার উপাসনা করি না। তাহার অভিধ কিসের, তিনি যে সঁদাই সন্তুষ্ট তিনি আমার চির আনন্দময় প্রভু, ক্ষণ মাত্র তাহার সন্তোষের অভিধ নাই—তাহাকে নূতন করিয়া তুষ্ট বা সন্তুষ্ট করিবে কি? এই যে সকল অহুতান, এই যে সকল পুজা উপাসনা—এ সকল আমাদের নিজের সন্তুষ্ট বা তুষ্ট হইবার জন্ত। তাঁহাকে যেমতভাবে ভাল বাসিলে তেমনি আনন্দ হয়—হুনি তাহাকে সেই

রূপ ভাবেই ভালবাস; যে ভাবে হুনি তাহাকে আরক্ত করিতে পার—সেই ভাবেই কর তাহাতে আসে যায় কি? আমার মা জননী তাঁহাকে বড়ী ঠাকুরাণী বলিয়া সন্তুষ্ট, মা যশোদা পুত্র বলে সন্তুষ্ট, রাখাল বালকগণ সখা ভাবে সন্তুষ্ট আর ব্রহ্মগোপিকাগণ প্রাণনাথ বলিয়া তাহার সেবার সন্তুষ্ট, একই ঈশ্বর তিন্ন ভাবে পূজিত, যিনি যে ভাবেই তাঁহার উপাসনা করুন না কেন—মনোভাবের তেদ অহুসারে ভালবাসার প্রভাব তিন্ন হইলেও সকল উপাসনার মূল উদ্দেশ্য তাঁহাকে ভালবাসা, তাঁহাকে পাওয়া তিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব যে যেভাবে ভাল বাসুক তাহাতে কাহার আপত্তি হইতে পারে না। সংসারের ভালবাসা বহিমুখীন, ক্ষণ ভঙ্গুর—এই আছে এই নাই,—ইহাতে জীবের বন্ধন মুক্ত না হইয়া বরং দৃঢ়তর হইয়া যায় কিন্তু এই ভালবাসাকে প্রেমময়ের চরণে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের মুক্তির পথ অবশুস্তাবী। ভগবানের রাসলীলার “আস্তারামঃ স রেমে” আশ্রয়ণ নিষ্ঠ ঐক্যগোপিকাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। যে রুট আশ্রয়রূপ, তাহার রমণ ক্রিয়া কি রক্তমাংসময় ব্যাভিচার অভিভূত হইতে পারে, পরন্তু ভাবময় সাধনার একটা উপাধান যাত্র—সাধক যাত্রাই এ কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। যে ভালবাসার অভিভব সম্পাদিত হয়; যে ভালবাসা ভালবাসার আধারে বহুতকে ডুবাইয়া অহিৎ লোপ করিয়া দেয়—তাছাই হইল ভালবাসার চূড়ান্ত। প্রেমই ভালবাসার পূর্ণপরিণতি—গোপিকাদেবী ইহাই লইয়া

উপাসনা। রাজ্যে বিচরণ করিতেন—তবে  
তাঁহা অস্বীকার কিসে হইল ?

পূর্বে বলিয়াছি যে সকল গোপিকার  
মাতৃর স্মৃতিত হয় নাই, তাঁহারা ই রাসে  
অবস্থিতা ছিলেন, আর রাসেশ্বরী ছিলেন—  
শ্রেয়স্বরী শ্রীমতী রাধিকা । শ্রীরাধা শক্তিরও  
মাতৃ ছিল না ; ভগবানের নিকট আসানের  
বর গ্রহণ সময় আসানও যেমন পুংশক্তি বিহীন,  
শ্রীরাধাও সেইরূপ শ্রীশক্তি বিহীনা হইয়া  
অবোনি সম্ভবা রূপে বস তাঁহু রাজ ভবনে প্রতি-  
পালিত হন । এই হেতু শ্রীমতী কখন মাতৃ  
নামে অভিহিতা, মাতৃরূপে পূজিতা হন নাই, বা  
রাধা কেহ কখন বলেন নাই—মা নাম তাঁহাতে  
আরোপিত হইলে কেন ভাল লাগিত না ।  
শ্রেয়ের রাজ্যে, ভক্তির রাজ্যে, ভালবাসার  
রাজ্যে তিনি আদর্শ, তিনি স্মৃতিমতী ভক্তি  
স্বরূপা বলিয়া শ্রীমতী আখ্যার আখ্যায়িতা  
হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রেমগুণ পরি-  
বোধের জন্য, প্রাণান্তকর ভক্তি ভালবাসার  
প্রতিদান করিবার জন্য ভগবান সেই সময়  
সৌররূপে ধরার অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রতিক্রম  
হইয়াছিলেন—ভগবানের এমন আশ্চর্যসম্বল  
এক গোপিকা তির আর কাহার জন্য হইয়া-  
ছিল কি ? তুমি আমি পার্শ্বব স্বামী, শ্রীর ভাল-  
বাসাকে স্নেহরূপ চক্ষে দেখি,—স্নেহরূপ ভাবে  
ইহাকে দেখিলে বাস্তবিক ঐশ্বরিক শ্রেয়ের  
অপমান করা হয় । উপভোগের অংশ, রক্ত  
মাংসের সমস্ত বাদ দিয়া দেখ দেখি রাগ মার্গের  
সাধক কবি চণ্ডীদাস কি বলিয়াছিলেন—

ভদ্র রজকিনি রাধি ।

রজকিনীরূপ কিশোরী রূপ

কামগন্ধ নাহি তার,

রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম

বিদ্য চণ্ডী দাসে কর ।

কামগন্ধ বিবর্জিত প্রেম কি আমাদের বুঝিবার  
বস্তু ? সোণার পাথর বাচী যেমন, উপভোগ  
বর্জিত প্রেম ও আমাদের পক্ষে ভেদম, লাভ  
মার্গের শীর্ষস্থ হইতে না পারিলে, প্রেম-ভক্তির  
অগাধ সলিলে ডুবিয়া একেবারে আত্মহারা  
না হইলে—ইহা বুঝা অসম্ভব । কত কলকল্যাতর  
সাধনা করিয়া বাহাকে পাইবার জন্য দেবতা-  
গণ লালারিত, গোপিকাগণ একত্রে তাঁহাকে  
এইভাবে লাভ করিয়া কি দত্তা হন নাই ?

গীতার যে ভগবান অর্জুনকে আশ্বমত্রে দীক্ষিত  
করিয়াছেন, তাগবতে প্রেম-মন্ত্রে সেই ভগবান  
গোপিকাগণকে শিক্ষা দিয়াছেন—ইহাদের  
ভক্তির—ইহাদের সাধনার কি ভুলনা আছে ?  
না না ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে নানাতাবে সাধন  
করিবার পন্থা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এক-  
গোপিকার সাধনার মত অতুলনীর সাধন  
হিন্দু-শাস্ত্র ছাড়া আর কোথাও নাই ।  
বাহাকে আশ্বদান করিয়াছি, জমর পুণিরা  
বাহাকে আপনায় করিয়া লইয়াছি—  
তাঁহার অমানিত তাহাকে অধের কি আছে ?  
জমর বস্ত্রভের, প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পদ  
সর্বত্র উৎসর্গ করিয়া তাঁহার কলম্বরকণ্ড  
দেখিতেন । রাসরসিক রসমতের সুরস  
সম্ভার নিজ সুর সম্বাহিত সুবাহিতা দিয়া রস-  
কেলি করিয়াছিলেন । ভান-রসোবরে  
করিয়া ছুর দিয়া আপনায় অহিষ হারোহিষ—



ছিলেন। বাহারা অগতের প্রত্যেক বসন্তে  
প্রাণময়ের রূপ দেখিতেন, বাহারা সর্বত্র  
ঈশ্বরের বোহন রূপ মাথুরী দেখিয়া কৃষ্ণের  
জীবন ধারণ করিতেন। বাহাদের ভক্তিডোরে  
আবদ্ধ হইয়া ভগবান বলিয়াছিলেন—“বৃন্দাবনঃ  
পরিভাষ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি, তাহাদের  
ভক্তি বা ভালবাসার কল্পনা, অভক্ত, অসাধক  
ভগবানের প্রতি রতিমতিহীন পাষণ্ড আমরা কি  
বুঝিব ?

বেশী ভক্ত হইলেও মাগে একটা অহংকার  
হয়—এব, কি প্রজ্ঞাদ, কি অর্জুন, প্রভৃতিরও  
হইয়াছিল কিন্তু ব্রজগোপিকার প্রাণে কি সে  
ভাব লেশমাত্র কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় ?  
অর্জুন মনে করিতেন—আমি ভগবানের বড়  
ভক্ত, কি দর্পধারী একদিন তাঁহার দর্পচূর্ণ  
করিবার জন্য সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া  
গেলেন, যুগ্মার বন ভ্রমণ করিয়া উত্তরে কাতর  
হইলেন, পিপাসার প্রাণ যায়, এমন সময় ভগ-  
বান মায়া বলে বন মধ্যে এক অপূর্ণ অট্টালিকা  
সৃষ্টি করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ অট্টালিকা  
দেখিয়া দুই জনে তাহাতে প্রবেশ করিলেন—  
অর্জুন বড়ই পরিশ্রান্ত তহয়ছিলেন, তিনি  
ভাটবানকে তথায় সে রজনী যাপনের অভিপ্রায়  
জ্ঞাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।  
ঈশ্বরও কপট নিদ্রিত। মধ্য রাত্রে অর্জুনের  
একবার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সহসা উড়ে চাহিয়া  
মস্তকের উপর তিন খানি শাণিত অস্ত্র বুলি-  
তেছে—বেধিতে পাইলেন। আশ্চর্য হইয়া  
অর্জুন প্রহরীকে ইহার বৃত্তান্ত বলিতে  
বিস্মিত। প্রহরী বলিল—ইহা প্রজ্ঞাদ, এবং

আর অর্জুন এই তিনজন পাবাত অভক্তের  
মস্তকেদন করিবার জন্য বুলান রহিয়াছে।  
ততোধিক বিদ্রিত হইয়া অর্জুন নিজাসা করি-  
লেন—কেন, কেন, প্রহরী। ভাল করিয়া  
বুঝাইয়া বল। প্রহরী বলিল—প্রথম অভক্ত  
প্রজ্ঞাদ, তাহার পিতা যখন বলিল—তোমার  
কৃষ্ণ কোথায় ? ইহাতে অভক্ত আপনার প্রাণ  
রক্ষার্থ এবং নিজের কৃতীত্ব দেখাইবার জন্য  
ভক্ত দেখাইয়া বলিল—ইহার মধ্যে আছেন।  
প্রাণের এমনি সমতা যে তাহার রক্ষার জন্য  
ভগবৎ শরীরে অন্ত্রাবাত করাইল। প্রথমখানি  
তাহার জন্য বুলান রহিয়াছে। আর দ্বিতীয়  
অভক্ত প্রহরী—সে কেবল “পদ্মপশাল লোচন”  
রবে চাৎকার করিয়া ভগবানকে বস্ত্র ব্যাঘ্রের  
যুখে তুলিয়া দিয়াছিল—দুরাত্মা এমনি  
দার্পপর। দ্বিতীয় খানি তাহার মস্তকেদন  
করিলে। আর তৃতীয় খানি অর্জুন নামক  
একটা ব্রহ্মভক্ত আছে, তাহার জন্য, সে  
নরাধম—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে ভগবানকে রথের  
সারথি করিয়া তাহার কোমল গাত্রে কত  
ভীষণ অস্ত্র বিদ্ধ করাইয়াছে—নিশে অকত  
শরীরে রথেরাভতর অবস্থিতি করিয়াছে। যে  
নিজের স্বার্থসাধনের জন্য প্রাণের প্রাণ জগৎকে  
এমন ভাবে নির্যাতন করিতে পারে, তাহার  
মত অধ্যাত্মিক ভগতে আর কে আছে ?  
কথা শুনিয়া অর্জুনের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল—  
তাঁহার মস্তক বিদ্রুপিত হইতে লাগিল। তিনি  
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৃন্দাবনের পর  
আর সে সকল কিছুই বেধিতে পাইলেন না।  
বেধিলেন—তিনি একটা বনের মধ্যে পড়িয়া

রহিয়াছেন। অর্জুন ব্যাকুল হইয়া ঐক্যকে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। তগ-  
তগবান বলিলেন—তোমার মনে, প্রধান ভক্ত  
বলিয়া একটা অভিমান জন্মিয়াছিল—তাই এই  
মায়িক ব্যাপার সৃষ্টি করিয়া তোমার অভিমান  
ভঙ্গ করিলাম—ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে  
ভক্তির অভিমানও ভক্তের পক্ষে মঙ্গলজনক  
নহে। প্রব, প্রজ্ঞান, অর্জুন হেন ভক্তের  
ভক্তিও নিখুঁৎ নহে; তাহাতেও অভিমানের  
কলঙ্কপাত হইয়াছিল, আর ব্রজে ব্রজগোপিকার  
ভক্তিতে কি কেহ কোন খুঁৎ বাহির করিতে  
পারেন?

ইহাদের তুল্য নির্মল প্রেম—এমন অচে-  
তুকী ভক্তি কি আর কোন ভক্ত তগবানে  
অর্পণ করিতে পারিয়াছেন? এমন আশ্চর্য  
আশ্চর্য আশ্চর্য রমণ করিয়া আশ্চর্য—  
ব্রজানন্দে, পরমব্রজের প্রেমসাগরে একেবারে  
নিখুঁৎভাবে আশ্চর্য হইয়া তলাইয়া বাইতে,  
তগবৎ তন্মাত্রে আন্তরিকতা হইয়া তন্ময়  
হইতে আর কোন ভক্ত কি পারিয়াছে? হিন্দু-  
শাস্ত্রে ব্রজগোপিকা ভিন্ন কি এমন কোন  
ভক্তের নামোল্লেখ কোন ধর্মশাস্ত্র করিতে  
পারেন?

এমন নির্মল, নিকলজ ভক্তির খেলা  
ঐক্যের রাসলীলা ভিন্ন, শুণু রাসলীলা কেন  
ঐক্যবাসনে বেকোন লীলা লীলাময় দেখাইয়া-  
ছেন—তাহা আর কোথায় দেখিতে পাইবে?  
অভক্তের চক্ষে দেখিলে হইবে না, কামকান্তার  
ভাবে বিভোর হইয়া তাবিলে চলিবে না,  
রাসবার্ষে প্রসাদ ভক্তিমার্গে চিত্ত লয় করিয়া

সাধকের চক্ষে একবার দেখুন যে—রাসলীলা  
কিন্তু রসময়ের রাসলীলার আশ্চর্যময়ের কি  
অসম্ভব—কি প্রেমকুণ্ডল ছবি কুটিয়া উঠিয়াছে?  
ব্রজগোপিকাগণের স্তায় নিঃস্বার্থভাবে তগবানের  
উপাসনা কোনও ভক্ত করিতে পারে নাই।  
সকল ভক্তেরই এক একটা বাসনা লইয়া  
উপাসনার পথ মুক্ত হয় কিন্তু গোপিকাদের  
হৃদয়ের অন্তহলে কোন বাসনা ছিল না—বহি  
ধাক্ত তাহা হইলে প্রকাশ হইয়া প্রার্থনারূপে  
বাহির হইত। ব্রজগোপিকা জীবনে কোন  
প্রার্থনা জানান নাই। অতএব ইহা নিম্পৃহ,  
নির্লোভা—নিবৃত্তিমার্গের সাধকের বাহা হইয়া  
থাকে—ইহা তাহাই। রাসলীলা সাধনমার্গের  
চূড়ান্ত আদর্শ; আপন ভুলিয়া আশ্চর্যময়ের  
হওয়া, প্রাণ দিয়া প্রাণময়ে মিশাইয়া যাওয়াই  
রাসলীলার আদর্শ দৃষ্টান্ত—সাধনার উচ্চতরে  
বসিয়া ভক্তির চক্ষে দেখিলে সাধক মাত্রেরই  
এ লীলার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।

সম্পাদক।

## সুখাশ্বেষণে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১০)

সুখীও দিন বেরুপ যায়, দুঃখীও দিন  
সেইরূপ যায়। দিন কাহারও থাকে না।  
কাজেই আমাদেরও দিনের পর দিন চলিয়া  
যাইতে লাগিল।

বধন প্রাতঃকালে সুখদেব পুন্ডর রক্তিম  
সাদে সজ্জিত হইয়া পূর্ণ-বার্ষে গিয়া

হৈমবিন্দন জন্ম কাব্য আরম্ভ করিতেন আমরাও তাঁহার লক্ষী হইরা পঞ্চপাটনে আরম্ভ করিতাম; তারপর যখন সেই সুখ্যদেব সাগর-কালে ক্রান্তি বিনোদনের ক্ষণ অবকাশ লইতেন, আমরাও পঞ্চপাতি হ্রস্ব করিবার জন্য বিশ্রাম করিতাম। আমাদের পশ্চাত্তাত্ত্বিক ভাষা জানিতাম না, তথাপি এরূপভাবে ক্রমাগত চলিতে লাগিতাম।

একত্রে কোন কাজ করিতে হইলে পর-পরের মধ্যে কার্যের ভাগ করিয়া লইতে হয় সুতরাং আমরা তিন জন আমাদের মধ্যে কার্যের বিভাগ করিয়া লইলাম। আমি ভোলা-হাদার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতাম। নির্মলা আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিত আর বিরামদায়িনী রজনীর স্নিগ্ধ হারায় কোন এক মধুর-ভাবিনী তটিনীর বগ্নময় নির্জন তটে অথবা কোন এক ঘোংলা-বিধৌত অরণ্যানীর নিভৃত কুঞ্জে বাসিয়া বীণা-বিনিমিত কণ্ঠে “সামাগণ” ও “মহা-ভারতের” শ্লোকগুলির পুনরাবৃত্তি করিত। আহা! সে কতই মধুর! কতই ভাবময়! কতই মর্মস্পর্শী! তনিতে তনিতে কখনও কখনও ভাব-বিমুগ্ধ হইরা আপনাকে আপনিই হারাইয়া ফেলিতাম।

এখনে যখন পঞ্চ-জন্মে বাহির হই তখন ভাবিতামলাম পথে কত কষ্টই না পাইব, কিন্তু পরে দেখিলাম সে ভাবনা ভিত্তিহীন। কই, কষ্ট পাইলাম না! কষ্টের পরিবর্তে যেন কেমন একটা সুতন সুখের আবাদন পাইলাম। ক্রমাগতি কার্যাক্রম ছিলাম হঠাৎ

জানিমা কোন দেবতার আশীর্বাদে কার্যাক্রম হইয়া নিবিড় নিলীমা-বস্তিত উহার উন্মুক্ত আকাশের তলে জন্ম করিতে করিতে যখন অনন্ত সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির নিত্য নুতন মাধুরী ছবি দেখিতে পাইতাম, তখন যে অপূর্ণ অসীম আনন্দ রসে হৃদয় ভরিয়া বাইত, তাহা অনির্বচনীয় ও অল্পপমেয়। সেই সময় ভাবিতাম হায়! কেন আমি এতদিন নিকটভোজী কুস্করের মত সেই নন্দনকাননরূপ প্রেতভূমিতে গলিত শব্দময় পৃতিপঙ্কময় সুখরাশির জন্য লোলরসনায় ঘুরিয়া মরিতেছিলাম।

পঞ্চ-পাটনে প্রায় তিন মাস অতীত হইল। সহসা একদিন ভবিষ্যতের কুঅটিকা-ময় আবরণ ভেদ করিয়া এমন একটা ঘটনা দেখা দিল—বাহাতে আমার নুতন জীবন-বারা আবার একটা নুতন দিকে বাণিত হইল। পিতার মৃত্যুতে ও অজুল পৈতৃক সম্পত্তির বন্ধনে আমার কিছু পরিবর্তন ঘটয়াছিল বটে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নহে। কই, তাহাতে আমার কার্য পুরাতন দেহ-মনটা ত ভালিয়া যায় নাই! এবার সেটাও ভালিয়া বাইল এবং তাহার স্থানে যেন একটা নুতন দেহ-মন পাইলাম। অতএব এ ঘটনাটা না বলিয়া আমি কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না।

তখন সন্ধ্যার কাল-ছায়া জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পঞ্চ-পাটনাবে দেখা বাই-তেছিল না। এমন সময় একদিন আমরা সমস্ত দিবস জন্মের পর বিশ্রামের জন্য একটা বটবৃক্ষ তলে আশ্রয় লইলাম।

বৈশাখী পূর্ণিমা। শীত পূর্ণিমা-র উদয়

হইল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশটা বহু  
কিরণ-ধারায় প্রাবৃত হইয়া গেল। তখন  
দেখিলাম, পশ্চাতে এক সুদীর্ঘ-কলেবর গিরি-  
বর সেই পুত কিরণ-সলিলে স্নাত হইয়া  
ধ্যান-নিমগ্ন-চিত্তে যোগীবরের মত বিরাজ  
করিতেছে, সম্মুখে এক মধুর রত্নিনী তরঙ্গিনী  
চক্ষিকা-ভরণে স্বীয় অঙ্গ সজ্জিত করিয়া যেন  
সেই পরম-প্রেমময়ের প্রেমাশ্রাবনে উন্মত্তবৎ  
ছুটিয়া চলিয়াছে, আর হুই পার্শ্বে দূর-বনাস্ত-  
রালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপাবলী  
আলিয়া যেন ভক্তিতরে শুক্লভাবে সেই বিশ্ব-  
দেবতার আরাতি করিতেছে। বাঃ! বাঃ!  
কি শান্ত সৌন্দর্য! কি অতুলনীয় রমণীয়তা!  
আহা! এমনটা পূর্বে কোথাও কখনও দেখি  
নাই। প্যাশাণ-কঠিন মানব-হৃদয়ও এভাবে-  
দর্শনে বিচলিত হয়। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী নয়,  
এ স্বর্গধার! আমি ভ্রম্যভিষ্টে বসিয়া বসিয়া  
এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় মনে হইল যেন  
আমার অন্তরের একটি রুদ্ধ প্রস্রবণ হঠাৎ  
খুলিয়া গেল—যুগপৎ যেন এক দুর্জননীয়  
স্রোত কোথায় এক নূতন দেশে লইয়া যাইবার  
জন্য আমাকে প্রবলবেগে টানিতে লাগিল।  
আমি আর এক মুহূর্তও স্থির থাকিতে পারি-  
লাম না। ভোলা ও নির্ঝলা বসিয়া রহিল, আমি  
নির্ঝাক্তভাবে নদীতীর ধরিয়া চলিতে লাগি-  
লাম। এইরূপে কতদূর চলিয়া গেলাম  
বলিতে পারি না। অবশেষে ক্লান্ত-চরণে এক  
উপলব্ধের উপর বসিয়া পড়িলাম। ঐ সময়  
অনভিভূরে তরু নৈশ গগন কাঁপাইয়া কে যেন  
গাহিতেছিল,—

কত নিশি, আমি,  
ওগো! হৃদি-স্বামী!  
রহিব বিরহে আগিয়া।  
পিপাসিত চিত  
বাচিছে নিয়ত  
তোমারি মিলন অমিয়া।  
হেরি' এ মধুর!  
পূর্ণিমা যামিনী,  
কাঁদি গো তাপিতা  
তব বিরহিনী,  
কোথা তাপহারী  
হৃদয় বিহারী!  
জুড়াও বারেক আসিয়া॥  
বুঝি কোথা কোন  
সুদূর গগনে,  
রেখেছ লুকায়ে  
তোমারে গোপনে,  
এস, মাথ! এস,  
হৃদয়েতে ব'স  
কনক আসন পাতিয়া॥

গান ধামিয়া গেল। কিন্তু তখনও যেন আমার  
কানে প্রতিধ্বনি হইতেছিল,—

'বুঝি কোথা কোন সুদূর গগনে  
রেখেছ লুকায়ে তোমারে গোপনে,  
এস নাথ! এস, হৃদয়েতে ব'স  
কনক আসন পাতিয়া॥

সেই নির্জন প্রান্তরের মাঝে এ কোন  
বেদনাতুরের করুণ স্বর্ণম্পর্শী গান—তাহা  
আমি বলিতে পারি না; তবে সে যেন, সেই  
মুহূর্তে তাহার বেদনায় কিছুটা আনন্দ

অন্তরের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। আমি ব্যাকুল চিন্তে সেই চক্ৰিমা বিকসিত নীলনভোমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন কাহার অঙ্গুসঙ্গান করিতে লাগিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন এক নতুন চিন্তার ঘোর আর্মি-বিতোর হইয়া পড়িলাম।

যখন চিন্তার ঘোর ভাঙিল, তখন ত্রাণি তৃতীয় প্রহর। এতক্ষণ ভোলা ও নির্মলার কথা মনে ছিল না, এইবার তাহাদের কথা মনে পড়িল। সহসা কেন যেন অস্তুরাঙ্গার সঙ্গীত কল্পন অমুভব করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম। তাইত! তবে কি তাহাদের কোন অমঙ্গল ঘটেছে, ঘটতেও পারে। এত মাঠের মাঝে তাহাদের দুজনকে ফেলে রেখে আসা আমার খুব নিবুদ্ধিতারই কাজ হ'য়েছে।

আমি তখন আশ্ব-ভৎসনা করিতে করিতে ভরিত পদে ফিরিতে লাগিলাম।

যখন পূর্ব কথিত বটরুদ্ধের নিকটবর্তী হইলাম, তখন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। “ভোলাদাদা” “ভোলাদাদা” বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলাম না। তখন সন্দেহ ঘনীভূত হইল। পরে আরও নিকটবর্তী হইলে যেন কাহার অল্পটুকু কাতর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বুকের মাঝে কে যেন সঙ্কোরে আঘাত করিতে লাগিল। “কি সঙ্গীনাশ! যা ভাবিলাম তাই নাশি।”

গাছের ডালয় ছুটিয়া আসিয়া দেখিলাম লম্বাধেই নদীর তটে যেন একটি মহত্ব দেহ অকণ্ঠ পড়িয়া রহিয়াছে। কাছে আসিয়া

তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সঙ্গীনাশ! এ কি, এ যে ভোলাদাদা!

তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। আমি বিষম-বিহ্বল-নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছি, এমন সময় আমার সেই কাতর স্বর শুনিতে পাইলাম। দূরে থাকায় সে কার কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারি নাই। এবার বুঝিতে পারিলাম—ওহো! এ যে নির্মলার!

আমি তখন কিপ্রগতিতে গাছের অপর এক পার্শ্বে ঘাইয়া দেখিলাম যে কিছু দূরেই নির্মলা শুইয়া আছে। তাহার হস্তপদ যেন রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিম্ন-বের মধ্যে দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাধার উঠিল। রক্তবর্ণে তাহার কাছে ছুটিয়া গেলাম। নির্মলা—নির্মলা—নির্মলা—বলিয়া আর যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহা বলিতে পারিলাম না।

নির্মলা আমার মনের তীব্র উবেগ বুঝিতে পারিয়া ধীরভাবে বলিল—ঐধ্য ধর। প্রথমে আমার বাধন খুলে দাও, তারপর আমি সব বলছি।

আমি যত সত্বর পারিলাম বন্ধন খুলিয়া দিয়া যেন শক্তি শূন্য দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার পাশে বলিয়া পড়িলাম।

নির্মলা অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া বলিল—তুমি আমার মাধার কাছে বস। আমি তোমার কোলের উপর মাথা রাখি।

আমি মারা-বুকের মত নির্মলার কথায় বারী কোল পাতিয়া বসিলাম। সে আমার

কোলে মাথা রাখিয়া বলিতে লাগিল—টাকা ও গহনার লোভে একজন সাধুবেশী দম্পত্য আমাদের এ দশা ঘটাইয়াছে। সে যে কতক্ষণ আমাদের পিছন নিয়েছিল তা বলিতে পারি না। তোমার ফিরিতে বলিল দেখে আমাদের ও ভোলাদাদাকে চিন্তিত মনে ব'সে আছি, হটাত সেই দম্পত্য বটগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ভোলাদাদাকে ছুরি মারলে। ভোলাদাদা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তাকে বাধা দিতে লাগলো। শেষে যখন তার বৃত্তদেহ মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল—তখন আমি চীৎকার করে উঠলুম। তখন সেই দম্পত্য আমাদের মরণের ভয় দেখিয়ে তোমার কথা প্রিজ্ঞাসা করলো। আমি কিছুতেই বসলাম না। তারপর সে আমার হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রহার কর্তে লাগলো। তাতেও আমি তোমার কথা—বসলাম না। শেষে গরনা ও টাকার খনিটাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে পালালো, আর কাবার সময় বেগে আমাদের একটা ছুরির আঘাত ক'রে গেল।

সর্পদণ্ডের মত আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—এ্যা! সে কি! নির্মলা তোমাকেও জবাব ক'রেছে! তাহার বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে সত্য সত্যই—অনর্গল রক্তস্রাব হইতেছে।

উঃ! নির্মলা, আজ আমিই তোমাদের এ হত্যার কারণ। গরনা ও টাকা সঙ্গে নিয়ে আসিতে তোমরা কত নিবেদন করলে কিন্তু আমিই তা ওলটলুম না। বিষয় বৈতন সমস্ত হারিয়ে ফুল গরনা ও টাকার দ্বারা ত্যাগ

কর্তে পারলুম না—তাই আজ তোমাদের এই দশা, এই বণিয়া আমি সঙ্কল-নেত্রে—অপরোধীকৃত নির্মলার মুখের দিকে চাহিলাম। এই সময় কেমন যে একটা কঠিন বেদনা আমার বুকের মধ্যে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া অস্থি-পঙ্কর কর ধানিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমার প্রাণের বাধা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয়, প্রবোধ দিবার জন্য নির্মলা বলিল—‘ভবিতব্য হবেই হবে। তাহে কারও হাত নেই—তা ছাড়া তোমাকে লগদীষেরের ওপর সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় নির্ভরতা দেখাবার জন্যই বোধ হয়, আজকের এই ঘটনা। সুতরাং এও মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা, তবে এর জন্য কষ্ট কি? নির্মলা, এই সবে যাত্রা—আমি তোমার চিন্তে পেরেছিলাম—তাই, মনে ক'রেছিলাম যে যদিও সক্ষম হারিয়েছি, তবু তোমাকে আর ভোলাদাদাকে নিয়ে জীবনের বাকী দিন টুকু আনন্দে কাটিয়ে দিব। বিধি বাদী হ'য়ে সে আশাটুকুও যে আজ কেড়ে নিলে নির্মলা! শুধের জিনিস সবই চ'লে গেল, আর এতে কষ্ট কি! উঃ! আমি যে ভাবতে পারছি না তোমরা আমাদের ছেড়ে চ'লে গেলে আমি—একলা এই অকস্মিক পৃথিবীর মাঝে কি ক'রে থাকিবো—বলিতে বলিতে বাস্তবিককর্তে থামিয়া গেলাম। দেখিতে দেখিতে হুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে অজ্ঞান ধারায় সেই জন নির্মলার বেদনা-পাতুর গণ্ডবেশের উপর পড়িতে লাগিল। বোধ হয়, বিচ্ছেদের কাল আসন্ন বুঝিয়া—একবার শেষ মিলনের জন্য

নির্মলা আমার দুই হাত বাহরদ্বারা বেটন করিয়া ক্ষত বন্ধের উপর চাপিয়া ধরিল।

তারপর পূর্ণাপেকা আরও ক্রীণবরে নির্মলা বলিতে লাগিল,—‘তুমি আমার স্বামী, গুরু, দেবতা, তোমার ছেড়ে আমার গতি—কোথায়? বোধ হয় তোমার চরম লক্ষ্যের পথে আমি একটুকু—অন্তরায় হ’য়েছিলুম তাই—জগদীশ্বর আপাততঃ কিছুদিনের জন্য আমার সরিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু স্থির জেনো, তিনি চিরদিনের জন্য আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন না। যে অজানা দেশে আমাকে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে আমি তোমার মিলন প্রত্যাশিনী হ’য়ে থাকবো। যখন তোমার এ জগতের কাজ শেষ হ’য়ে যাবে, তখন আবার আমরা মিলবো, ভোলা দাদাকে পাবো, খাণ্ডড়িকে পাবো, সকলকে পাবো। সকলে মিলে আবার এক নূতন সংসার পাওবো। এ সংসারে যে সুখ পেলাম না, সেখানে সে সুখ পাবো। সে সুখ অনন্ত—অবিচ্যব।

এই বলিয়া নির্মলা যেমন জোরে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল, অমনি তাহার ক্ষত বক্ষ আরও বেগে রক্তবয়ন করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ—অবসর হইয়া পড়িল।

আমি নিরুপায় হইয়া ব্যাকুল-চিত্তে নিজের পরিধের বস্ত্রের দ্বারা তাহার ক্ষত স্থানে চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু তাহা বিফল হইল। রক্ত কিছুতেই থামিল না। তখন একমনে সেই লক্ষ্যবস্তুর পন্থায় দীনবন্ধকে ডাকিতে লাগিলাম। যেন হয়—জগদীশ্বরকে সেই আমার

প্রথম ডাকা।

এদিকে নির্মলার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় ক্রমশঃই নিশ্চত হইয়া আসিল। তাহার চোখের আরও নিকটে আমার মুখ লইয়া যাইবার জন্ত অম্পট ভাবে বলিল। আমি মস্তমূর্চ্ছের মত তাহাই করিলাম।

তখন নির্মলা তাহার সেই দুর্বল হস্ত দুই—খানি আমার স্বকের উপর রাখিয়া অতি ক্রীণবরে বলিতে লাগিল,—‘আমার মনে হ’চ্ছে—যেন চাঁদের আলোয় আর তেজ নেই। সমস্তই যেন একটা কাল আচ্ছাদনে ঢেকে যাচ্ছে। তবে এই বুকি মৃত্যুর কাল ছায়া!’ এই খানে ক্ষণেক থাকিবার পর সহসা যেন কি এক গুপ্ত বেদনার অস্থির হইয়া আমার মুখের দিকে আকুল নয়নে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—‘যাক্—সব আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাক্,—সব অন্ধকারে ডুবে যাক্, কিন্তু তুমি চলে যেওনা। এস, তুমি আরও আমার চোখের কাছে মুখ নিয়ে এস।’

আমি যন্ত্র চালিত পুতুলের মত তাহার চোখের আরও কাছে মুখ লইয়া যাইলাম। নির্মলা—আমার দিকে সন্তুষ্টনয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সেই ক্রীণ রক্তহীন হস্ত দুইখানি আমার স্বকের উপর হইতে নামাইয়া করবোড়ে সেই সুদূর নিশীথ গগনের এক প্রান্তে, তাহার সেই করুণাপ্রার্থী নয়নদ্বয় প্রেরণ করিল। আমি শুনিতে পাইলাম সে যেন অতি অম্পট স্বরে বলিতেছে—‘দয়াময়! তুমি রইলে আর আমার স্বপ্নের সার স্বপ্ন রইলো। দেবো! এই

যেন—'আর কিছু শুনিতে পাইলাম না।

আমি সাগ্রহে নির্মলার মুখের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম, তাহার ওষ্ঠদ্বয় মুহু মুহু কাঁপিতেছে আর জলভারাক্রান্ত চক্ষু দরদর বারার অশ্রু বর্ষণ করিতেছে।

তারপর নির্মলা অতি কষ্টে আমার চরণ-  
দ্বারা লইয়া নিজের মাথায় দিয়া কি যেন বলিবার প্রয়াস পাইল। আমি উদগ্রীব হইয়া তাহার মুখের কাছে কান পাতিয়া শুনিলাম, সে বলিতেছে,—‘হৃদয়দেবতা! আশীর্বাদ কর, তোমায় যেন জন্মজন্মান্তরে আবার পাই।’

তারপর? তারপর সব শেষ। নির্মলা ধামিনী গেল—ইহজন্মের মত বিদায় লইয়া ধামিনী গেল; বুঝিলাম, এ জগতে আর নির্মলার কথা আমি শুনিতে পাইব না। এক মুহূর্ত্ত পূর্বে সে আমার কাছে ছিল, তাই তাহার কথা শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু এখন সে যে বহুদূরে!—সে মরণ-সমুদ্রের পরপারে! আর কি তার কথা এ জীবনে আমি শুনিতে পাইব!

( ১১ )

নির্মলার মৃত্যুতে বুকিতে পারিলাম যে জগতে আর কিছু থাকুক আর না থাকুক মৃত্যু আছে। জ্ঞানপূর্ণের জীপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুকে উপহাস করিয়াছি; পিতার মৃত্যু ঘটয়াছে, মৃত্যুকে চিনিয়াও চিনিতে পারি নাই; তোলাদাদারও মৃত্যু ঘটিল, মৃত্যু লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াও হইল না; এইবার নির্মলা বলিল, মৃত্যুই অতিক্রম বুকিতে পারিলাম।

তাই, আজ সাধ হইল দেখি, ভাল করিয়া দেখি, মৃত্যু কি।

মৃত্যু চিত্র দেখিবার জন্য বিস্ময়িত-নেত্র্যে নির্মলার মুখের উপর চাহিলাম। কিন্তু একি! যাহা দেখিলাম সে ত মৃত্যু-চিত্র নয়! সে যে স্বর্ণ-ছবি! দেখিলাম, নির্মলার মুখমণ্ডলের উপর কেমন যেন এক দিবা জ্যোতির্বিগ্নিত পুণ্যময় দেশের হৃদয়-বিমোহন মূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!—যেন এই জীব-জগতের মহাশ্মানে অহোরাত্র পৈশা-  
চিক নৃত্যোন্মত্ত, সুখ-দুঃখ-ভয়-ক্লেদ-হিংসা-  
অভিমান সেই মোহময় শান্তির দেশে কোন এক কুহকীর কুহকদণ্ডের মুহূর্ণ্মর্মে হস্ত-চেতনা হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!—আর যেন এই সত্যত গুণায়মান সংসার-চক্রের উন্মত্তাঙ্গা ভ্রম-কঠোর স্বর্গের শব্দ সেখানে কোন এক মায়াময়ের বাহ্যমাত্র বহুমুখ নীরব গীতিতে পরিণত হইয়াছে। তাবিলাব, যে মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবকুল ভীত—সমুচিত—  
উৎকণ্ঠিত সেই মৃত্যুর চিত্র কি এতই সুন্দর! এতই মধুর! এতই মিলিত! এতই শান্তিময়! তাই বহি হয তপে—বিকার-প্রজ্ঞা গোপীর মত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া লঠিলাম—‘নির্মলা! নির্মলা! আমি আর এই নরক জগতের সুখ-মরীচিকার জুলিয়া থাকিতে চাহি না—চল, এখনই তোমার ঐ শান্তিময় আনন্দরাসে নিরে চল।’ এই বলিয়া আমি নির্মলার মৃতদেহের উপর আহুড়াইয়া পড়িলাম। একেবারে উৎকণ্ঠা শোক, দুঃখ, ও চিন্তার নিবারণ তখনা আনন্দ



দুর্বল মস্তিষ্ক সহ্য করিতে পারিল না।  
অচিরেই সমস্ত দেহ অবসর হইয়া পড়িল।  
ক্রমশঃই আমার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইতে  
লাগিল। আমি ধীরে ধীরে মোহাচ্ছন্ন হইয়া  
মাটির উপর গড়াইয়া পড়িলাম।

মোহাচ্ছোরে স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি  
একাকী এক বিধোরা যামিনীর ক্ষুতিভেদ  
অন্ধকারের ভিতরে কোন এক অপরিচিত পথে  
একটি ক্ষীণ আলোকের অন্তরঙ্গ করিয়া  
চলিয়াছি। ছুটিতে ছুটিতে ক্রমশঃ যেন এক  
কণ্টক-বন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ  
করিলাম। চরণ ক্ষত-বিক্ষত হইল, দেহে  
রক্তের স্রোত বহিল, তবুও আমি বিরত  
হইলাম না। এমন সময় কে যেন পশ্চাৎ  
হইতে আমার পৃষ্ঠে অঙ্গুলির দ্বারা আঘাত  
করিয়া বলিল,—‘সাবধান! ও আলিয়া,  
প্রকৃত আলো নয়। প্রকৃত আলো দেখিতে  
চাও ত বনের বাহিরে এস।’ আমি চতু-  
র্দিকে চাহিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম  
না। তখন ভাবিলাম, ‘সর্বনাশ! আমি  
এ আলিয়ার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কোণায়  
এসে পড়েছি। এখানে স.কেউ নেই! কে  
আমার হকে করবে? কে আমার এই নিপদ-  
সঙ্কল ভীষণ অরণ্যের বাহিরে নিয়ে যাবে?’  
ইহাৎ দেখিলাম ঠিক এই সময় কোথা হইতে  
যেন দুইটি মানুষ আসিয়া উপস্থিত হইল।  
একজন আমার সম্মুখে পথ দেখাইয়া চলিতে  
লাগিল, আর একজন আমার পিছনে সাহস  
দিতে দিতে আসিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)  
— জগদীশ্বর সিংহ রায়, এম, এ, বি, এল।

## বৈবস্বত মনু ।

ইতিপূর্বে আমরা পৃথিবীর ধর্ম্মরাজ্যের  
অধিপতি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিখিয়াছিলাম,  
এই প্রবন্ধে আমরা পৃথিবীর সামাজিক শাসন-  
কর্তার বিষয় আলোচনা করিব।

পৃথিবী একটি গ্রহ, ইহার নাম ‘বিষ্ণু’,  
এই বিষ্ণুকে কোন কোন স্থানে খেতদীপাধি-  
পতি বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর  
এই ত্রিমূর্তির বিষ্ণু ইনি নহেন। এই ত্রিমূর্তির  
অন্তর্গত বিষ্ণু আমাদের গৌরমণ্ডলের অধিপতি  
সুতরাং তিনি সূর্য্য, পৃথিবী ও অজ্ঞাত সমুদ্র  
গ্রহমণ্ডিত, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হইতে-  
ছেন ও আমাদের পৃথিবীর পালক বিষ্ণুর  
উপরে হইতেছেন। আমাদের পৃথিবীর রাজা  
এক গ্রহাধিপতিদেব হইতেছেন মাত্র। আমা-  
দের ব্রহ্মাণ্ডের স্তার অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও স্তারাদের  
অধিপতি ত্রিমূর্তিদের উপর একজন মহান  
পুরুষ আছেন, ইহাকে মহাবিষ্ণু বলা হইয়াছে,  
ইনি খেতবর্ণ চতুর্ভুজ। বনমালা শোভিত  
পাংদার ও কৌজুভমণি ভূষিত।

পৃথিবীর রাজা খেতদীপাধিপতি বিষ্ণু  
আমাদের পৃথিবীর একহুজাধিপ রাজা হইতে-  
ছেন, তিনি পৃথিবী সম্বন্ধে সকল বিভাগেরই  
কর্তা, অদীনস্থ দেবগণ ইহারই আজ্ঞাবহ,  
ইহার অধীনে বহুতর কর্মচারিবৃন্দ পৃথিবীর  
ব্যাপার পরিচালনে নিযুক্ত রহিয়াছেন, ইহার  
সকলেই মহান, অমিতশক্তির ও অসীম  
হইতেছেন, কিন্তু বিষ্ণু সকলের অপেক্ষা  
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

ধর্মরাজ্যের শাসনের কথা আমরা লিখিতে গিয়া বলিয়াছি যে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের উন্নতি করা ও নূতন ধর্ম স্থাপন করা এবং ধর্মপথের পথিকদের পরিচালনা করা সমস্তই এক বিভাগের কার্য, সেই বিভাগের উপর যিনি কর্তব্যচারী নিযুক্ত আছেন, তাঁহার নাম জগদ্রূপ ; কৌতুকগণ এই পদের নাম বোধিসত্ত্ব বলিয়া থাকেন। আমরা জানিতেছি যে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই পদে বহুকাল আক্ৰম্ব ছিলেন। তাঁহার উচ্চতর পদে উন্নতি হইবার পর হইতে ভগবান যৈত্রেয় ধর্মি এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইনি এখনও এই কার্যেই রহিয়াছেন এবং শীঘ্রই ইনি মর্ত্যলোকে নরদেহে প্রকাশ হইয়া সকল ধর্মের সাধক-গণকে নূতন শক্তিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র করিতে আসিতেছেন।

সামাজিক, নৈতিক, আন্তর্জাতিক শাসন-কার্যে উক্ত খেতদীপাধিপতি বিষ্ণুর অধীনে সর্বপ্রধান কর্তব্যচারীর নাম মনু। ভূমিকম্প, আগ্নেয় উৎপাত আদি, মানবজাতির ক্রমোন্নতি, নানাজাতির উৎপত্তি, জাতিবিশেষের ধ্বংস, নূতন রাজ্য ও সভ্যতা স্থাপন, প্রাচীন রাজ্যের ও সভ্যতার লোপ, যুদ্ধবিজ্রোহাদি ব্যাপার সমুদয় এই বিভাগে পর্যাবেক্ত হইয়া থাকে। এই বিভাগের কর্তব্যচারীর ইদ্রিতে মহাসমুদ্রে নূতন দেশের উৎপত্তি হয়, মহাদেশ ধ্বংস হইয়া অতল জলে ডুবিয়া যায়। কোন জাতি-বিশেষের উৎপত্তি হইয়া তাহার বিস্তার হইয়া শেষে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। মানবের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি গঠিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মহা-

জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। -মানবের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জাতিবিশেষের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া অল্প জাতির সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধান ও যুদ্ধে উদ্দেশ্যমত কোন জাতিবিশেষের জয় বা পরাজয় করান হইয়া থাকে, কোন কার্যই পৃথিবীর লোকেই ইচ্ছামতে হয় না।

ধর্মরাজ্যে যেক্রপ মানবের শিক্ষা ও পার-লৌকিক উন্নতির গঠন হয়, শাসন বিভাগে সেইক্রপে লোকের ও এই পৃথিবীর ইহলৌকিক সুখস্বচ্ছন্দ্যতার ও সামাজিক নৈতিক এবং আন্তর্জাতিক উন্নতি-বিধান করা হইয়া থাকে।

মনু আদর্শ মানব, প্রত্যেক মহাজাতির আদর্শ স্বরূপ এক এক জন মনু আছেন। প্রত্যেক মহাজাতির আকৃতি কোন এক বিশেষ প্রকারের হইয়া থাকে, অথবা সেই মহাজাতির অন্তর্গত সাত প্রকার শাখাজাতীর মানবদের আকৃতিরও অনেক বিভিন্নতা থাকে। এক চীনদেশবাসী লোকের সহিত একজন ইংরাজের আকৃতির তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই উভয়ের মধ্যে কতই প্রভেদ, ইহা হইতেই মহাজাতির মধ্যে গঠনের প্রভেদ ক্রিয় হইয়া থাকে বুঝা যায়। এক এক শাখাজাতিতে সেই মহাজাতির মূল গঠন বজায় রাখিয়া কোন অনির্দেশ্য কারণ ঘণ্টায় আকৃতির কোন প্রকার বিশেষত্ব উৎপাদন করা হইয়া থাকে। একজন জার্মানের সহিত একজন ইটালিয়ানের চেহারা তুলনা করিলে এই শাখাজাতি মধ্যে ক্রিয় আকৃতির বৈষম্য হয়—দেখা যায়। হুই জাতিই আর্ঘ্য নাদক

মহাজাতির শাখা হইতেছে। জার্মানরা পঞ্চম শাখাজাতি, ইটালিয়ানরা চতুর্থ শাখাজাতি।

জাপানী, আমেরিকাবাসী রেড ইণ্ডিয়ান নামক ভাষ্যবর্ণের জাতি, ও কবাইল জাতি, সকলেই চতুর্থ মহাজাতির লোক, কিন্তু জাপানীরা এই মহাজাতির সপ্তম শাখাজাতি, এই জাতির নাম মঙ্গোলিয়ান, আমেরিকার ভাষ্যবর্ণ জাতি চতুর্থ মহাজাতির টলটেক নামক তৃতীয় শাখাজাতির অন্তর্গত, কবাইল জাতি আকতিয়ান নামক চতুর্থ শাখাজাতি হইতেছে। কিন্তু এই সকল চতুর্থ মহাজাতির কাল বহু পূর্বে শেষ হইয়া যাওয়ার এই জাতির লোকে-দের ভিতর খাঁটি গড়ন আর মিলে না। অন্যান্য জাতির সহিত বিবাহাদি স্ত্রে মিশ্র গঠন হইতেছে।

আমাদের বর্তমান আর্ধ্যজাতির বৈবস্বত মনু নিখুত চেহারা, ইহাতে এই জাতির বৈরূপ গঠন হওয়ার—অমার্যাক বিস্তার ইচ্ছা ও তিনি যে আদর্শ এই মনুকে দেখাইয়াছিলেন তাহাই পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। আর্ধ্যজাতির একপে অতুল্য কাল চলিতেছে ও বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। আর্ধ্যজাতি পঞ্চম মহাজাতি, এই মহাজাতি হইতে পাঁচটি শাখা-জাতির উদ্ভব হইয়াছে, আর দুইটি শাখাজাতির উৎপত্তি হইতে এখনও বাকি আছে। হিন্দু-জাতি ইহার প্রথম ও প্রধান শাখাজাতি, জার্মান জাতি ইহার দ্বিতীয় শাখা, তৎপরে ইরানিয়ান জাতি তৃতীয়, তৎপরে কোলটিক জাতি চতুর্থ, এবং টিউটন জাতি পঞ্চম শাখা-জাতি হইতেছে। বর্তমান শাখাজাতি আমেরিকার

অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেটস নামক স্থানের কালিকর্ণিরা প্রদেশে আবর্তিত—বিজ লোকে ইহা অনুভব করিতেছেন।

এখানে অপর্যাপ্ত মহাজাতি ও শাখাজাতি লব্ধ হই এক কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথম দুই মহাজাতি পৃথিবী হইতে একে-বারে লোপ পাইয়াছে। তৃতীয় মহাজাতির নাম লেয়ুরিয়ান, ইহাদের বাসস্থান লেয়ুরিয়া নামক মহাদেশে ছিল। এই মহাদেশের একপে প্রশান্ত মহাসাগরের তলে প্রায় সমুদয় অংশই গিয়াছে; এই জাতির খাঁটি আকৃতি মেলা হ্রদ, নিম্নোজাতি অনেক অসবর্ণ বিবাহে মিশ্রিত হইয়া কতকটা জাতীয়তা এখনও রক্ষা করিতেছে। চতুর্থ মহাজাতির নাম আটলান্টিয়ান মহাজাতি। ইহারা আটলান্টিস নামক মহাদেশে বাস করিতেন। ইউরোপের পশ্চিম অংশ, আফ্রিকা ও আমেরিকা জুড়িয়া আটলান্টিক মহাসাগরের স্থলে এই মহাদেশ ছিল। প্রথম শাখাজাতির নাম রোমোহাল, টলা-ভাটনি। দ্বিতীয় শাখাজাতি, টলটেক তৃতীয়, টুবানিয়ান চতুর্থ, সেমিটিক পঞ্চম, আকতিয়ান ষষ্ঠ ও মঙ্গোলিয়ান সপ্তম শাখাজাতি মধ্যে পরি-গণিত।

বর্তমান মহাজাতি হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর বিলম্ব আছে, কিন্তু এই জাতি যে মহাদেশে বাস করিবেন, তাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে যেখানে লেয়ুরিয়া মহাদেশ ছিল, কতকটা সেই স্থান লইয়া নূতন দেশ গঠিত হইবার সম্ভাবনা বন ভূমিকম্প হইতেছে, ও খাঁটি জাতির উদ্ভিভেছে। এই সকল

মহাদেশকে আঁচাদের পুরাণে এক এক দ্বীপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেতদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, প্লকদ্বীপ ইত্যাদি। “সপ্তদ্বীপা মেদিনী” অর্থে সাত মহাজাতির সাতটি মহাদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বৈবস্বত মনু আমাদের মনু, আমরা বৈবস্বত মনুর বংশধর। মনুর প্রধান কাৰ্য্য এক মহাজাতির সৃষ্টি করা ও সেই জাতিকে নানাপ্রকার শিক্ষার দ্বারা কতকটা সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়া। মহারাজ পৃথিবীপতি আৰ্য্যজাতির যে আদর্শ দিয়াছেন, সেই আদর্শ মত আকারে মানুষ গঠন করার জন্য ইহাকে অনেক বাটিতে হয়। প্রথমতঃ তিনি কতকগুলি লোক পূর্বজাতি হইতে বাছিয়া লয়েন, তাহাদের কোন এক স্থানে নানা আপদ-বিপদ, আকস্মিক ঘটনা ইত্যাদি সূত্রে আনিয়া একত্রে বাস করান; ক্রমে তাহাদের সহিত চতুঃপার্শ্বের লোকের সন্ধক আদি ঝাকা বন্ধ করেন, তাহারা যেন কোন কারণে ইতর্প (দেশান্তরিত) হইয়াছেন ও অন্য লোকের সহিত মেশামিশ করিতে নিবেধ অজ্ঞা পাইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় পড়িয়া যান। পরে ইহাদের বংশে মনু বয়ঃ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সেই লোকদের মধ্যে প্রধান হইয়া আবশ্যকীয় বিধি নিবেধ রূপ সামাজিক রীতিনীতি প্রচার করেন। বিবাহাদি করিয়া সন্তান উৎপাদন করেন, তাহার পুত্রগণ তাহার অনেকটা অনু-রূপ হইলেন, এইরূপে সেই মহাজাতির আদর্শের দিকে মানব ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে।

এই বিত্তীয় আটলান্টিক মহাদেশ হইতে

নানা স্থানের নানা লোককে একত্রিত করিয়া ভবিষ্যৎ আৰ্য্যজাতি গঠনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজে জন্মগ্রহণ ও সন্তান-সন্ততির দ্বারা উহাদের লোক বৃদ্ধি করিবার পর প্রায় খৃষ্ট জন্মিবার লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনি জাতিকে একেবারে অজ্ঞান জাতি হইতে পৃথক করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের এক দ্বীপে আনিয়া বাস করান। খৃষ্টপূর্ব ৭৭২৭ সালে আফ্রিকার মধ্য দিয়া এই লোকদিগকে তিনি আরব দেশে লইয়া আসেন, আরবদেশে কিছুকাল বসবাস করেন। এই সময়ে ইহারা বৈবস্বত মনুর মত সাক্ষাৎভাবে পালন করিতেন, ইহাদের কোন কারণে আবশ্যক হইলে আবহমানমাত্র মনু প্রকাশ হইয়া বৃষ্টি আদেশ দিতেন।

পরে এই দেশ হইতে যেখানে এখন সাইবেরিয়া দেশ দেখিতে পাই, তাহা তৎকালে চটান সমুদ্র ছিল, এই সমুদ্রের তীরে ইহাদের লইয়া আসেন, এখান হইতে গোবি নামক সমুদ্র তীরে লইয়া আসেন, এই গোবি সাগর এক্ষণে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এইখানে আৰ্য্যজাতির বিশেষ জীবিত হইতে লাগিল। বংশ বৃদ্ধি হইয়া আৰ্য্য নামক এক জাতি হইল। ইহাদের মধ্যে যাহাদের যতি গতি, আকার অবয়ব বিসদৃশ হইয়া পড়িল, তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া পরস্পর যুদ্ধ দ্বারা ধ্বংস করা হইত। কোন কোন লোক দলবদ্ধ হইয়া অন্যত্র চলিয়া বাইরা ক্রমে মাশ প্রাপ্ত হইত। এইরূপে সুদীর্ঘকাল গড়া-ভাঙ্গা করিয়া কতকটা আদর্শ অনুরূপ মানবের গঠন হইয়া উঠিল।

পৃথিবীর ষাট হাজার বর্ষ কালে আৰ্য্যজাতি  
একটী বহু জাতিরূপে পরিগণিত হইল।  
এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত, সুদভা, শিক্ষিত  
জাতির লোক তৎকালে পৃথিবীতে বিরল  
হইয়া পড়িল।

সময় সময় উপনিবেশ স্থাপন জন্ত বৈবস্বত  
মহু এই স্থান হইতে দলে দলে লোক বাহির  
করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই দলের  
কর্তা হইয়া তিনি প্রায়ই নিজে যাইতেন।  
প্রথমে তিনি আরব দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন  
করেন, দক্ষিণে আফ্রিকা পর্য্যন্ত ইহাদের  
বিস্তৃতি হয়। অপর এক দল আসিয়া পারস্ত  
দেশে রাজ্য স্থাপন করেন। এক দল ইউ-  
রোপের দিকে বাইয়া গ্রীক ও রোমীয় রাজত্ব  
স্থাপন করেন, অপর এক দল ইউরোপের  
অংশে বাইয়া জাৰ্মান ও ইংরাজ প্রভৃতি  
জাতির সৃষ্টি করেন ও রাজত্ব স্থাপন করেন।  
শেষে গোবিত্তে আৰ্য্যজাতির অবশিষ্ট বাহারা  
ছিলেন, তাঁহাদের তিনি ভারতবর্ষে লইয়া  
আসেন। ইহারা ভারতবর্ষে আসিয়া এই  
দেশ জয় করিয়া অতি উচ্চ প্রকারের সভ্যতার  
বিস্তার করেন। এই সভ্যতার ব্যবস্থাদি  
সমুদয়ই বহু কর্তৃক প্রচারিত বলিয়া আজও  
চলিয়া আসিতেছে। মহুসংহিতা এই সমস্ত  
বিবিধে পরিপূর্ণ। এখন সামাজিক ও নৈতিক  
বিধি-ব্যবস্থার সম্পূর্ণতা আর কোথাও নাই।  
সীহারা মহুসংহিতা বুঝিতে উচ্চা করেন, তাঁহারা  
জাতির সেন্টাল হিন্দু কলেজের অধ্যাপক  
জি. কলকরবানদাস এম-এ কৃত "Science of  
Social Organisation" নামক গ্রন্থ পড়িবেন।

আৰ্য্যজাতির এই সকল নীতি দেশবাসী  
সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা এখানে স্থানান্তর। বাহারা  
সুদীর্ঘ কাল পূর্বের এই সকল ব্যাপার পাঠ  
করিতে কৌতুহলী হইবেন, তাঁহারা থিরজফিট  
নামক মাসিক পত্রিকায় "অ্যালসিওনির  
ত্রিশটি জন্ম বিবরণ" নামক প্রবন্ধগুলি পড়িতে  
পারেন। এইরূপে আৰ্য্যজাতি গঠনের জন্ত  
মহুকে যে রূপ দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম  
করিতে হয়, তাহার বর্ণনা এখানে বিশেষরূপে  
করা হইল না। তবে এটুকু বলা চাই যে  
প্রত্যেক যাত্রার পূর্বে আৰ্য্যজাতির লোক  
সকলে গোবিত্তীরে উপস্থিত হইয়া মহু প্রভৃতি  
কর্তৃপক্ষদের আহ্বান করিতেন, এই আহ্বানে  
তাঁহারা সশরীরে আবির্ভাব হইতেন। এক  
সময়ের ঘটনান্তে আমরা পড়িলাম, শুক্র-  
লোক হইতে যে মহাপুরুষ পৃথিবীতে মানব  
জাতির কল্যাণের জন্ত আসিয়াছিলেন, সেই  
মহারাজ সনৎকুমার ও মহু এবং জগদগুরু এই  
তিন জনে আবির্ভাব হইলেন, এবং যাত্রা  
বাহাতে শুভ হয়, এরূপ আশীর্বাদ করিয়া  
অস্তর্ধান হইলেন। তৎকালে দেবগণ এরূপে  
আহ্বান মাত্রে আসিতেন ও তাঁহাদের তখন  
মূল চক্ষে দর্শনযোগ্য শরীর হইত।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, এক্ষণে বর্ত্ত  
শাখাজাতির সৃষ্টিকার্য্যে আমাদের মহু ব্যস্ত  
রহিয়াছেন, এই জাতি হইতেই পরবর্ত্তী মহু  
তাঁহার বর্ত্ত মহাজাতির জন্ত লোক বাছিয়া  
লইবেন। আমরা আরও জানিয়াছি যে,  
মাত্রাজের থিওলজিক্যাল সোসাইটির প্রবর্ত্তক  
হই জন জীবনুত ববিদের মধ্যে একজন

পরবর্তী মনু হইবেন ও অপর একজন অগদগুরু হইবেন। পাঠকগণও ইচ্ছা করিলে আপনাদের এমনভাবে গঠন করিতে পারেন যে, এই পদ তাঁহাদের লভ্য হইতে পারে।

পূর্বে যে “অ্যালসিওনির ত্রিশটি জন্মের বিবরণ” নামক প্রবন্ধের বিষয় বলিয়াছি— তাহাতে আমরা এই দুই মহাপুরুষ কি অবস্থায় কোন্ দেশে কিরূপ বংশে জন্ম লইয়া কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়া ও কিরূপ কার্য করিয়া আসিয়া শেষে জীবমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও মনুর কাজ করিবার যোগ্য হইয়াছেন, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত দেখিতে পাই।

অগদগুরুর প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে মৈত্রেয় ঋষি অগদগুরুর পদে অতিবিক্ত হইয়া হিমালয়ে বাস করিতেছেন; এবং তিনি নিজ শরীরকে যোগাগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়া বহুকাল হইতে বজায় রাখিয়াছেন, তাহার এই যোগাগ্নি-সজ্জত দেহ বহুকাল স্থায়ী হইয়াছে ও তাহা চক্ষুর দর্শনযোগ্য। সেইরূপ আমাদের বৈবস্বত মনুও হিমালয়ে অগদগুরুর আশ্রয়ের অনতিদূরে থাকেন ও তাহার দেহও দর্শনযোগ্য। যিনি দেখিয়াছেন—তিনি বলেন, ইনি অগদগুরুর বাটীতে মথো মথো আসিয়া থাকেন। ইনি দেখিতে অতি সুপুরুষ, ইনি পুরুষোত্তম ও পুরুষসিংহও বটে। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের আদর্শ যিনি, তাহার আকৃতি সুন্দর ত হইবেই। বন্ধোপরি কটা ও বর্ণবর্ণের সুদীর্ঘ কেশরাশি বুলিতেছে, সিংহের কেশরের দ্যায় জটা সেই পুরুষসিংহের

অনতিক্রম্য শক্তি ও ভক্তের আধার নিরোধে লম্বান রহিয়াছেন। আকৃতি অতি পরাক্রান্ত নৃপতির দ্যায় শৌর্যশোভিত, চক্ষু দুইটি ঈশল পক্ষীর চক্ষের দ্যায় জ্যোতিতে পূর্ণ, বর্ণবর্ণের আলোক দীপ্তি পাইতেছে।

যখন আমরা দেখি, দেশ যুদ্ধ হেঁচু বিপর্যস্ত হইতে বসিয়াছে, রাজ্য টলমলমান হইতেছে, সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অদূরে গুরুতর পরিবর্তন সম্ভাবনা হইয়াছে, তখন আমাদের বিচলিত হইবার কারণ নাই। আমাদের তখন বুঝা উচিত, মনু বৈবস্বত প্রয়োজন, যেরূপ মানবজাতির উন্নতি হইবে, তাহাই করিবার জন্য তাহারই ইচ্ছায় এই সকল আসিয়াছে, তিনি সূত ভবিষ্যৎ সকলই জ্ঞাত আছেন এবং সর্বদা সকল সময়ে তিনিই আমাদের নেতা। বর্তমান সময়ে সভ্যতার প্রত্যন্ত পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে, সেইজন্যই এই মহামারী রূপ উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার ফলে মচরাচর লোকে যেমন মনে করিতেছেন, যে ইউরোপের ধ্বংসাবস্থা হইবে তাহা নহে, বর্তমান যুদ্ধের ফলে মানবজাতি নবজীবন লাভ করিবে। এই উদ্দেশ্যেই বৈবস্বত মনু কর্তৃক ইউরোপীয় মহা সমরের অবতারণা হইয়াছে।

মনু কথাটা আমরা ভুলিয়া গাইতে বসিয়াছি, পত্রিকাতে মনুর অধিকার কাল লিখিত থাকে, তাহা আমরা আর বিশ্বাস করিতে পারি না, এজন্য এই প্রবন্ধে কতকটা আমরা আলোচনা করিলাম এবং তাহার অতিশয় সম্বন্ধে ইহার সাক্ষ্য তাহাকে দেখিয়াছেন, তাহারই লিখিত প্রবন্ধ হইতে কতকটা বর্ণনা দেখা

হইল।

সর্বভরতু দুর্গাণি

সর্বো ভদ্রাণি পদ্মতু ।

সর্বঃ সুখমবাপ্নোতু

সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু ॥

লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্ত ।

ঐকান্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্ ।

## পৌরাণিক পঞ্চ পুষ্প ।

(ধর্ম্মমূলক পাঁচটা ক্ষুদ্র গল্প ।)

নাম-মাহাত্ম্য । (১)

সে অনেক দিনের কথা । অরণ্যভীত কালে মহাবোণী মহেশ্বরের কণ্ঠে এক ছড়া হাড়ের মালা ছিল । ভোলানাথ শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া মড়ার হাড় কুড়াইয়া এ সাধের মালা ছড়াটি গাঁধিয়া আপন কণ্ঠে পরিয়াছিলেন ! এ মালায় শক্তি অনন্ত, গুণ অপূর্ণ, প্রভাব অশোকিক ! ইহা সর্বসিদ্ধিপ্রদ মহা রত্ন ; ইহা মহা বৈরাগ্যের অঙ্গস্ত চিহ্ন, অনন্ত দৈত্যের চরম নিবর্ধন, বিষয়-ভ্যাগী শ্রাবণবানীর অপূর্ণ অকাজরণ ।

এই অস্থিময় হারের অসাধারণ গুণের কথা কাষ্ঠিক-গণেশের অজ্ঞাত ছিল না । তাঁহার এ মালা ছড়াটির শক্তি ভালরূপই জানিতেন । একদিন উত্তর ভ্রাতা মিলিয়া এই হারের নিমিত্ত পিতা মহাদেবের নিকট মহা আদ্যার জুড়িয়া দিলেন । দুইজনের কেহই সে মালা ছড়াটি না লইয়া ছাড়িবেন না, এমন তাঁহাদের আন্তরিক জেহু—এমনি তাঁহাদের চর্য্যের আদ্যাক্ষ ।

মহাদেব প্রমাদ গণিলেন । একগাছি মালা তিনি কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে দিবেন ? উভয়ের আদ্যার অত্যাচারে তাঁহার ষোণের বড়ই ব্যাখাত হইতে লাগিল । অগত্যা তিনি বলিলেন, “তোমাদের দু’জনের মধ্যে অন্যই পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, আমি এ হার তাঁহাকেই প্রদান করিব, সূর্য্যাস্তের পর আসিলে কেহই ইহা পাইবে না ।

কাষ্ঠিকের বাহন ময়ূর ; আর গণেশের বাহন ইঁহর । ইঁহর ময়ূরের ত্রায় ক্ষুণ্ণগমনে চির অসক্ত । তাই পিতৃ-বাক্য শুনিয়া কাষ্ঠিকের প্রাণ বিজয়-উল্লাসে নাচিয়া উঠিল । তিনি অবিলম্বে ময়ূর বাহনে ভূতীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন । শিখীরাঙ্গ উখাত ছুটিস । আর গণেশ নৈরাশ্রের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পিতৃপদ-প্রান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

গণপতি সহস্র ভগ্নহৃদয় প্রণয়ীর ত্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া উঠিলেন ! অনন্তর তিনি “হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !” বলিয়া মধুর ধ্বনিতে দশ দিক পূর্ণ করিয়া খোল-করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া হরি-সঙ্গীত করিতে লাগিলেন । অহো কি মধুর—কি মনোমদ ঐ হরিধ্বনি !

গণেশের ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, এ জগতের কোন ভাবনা চিন্তাই যেন নাই ; তিনি বিশ্ব ভুলিয়া অবিরত গাইতেছেন, “হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !—হরি হরিবোল !” অহো ! বেণু-বীণা-বিনিমিত সে স্বরতরঙ্গে এ বিরাট বিশ্ব পরিপূর্ণ হইল যে ! এমন তাহে

ভোলা-প্রাণ খোলা! হুরসদীত এজগতে বুঝি  
আর কেহ শুনে নাই! কে জানে ঐ নামের  
তিতর কি আছে? নাম শুধা পানে বিশ্বপ্রাণী  
কুড়াইল যে।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়! গগণতির হরি-  
সদীতের আর বিরাম নাই; তিনি বাহুজ্ঞান  
হীন হইয়া মনে-প্রাণে অবিরত কেবলই হরি-  
সদীত করিতেছেন? কাঞ্চিক পৃথিবীর যাবতীয়  
ভীৰ্ষ ভ্রমণ করিয়া তখনও গৃহে প্রত্যাগমন  
করিতে পারেন নাই। সহসা হরিনামযুক্ত ভোলা  
মহেশ্বর ছুটিয়া আসিয়া প্রেমভরে গণেশকে  
ক্রোড়ে ধারণপূর্বক সেই সর্কসিদ্ধিপ্রদ মালা  
ছড়াটি গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, “বৎস!  
বহুক্ষণ তোমার বিশ্বভীৰ্ষ পর্যটন শেষ হইয়াছে;  
তাই ভিখারীর সর্কস্থলন এই মহা গুণশালী  
মহাশক্তির মহাসিদ্ধির মালা তোমাকেই প্রদান  
করিলাম। কারণ যেখানে হরি-প্রসঙ্গ—হরি-  
সদীত হয়, পৃথিবীর যাবতীয় ভীৰ্ষ তথায়  
অবস্থান করিয়া থাকে। যথা:—

“তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী

তত্র সরস্বতী চ।

সর্কানি ভীষণি বসন্তি তত্র যত্রাচাতো-

দারকথাপ্রসঙ্গঃ ॥”

হরি! হরি! হরি! হরিনামের কি অনন্ত  
শক্তি—কি অসাধারণ প্রভাব! নামের শুণে  
আজ কর্ণকল পরাভূত হইল—গণেশ বরে  
বসিয়া বিশ্বভীৰ্ষ ভ্রমণের মহা ফললাভে ধস্ত  
হইলেন।

আহা! এ বিশ্ব হরিনামেই মা একদিন  
পদ্মা উর্জান বহিভ, ভাবাবেশে পঞ্চপদী

অজ্ঞপাত করিভ, পাষণ গলিভ, ঐটেভ  
মহাপ্রভুর সোণার অঙ্গ মাটিতে গড়াইভ।  
যাহার নামের এত গুণ—এমন উদ্ভাদিনী শক্তি  
না জানি তিনি কেমন! পাণী-পাষণ বলিয়া  
কি তাহার দর্শন মিলিবে না?

“ডাকলে তাঁরে প্রেমভরে,

স্নেহে হরি পার করে।”

পাণী-তাপীর প্রতি যে তাহার অসাধারণ  
স্নেহ-মমতা। তিনি যে পতিতপাবন।  
তাঁহার এত দয়া বলিয়াই তিনি বিশ্বপ্রাণীর  
প্রাণের ঠাকুর—হৃদয়ের ধন—আরাধ্য দেবতা!  
বল, সাধক! প্রেমভরে একবার “হরিবল”।

—০—

নাম-প্রভাব। (২)

পূর্বকালে এদেশে এক রাজার একটা মাত্র  
পুত্র ছিল। রাজা-রানীর নিকট সে পুত্র “সাত  
রাজার ধন এক মাণিকের” চেয়েও মহারাজ।  
সহসা রাজপুত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন।  
কত চিকিৎসক দেখিলেন, কত ঘৃণাধান  
ঔষধও ব্যবহা হইল, কত সেবা-শ্রদ্ধা চলিল,  
কিন্তু রাজপুত্রের বিবম ব্যাধি আর কিছুতেই  
আরোগ্য হইল না। রাজকুমার বুঝি আর  
প্রাণে বাঁচিলেন না, শত অরিষ্ট লক্ষণ দর্শনে  
চিকিৎসকগণ রোগী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া  
গেলেন।

বিপদে ঐমধুস্থলন। সহসা নৃপতির মনে  
ঐতগবানের নাম-মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ হইল;  
কে যেন তাঁহার কর্ণমূলে বলিয়া গেল,  
“হরিনামের ভায় এমন মহৌষধ আর নাই,”  
তাই তিনি নগরবর অবিরাম হরিসদীতের



আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন। অচিরে  
রাজ্যের প্রতিপালিত হইল “হরিবোল!  
হরিবোল!” যবে রাজার রাজ্য সুখরিত হইয়া  
উঠিল।

এদিকে রাজপুরীর চতুর্দিকে অবিচ্ছেন  
 ভাবে ভুলগীরক রোপিত হইল। সেই পবিত্র  
 ভুলগী বনের কেন্দ্রেস্থলে রাজকুমারকে রাখিয়া  
 তাঁহার চারিদিকে অবিরত হরিসংকীৰ্ত্তন করা  
 হইতে লাগিল।

তিনি দিম অতীতপ্রায়। রাজ্যময় কাহারও  
আহার নাই, নিদ্রা নাই—মর জগতের কোন  
ভাবনা-চিন্তাই যেন নাই। সকলেই হরিনাম  
কীর্তনে উগ্ৰস্ত। তখন সকলে দেখিল, রাজ-  
পুত্রের দেহে কোনরূপ ব্যাধির লক্ষণই আর  
নাই; তিনি স্বস্থ-সবল দেহে ‘হরিবোল!’  
‘হরিবোল!’ বলিয়া নৃত্য করিতেছেন!  
এমাত্রে প্রবাহে তাঁহার বক্ষ সিক্ত হইতেছে।  
এ অপূর্ণ দৃষ্ট দর্শনে সকলেই বিম্বিত হইয়া  
‘হরিবোল!’ ‘হরিবোল!’ বলিয়া প্রেমভরে  
কুড়লে অবলুপ্ত হইতে লাগিলেন। হরিনামের  
এমনি গুণ।—এমনি অপূর্ণ অনন্ত মাহাত্ম্য!

এস, ভাই সকল! ভব ব্যাধির হাত  
হইকে মুক্ত হইবেত প্রাণ তরিয়া সদা 'হরি  
হরি' বলিয়া ডাক। সুখে-দুখে অবিরত বল,—  
হরিবোল। হরিবোল। হরিবোল। বল,—

**“কেবল যাত্রা হরিষোল !**

हरिवोण ! हरिवोण ! हरिवोण ! हरिवोण !

କେବଳ ଯାତ୍ର କରିବେନା !

ਜਾਨ ਨਾਹੈ ਬਲ ਨਾਹੈ,      ਭਲ ਨਾਹੈ ਬਲ ਨਾਹੈ,

କେବଳ ନାୟକ ବନ୍ଧିବୋଲ ।

যে দিকেতে চাই,                      দেখিবারে পাই,  
কেবল মাত্র হরিবোল !  
হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !  
কেবল মাত্র হরিবোল !”

— ● —

### ভক্তির অভিমান । (৩)

সারথী করিয়া তাঁহার আড়ালে থাকিয়া আশ্রয় করা হই কি তাঁহার ভগবন্তের পরিচয় ? তাঁহার ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হইলে কখনই ঐরূপ করিতে পারিত না । অর্জুনের সৃষ্টি-বশ্ন ভাঙ্গিল, ভক্তির অভিমান দূর হইল । তিনি বুঝিলেন—ভগবানকে ভালবাসিতে হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, চাই নিরভিমান ভক্তি—চাই আশ্র-বিসর্জন ।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, একদিন তাঁহার মনে এই অভিমান হইয়াছিল, তিনি ভাবিয়া-ছিলেন, “আমার মত ভক্ত বুঝি ভগবানের আর কেহ নাই,—আমিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ।” তাই ভগবান এই মায়ার-বশ্নের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন । এবং ও প্রজ্ঞাদের ভক্তি, প্রজ্ঞা-ভক্তি, তাহাতে কোনও দোষ নাই, তাহারা জানিতেন যে, সর্ব-শক্তিমান ভগবানের শত্রু-মিত্র নাই—সামান্য বস্ত্র ব্যাঘ্র বা হিরণ্যকশিপু তাঁহার কি করিতে পারে ? তাই তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছিলেন । অর্জুনের ভগবন্তভক্তিও ঐরূপ দোষ-কলুষ সম্পর্ক শূন্য । শুধু ভক্তের ভক্তির অভিমান চূর্ণ করিবার নিমিত্তই ভগবানের এই মায়ার-বশ্ন সৃষ্টির অদ্ভুত খেলা ! ইহা ভগবানের অপার কৃপা ।

অর্জুন বাট্ট হইয়াছিলেন, পূর্ব-অভিমানে অর্জুন বাট্ট হইয়াই বলিয়াছিলেন, “শিষ্ট-২৩২ঃ সাদি মাং বাং প্রণয়ন ।” “সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার অমির যত্ন উপদেশে তাঁহার প্রিয় সখা অর্জুনের জ্ঞানেন্দ্র পরি-স্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন । অভিমানশূন্য না

হইলে ভগবৎ চরণ লাভ করা যায় না । অভি-মান ত্যাগ বড় শক্ত কাজ । তাই ভক্ত ভগবানের এত প্রিয় । তাই ! যদি শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিতে—তাঁহার শ্রীচরণ লাভ করিতে চাহ, তবে অভিমান ত্যাগ করা ।”

অহঙ্কারী পাপী যারা,

তাঁহার নাগাল পায় না তারা,

দীনজনের বহু তিনি সকলে জানে ।”

—•—

ভক্তের ভগবান । (৪)

“ভক্তি হীন নর সুখাদিলে সুখাই নারে,

ভক্তজন বিষ এনে দিলে খাই ।”

সুদামা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-সখা । সুদামা ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত । কিন্তু তিনি বড় দরিদ্র । বড় কষ্টেই তাঁহার জীবনের দিন-গুলি অতিবাহিত হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায় রাজা হইয়াছেন, আর পণ্ডিত সুদামা অন্ন-বস্ত্রের কাল্পাল—তাঁহার হৃৎকের অবশি নাই !

একদিন ব্রাহ্মণ-পত্নী বলিলেন,—‘দেখ, তুমি এত বড় পণ্ডিত অথচ পয়সা কড়ি উপা-র্জন করিতে পার না ! আমাদের যে হৃৎক চিরকাল সেই হৃৎকই যদি থাকিল, তবে আর তোমার এত লেখাপড়া শিক্ষার লাভ কি ? একবার কিছু অর্থ অর্জুনের নিমিত্ত যত্ন করিয়া দেখিলে হয় না ?’ পণ্ডিত বলিলেন, ‘আমার বিজ্ঞা এত তুচ্ছ নয় যে, সে বিজ্ঞা সাধারণ অর্থ উপার্জনার্থ নিয়োগ করিব ?’ ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন, “তাল, তুমি তোমার বিজ্ঞা দ্বারা অর্থ লাভ করিতে চাহ না, আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ

তোমার বালাবন্ধু, তিনি একজন দারকার রাজা, তুমি একবার তাঁহার নিকট বাও না কেন ? সুদামা বলিলেন, 'ভগবানের সহিত আমার লগ্ন্যভাব আছে বলিয়া, আমি তাঁহার নিকট তুচ্ছ টাকাকড়ি প্রার্থনা করিতে যাইব ? ভগবন্তক্তি কি এতই সাধারণ পদার্থ যে, তদ্বিনিময়ে সামান্ত অর্থ প্রাপ্ত হইতে যত্ন করিব ? আমার দ্বারা তাহা হইবে না।' ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'আমি তোমাকে তাঁহার নিকট যাইয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে বলিতেছি না ; তিনি তোমার বন্ধু, বন্ধুর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ত দোষ নাই ! তুমি শুধু সাক্ষাৎ যাত্রা করিলে, তোমাকে তাঁহার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিতে হইবে না, তাহাতেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।'।

পত্নীর কথায় ব্রাহ্মণ বস্ত্রাঞ্চলে কিঞ্চিৎ ততুল কণা বাঁধিয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণ দর্শনার্থ দ্বারকাভিমুখে রওনা হইলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকার রাজদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারকাধিপতিকে দ্বারবান দ্বারা দ্বীপ আগমন-সংবাদ প্রদান করিলেন। রাজ-ভবনের অতুল ঐশ্বর্য ও অতুল শোভা দর্শনে তিনি ভাবিলেন, যিনি এ অতুল সম্পদের অধিকারী, তাঁহার কি আমার দ্বার একজন দরিদ্র বালাবন্ধুর কথা শ্রবণ থাকিতে পারে ? হয় ত এ দীর্ঘকালে তিনি আমাকে ভুলিয়াই বা গিয়া থাকিবেন ! দারুণ হৃদিতার ব্রাহ্মণ বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন রত্নবর সিংহাসনে উপবিষ্ট, কল্পিণী ও সত্যভামা তাঁহার পদ-

সেবার নিয়ত। অন্তর্যামী ভগবান সহসা বালা-সংহার আগমন-বার্তা প্রাপ্তে অমৃতব করিয়াই দৌড়িয়া দ্বারে উপনীত হইয়া বন্ধুকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তখন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামার কত যত্ন ! কল্পিণী ও সত্যভামা তাঁহার পদধৌত করিয়া দিলেন। ভগবান বন্ধুকে স্বর্ণাসনে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে বাজন করিতে করিতে কত কথা কহিতে—কত মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় ভগবান বলিলেন, 'ভাই, বহুদিন পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, লোকে বন্ধুকে কত উপহার প্রদান করিয়া থাকে, আমার লজ্জা তুমি কি আনিয়াছ ? যাহা আনিয়াছ শীঘ্র দাও, উহা দেখিবার লজ্জা আমার বড় কোতূহল হইয়াছে। সুদামা বড় দরিদ্র, রাজ-বন্ধুকে উপহার দিবার মত মূল্য-বান দ্রব্য ত সে আনিতে সমর্থ হয় নাই ! শুষ্ক বস্ত্রাঞ্চল হইতে ততুল-কণাগুলি খুলিয়া ভগবানের হস্তে উৎসর্গ করিলেন। ভগবান সাদরে তাহা হাত পাতিয়া লইয়া প্রীতির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনগ্রাস ততুল-কণা ভক্ষণ করিয়া যেই চতুর্থ গ্রাস গ্রহণোত্তম হইয়াছেন, অমনি কল্পিণী ও সত্যভামা যুগপৎ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, প্রভু ! করেন কি ? বন্ধু প্রদত্ত ততুল-কণা আর খাইবেন না, প্রথম গ্রাস গ্রহণ করিয়া আপনি কাদালকে স্বর্ণায় সম্পদ দান করিয়াছেন, দ্বিতীয় গ্রাসে মর্ত্যের এবং তৃতীয় গ্রাসে পাতালের ঐশ্বর্য প্রদত্ত হইয়াছে ! তিন গ্রাসে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য

তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। আর কি আছে ? তাঁহাকে আর কি দিবেন ? চতুর্থ গ্রাস গ্রহণ করিলে যে, আমাদেরকেই তাঁহার সেবার দত্ত বাইতে হইবে। আমরা কি এমন অপরাধ করিয়াছি যে, বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্যে আসিয়া প্রভু, তোমার পদসেবায় বঞ্চিত হইব ? তখন ভগবান বজ্র-প্রদত্ত তণ্ডুল-কণা ভক্ষণে বিরত হইয়া নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। একটা কথা আছে যে,—

“যে করে আমার আশ,

আমি করি তার সর্কনাশ,

ভবু যে করে আমার আশ,

আমি হই তার দাসের দাস।”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রীদামাঃ সহিত ব্যবহারে একথা বেশ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের কি অপার করুণা,—কি অপরিমিত স্নেহ-ভালবাসা ! একজন্মই বৃষ্টি ভক্ত ভগবানকে প্রাপ্ত হইলে, আর ছাড়িয়া দিতে চাহে না—চিরদিন স্তব-মন্দিরে রাখিয়া পূজা করেন। তাই ভক্ত কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন,—

“ঈধুহে ছাড়িয়া নাহিক দিব।”

হিয়ার নাকারে, রাখিব তোনারে,

সদাই দেখিতে পাব।”

পণ্ডিত স্ত্রীদামা এইরূপ মহানুশঙ্গ কিছদিন বন্ধ-ভবনে অবস্থান করিয়া স্বভবনে যাত্রা করিলেন। তিনি যেমন রিক্তহস্তে আসিয়াছিলেন, তেমনি রিক্তহস্তেই বাটীতে প্রতিগমন করিলেন। লক্ষ্যের মূখ্য হুটিয়া বন্ধুর নিকট কিছুই চাহিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিতে

লাগিলেন,—“হায় ! সন্ময়ে মরম কথা বলিতে নারিছ !” অর্থ ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া বাইতে পারিলাম না, এখন বাড়ী বাইয়া ব্রাহ্মণকে কি বলিয়া প্রবেশ দিব ? সহধর্মিণীর বিরক্তিতে ব্রাহ্মণ বড়ই বিষাদিত হইলেন। ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষ ব্রাহ্মণ নিজ বাটীর সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, তাঁহার অতি জীর্ণ পর্ণকুটারের পরিবর্তে তথায় এক বিরাট মৌণ্ডভবন শোভা পাইতেছে।

এই অভাবনীয় অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে ব্রাহ্মণ বিষম-বিষাদে অভিভূত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, হয় ত কোন পরাক্রান্ত রাজা—আমার অনুপস্থিতি-কালে আমার পর্ণকুটার ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনার রাজ-ভবন নির্মাণ করিয়াছেন। বাড়ী, ঘর ও পত্নীর নিমিত্ত ব্রাহ্মণের মনে হুখে হইল। সহসা ব্রাহ্মণ দেখিলেন, পবাক্ষপথে অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে ডাকিতেছেন ! তিনি ভাবিলেন, হায় ! দুঃখের আশ্রয় সহধর্মিণীকে পর্যন্ত হরণ করিয়াছে ! ব্রাহ্মণীও হয় ত রাজার অকুল ঐর্ষ্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তবে আবার তিনি আমাদেরকে ডাকিতেছেন কেন ? বধ করা ব্যতীত তাঁহার এ আহ্বানের উদ্দেশ্য কি ? এই মনে করিয়া ভীতি-বিহ্বল ব্রাহ্মণ সে স্থান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণী লোক পাঠাইয়া ব্রাহ্মণকে গৃহে আনয়ন করিলেন, এবং বহুতে তাঁহার পদ-প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ব্যজন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—“এ অপূর্ব অট্টালিকা এবং অকুল ঐর্ষ্য দর্শনে তুমি এত ভীত হইতেছ—

কেন?—এসব তোমারই বন্ধু-দর্শনের ফল।” ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“কৈ আমি ত তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করি নাই।” ব্রাহ্মণী বলিলেন,—“তুমিও সাক্ষাৎ সন্ধ্যাে কিছু প্রার্থনা কর নাই, তিনিও সাক্ষাৎ কিছু প্রদান করেন নাই; অতর্ক্যায়ী ভগবান তিনি, তোমার অন্তরের ভাব জানিয়া—তোমার অসাক্ষাৎতেই তিনি তোমাকে এসব দিয়াছেন।” ভক্তি-বিশ্বাসে ব্রাহ্মণের হৃৎকরু বহিয়া অশ্রু-গঙ্গা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

— . —

ভক্ত-গৃহে ভগবান। (৫)

এখানে ভগবন্তুক্ত বিহুরের গৃহে ভগবান ঐক্যের আতিথ্য-গ্রহণ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। একদিন ভগবান ঐক্য একটা রাজনৈতিক মীমাংসার নিমিত্ত রাজাধিরাজ হুর্ঘ্যোথনের দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহরের কিছু পূর্বে সভা ভঙ্গ হইল। কুরুরাজের সান্নিধ্য অহরোধ সন্ধ্যাে ভগবান রাজ-আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া ভিখারী বিহুরের পর্ণকুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া উঠেঃবরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

বিহুর গৃহে ছিলেন না; তিনি তৎকালে ভিক্ষার্থ বাহির হইয়াছিলেন। বিহুর-পত্নী তখন স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন করিতেছিলেন, ঐক্যের আগমনেতি নি এমনি আশ্চর্যবিশ্বস্তা হইলেন যে, তাঁহার কটির বস্ত্র ভূতলে পড়িয়া থাকিল, তিনি সেই উলজিনীবেশেই ভগবানের অতর্ক্যায়ী নিমিত্ত চকলা বালিকার দ্বারা

ছুটিয়া বাইয়া সাদরে পাশ্চ-অর্ঘ্য দানে গৃহে আনিলেন।

দীনের পর্ণকুটীর তখন অগ্নিশূন্য; গৃহে এক-কাদি সুপক মর্ত্যমান কলা ছিল, তিনি তাহাই একটির পর একটা করিয়া ভগবানের শ্রীমুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন! ভক্তিমতী রমণী তখন তন্ময়চিত্ত—এ বিশ্ব তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন! তাই তিনি কখনও কদলির বৃক্ষ ছাড়াইয়া শাঁস, কখনও বা শাঁস ফেলিয়া বৃক্ষই শ্রীভগবানের মুখে তুলিয়া দিতেছেন—আর শ্রীভগবান হর্ষভরে তাহাই ভক্ষণ করিতেছেন।

এমন সময়ে বিহুর গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন—ভক্তিমতী উলজিনী রমণী আশ্চর্য্যবাহী হইয়া ভগবানের শ্রীমুখে কদলির বৃক্ষ তুলিয়া দিতেছেন। এ দৃশ্য দর্শনে তাঁহার প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। তিনি স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে পত্নীর অঙ্গ আবৃত করিয়া দিয়া প্রীতিভরে বলিলেন,—“পত্নী! তুমিই ভাগ্যবতী, ভগবান তোমার প্রদত্ত কদলির বৃক্ষও উপেক্ষা না করিয়া সাগ্রহে ভক্ষণ করিতেছেন!”

পত্নীর কথায় পত্নীর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি লজ্জায় দরন্তে জ্বিত কাটিয়া বস্ত্র পরিধানার্থ সেতান হইতে ছুটিয়া পলাইলেন। তখন ভক্তের সহিত ভগবানের কত কথা—কত মধুর প্রেমালোপ চলিতে লাগিল।

ভগবান, বিহুর-পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন,—“আমি বড় ভূখার্ড,তুমি শীঘ্র আমার লজ্জা প্রত্যাহত করিয়া আন। বিহুর যে দিন কদলি-

ভলি তুঙ্গ-কণা বাতীত আর কিছুই ভিক্ষা  
প্রাপ্ত হন নাই। এই ক্ষণ তুঙ্গ না থাকায়  
তিনি অন্ন প্রস্তুত করিতে ইতস্ততঃ করিতে-  
ছিলেন। ভগবান বলিলেন,—“আমি  
উহাই ভক্ষণ করিব, তুমি শীঘ্রই রন্ধন  
করিয়া দাও।” বিদূর-পত্নী বলিলেন,—“প্রভু!  
আমি শূদ্রাণী হইয়া কেমন করিয়া তোমাকে  
আমার পক্কান্ন প্রদান করিব?” ভগবান শ্রীকৃষ্ণ  
মুহু হাসিয়া বলিলেন,—“হাঁ, তোমাকেই  
রক্ষিতে হইবে, আমি আজ তোমার পবিত্র হস্ত-  
পঙ্ক অন্ন গ্রহণ করিব বলিয়াই হৃষ্যোদনের রাজ-  
ভোগ পরিত্যাগ করিয়া তোমার গৃহে অতিথি  
হইয়াছি।” অতঃপর বিদূর-পত্নী সেই তুঙ্গ-  
কণাগুলি রন্ধন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,  
—কেমন করিয়াই বা আমি ইহা ভগবানের  
সম্মুখে প্রদান করিব? অন্তর্যামী ভগবান  
ভক্তের আন্তরিক ভাব বুঝিয়া তাঁহার রন্ধন-  
শালায় প্রবেশ করতঃ স্বহস্তে অন্নখালা টানিয়া  
লইয়া প্রীতি-প্রকৃষ্ট মনে ভক্ষণ করিতে  
লাগিলেন! ভক্তের প্রতি ভগবানের এমন  
অপার কৃপা।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত কপিরত্ন।

## হৃদয়-সখা।

ভূমিত আমার হৃদয়ের সখা

রয়েছ আমার হৃদয়ে;

এত কাছে থাকি হে জীবন সখা,

কেন গো রয়েছ লুকায়ে?

ভাবিতাম মনে কতদূরে তুমি—

ভুলিয়া রয়েছ হে অন্তরবাসী,

আকুলিত হিয়া দিবস-রাতিনি

বেড়াই বাহিরে ঘুরিয়ে;

ওগো! তুমি যে রয়েছ ছদ্মবেশে।

বাজীকর তুমি খেলিতেছ খেলা,

আমার অলক্ষ্যে লুকায়ে,

মস্ত্রে মৃদ্ধ করি অসার “আমার”

বদনে দিয়াছ ছুটায়ে।

ওগো প্রেমময়, মানস মোহন

কেটে দাও প্রভো মায়ায় বাঁধন,

আর কত দিবে মরম বেদন

আশার পিছনে ছুটায়ে;

ওগো! আমার অলক্ষ্যে লুকায়ে!

হৃদয়-বিমানে বিবেক তপন

হাজার কিরণ রাশিতে

ভাতাও অচিরে ওগো প্রিয়তম

হৃদয়ে তোমারে দেখিতে।

মোহের ছলনে আমারে ভুলায়ে

অবিজ্ঞা তিমিরে দিয়াছ রাশিয়ে,

(এবে) জ্ঞানের আলোক ছুটাও হাসিয়ে।

হৃদি-সখা তোমা হেহিতে;

ওগো! হাজার কিরণ রাশিতে।

শ্রীবরদাকান্ত নাথ বিভাবিনোদ।

## অভিমানিনী প্রতি।

(বেলাগ-খালাজ—আড়াঠেকা)

(আমার) সাধেরই সেতার—নাহি যে সে তার,

সে তারের তারে, বাজে না বাজে না;

হিঁড়ে গেছে তার, ডুয়েছে বাক্য,  
 সুর-ভরা-তানে, আর গো গাহেনা।  
 কত বে সোহাগে, বাজিত সে আগে,  
 রাগিণী মিলায়ে নব নব রাগে,—  
 শীরব কেন গো আজিকে বিরাগে ?—  
 অতুরাগে কথা কহ না কহ না।  
 অমিয়-করণা করিত সে তানে,  
 প্রেম-আন্ধাকিনী ছুটিত পরাগে,  
 সে তান, সে নয় হরে কি বিলয় !  
 প্রায় পরাগে ভুলো না ভুলো না।

ঐকান্তিকচন্দ্র ধর, বি-এস-সি।

## দ্রুগ্ধিনীর আত্মকথা।

( গল্প )

বেশ মনে আছে, সেদিন শনিবার। সকাল  
 সকাল কলেজ হইতে আসিয়া বাড়ী ঢুকিতেই  
 দেখি, সমস্তদরজার পাশে একটা পাগলী বসিয়া  
 আছে। একখানা আধময়লা কাপড়ে তাহার  
 সর্বাঙ্গ ঢাক।। বয়স আন্দাজ চরিত্র কি  
 পর্যন্তানিশ। তাহার সেই পাণ্ডুর মুখখানি  
 দেখিলে বোধ হয় যেন তাহাতে কোন্ সুন্দর  
 অভ্যন্তর স্বভাব, একটা তীব্র বেদনার আভাস  
 থাকিয়া থাকিয়া সুটিয়া উঠিতেছে। কি জানি  
 কেন সেই বেধনাক্রিষ্ট মুখখানি দেখিয়া তাহার  
 ইতিমুখ আনিবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা  
 হইল। আমাকে দেখিয়াই কিন্তু পাগলী  
 উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে করিলাম, কিছু পাই-  
 বার আশায় এখানে বসিয়া আছে। তাহাকে  
 বলিলাম,—“পাগলী, তুই একটু ব'স আমি  
 আসছি।”

এই বলিয়া ভাড়াভাড়ি বাড়ীতে আসিয়া  
 বইগুলি টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিলাম।  
 তারপর ট্রাকটা খুলিয়া একটা সিকি বাহির  
 করিয়া আবার পাগলীর কাছে আসিলাম।  
 দেখিলাল, সে তখনও তেমনিভাবে সেইখানে  
 দাঁড়াইয়া আছে। আমি সিকিটা ছুড়িয়া দিয়া  
 বলিলাম,—“এই নে পাগলী।”

সে কিন্তু সিকিটা লইল না। “বাবু,  
 পয়সা কি হবে?” বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া  
 উঠিল। সে হাসি কি মর্শ্মস্পর্শী! আমার  
 শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে সেই হাসির  
 হা হা শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।  
 “তবে তুই কি চাস” বলিয়া সিকিটা কুড়াইয়া  
 লইলাম।

“বাবু, আমার কথা কি শুনতে পারবেন ?  
 না—না—আপনার সে ক্ষমতা নাই—সে ঐশ্বর্য  
 নাই! না বাবু, আপনি পারবেন না—আমি  
 উঠি।” এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উত্তত  
 হইল।

আমি তাহাকে ধামাইয়া বলিলাম,—“না  
 পাগলী, তুই যা বলবি আমি তাই বেশ মন  
 দিয়ে শুনবো। তোর কথা জানতে আমার  
 বড় ইচ্ছে হচ্ছে।”

“তবে ভাল হয়ে বসুন; আমি ব'লে  
 যাই—” বলিয়া পাগলী চিরপরিত্যক্ত ভাৱ  
 ধরের দাওয়ার আসিয়া ভাল করিয়া বসিল।  
 আমিও একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া  
 তাহার কাছে বসিলাম। পাগলী বলিতে  
 ললিল :—

“আমার বাড়ী মদের দোকান উ—পারে।

আমার বাগমায়ের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ভীষণ কষ্টে সংসার চলিত। কয়েকটা গুরু আর কয়েক বিধা জমি ছিল—বাবা তাই নিয়ে চাষবাস করতেন। আমরা তাঁরী জাত হলেও বাবা তাঁদের কাজ বড় পছন্দ করতেন না। সংসারে বাবা, মা আর একটা রাখাল ছিল। মা আমার এলোভুলো মানুষ—সংসারের কাম-কর্ম বড় একটা বুঝতেন না। বাবাই সমস্ত দেখিতেন। এমনি ক'রে তাঁহাদের সংসারটা একরকমে চলিত। তারপর যেদিন আমি চাঁদপানা মুখ নিয়ে পৃথিবীর মাথা ছুঁলাম, সেইদিন হ'তেই আমাদের সংসার ছারখারে বাইতে লাগিল। এ হতভাগিনীর জন্মাইবার দুই দিন পরেই বাবা মারা গেলেন। তাই দুঃখে প'ড়ে মা আমার নাম রাখলেন—“দুঃখিনী”। সেই অবধি আমি সকলের কাছে এই নামেই পরিচিতা হ'য়ে আসছি।

বাবা যতদিন সঁচে ছিলেন, ততদিন মা আমার সংসারে কোন কিছুই অভাব বোধ করতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর মায়ের মাথায় টনক পড়ল। তিনি তেবে আকুল হলেন। তবে একটা সহায় ছিল। আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই হরিশ দত্তের বাড়ী। তাঁর সঙ্গে বাবার অত্যন্ত সন্তান ছিল। তাঁকে আমি কাকা বলে ডাকতাম। তিনিই সে দুঃসময়ে এসে আমাদের পকে বুক করে নিলেন। কতক কৌশলমা বিক্রী করে মায়ের হাতে টাকা আনিয়া দিলেন। দুঃখিনী মা আমার সেই টাকা লইয়া মৃত্যু কিনে মলি পাকিরে বা কিছু পেড়েন, তাহাতেই কষ্টেই আমাদের সংসার

চলতে লাগল। হরিশ কাকার নরেশ বলে একটি ছেলে ছিল। তত্তির তাঁর সংসারে আর কেহই ছিল না। তবে গ্রাম সন্মার্কে পাতান মাসীগোছের নরেশবাবুর এক পিসীমা মধ্যে মধ্যে তাঁদের বাড়ী আসতেন। হরিশ কাকাদের অবস্থা অত্যন্ত ভাল ছিল। গাঁয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড একখানা কাপড়ের দোকান—তত্তির জমিদারগাও যথেষ্ট ছিল। বাড়ীতে চাকরেরও অভাব ছিল না। একমাত্র ছেলে নরেশবাবুকে নিয়ে কাকা বেশ সুখেই দিন কাটাতেন। নরেশবাবু প্রায়ই আমাদের বাড়ী এসে দেখাশুনা করে যেতেন। আমারও ক্রমে তাঁর সঙ্গে বেশ ভাল হইল। এমনি করে দশ বৎসর অতিবাহিত হইল। বেরে বড় হয়েছে দেখে মা আমার বিয়ের অন্ত আশ্বর্য হয়ে উঠলেন। যদিও আমার বয়স তখন সবেমাত্র দশ; কিন্তু দেখতে আমি ঠিক তের বৎসরের মেয়ের মতন ছিলাম। নরেশ বাবুর বয়স তখন ষোল। তিনি লেখাপড়া ছেড়ে কাপড়ের দোকানে বসেছেন। পূর্বের মত আর আমি তাঁর সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারতাম না। বাধ বাধ চেক্তোয় নরেশবাবু কিন্তু আমার সঙ্গে বিশবায় লজ্জা খুব চেষ্টা করতেন। আমার সলজ্জ ভাব দেখে মনে হত যে, তিনি বড় খুসী হতেন। এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিল।

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম,—“তার পর কি হ'ল পাগলী?”

আমার উৎস্রুকা দেখিয়া পাগলী একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া আমার বলিতে লাগিল—



“হী, তারপর একদিন সন্ধ্যার পর আমি নরেশবাবুরের আমবাগানে বেড়াতে গেলাম। তখন সবোমাত্র চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় পৃথিবীটা যেন হাসছে। আকাশে টুপটাপ করে দু'একটা তারা ছুটে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে এক একখানা সাদা মেঘ উকিঝুকি মারছে। আমি এক মনে এই সব দেখছি— হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন আমার গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে—“হুখী, হুখী, একলা বসে কি করছ ?” ফিরে দেখি নরেশবাবু। আমি তাঁর দিকে চাইতেই তিনি ফিক্ ক'রে হেসে উঠলেন। আমার প্রাণটা সে হাসিতে যেন কেমনখান্না হ'য়ে গেল। হেসে বললাম—“কেন, চাঁদ দেখছি।”

“আচ্ছা হুখী, চাঁদকেই কেবল তোমার দেখতে ইচ্ছা করে, আর আমাকে বুঝি—”

“হাত” বলে আমি তাঁর যুগ চেপে ধরলাম। তিনি তখন একটু মুচ্কে হেসে বলেন,—“আচ্ছা হুখী, তুমি কি আমার ভালবাস ?”

“দেখ দেখ ঐ মেঘখানা কেমন ভেসে যাচ্ছে” ব'লে তাঁকে অশ্রুমনক করবার চেষ্টা করলাম। তিনি তো আমার মত বোকা নয়। আমার চালাকি বুঝতে পেরে বলেন,—“হুখী, তুমি আমাকে ভুলাবার চেষ্টা করছ ?”

হাতে হাতে ধরা প'ড়ে লজ্জার আমার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠল। আমি অশ্রুস্ত হ'য়ে বললাম,—“না, না—ওই মেঘখানা বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল কিনা তাই।”

“বাকি নে কথা” ব'লে নরেশবাবু আমার

আমার দিকে চেয়ে বলেন,—“কই বলে না ?”

“কি বলবো ?” ব'লেই হেসে ফেললাম।

“কের হুইমি” ব'লে নরেশবাবু আমার হাতখানা ঝাকা দিয়ে বলেন,—“বল, আমাকে তুমি ভালবাস কিনা।”

এর উত্তর কি দিব—খুঁজে পেলাম না। একবার মনে করলাম যাক্ ছাই বলেই ফেলিনা কেন—“তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালবাসি” কিন্তু লজ্জা করে না বুঝি ? আমি মাথা হেঁট ক'রে দাঁইয়ে রইলাম।

“আচ্ছা বলবে না, তবে এই আমি চন্দ্রাম। আজ হ'তে তোমার সঙ্গে আড়ি।” এই বলে সত্যসত্যই পা বাড়ালেন। এমন সময় “হুখী, হুখী” বলে ডাকতে ডাকতে মা এসে উপস্থিত হ'লেন। নরেশ বাবু ত সটান চম্পট। আমি খতমস্ত থেয়ে বললাম,—“কি মা ?”

“রাত্রি যে দশটা বাজে—তার কি কিছু খেয়াল আছে ? পাগলী মেয়ে আমার বনে বনে ঘুরতেই ভালবাসে।” এই বলিয়া মা আমার হাত ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। তেমনই ভাবে বেশ হাসিয়া খেলিয়া আরও ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। ইহারই মধ্যে নরেশ বাবুর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইয়া উঠিল। মা আমার বিয়ের লজ্জা দিনরাত্রি ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। হরিশচাকাকো চারিদিকে ঘটক পাটিয়ে পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে আজকাল করিয়া আরও এক বৎসর অতীত হইল। এখন বিবাহ না দিয়া আর কিছুতেই রাখা যায়না দেখিয়া বা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; এবং হরিশ

কাকাকে ডাকাইয়া বলিলেন—“ঠাকুরপো! মেয়েটার কি উপায় হবে—” এই বলিয়া কাদিতে লাগিলেন।

“এর জন্ত কামা কেন? এতে তোমার কোন ভাবনা নাই। তবে আজকাল যেরূপ দিন পড়েচে, তাতে ভাল পাত্র খীত্র পাওয়া কঠিন। দেখি আরও দুই একমাস চেষ্টা করে, যদি একান্তই ভাল পাত্র পাওয়া না যায়, তবে আমার নরেশ ত আছেই।”

না কাদিতে কাদিতে বলিলেন—“ঠাকুরপো! আমার দুখীর কি সে বরাত হবে?”

“খুব হবে। আমি থাকতে তোমার কোন ভাবনা নাই।” এই বলিয়া কাকা চলিয়া গেলেন।

যখন কাকার সঙ্গে মার এইসব কথাবার্তা হইতেছিল, আমি তখন জানালার পাশে লুকিয়ে সব শুনিছিলুম। নরেশবাবুর সঙ্গে নিয়ে হবার আশা আছে জেনে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠলো। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম—“ভগবান! দুই মাসের মধ্যে যেন আমার কোন পাত্র না জুটে। আমি প্রাণ থাকিতে নরেশ বাবুকে ছাড়া আর কাহাকে বিয়ে কর্তে পারবো না।”

ভগবান্ বোধ হয়, এ দুঃখিনীর প্রার্থনা শুনিলেন। কাকা একদিন বৈকালে আমাদের বাড়ী এসে মাকে বলেন—“দেখ বো, যখন এই দুই মাসেও দুখীর কোনও ভাল পাত্র পাওয়া গেল না, তখন আগামী শ্রাবণ মাসের ৪ঠা তারিখে আমার নরেশের সঙ্গে দুখীর বিবাহের দিন স্থির করেছি। আর বিবাহের খরচ-পত্রও

আমিই সব দিব।” কাকার কথা শুনে মায়ের চোক দিয়ে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বর বর করিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বাম্পকৃতকণ্ঠে বলিলেন—“ঠাকুরপো, পূর্বজন্মে তুমি আমার ভাই ছিলে।” তার পর কাকা চলিয়া গেলেন।

আনি আড়ালে দাঁড়িয়ে সমস্ত কথা শুনলুম, আনন্দে আমার বুক হুক হুক কাপিতে লাগিল। সেই দিন হইতে আমার মনে কত রকম সুখের কল্পনা উদয় হইতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

নরেশ বাবুর সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার পর হইতে তিনি আর আমার সহিত দেখা কর্তেন না। বুঝিলাম—তিনি লজ্জায় অমন কচ্ছেন।

সুখের সমুদ্রে স্নাতার দিগে দিগে নৌয়াই এই কয়টা দিন কেটে গেল। তারপর একদিন সকালে উঠে দেখি, আমাদের বাড়ীতে অনেক লোকজন এসেছে, এবং সকলেই কাজে ব্যস্ত। বাহির বাড়ীতে সানায়ের রাগিনী শুনে বুঝলুম আজ আমার বিবাহ। সন্ধ্যার সময় বাজনা বাজিয়ে বর এলেন। মাথায় ছোট টোপের পরে আমি তার পাশে বসিলাম, পুরুতঠাকুর মন্ত্র পাঠ করিলেন—আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। সে দিন আমার মনে যে কি আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগলো, তা নিজেই বুঝতে পারিলাম না।

তারপর আমি স্বত্বরবাড়ী গেলাম। স্বত্বর মহাশয় আমাকে খুব ভাল বাসিতেন, বোমা বলিতে অজান হইতেন। বিয়ের পর হইতে মাকে তিনি আর সুতা কাটিতে দিতেন না।

মায়ের সমস্ত খরচ তিনি দিতে লাগিলেন । মায়ের আমার কোন কষ্টই রহিল না । অতঃপর বেশ সুখেই মায়ের দিন কাটিতে লাগিল । আমিও আমার অগাধ ভালবাসা পেয়ে মনের আনন্দে বরকরা কর্তে লাগলাম । হায় ! তখন কে জানিত যে, আমার সে সাধের বর ছেলেরের খেলাঘরের মত একদিন চুরমার হয়ে যাবে । এই পর্য্যন্ত বলিয়া পাগলী আমার ধামিল । তাহার চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল । আমি সমবেদনার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—“পাগলী, তোর কি বলিতে কষ্ট বোধ হচ্ছে ?”

“না, না—আমার কষ্ট কি বাবু ! আজ যে আপনাকে আমার দুঃখের কথা বলবার জুটাই এসেছি ।” এই বলিয়া পাগলী আমার বলিতে লাগিল—

“তারপর আমার ভালবাসায়, খুশির-শান্ত-ভীর আদর-যত্নে, দাস-দাসীদের ভক্তি-শ্রদ্ধায় কয়েক বৎসর আমার সুখেই কাটিলো । তারপর একদিন শুনিলাম, স্বামীকে বিদেশে দোকান কন্ডে যেতে হবে । তার সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে । শুনেই আমার প্রাণের ভিতর কি এক অজানিত আশঙ্কায় শিউরে উঠল । তা ছাড়া মাকে ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে ছিল না ; কিন্তু কি করব, খুশরের আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে জন্ম-ভূমি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে রায়গঞ্জে যেতে হ’ল ।

শুধু এইতেই সেখানে আমাদের থাকিবার জুট একটা বাড়ী ঠিক হয়েছিল । আমরা সেই বাড়ীতেই উঠলাম । চাকর চাকরানী সমস্তই ঠিক ছিল । এই নূতন বাড়ীতে এসে আমরা কোন কষ্টই জানুও পাল্লায় না । উনি সেই বাড়ীর সংস্রব একখানি বড় ঘরে দোকান কর্তে লাগলেন । দোকানে বেশ ছুঁপয়সা লাভ হতে লাগলো । আমার কিন্তু এ জায়গা বড় ভাল লাগত না । সর্বদা যেন কঁাকা কঁাকা লাগত । কি করব, কোন রকমে এই ভাবে এক বৎসর কেটে গেল । তারপরে আমার একটা পোকা হইল । তখন আমি যেন সেই নৈরাশ্রের ভিতর একটা শান্তি পাইলাম । থোকাকে কোলে পাইয়া আমার সকল কষ্ট দূর হইল । খুশর মহাশয় সংবাদ পাইয়া থোকাকে দেখিতে আসিলেন । তারপর তিনি আমাঙ্গিকে দেশে লইয়া গেলেন । আমরা দেশে আসিয়াছি শুনিয়া মা আমাদের বাড়ী আসিলেন এবং থোকাকে কোলে লইয়া কত আনন্দ করিতে লাগিলেন । আমরা যত দিন দেশে ছিলাম, ততদিন মাই থোকাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন । শান্তুড়ী থোকার নাম রাখিলেন—নিধুবাবু । এইভাবে আমোদ-আহ্লাদে ছয় মাস কাটিয়া গেল । তারপর আমার আমরা রায়গঞ্জের বাসায় আসিলাম ।

ক্রমশঃ ।

জনলিনাক হোড় ।

## শান্তি ও শান্তি

পরিজ্ঞান সাধনাং বিনাশায় চ দৃষ্টতাম্ ।  
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সত্ত্বামি যুগে যুগে ॥

গীতা ৪-৮

‘হৃকৃত্তে দিগের দলন ঘটিলেই সাধুরা পরি-  
জ্ঞান পাইয়া নিরাপদ হন।’ সামান্য ক্ষেত্রে  
সামান্য মনুষ্যে ঐশী শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহা  
সাধন করে, বিশেষ স্থলে ক্রমোর্ধ্ব বলে শেষে  
ভগবানকে অবতার গ্রহণ করিতে হয়।  
প্রথম প্রথম মনুষ্য করিলেও তাহা ভগবানের  
ইচ্ছাপ্রযুত। সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইলেই শান্তি।  
শান্তি উড়িয়া গিয়া দেশ নিরুপদ্রব হয়। কিন্তু  
ভগবানের কার্য্য বৃদ্ধিয়া, সেই দিকে চলিতে  
পারা সামান্য মানুষের কাজ নয়। তাই  
মানুষের চক্ষুতে সব আশঙ্ক্যের প্রতিফলন  
ঘটে। এই চারি বৎসরের অধিক কালব্যাপী  
যে মহাসমর ইউরোপে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া  
সমস্ত পৃথিবীকে তাপদগ্ধ করিতেছিল, ধ্বং-  
শজির সস্ত্রসারণে কেন্দ্রাতিকর্ষণী শক্তিতে  
সকলকে আকর্ষণ করিয়া মুহমান রাখিয়াছিল,  
একের বার্ষিক রক্ষার সঙ্কল্পে সমস্ত সভ্য সস্ত্র-  
বায়ের ধন-জন সবই ধ্বংসযুগে সবেগে

ফেলিতেছিল, ইহা মানুষের চক্ষে আশঙ্ক্যপূর্ণ  
হইলেও ভগবানের নিকট ধ্বংস হইলেও  
সাক্ষরজনীন শক্তিই প্রকাশিত হয়; নতুবা  
তাহার জায়বিচার কিরূপ?

সে বিচার যন্ত্র, যে যন্ত্রেই মূলভীষী  
আমাদের অধিকার নাই;—একত্র এ যন্ত্রের  
ফল ‘মু’ কি ‘কু’ তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই  
—শক্তিও নাই। ভগবান ক্রম এই পালনী  
শক্তিতেই নিজ বংশ ও ধ্বংস করিয়াছিলেন।

মহাযুদ্ধের অবসান হইল। প্রথমে ‘শান্তি’  
না ‘শান্তি’ আসিল? শান্তি ত প্রথম হইতেই  
উভয় পক্ষের হইতেছে। ধন জন অনেক  
গিয়াছে। তবে এ বিজ্ঞাটেও সব ধরিতে নাই।  
যন্ত্রবিচারে দেখিতে হইলে, শেষ শান্তি স্থাপিত  
হইল। কিন্তু শান্তিও ব্যাপিয়া রহিল, ব্যক্তি-  
বিশেষকে—জাতি বিশেষকে, সমগ্র ইউরোপকে  
নয়।

নিরাশ্রয় নিরাশ্রয় পুরীর মধ্যে জর্জন  
সজাট সকল শক্তিকে লইয়া, সকল শক্তির  
হইয়া, বেশ আনন্দে নাচিতেছিলেন। ঘট্য  
হ্রস্বাক্ষর। তাঁহাকে পাগল করিল। রাজ-

শক্তির প্রভুত্ব,—কঠিন আদেশে সমগ্র জগৎ  
জাতি তাঁহার পশ্চাতে বেলজিয়ম দমনে  
চলিল। কত অশ্রুতরা চক্ষু, কত বেদনাভরা  
হৃদয়, কত তারগ্রস্ত শির, নীরবে কাতর  
প্রার্থনা করিল, কিন্তু রাজ-শক্তি টলিল না।  
ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইল; আশানের দার  
উন্মুক্ত হইল, চিতা জ্বলিল। এ ও সে একে  
একে পড়িতে আরম্ভ করিল। মাংসমেদে  
চিতার চির প্রস্ফুল্লন ঘটিল—আর পামিল না।  
বেলজিয়ম হইতে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ চিতায়  
পরিপূর্ণ হইল। সমগ্র শক্তি তাহাতে ঝাঁপ  
দিতে ছুটিল।

কেস ছুটিল? বেলজিয়ম নিরীহ, দুর্বৃত্ততায়  
জগৎ তাহাকে গ্রাস করিবে, এ অন্ডায়  
ইংলণ্ড সহিতে পারিল না। জগৎ সম্রাট  
শোণিত সমুদ্রে আপনাব হইলেও তিনি জায়ের  
মাধ্যম পা. দিয়াছেন, জায়বীর জায়াদীশ পক্ষম  
জর্জ কল্পে সহিবেন? ভগবানের দিকে  
তাকাইয়া রক্ষা-মন্ত্রে বেলজিয়ম রক্ষা  
ছুটিলেন। এই গুরুই এত দিন বহু নিপৃত  
হইয়া ইউরোপকে আশানে পরিণত করিল।  
কত মায়ের কোল শূন্য, কত জীর হৃদয় শূন্য,  
কত শিশু রক্ষাধার পিতা শূন্য, আর কত  
মলিহ,—সব গিয়াছে, এ ইচ্ছা কি ভগবানের?  
পূর্বোক্ত স্নোকে অর্ধত তাহাই। আবার  
সেই অর্ধেই নাথুর প্রাণে শান্তি!

এ যুদ্ধের মূল কাইসার। সুতরাং দোষীও  
তিনি। তিনি বাহ্য করিয়াছেন, যদি তাহার  
মূলে ভাৱ থাকিত, তবে সত্য সমাজ তাঁহাকে  
আজ বিজয়-মাণ্ডো ভূষিত করিতেন—পরাজিত

হইলেও মিত্রশক্তি আজ বীরবেগে সম্মান রক্ষার  
আনন্দিত হইতেন। কিন্তু কাইসারের ভাগ্যে  
সে অর্থা নাই। তিনি যুদ্ধের মূল হইতে গুপ্ত  
মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিয়া সবমেরিন, টেরপিডো, মাইন,  
আকাশচারী বিমান, অগ্ন্যো পানীয় জলে  
বিশ সংযোগ ইত্যাদি যে সকল গুপ্ত যাতক  
সকলকে দশদিকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন,  
তাহারাই তাহার সকল স্মরণ, সকল যশেত্র,  
মূল নষ্ট করিয়া সকল শাস্তি আনয়ন করিয়াছে।  
তাঁহার কৃতকর্ম্মে যে সকল চিতা জ্বলিয়াছে,  
তাহা নিরীক্ষিত হইলেও তাহাদের জগন্ত-অঙ্গার  
একত্রীভূত হইয়া চিত্তার সহিত তাঁহাকে দিবা-  
নিশি দগ্ধ করিতে থাকিল। এই জগ্নই তাঁহার  
শেষ জীবনের শেষ অভিনয় চির পরিস্ফুট রহিল,  
যবনিকা পড়িল না। তাঁহার অন্তর্গত শান্তিই  
এ ভয় অভিনয়ের সুস্পষ্ট দৃশ্য!

যে রাজশক্তিতে তিনি প্রজাপুঞ্জের সব হইয়া  
সব লইয়াছিলেন, সেই প্রজাশক্তি-তিল হইতে  
তানে উঠিয়া আর কত সহিবে, তাহার সেই  
রাজ-মহুট শক্তির বিলোপ সাধন করিল।  
তাঁহার সাধের প্রাসাদ আশান হইল, মনের  
নন্দনকাননে অহর নাচিতে লাগিল, শুধু  
তাই নয় চিরকাল ধরিয়া নাচিতে থাকিল।  
প্রভু ভূতাবে আসিয়া মানমুখে স্থান ত্যাগ  
করিল।

হায়! কাল-ধর্ম্ম—হায় যুগ-প্রলয়!  
তোমরাই সত্য! আর সত্য ভগবানের কার্য্য।

কাইসার সবগুণে ভূষিত ছিলেন না, বরো-  
জমগুণ তাঁহাকে এই সর্বনাশকারী অবলম্বয়ী  
পথে আকাক্ষার হাস করিয়া, নাড়াইয়া

আলোক হইতে অন্ধকারে, আনিয়াছিল ; তাই তাঁহার হঠাৎ এই পরিণতি ! এক মাস পূর্বে যাহার নামে দেহ শিহরিত, আজ তাঁহার এই অবস্থা !

এই জন্তই আগে শান্তি হইয়া পরে শান্তি ঘটিলে, যাহা ঘটিল, তাহাতে আর অবশ্য যন্ত্রণা আসে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ভগবানের ইচ্ছায় কহিসারের পূর্বোক্ত গুপ্ত পাপ-পরম্পরায় তাহা হইবে না, সেই জন্তই তিনি “বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীয়ে,” এই কবি বাক্যকে ত্যাগ করিয়া, নিজে বদ্ধ। তাঁহার সেই দেহ, সেই কর-চরণ, সেই চক্ষু কর্ণ, সেই মন-বুদ্ধি, সব আছে কিন্তু থাকিতেও নাই। জ্বায়েয় সোনা এখনি স্মৃষ্ট।

তিনি নিদ্রিত, গুপ্ত-যন্ত্রণায় ধ্বংস-বিস্তারের জন্ত ; নিরীহ, নিরপেক্ষ বালক-বালিকা ও নর-নারীদিগকে ধ্বংসের জন্ত। সেই অতৃষ্ণা-কিছুপে ভুগিতে হয়,—নিঃশেষ ক্ষতি হইলে কি যাতনা হয়, নিজের পুত্র কলত্রের সহিত স্মৃৎ-বিচ্ছেদ ঘটিলে, কি বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহার জরয়ে একযোগে জ্বালাময়ী শিখা বিস্তারে দেখাইবে বলিয়া তিনি জীবিত, তাই আগে শান্তি—পরে তাঁহার অন্তরের শান্তি !

অবশ্যই ইহা স্মরণ করণীয়। তবে তাঁহার দুর্ভাগ্যের কারণ বলিবার বা আলোচনা করিবার শক্তি সাধারণের, এই জন্ত এ সকল কথা।

বহাবীর মেনোলিয়ান প্রথমে এই শান্তি চালিয়া নিজের উগ্র আশা, উত্তেজনা ও

আকাঙ্ক্ষায় শেষে এই শান্তি আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই জন্তই এই সকল ক্ষেত্রে আগে শান্তি পরে শান্তি।

কেন এ বিভ্রাট ? লোক-জীবনে তাঁহার অনিচ্ছাকারিতার ফল, আর জ্বালাময়ী রাজ-জীবনে যন্ত্রাচারের জন্ত জলন্ত বহি ! মানুষ অত্যাচার করিলে, রাজা তাঁহার বিচার করেন, শাস্তি দেন। অপত্য নিকর্ষশেষে প্রজা পালনই রাজমর্ম্ম ! দিল্লীর নাশাকদ্দিন, প্রজার জন্ত গুপ্ত অর্থ তাঁহার বায় করিবার অধিকার নাই বলিবার, একদিন মহিষীর একটা পাচিকার প্রার্থনাও নামমুখ করিয়াছিলেন। সেই রাজ্যে কহিসার ? তিনি নিজ প্রভুত্ববলে কঠিন আদেশে প্রজার ধন-প্রাণ গ্রহণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সর্বদা হাহাকার শব্দ শুনিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া যায় নাই। শত্রু হইলেও অত্যাচার ও কপট ব্যবহারে সকলকে ধ্বংসমুখে রাখিয়াছিলেন, একবার ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবারও তাঁহার অবকাশ হয় নাই। দয়া-করণের কোমল ছবিগুলিতে আগুন দিয়া, কেবল স্বার্থাকাঙ্ক্ষার দিকে চাওয়াছিলেন। এ সকলের কর্তা কে, তিনিই ত ? তবে এ বিভ্রাটের উৎপত্তিও তাহা হইতে। শান্তি-সামর্থ্য, অর্থবল, লোকবল, অস্ত্র ইত্যাদি ক্ষমতাসা, সূচকাবে উড়িয়া যায়। তবে তাহাদের গর্ভ কি ? সেই গর্ভই পরিণামে এই শক্তির আকারে তাঁহার জীবনের উপর, তাঁহার চক্ষের সমক্ষে চির জীবনের জন্ত রহিয়া গেল। তাঁহার জন্ত ইউরোপে যে ক্ষতি হইল, তাহার পূরণে যে কত বৎসর অতীত হইবে, তাহা থলা যায়

নী। তাই তাঁহার এ শাস্তি।

কোথার তিনি আজ অস্তিত্ব শক্তির সম-  
ককতার শাস্তি স্থাপয়িত্বগণের মধ্যে একজন  
হইয়া দেশের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান থাকি-  
বেন, না, যুদ্ধেই শিশির সম্পাত! মানের  
অভিনয় সুবাইল, সাজ সজ্জা ছিড়িয়া পড়িল,  
রক্তমণ্ড তালিয়া গেল! থাকিলেন—তিনি মাত্র  
তগ-মন্দির-কোটরগত হইয়া, আশাহীন, উৎসাহ-  
হীন, তজ্জাহীন, সঙ্গহীন, স্ববুপ্তিগীন ও জাগরণহীন  
জীবনে! উদ্ধাম জীবনের আলোকময় তেজঃ-  
পুঞ্জ-ব্রহ্মপতি চলিয়া গেল, পড়িয়া রহিল ঘোর  
অন্ধকার, তাহাতে আলোকের আশা আর  
নাই। অথবা ভগবানের ইচ্ছা কে বলিবে।

ব্যক্তিগত আশা বা শক্তি সামান্ত কেন্দ্র-  
বাহিনী ক্ষুদ্র নদীর স্রোত মাত্র। তাগ তটস্থ  
সাধারণের উপকার করিলেও, জাতীয় শক্তি  
যে ভাগীরথীর স্রোত, তাহার উপর কখন  
বাইতে পারে না—মিশিয়া যায়। কাইসারের  
জাতীয় শক্তির উন্নাদনার মধ্যে তাহার মুখা  
ব্যক্তিগত শক্তি এক ভাবেই বিলয় পাইয়াছে।  
ভগবানের ইচ্ছা এইরূপই, কাহাকেও দেখিতে,  
ভনিত, বৃষ্টিতে না দিয়া, কাজ করিয়া জাতীয়  
সর্বস্বের প্রভুত্ব ও সার্বজনীন ভাব প্রকাশ করিয়া  
থাকেন। বাত্মব ভাবে, আকাশ হইতে পড়িল।

ভগবানের সেই দুর্ভুক্তব্যঙ্গী অবতার বা  
ইচ্ছা কই? যুদ্ধের প্রথম উত্তরে জয় ও ধ্বংসের  
উল্লসকে দাঁড়াইয়া। কাইসারই নিজেই ভগ-  
বানের অবতার বলিয়া রটাইতেছেন শুনিয়া-  
ছিলাম।

ভগবানের অবতারের কার্য্যে ধ্বংস

থাকিবেই, সে ধ্বংসে হৃদয় কাঁপিবে না,—‘হাহ’  
‘আহা’! শব্দ থাকিবে না, আনন্দ আসিবে।  
হিরণ্যকশিপু, রাবণ, দুষ্টোদন প্রভৃতির ভিতর  
তিনি বা তাঁহার ইচ্ছা কার্য্য করিত,—সে  
কার্য্যে আজ পর্য্যন্ত শ্রোতার কাণে আনন্দ  
বর্ষণ করে, শাস্তির স্থলে শাস্তিই আসিয়া  
পড়ে। এই তথ্যে কাইসারের প্রভু-শক্তি,  
অসাম্য বিশ্ব-প্রভু-শক্তির নিকট, সিদ্ধুর নিকট  
কণিকা মাত্র। তবে সে শক্তি কোথার? তাহা  
সর্ব শক্তির ভিতরে অলক্ষ্যে থাকিয়া দুর্ভুক্ত  
দগুন করিয়াছে, ইহাই বুঝা যায়, আর বুঝা যায়  
সেই শক্তির ইচ্ছাই মৃত্তিমতী হইয়া, সম্মিলন  
শক্তিরূপে আজ ইউরোপের ধিক ধিক জ্বালা-  
ময়ী নরকাগ্নি নিক্ষেপিত করিয়া সকলকে শাস্তি  
দিগ; সেই সঙ্গে কাইসারও ( ন্যায় চক্ষে  
দেখিলে ) শাস্তি পাইলেন; কিন্তু মানবিক  
জীবন তাহা দেখিতে চায় না বা দেখে  
না; এই জন্যই বলি, তাঁহার আশ্রয় এখন  
কেবল শাস্তি! তাই আগে শাস্তি পরে শাস্তি!

তিনি শাস্তিময়, তাঁহার প্রবর্ত শাস্তি ভিন্ন  
কগল শাস্তিতে ভাসে না। তাঁহার ইচ্ছাই  
শাস্তি। তিনি নরকাগ্নির মধ্যে থাকিলেও,  
তাহা শাস্তিময়। সেইজন্যই বিবে, জলে,  
অগ্নিতে, হস্তিপদেও প্রজ্জ্বলনের সূত্ৰা হয় নাই।  
কাতর প্রার্থনাতে ভক্তি মাখাইয়া ভগবান্  
বলিয়া ডাকিলেই তিনি মরকে অমর করেন—  
বিষকে অমৃত করেন। যাঁহা কেহ কখন ভাবে  
নাই, তাহা নিমিষে হইয়া যায়,—কেহ কারণ  
খুঁজিয়া পায় না। তাঁহার কার্য্যকাণ্ড-ভাব  
বুঝিবে কে? তাই ইউরোপের মহা নরকাগ্নি

বাহা মিল্লানের আশা ছিল না, মহাপুরুষ  
প্রেসিডেন্ট উইলসনের মন্ত্রশক্তি, কি এক  
শক্তিতে কার্যশক্তি আনয়ন করিল, ইহাই  
শান্তি ! কবিও তাহাই বলেন,—

পশিলা কুতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,  
দাবদল্ল বনে, মরি ঋতুরাজ যেন  
বসন্ত, অমৃত কিংবা জীবন্ত দেহে ।

মাইকেল ।

ইহাই ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি—‘শান্তি !’  
মাহুপ উপলক্ষ্য মাত্র । এই হিসাবেই শান্তি !  
ঐক্যবানচন্দ্র সেন ।

## স্বপনে ।

যবে প্রভাতের পিক গায় নাই গীত  
পাতার আড়ালে বসিয়ে,  
যবে বন উপবনে ফোটে নিক’ ফুল  
প্রভাত আবেগে ভরিয়ে ।  
যবে কাননের কোলে সেই মধু বোলে,  
যবে নি’ পাপিয়া তান  
যবে ফুলের রেণুটি মাখিয়া ভ্রমর  
হয়নি গো আশ্রয়ান ।  
যবে কুমুদে কুমুদে জড়ারে প্রণয়ে  
যুঝারে ছিল সব জুটিয়ে,  
(তুমি) সেই বেলা প্রিয়ে দেখা দিবে মোরে  
বলেছ কতই বুঝিয়ে ।

(তুমি) কতই আশায় ভাসারে হৃদিয়ে  
করেছিলে যে অর্ঘ্য দান,  
(ওগো) বিধি বিড়ম্বনার প্রভাবে যে তাম্র  
হয়ে গেল আবার স্নান ।  
ঐক্যবানন্দ বিশ্বাস ।

## গয়ার ইতিহাস ।

বাদসাহ (সেলিম) জাহাঙ্গীর দিল্লীর  
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গয়ার স্বাধীন  
সামন্তরাজত্বলিকে দমিত করিবার জন্য সুবেদার  
ইব্রাহীম খাঁকে বিহার হইতে বাহিতে হুকুম  
করিলেন । নবাব ইব্রাহীম খাঁর সুবেদারীর  
কালে পালায়ুর হীরকখনির সৌরভ দিল্লী-  
দরবারেও বাবিত হইয়াছিল । বাদসাহ  
জাহাঙ্গীর এই কার্যে সুবেদার জাকর খাঁকে  
ব্রতী করেন কিন্তু তিনি বার্কত প্রযুক্ত কোকরা  
পর্যন্ত অভিযান লইয়া বাহিতে না বাহিতে  
হোসেনাবাদের সন্নিকট সঁড়াকারার কোর্টের  
নিকট কালগ্রাসে পতিত হন ; যুদ্ধের অভিযান  
কাজেই প্রত্যাখর্ষন করিতে বাধ্য হয় ।  
অবশেষে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ নবাব ইব্রাহীম  
খাঁকে বিহারের সুবেদার নিযুক্ত করিয়া এই  
হীরকখনি অধিকার করিয়া লইবার আদেশ  
সহ প্রেরণ করিলেন । টেভার্নিয়ার তাঁহার  
ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলেন যে এইখানি কোকরাগ্রামে  
অবস্থিত । বর্তমান সময়ে কোকরার অস্তিত্ব  
নির্দেশ করা কম কঠিন নহে । আবার যদে  
হর-কোইল ও সন্ধ্যা নামক দুইটি নদীর মূলদেশে



যে বিজ্ঞান “বেসীন্” বা সমতল উচ্চভূমি আছে (এবং যেখান হইতে সন্নিকটেই হটার ও আওরাঙ্গ প্রভৃতির করলার খনি আছে) তাহার সন্নিকটেই এই প্রসিদ্ধ খনি অবস্থিত ছিল। টাভাগিয়ারের বিবরণ অনুসারে বল, হল্যাণ্ড, হিউজেস্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই খনির অস্তিত্ব নির্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। বর্তমান রোহতাসগড় হইতে কোকরাচ্য ১১ মাইল দূরে কোইল নদীর মূলের দিকে সুরমেলপুর বা সফলপুরের সন্নিকট অবস্থিত। \* সুরমেলপুর বর্তমান সেসাগ্রাম হইতে পারে। নবাব দাউদ খাঁ ১৬৬০—৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন পালায়ুর বিজ্রোহী সামন্তরাজগণকে দমিত করিয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি পালায়ুর অন্তর্গত কোকরা রাজধানীতে পালায়ুর রাজা-রূপে একজন কোলবংশীয় রাজপুত্র রাজাকে অধিষ্ঠিত পাইয়াছিলেন। ইনিই সম্ভবতঃ টেভাগিয়ারের “হীরক রাজা” হইতে পারেন, যেহেতু দাউদ খাঁর পাঁচ বৎসর মাত্র পরে টেভাগিয়ার হীরক-খনি পারদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিহার প্রদেশের শাসক নবাব দাউদ খাঁ থাকেন। তিনি গয়া এবং পালায়ুর জেলার সকল সামন্তরাজগণকে বশে আনিয়া কর গ্রহণ করিতে থাকেন। দাউদ খাঁ বাদসাহ আওরাঙ্গজেবের সময়ে একজন ভাল সুলাসক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই দাউদ খাঁ গয়া জেলার অন্তর্গত দাউদনগর নামক গ্রাম স্থাপন করেন। দাউদনগর আওরাঙ্গাবাদ মহকুমার

অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট গ্রাম। ইহা সোন নদের পূর্বতীরের উপর অবস্থিত। নবাব দাউদ খাঁ সুবেদারের বংশধরগণের মধ্যে নবাব দাউদ খাঁ, নবাব আহম্মদ, আহম্মদ খাঁ, নবাব কাইউন সাহেব প্রভৃতি অগ্রাবধি দাউদ নগরে বাস করিয়া থাকেন। ১৬৬০—৬৫ খৃষ্টাব্দে পালায়ুর এবং রামগড় রাজদ্বয়কে বিজয় করিয়া যখন সুবেদার নবাব দাউদ খাঁ প্রত্যাগমন করিলেন দাউদ নগরের সন্নিকট “তানু গাড়িয়া” বিশ্রাম জন্য সৈন্যসামন্তসহ “কুচ্” করিয়াছিলেন, তখন এই স্থানের রমণীয়তা দেখিয়া এইখানে একটি নিজ নামে গ্রাম বা “বস্তা” স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়া “দাউদ নগর” গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার নামে এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার পৌত্র আহম্মদ খাঁ এই নগরের গীমা বর্দ্ধিত করিয়া খীর নামে একটি অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এই বর্দ্ধিত অংশটির নাম আহম্মদগঞ্জ, এইখানে তাঁহার সমাধি বর্তমান আছে। এইখানে ভাল কবল, সতরঞ্জ, তসর কাপড়, শুড়, দোলো, পিতলের বাসন প্রস্তুত হয়। এইখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটিও আছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। নবাব দাউদ খাঁ এই নগরটিকে স্থাপন করিয়া একটি বেশ সুরক্ষিত গড়ে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পালায়ুর জেলার শাসন-ভার বিহার সুবেদারের অধীনে একজন নারের সুবেদারের উপর রক্ষিত হইল। তাঁহার সদর মহকুমা স্থান হোসেনাবাদ-জাপলায় নির্দিষ্ট ছিল। তিনি সোনপুরা রাজাকে

বিজয় করিয়া তাঁহাকে শাসন কর্তৃক নিকটেই হোসেনাবাদ নামক নগর স্থাপন করিয়া সেইখানে বসবাস করিতে লাগিলেন। হোসেনাবাদের নবাব-বংশ এককালে খুবই প্রতাপশালী ছিলেন, এখন তাঁহারা হতশ্রী ও নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছেন। হোসেনাবাদে একটি সাবরেভেন্টরী অফিস ও থানা আছে। ইহা বারুণ ডাকটনগঞ্জ লাইনের উপর একটি স্টেশন। এইখানে বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত জাপলা লাইম ওয়ার্কস্ লিমিটেড নামক একটি পাথুরে চূণের কারখানা আছে। প্রসন্ন বাবু অতি অমায়িক ও সদাশয় লোক। তাঁহার স্বযোগ্য পুত্র বাবু ভোলানাথ দত্ত পিতার ধাত পাইয়াছেন। জাপলা হোসেনাবাদের দত্ত বাবুরা হাইকোর্টের ডুওপ্লী উকীল ৬ হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ আশ্রয় হইতেছেন। হোসেনাবাদ একটি বেশ বর্ধিত গ্রাম হটলেও বিগত কয়েক বৎসরের প্লেগে ইহার বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে এবং নগরটি ক্রমশঃই শীতল হইয়া পড়িতেছে। শস্ত, ঘৃত, কাগজের জন্ত সাগে ঘাস, বাঁশ, পাহাড়ী কাঠ, কবল, ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য এতখানকার স্টেশন হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

পালামুজেলার মধ্যে হীরক ছাড়া অপর বনিক পদার্থের অভিশ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার মধ্যে করলা, চূণ, লৌহ প্রভৃতি আছে। করলাবনির মধ্যে রামগড়, বোকাকো (M. Geo. Sur. of India ৬ ভাগ), আওরাঙ্গা হট্টার M. G. S. I vol XV দেওবর, কর্পুরা, করহরখাড়া (M. G. S. I vol vii) সিংহ-

ভূম জেলার মধ্যে নদীর ঢালীতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। Ball's Geo Survy of India vol III P. ৪০, m G S I vol X-viii) ইহা বাতীত জাপলা ও বিলোজা পরগণার যে সমস্ত গিরিরাজি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদিগের মধ্যে খয়রা, ভাঙ্গার অন্তর্গত খয়েরা, শিরদীলি, কুলীয়া, মুকুর্জা, ডালা প্রভৃতি গ্রামের পর্বত-ভাগের মধ্যে চূণ এক লৌহ বহুল পরিদৃষ্ট হয়। বনে শাল, খয়ের প্রভৃতি কাঠও বহুল আছে। এই বিশাল কাজর টেটের অধিকারী হাইকোর্টের উকীল ৬ উমেশচন্দ্র সরকারের পুত্র কলিকাতা ও পাটনা হাইকোর্টের উকীল বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার এবং তাঁহার ভ্রাতাপণ শরৎ ভূষাধিকারী হইতেছেন। এ সবকিছুর পরে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

দেশের এই প্রকার উচ্চাঙ্গল সময়ে যখন যোগল সম্রাটগণ ক্রমশঃই হীনবল হইয়া আসিতেছিলেন সেই সময়ে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দী খাঁ সিংহের ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত হইয়া আইসেন। নবাব নাসীর খাঁ জাউদৌলা আলীবর্দীকে খুব ভাল বাসিতেন। আলিবর্দী দেখিলেন যে, গয়া এবং পালায়ুর উপরোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাদের দমিত না করিলে ভবিষ্যতে যোগল সুবেদারীর পর্যাপ্ত বিপদপাত লইতে পারে বলিয়া তিনি টিকারী-রাজ সুন্দরসিংহ, দেওরাজ ছত্রপতিসিংহ এবং নওয়াদার নবাব নাসদার খাঁ মুইয়ের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়া নওয়াদা, আবগীলা, উমুগা, তেলজিরা, আরমু-পরায়ী, উত্তরমু, নেরা, পানী, ভুয়া প্রভৃতি

স্থানের যুদ্ধে ঐ সকল সামন্ত রাজগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিলেন এবং তাঁহারা মোগল সম্রাটের বশ্ততা স্বীকার করিয়া কর ও রাজস্ব দান করিতে লাগিলেন, এদিকে সাগের-উল্ মুতাক্করীনের লেখক মোলাম হোসেন খাঁর পিতা নবাব হেদায়েৎআলী খাঁ নবাব আলিবর্দী খাঁর অব্যবহিত পরে বিহারের ডেপুটী গভর্নররূপে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পালায়ু জেলার ঐক্য বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া পালায়ু রাজ ও সোনপুরী রাজদ্বয়কে বশে আনিয়া পালায়ু পরগণা এবং সোনপুরী-রাজের অধিকৃত জাপলা, বিলৌজা প্রভৃতি পঞ্চ-পরগণার এবং পাওয়াই রাজাধিকৃত সিরিশ ও ফুটুবা পরগণার উপর যোগলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে রামগড়রাজ বশ্ততা স্বীকার না করিলে নবাব হেদায়েৎ আলি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রামগড় জয়ের জন্য সৈন্য সহ অগসর হইলেন। ভীমচূলা, কীতাত, কাকল, বিশ্বরামপুর, পাণ্ডু, ডালা, পাটল, আসাতু প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে রামগড়-রাজ তীব্র বাধা দিয়াও মোগল-বাহিনীকে হটাইতে না পারিয়া শেষে ভূর্গ ছাড়িয়া বনের মধ্যে পলায়ন করিলে ডেপুটী গভর্নর নবাব সাহেব রামগড় জয় করিয়া শ্রবণ করিলেন যে, মহারাষ্ট্রগণ ৫০০০০ সৈন্য সহ পতিত রঘুজী ভোঁসলাব নেতৃত্বে অগসর হইতেছেন। এই সংবাদ পাইয়াই আলিবর্দী খাঁ পালায়ু ও পরা স্থানের সকল তার ডেপুটী গভর্নর হেদায়েৎ আলি খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া বরং মহারাষ্ট্রগণকে

দেখ হইতে তাড়াইবার জন্ত পাটনায় গমন করিলেন। নূতন সহকারী গভর্নর সাহেব রামগড়ের রাজাকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরিয়া দিয়া সোন-পুরাদি নবাবপ্রতিভূতাগগুলির শাসন ও বন্দোবস্তের জন্ত অগসর হইলেন। এই সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের যুগে এবং ব্রিটিশ শক্তির প্রথম অভ্যুত্থানের কালে গয়াজেলা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বিজিত সৈন্তগণের দ্বারা লুণ্ঠিত হইত বলিয়া নিঃস্ব অধিবাসিগণের আর কষ্টের সীমা থাকিত না। নবাব হেদায়েৎ আলি খাঁ নিজ শাসন-কার্য সুচারুরূপ পরিচালন জন্ত জাপলা পরগণার অন্তর্গত দৌরিখাদি মৌজাব সম্মিলিত হোসেনাবাদ নামক একটি নগর স্থাপন করিয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। সোনপুরারাজ রাজ কর না দেওয়ায় দিল্লীর আদেশে ক্রমে তাঁহার তালুক নবাব সাহেব দখল করিয়া লইয়া দিল্লী হইতে কারমান আনাইয়া নিজ নামে বন্দোবস্ত করাইয়া লইলেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, শেষে মোগল সম্রাটগণের শাসন কালে যখন মোগল সাম্রাজ্য ক্রমবশেষে অস্তিত্বশেষে ধাবিত হইতেছিল, তখন দিল্লীর মোগল দরবারের দাবতীয় আমীর ওমরাহগণ গয়া, সাহাবাদ, পাটনা প্রভৃতির জায়গীরে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বহু শিল্পী ও কর্মকারগণকে সেই সূত্রে দেশে আনিয়া বাসস্থাপন করাইয়াছিলেন। গয়া জেলার মধ্যে জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত দৌণতপুরের কাছি আসাদ আলি খাঁ,

রাউদঙ্গের নবাব দাউদ খাঁ, মওরাদা মহ-  
কুমার অন্তর্গত মহকুমার নরহট্টের কাজী, ঐ  
মহকুমার দাকৌলী খানার অন্তর্গত কন্দে-  
র্জরা-উক-শিরদৌলা নিবাসী সাইয়দ শাহ  
আসাদুল্লাহ, আফানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত  
পিঞ্জোরার সৈয়দ ও আল্লখর শরীফের শাহ  
সায়েব প্রভৃতির বংশাবলীর গয়া জিলায় বাস-  
স্থাপন এইরূপে হইয়াছিল । ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে  
বালাজী রাও ৫০০০০ হাজার সৈন্যসহ গয়ার  
মধ্য দিয়া বাকলা দেশ জয় করিতে আসিবার  
সময় পরা নগর লুণ্ঠন করত তত্রত্য মুসলমান  
অধিবাসিগণকে বিধ্বস্ত করেন । পালী এবং  
উৎকলের বুদ্ধে টিকারী-রাজ পরাজিত হইলে,  
মহারাজ সেনাধিপতিকে প্রভূত অর্থদণ্ড দিয়া  
খীর বিশাল রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া-  
ছিলেন ।

ক্রমশঃ

ত্ৰিপ্রকাশচক্র সরকার বি-এল্ ।

## মহুগুহ ।

মহুগুহ আমাদের একটি প্রধান আলোচ্য  
বিষয় ; এবং উহা নিত্য আবশ্যকীয় ও উপা-  
বেশ । মানুষ যদি প্রত্যহ কিছুকণ ধরিয়া  
আপন আপন মহুগুহের বিষয় আলোচনা করে,  
মানব হইয়া কে কতটুকু মহুগুহ লাভ করিতে  
পারিয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে যদি তাহা আপন  
মনেরে বিচার করিয়া দেখে, তাহা হইলে, এ  
জগতের অনেক দুঃখ-দৈতের লাভ হয় । যদি  
সকলই মহুগুহের বিবেচনা রাখিয়া, সত্য-

ধর্মের পবিত্র সাহসে জ্বরকে বলীমান করতঃ  
কালে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে জগতে আর  
কোন প্রকার বৈষম্য উপস্থিত হয় না ; এবং  
মর্দাহত ব্যক্তির জ্বরভেদী আর্জনাহও আর  
ভ্রুনিতে পাওয়া যায় না । সংসারে এত ভীষণ  
জালা-যন্ত্রণাসমূহও আর স্থান পায় না । কে  
বিশ জগতে নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, যে বিবেক  
জালায় জগৎ জর্জরীভূত, জালাময়, কঠোরতা-  
ময় হইয়া পড়িয়াছে, যে বিবেক জগতের কোমল  
কমনীয় আকৃতিকে বিকৃত ও বিভীষিকাময়ী  
করিয়া ফেলে—সে বিবেকও আর অস্তিত্ব থাকে  
না ।

বিশ্বকর্তা পরমেশ্বরের প্রদত্ত যাবতীয়  
পবিত্র পদার্থ, অক্ষয় শক্তি ও অনন্ত সুখপূর্ণ, সদা  
বেদীপামান্ যে স্থান—তাহাই জগৎ-নামে  
অভিহিত । সেইরূপ জগতের স্বর্গীয় শক্তির  
অর্থাৎ মহুগুহের ব্যাভিচারিহই জগতের শক্তি ।  
যাহা বিকৃত, তাহাই সত্যের বিরোধী ; সুতরাং  
মানবের মহুগুহই স্বর্গীয় জগতের আশ্রয় এবং  
মহুগুহের ব্যাভিচারই বিকৃত জগতের হেতুভূত ।  
এই ব্যাভিচার কৌন পথ দিয়া আসিয়া এমন  
শক্তি সাধিতে লাগিল, তাহা স্থির করা  
হুসাধ্য । তবে এই সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে  
হইলে, দেখিতে হইবে যে, মানবের প্রকৃতির  
সহিত জড়জগতের কিরূপ সম্বন্ধ ।

মানুষ এবং জড়জগৎ পরস্পর এরূপ সম্বন্ধে  
আবদ্ধ যে, পরস্পর কেহ তাহাকেও আশ্রয় না  
করিয়া থাকিতে পারে না । ইহা যে ভিত্তি  
সরল ও সত্যমুখে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠা  
রাখিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা মানবের

জানাবা। ঈশ্বর হইতে অগতঃ পর্যন্ত যে এক নির্বল, জ্যোতির্পর, সরল ও পবিত্র পথ আছে, মানুষ বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই জন্মাবধি সেই পথের অনুসরণ করিতে বাধ্য। যদি সেই স্বর্গীয় পথের সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে জগতে সত্যোত্তর কোন অস্তিত্ব থাকিত না।

সেই সরল পবিত্র পথ দিয়া ঈশ্বরের কল্যাণ-ময় আদেশ জগতে আসিয়া পৌছায়। মানব-মাজেরই হৃদয়ের অস্থঃস্থল পর্যন্ত এই পথ বিস্তারিত রহিয়াছে। তাই মানব-হৃদয় অশু-সন্ধান করিলে সেই আলোকমালা পরিশোধিত পবিত্র পথ দেখিতে পাওয়া যায়।

চুরি করা, মিথ্যা কথ্য বলা, পরহিংসা করা প্রভৃতি কার্য্য পাপ কি পুণ্য, তাহা যদি জানিতে চাও, তবে তর্ক যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া, আপন হৃদয়কে একান্তমনে জিজ্ঞাসা কর—সত্ত্বের পাইবে। সেই হৃদয়-বাণী তোমার স্তম্ভিত করিয়া দিবে, তোমার পাপ-প্রবৃত্তি সন্মুচিত করিবে; মনুষ্যের জগৎ সত্যের আলোক তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত করিবে। তখন তুমি আপনিকুব্রিতে পারিবে, মিথ্যা বলা, চুরি করা পাপকাণ্ড। তখনই জানিতে পারিতে—তোমাকে শাসন করিতে, তোমার সাবধান করিতে—তোমার হৃদয় বাতীত অন্ধ কেহ নাই। তাই বলি—মানুষ জন্মাবধি আশ্রয় এই সত্য, সরল, স্বর্গীয় পথে বিচরণ করিতে বাধ্য থাকিবে, বিমল মন হইতে বিমল বাসনা প্রসূত হইয়া, বিমলভাবে সংসার সমুদ্রেতে সীলা করিবে, স্বর্গীয় সম্পদের পৌরুষ বন্ধা করিবে—ইহাই ভগবানের

আদেশ। কিন্তু এখন সেই আদেশের বিপরীত হয় কেন? শাস্ত্রোক্ত হইয়াছে—“বাসনা বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা শুদ্ধা বাসনার কথা উপরে লিখিত হইল, শুদ্ধা শুদ্ধা বাসনা। আর এক প্রকার বাসনা আছে, তাহাকে মলিনা বাসনা বলে। মলিনা বাসনা সত্যের ও হৃদয়ের শাসনকে উপেক্ষা করে। এই মলিনা বাসনার বশবর্তী হইলেই মানব ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় এবং পাপ-তাপ, আলা-যন্ত্রণা প্রভৃতি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। এই মলিনা বাসনাই মানুষকে অহরহঃ হৃৎশব্দে পেষণে নিম্পেষিত করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ সহজে এই ব্যভিচারের বিনাশ সাধন করিতে সক্ষম হয় না। কারণ, যে মলিনা বাসনা হইতে ব্যভিচারের উৎপত্তি হয়, শুদ্ধা বাসনা ও তৎসংচরিত মনুষ্যত্ব ভিন্ন তাহার বিনাশ হয় না।

মানব যখন ব্যভিচারের ভাড়নায় মগ্ন হইয়া, ব্যাকুলপ্রাণে রোদন করে, পাপানলে যখন তাহার হৃদয় অগ্নি-পুড়িয়া যায়, যখন সে আপন হৃদয়ে মনুষ্যত্বের অভাব অনুভব করে, তখন তাহাকে মনুষ্যত্বই আশ্রয় প্রদান করে। যখন সে মানুষ হইয়া মনুষ্যত্বের আশ্রয় লয় নাই—ইহা বুঝিতে পারিল, তখন তাহার মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসিল, মলিনা বাসনা দূরীভূত হইয়া শুদ্ধা বাসনা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বলিল।

যদি সত্য ও মনুষ্যত্বের শাসন অজ্ঞেয় না হইত, তাহা হইলে মনুষ্যকে ভাল করা হইত না, বিকৃতকে প্রভুত করা অসম্ভব হইত।

মহুবাঘের শক্তি স্বর্গীয় ও অজের, তাই তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মানব যুদ্ধের জন্তও ঘৃণা হইতে পারে না। বাহা উপদেশ, যাহা স্বর্গীয়, তাহাই মহুবাঘের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। ধর্ম মহুবাঘের প্রাণ এবং শান্তি মহুবাঘের নিকেতন। অস্ত্রাস্ত্র যাবতীয় সদৃশাবলী মহুবাঘের সেবক। ঘৃণা উদ্ভিত হইলে যেমন অন্ধকার কোন্ নিভৃত কন্দরে লুকায়িত হয়, সেইরূপ মানব-জন্মে মহুবাঘ অভ্যাদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হিংসা, ঘেদ, ঈর্ষা, অসুখা, পর-নিন্দা, মিথ্যা, বৈষম্য প্রভৃতি বিকৃত জগতের সমস্ত নারকীয় পদার্থগুলি লয়প্রাপ্ত হয়। জলে যেমন আগুন জ্বলে না, শত্রু-মিত্রে যেমন একত্রে বেড়ায় না, সেইরূপ মহুবাঘ ও মহুবাঘের বাস্তিচারও এক স্থানে থাকিতে পারে না। মহুবাঘের আগমনে বাস্তিচার দূরে পলায়ন করে।

জাতিভেদের আদি কারণ অতঃসন্ধান করিয়া দেখিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মহুবাঘের তারতম্যানুসারে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। যদি জগতে মহুবাঘের সন্ধান অধিকার থাকিত, তাহা হইলে এক্ষণ জাতিভেদ প্রথাও দেখিতে পাওয়া যাইত না।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ মহুবাঘাধিকারী ছিলেন বলিয়া আৰ্ঘা নামে জগতে পূজা ছিলেন। আশুরা তাহাদের এমন একটা গুণও প্রমাণ হই নাই, যাহাতে আৰ্ঘাসন্ধান বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। এই আৰ্ঘ্যপণ এক সময়ে ‘জগৎপূজা’ ছিলেন, আর আশুরা তাহাদের সংবধন হইয়া মহুবাঘ বিহীনাবস্থায় কোন-

প্রকারে এখন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি যাত্র। ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে ?

শ্রীললিতাক্ষ হোড় ।

## সাকার দেবতা ।

( কৃত্ত গল্প । )

“বিনোদ !”

“আদেশ করুন !”

“আমি পণ নিয়ে, তা’তে তোর কি ?

“বাবা ! বিয়ের পণ কি আপনার নেওয়া উচিত ? আমাদের কি টাকার অভাব আছে ? আমরাই যদি পণ নিয়ে বিয়ে করি, তা’ হ’লে যারা গরীব তারা ত নেবেই।”

“আমি তোর কাছে উপদেশ নিতে আসি নাই ;—শুধু বল বিবাহ কর্বি কি না ?”

“বাবা ! আমি যে পণ-প্রথা নিবারণের জন্ত কত সভা-সামিতিতে বক্তৃতা করেছি, কত লোকে উপদেশ দিয়েছি ;—এখন আমিই যদি পণ নিয়ে বিয়ে করি, তা’ হ’লে লোকে কি বলবে ? কেমন করে লোক-সমাজে এ কালামুখ দেখান ?”

“এখন বক্তৃতা রাখ, স্পষ্ট বল,—এ বিবাহ কর্বি কি না ?

“না”—দৃঢ়বরে বিনোদ বলিল—“না”  
আমি পণ নিয়ে বিয়ে করবো না।”

“এই কি ঠিক ?”

“হ্যাঁ, এই ঠিক।”

পিতা জগদীশ বাবু পুত্রের অবাধ্যতার

জোড়ে অধীর হইয়া বলিলেন—“যে পুত্র পিতৃ-  
বাধ্য লক্ষণ করে, সে পুত্র—পুত্র নয়—শত্রু ।  
আমার বাড়ী হ’তে দূর হ’য়ে যাও, তুমি আমার  
তাক্য পুত্র ।”

“এখনি যাচ্ছি ।” এই বলিয়া বিনোদ  
চলিয়া গেল ।

বিনোদ এক বজ্রেই বাড়ী হইতে বহির্গত  
হইল । গৃহিণী পুত্র বিনোদের গৃহত্যাগের  
কথা শুনিয়া উঠেঃখরে কাদিতে লাগিলেন ।  
হার, ভ্রাম-বিহীন জীবন্যাবনের জায় তাঁহার  
আনন্দ-নিকेतন আজ নিয়ানন্দময় হইয়া  
উঠিল ।—হার রে মায়ের প্রাণ !

( ২ )

পরিভ্রান্ত বিনোদ বাটী হইতে বাহির  
হইয়া, নিজের জীবনকে নদী-বক্ষে বিক্ষিপ্ত  
নিরবলম্বন ভূগের মত অসুভব করিতে লাগিল ।  
শৈশবের খেলা-ধর হইতে আরম্ভ করিয়া,  
বর্তমান জীবনের অবস্থার বিষয় একে একে  
তাঁহার স্মৃতিপটে উদয় হইতে লাগিল । সে  
কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কত  
দুঃখের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল ;—হার !  
আজ তাহা মর্দী-সৈন্যের বালুকা-ভূপের মত  
নিমিষে ভাঙিয়া গেল ।

বিনোদ ভাবিতে লাগিল,—অমন স্নেহময়  
পিতা আমার, কেমন করিয়া আজ এত নির্মম  
হইলেন । কি এমন অপরাধ করিয়াছি, যাঁহার  
অন্ত আঁখি ভিনি আমার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া  
দিলেন । অর্ধের কত ! হার, পুত্রের চেয়ে  
অধিক কি বড় হইল ? এইরূপ মান্য কথা  
ভাবিতে ভাবিতে সে কহিলোঁতার আসিল ।

কিন্তু কি করিয়া জীবনধারণ করিবে ভাবিয়া  
পাইল না । অবশেষে বন্ধ বিয়লচন্ডের সহিত  
সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার নিকট সকল কথা  
প্রকাশ করিয়া বলিল ।

বিয়ল বলিল—“বেশ, ভাল কাজই করেছ  
তাই । অর্থ-লোভে তুমি যে পুরুষাৰ্থ বিক্রয়  
কর নাই, তজ্জন্ত তোমায় শত শত ধন্যবাদ  
দিই । সম্প্রতি আমাদের এখানেই থাক ;  
তার পর দেখে-শুনে চাকুরির চেষ্টা করো ।  
আর দেখো ভাই ! এসব কথা যেন বাঁধা  
জানুতে না পারেন ।”

বিনোদ বন্ধগৃহে আশ্রয় পাইল । বিয়লের  
পিতা ভবেশবাবু দয়া করিয়া তাঁহার গৃহে  
বিনোদের দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের ব্যবস্থা  
করিয়া দিলেন । দিন বেশ সুখেই বাইতে  
লাগিল । কিন্তু মাঝে মাঝে সেই স্মৃতির পল্লী-  
প্রান্তে অপত্য-মায়ী-মুগ্ধা স্নেহময়ী জননীর কথা  
মনে আগিয়া উঠিত, আবার নিজ মনেই ধীরে  
ধীরে বিরাম লাভ করিত ।

ছয় মাস অতীত হইল বিনোদকুমার বন্ধ-  
গৃহে অবস্থান করিতেছেন, ইহার মধ্যে সে  
মাতাকে কোন চিঠি-পত্রাদি লেখে নাই ।  
পিতা তাহাকে বাড়ীতে বাইবার অল্প অনুরোধ  
করিয়া দুই-তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ।  
কিন্তু অভিমানী বিনোদকুমার মনের কোঁড়ে  
সে সকল পত্রের উত্তর পর্যন্ত দেয় নাই ।

( ৩ )

বাহুব বন্ধন বড় মেহের বড় হারাইয়া কেলে,  
তখন সে সেই জিনিষের অভাবে পরিস্রাবি  
সর্বজন বাতনার মন-কল পরিভ্রাপ করে।

জগদীশ বাবুর অবস্থা ঠিক সেইরূপ। তিনি বধন বিনোদকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তখন ক্রোধের বশেই তেমন কঠিন-জবর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রোধামল ক্রমে সময়-সুগিলে নির্ঝাপিত হইলে বিনোদের জন্য তাঁহার প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি প্রিয়তম পুত্রকে বিদায় দিয়া কয়েক দিন চখের জল ফেলিলেন,—ক্রমে চোখের ধারা শুকাইল, কিন্তু প্রাণের আশ্রয় রাবন্দের চিতার মত জ্বলিতে লাগিল।

এ দিকে অন্তপুরেও সুখ-শান্তি নাই। বিনোদ-জননী পুত্র-বিরহে দিবানিশি অশ্রুজলে জ্বলিতেছেন, সে অশ্রুর বিরাম নাই। এই স্ত্রীর্ধ ছয়টা মাস যাবৎ অবিরল ধারায় ঝরিতেছে। হায়, তাঁহার চির-শান্ত-হৃদয়ে আশ্রয় অলিয়াছে—বুঝি বিনোদ ব্যতীত সে আশ্রয় নিবিবে না। বিনোদ যে তাঁহার বড় আদরের—বড় স্নেহের ধন।

বাহাকে বিন্দু বিন্দু বুকুর রক্ত দিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, যার মলিন মুখ দেখিলে নিজে কাঁদিয়াছেন, যার রোগে সারা-রাত্রি জাগিয়া বাতাস করিয়াছেন,—সেই প্রাণাধিক বিনোদ কোথায়? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ-জননী বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। পুত্র-বিরহ-কাতরা জননী শয্যা গ্রহণ করিলেন।

একদিন তিনি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন,—“কোথায় ছুঁ পায় পড়ি, আমার বিনোদকে এনে দেবাও, আমি জন্মের মত সেই চাঁদ বুকে ধরি ধরে বাই। বাও—একবার এনে তাকে

দেবাও। আমার বুকুর মিথি—ছার-সোদিত প্রাণাধিক বিনোদকে একটিকার মাত্র দেবাও। আমার এই অস্তিম-শয্যায় শেষ মিনতি কি রাখবে না?” কাতর ও মিনতিপূর্ণ স্বরে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়ের নিভৃতকন্দর ফাটিয়া উজ্জ্বল-প্রভাবণ রোগশীর্ণ গুণ্ডহল প্রাবিত করতঃ উপাধান সিক্ত করিল। শান্তি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বাম হস্তে মাথা টিপিতেছিল আর দক্ষিণ হস্তে অবিরাম বাতাস করিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে মায়ের চোখের জল মুছাইয়া দিতেছিল। এবারেও সে অশ্রু মুছাইয়া দিল। কিন্তু বুকফাটা অশ্রু তাহাতে মিটে কি? প্রাবনের ধারা সহজে যায় কি? হৃদয় প্রাবিত বনার শ্রোত বাধে আটকায় কি? হায় রে জননীর প্রাণ! জগদীশ বাবুও বুকুর মাথা বুকে চাপিয়া দুই হাতে চোক ঢাকিয়া, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রিয়তমা পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—“কৈদ না পুণ্য! বিনোদ বা'তে বাড়ী আসে, আমি এখন তার ব্যবস্থা করছি।”

জগদীশ বাবু সেই দিনই পুত্রের নিকট আব্রুজেন্ট টেলিগ্রাম করিলেন,—“তোমার জননী বৃদ্ধা-শয্যায় শায়িতা, বোধবার ইচ্ছা থাকিলে শীঘ্র আসিবে।”

সন্ধ্যার পূর্বে বিনোদ একাকী বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল; এমন সময় পিয়ন আসিয়া ডাকিল—“বিনোদ বাবুকা তার মায়া হ্যাঃ!” বিনোদ চমকিত হইয়া ক্রত বাহির হইয়া তার গ্রহণ করিল। শক্ত হৃদয়ে কণ্ঠিত হস্তে তাহা উদ্ধৃত করিল। এ কি ভীষণ



বজ্রাঘাত !!

বিনোদের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে মাতালের ভায় টলিতে টলিতে ভবেশ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার কাছে নিজের সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিল।

ভবেশ বাবু আনুপূর্বিক সমস্ত বস্তান্ত ভূমিরা ভক্তিত হইলেন। তার পর তৎসনা স্বরে কহিলেন—“হায়, তুমি করেছ কি? এমন প্লেহবয় পিতামাতার বৃকে বাধা দিয়া আশিরাহ? পুত্রের জন্ত পিতামাতা যে কত কষ্ট বৃক পেতে সহ্য করেন, তা' শুধু পিতা-মাতাই জানেন। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় হইতেই তাঁহারা সন্তান লালন-পালন জন্ত অপ্লেব ফ্লেশ স্বীকার করেন। তুমি এমনই বিকোণ, এমনই উচ্ছল যে, পরমাশ্রাণ্য পূজনীয় পিতৃদেবের অবাধা হইয়া মাতৃদেবীর স্ববরে নিদারুণ শোকানল জ্বলাইয়া দিয়া পরিশ্রমে—পরের সুখ চাহিয়া বসিয়া আছ। যেমো—পিতামাতার মনে কষ্ট দিলে কখনও ক্ষমালাভ করা যায় না, বরং আজীবন নিদারুণ দুঃখ-দানব্বাহে দক্ষীকৃত হইতে হয়। জান ত, ‘পিতা ধর্মঃ পিতা বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপয়ে প্রীয়ন্তে সর্বং দেবতাঃ।’ পিতা বর্গবানে পুত্রের অজ্ঞ কোন দেবতা নাই, পিতাই সর্ব। সেই পূজনীয় পিতা বাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহা করাই পুত্রের একান্ত কর্তব্য। তুমি যে করে—‘পণ দিলে, দেহ বিক্রয় করা হয়।’ তে দেহ তুমি কোথায় পাইলে? এ দেহ তোমার নয়—তোমার পিতামাতার। তোমার এ দেহ নষ্ট। তাঁহাদের বাধা ইচ্ছা

তাহাই করিবেন—তোমার কি?”

বিনোদ ভাবিল—“তাই তো, আমার কি? ইহাতে আমার কি অধিকার আছে?”

ভবেশ বাবু বলিলেন—“বিনোদ! যাও—এখনি গৃহে যাও, আরাধ্য দেব-দেবী জনক-জন-নীর্ নিকট ক্ষমা চাওগে। তাঁহাদের পদসেবা করিয়া পুত্র-জীবন সাধক করগে। আমাদের শাস্ত্রে আছে—‘পিতরং মাতরকৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেশতাম্। সদা গৃহী নিষেবেত সেবা-ধর্ম প্রয়ত্তবান্।’ হিন্দু আমরা—শাস্ত্রের এ উপদেশ সর্বতোভাবে পালন করা আমাদের কর্তব্য। আর দেখ, দৈব নিরাকার অজের পুরুষ, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু এই সংসারে পিতামাতাকে সর্বদা দেখিতে পাই—জগতে পিতামাতাই সজীব ও সাকার দেবতা!”

ভবেশ বাবুর উপদেশ-বাণী শুনিয়া বিনোদের মনে নিদারুণ অমুতাপ উপস্থিত হইল। তাঁহার সেই পহিতাচরণই যে মায়ের পীড়ার একমাত্র কারণ, তাহা আর বৃদ্ধিতে বাকি রহিল না; সেই দিনই সন্ধ্যার টেপে বিনোদকুমার গৃহাভিগৃহে রওনা হইল। সংসারে পিতামাতাই যে সজীব ও সাকার-দেবতা ইহা বেশ বুঝিতে পারিল। সেই হইতে “পিতা ধর্মঃ পিতা বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।” তাহার মূল মন্ত্র হইল।

( ৫ )

বিনোদ নিদিষ্ট টেসনে অবতরণ করিয়া ডাক্তারভি অগ্রসর হইতে লাগিল, চারিদিকে জীবন অন্ধকার,—কোলের দ্বারস্থ ফেলা বাহ

না। এই জীবন স্বরকার ভেদ করিয়া বিনোদ আশা ও নিরাশার মধ্যস্থলে পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। “মা আছেন কি নাই,— বাড়ী দিয়া মাঝে দেখিতে পাইব কি না,— যদি না পাই, তবে যে আমার পরিবর্তিত জীবনের নবীন তত্ত্ব-দুগ্ধে তাঁহাকে পূজা করিতে পারিব না।”

ক্রমে বিনোদ যত্নে প্রবেশ করিল এবং দূরে অস্পষ্ট প্রদীপালোক দেখিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিল—ঐ আমাদের বাড়ী। ঐ স্থানে আমার পরমারাধ্য পিতা-মাতা অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে আপন বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং শুনিতে পাইল,—গৃহমধ্যে শান্তি শোক-বিজড়িত-স্বরে কাদিতেছে। বিনোদ বুকিতে পারিল—তাহার জননী আর ইহ জগতে নাই। তাই সে রুদ্ধভাবে দরজার নিকটে আসিয়া কল্পিতকণ্ঠে ডাকিল—“শান্তি!” শান্তি দ্বার উন্মুক্ত করিল এবং দাদাকে সম্মুখে দেখিয়া কাদিয়া ফেলিল। বিনোদ অশ্রু-উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল—“শান্তি, মা, কোথা?”

অশ্রু মুছিতে মুছিতে শান্তি বলিল—“মা, তোমার হারাইয়া আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মা’র আর জীবনের আশা নাই। তুমি তাঁকে দেখবে এস।”

যে প্রবেশ করিয়া বিনোদ দেখিল, সেই দ্বি-স্নেহময়ী, হস্তময়ী জননী মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া রোগ-বন্ত্রণায় ছটকট করিতেছেন। তাঁহার সেই সোণার অঙ্গে কে বেন কালিয়া বেগন করিয়া দিয়াছে। বিনোদ আবেগভরে

ডাকিল—“মা।”

“তবু ডাকিস কেন? আমার বিনোদ এখনও এল না? বিনোদ যে আমার বড় আদরের, বড় স্নেহের ধন।”

“এই যে আমি এসেছি মা।”

“কই, কই, হুঃখিনীর জীবনমলল হারানিধি কই? আর আর বাপ। তাকে বুকে ধরে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি।” বলিতে বলিতে স্নেহময়ী বিনোদ-জননী শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সমস্ত ব্যাধি বেন মুহূর্তমধ্যে অন্তহিত হইল। বিনোদ আর দ্বিঃ থাকিতে পারিল না। জননীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং বলিল,—“মা, মা! তোর অব্যর্থ সন্তানকে কমা কর মা।”

জননী স্নেহে পুত্রকে কোলে লইয়া বুৎ-চুষন করিতে লাগিলেন। জগদীশ বাবু এই দৃশ্য দেখিয়া বিষয়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। স্নেহ-কোমল স্বরে ডাকিলেন—“বাবা বিনোদ!” বিনোদ পিতার পদমুগল ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বলিল—“বাবা! আমার কমা করুন। মা বুঝিয়া এতদিন আপনাদের দেব-জগৎ বাধা দিয়া মহাপাপ-সাগরে ডুবিয়ে রাছি। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, সন্তানের উপর পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অধিকার। কেন না, পিতা-মাতা সন্তানের পরমারাধ্য সাকার দেবতা।”

জগদীশ বাবু স্নেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

ঐযোগ্যস্নেহময় বিবাস।

## হরিনাম ।

(পূর্ব প্রকাশিতাংশের পর)

সে কালের বাল্যায় নবাব হোসেন সাহ  
সুখি রাখকে “করোরার পানী” পান করা-  
ইয়া আতিষ্ঠ্য করিয়াছিলেন। কানীর প্রেষ্ঠ  
পতিভগ্ন তাঁহাকে উক্ত বৃত্ত পানে জীবন ত্যাগ  
করিবার প্ররোচিত বিধান করেন, শ্রীগোরাধ-  
দেব তাঁহাকে জীবনত্যাগের পরিবর্তে হরিনাম  
করিয়া পাপমুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন  
যথা,—

“এতু কবে ইহা হইতে যাহ বৃন্দাবন ।

নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীৰ্ত্তন ।

এক নামাত্যাসে তোমার পাপদোষ যাবে ।

আর নাম হইতে কৃষ্ণ চরণ পাইযে ॥”

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

পতিভগ্নাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন  
যে, তিসিন্দ্র তক্তির অনলে নীচজাতের  
জাতীর অপবিত্রতা অতি সত্তর বিনষ্ট হয়, এবং  
অন্যোপে অতীত পবিত্রতার উদয় হয়। এতদপ  
নামি জাম্বীন চণ্ডালও মহাপ্রভু, কিন্তু বেদজ্ঞ  
নাস্তিকও তাঁহার জ্ঞান মাননীয় নহে।” যথা—

“তক্তি নতক্তি দীপ্তারি-নক-দুর্জাতি-কম্বঃ ।

যপাকোহপি বৃথৈঃ স্যামো ন বেদজ্ঞোহপি

নাস্তিকঃ ॥”

নীচজাতীর সমাতন শ্রীগোরাধদেবের  
চরণে পতিত হইলে, তিনি তাঁহাকে আলম্বন  
করিতে উত্তত হইলেন, তখন সমাতন  
বলিলেন,—“এতু! আমাকে স্পর্শ করিলেন  
না, আমি অতি নীচজাতি, অতি বীনচরী।”

প্রত্যাহরে এতু বলিলেন,—“তোমা স্পর্শ  
পবিত্র হইতে, তক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড  
শোধিতে।” এতু আরও বলিলেন,—

তববিধা ভাগবতাতীর্থাভূতা স্বয়ং প্রভো ।

তাধাকুরন্তি তীর্থানি স্বাত্মেন পদাভূতা ॥

নমে তক্তশতকৈরী মন্তকঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ ।

তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহং সচপূজ্যো

বখাহবৎ ॥”

“অক্কাঃ ফলং স্বাদৃশ দর্শনং হি

তনোঃ ফলং স্বাদৃশ গাত্র সঙ্গঃ ।

জিহ্বাফলং স্বাদৃশ কীৰ্ত্তনং হি

সুহৃৎভা ভাগবতা হি লোকে ॥”

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ঠাকুর হরিনামকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হরিনাম! কলিতে গো-  
ব্রাহ্মণ হিংসাকারী যবনগণের মুক্তির উপায় কি  
হইবে?” হরিনাম বলিলেন,—

“যবন সকলের মুক্তি হবে নামাত্যাসে।

‘হারাম’, ‘হারাম’ বোল কহে নামাত্যাসে ॥”

মহাপ্রেমে তক্ত কহে ‘হারাম’, ‘হারাম’ ।

যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম ॥

যতপি অস্ত্র সঙ্কেতে অস্ত্র হয় নামাত্যাস ।

তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥

অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ ।

বিষদূত আসি ছোড়ায় তাহার বন্ধন ॥

‘রাম’ হুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত ।

প্রেমবাচী ‘হা’ শব্দ তাহাতে কুচিত ॥

নামের অক্ষর সবার এইতো স্বভাব ।

অব্যবহিত বৈলে না ছাড়ি আপন স্বভাব ॥”

“নামৈকং যতবাচি স্বরণপঞ্চকং শ্রোত্রবৃন্দং

পদং বা ॥

তত্ব বা শুদ্ধবর্ণ বাবহিত রহিতংভার-  
ভ্যেব শতং ।”

“নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ।

নামাভাস হৈতে হয় সৰ্ব্বপাপ ক্ষয় ॥

নামাভাসে হুক্তি হয় সৰ্ব্বশাস্ত্রে দেখি ।

ঐভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ॥”

(ঐতৈত্তত্ত চরিতামৃত)

বিধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম করিয়া লইবার, বিজা-  
তীয়কে সজাতীয় বলিয়া গ্রহণ করিবার এবং  
নীচ জাতীয় লোকদিগকে উন্নীত করিবার ইহা  
উৎকৃষ্ট পন্থা । জানি না, ইহাপেকা সুন্দর ও  
সরল পথ পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মে আছে কি  
না ? ধর্ম্মশ্রোতা কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তিব্যংসের  
জায় নিরত হিন্দুধর্ম্ম লয়প্রাপ্ত হইয়া আসি-  
তেছে । বদে কে এমন মহাপুরুষ আছেন,  
যিনি ঐতৈত্তত্তদেবের জায় উদার পন্থা অবলম্বন  
করিয়া এই পতনশীল জাতিকে তাহাদের স্বধর্ম্ম-  
ভাগরূপ মহাব্যাধি ও জাতীয় অপমাত নিবা-  
রণ করিতে পারেন ? কে এমন ধর্ম্মবীর  
আছেন, যিনি হরিনাম প্রাবনে অন্তরিকে স্তম্ভ  
করিতে, নীচকে উচ্চ করিতে, পাপিকে পুণ্য-  
বান্ করিয়া, আপন সমাজ ও ধর্ম্মের বিশাল  
ক্রোড়ে স্থান দান করিতে সমর্থ হইবেন ?

কোনও পল্লীগ্রামে একটীমাত্র ভাল পুক-  
রী ছিল, পল্লীস্থ সকল লোকে সেই পুকুরের  
জল পান করিত । উহা ব্যতীত তাহাদের  
আর ভাল জল পাইবার উপায় ছিল না ।  
এক সময়ে কতকগুলি ছুঁইলোক ঐ জলাশয়ের  
তীরে, ঘাটে, পথে, চতুর্দিকে মলময় করিয়া  
প্রাণবাসিস্বপ্নকে বিরক্ত করিতে যাপিল । শত

চেষ্টা করিয়াও তাহারা এই উপগ্রহের শাস্তি  
করিতে না পারিয়া অবশেষে পুলিশে সংবাদ  
দিল । তৎপরে থানা হইতে একদিন একজন  
পুলিস আসিয়া যেমনি একটা নিবেদন আজ্ঞা  
প্রচার করিল, অমনি সেইদিন হইতে সেই  
দুর্ভাগ্য বন্ধ হইয়া গেল । ক্ষমতার এমনই গুণ,  
এমনই প্রভাব ।

এখানে আর একটি কাহিনী বলিব ।  
কথাটা নিতান্তই গল্প নহে, খুব সত্য কথা ।  
বারদ্বার লোকবিস্তৃত সিদ্ধপুরুষকে আপনারা  
অনেকেই জানেন । একদা তিনি জলপথে  
কোথাও যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে জনৈক  
ব্রাহ্মণ-শিষ্যকে তাঁহার দত্ত অন্ন-ব্যাঞ্জন আনিতে  
আদেশ করিলেন । শিষ্য কহিলেন, “ও প্রভু !  
সহরের পথে এ জনতার মধ্য দিয়া কেমন  
করিয়া আনিব—‘ছুঁই’ লাগিবে যে !” গুরু  
উত্তর করিলেন, “ক্ষতি নাই ।” শিষ্য-অন্ন-ব্যাঞ্জন  
আনিবার নিমিত্ত দুই চারি পদ গমন করিলেন,  
মহাপুরুষ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,  
“দেখ, যে ব্যক্তি দ্রব্য আনিবে, তাহা আমি  
খাইতে পারিব, তুমি কিন্তু পারিবে না ।” শিষ্য  
বলিলেন “কেন প্রভু ! আপনি পারিবেন,  
আর আমি পারিব না কেন ?” গুরু হাসিয়া  
উত্তর করিলেন, “না বৎস, আমি ব্রাহ্মণ—আমি  
যাহা পারি, তাহা তুমি পারিবে না ; তুমি শু  
এখনও ব্রাহ্মণ তও নাই ; যখন পরম-ব্রহ্মকে  
জানিতে সমর্থ হইবে তখন তুমিও পারিবে ।”  
প্রান্তরে বিচরি যবে হাতালি • নিরখি সবে  
ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র বলি করি অনুমান ;

• হাতালি ।

উঠিলে শেখর শিরে, হেরি সব একাকারে,  
তখন জনিতে নাহি থাকে ভেদ জ্ঞান।  
বস কাল নরগণ, নাহি করে আরোহণ,  
ধর্মের উন্নত শীর্ষ ভূমির উপর,  
তত দিন তার হায়, ভেদ-জ্ঞান থেকে বায়,  
বিধর্মী হেরিয়া তার অলে কলেবর।  
ধর্মের উন্নত স্তরে, যে জন উঠিতে পারে,  
ভেদ-বুদ্ধি তার চিতে কত নাহি রয়,  
হিন্দু ব্রাহ্ম পৃষ্ট প্রতি, সতীত সমান প্রীতি,  
ঈশ-প্রেমে পূর্ণ সঙ্গা যাহার হৃদয়।

দেবতার যাহা সাজে, মানুষের তাহা সাজে  
না; সিকপুরুষের যাহা সহজসাধ্য, সাধারণ  
লোকে তাহা করিতে সমর্থ হয় না; অধিকারীর  
যাহা অনায়াসসাধ্য, অনধিকারীর তাহা  
অসাধ্য। খ্রীষ্টেতত্ত্বদেব যাহা পারিয়াছেন,  
আমাদের মত ক্ষুদ্রলোক—তাঁহার পদাঙ্ক অনু-  
সরণ করিয়া, সে কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ  
হইবে কেন? যিনি নিজে সাত্বিক, শুদ্ধ ও  
অচিসম্পন্ন নহেন, তিনি অপর অসাত্বিক অশুদ্ধ ও  
অশুচিকে সাত্বিক শুদ্ধ ও শুচি করিয়া লইবেন  
কেনন করিয়া? যিনি আপনি নামরসে ভূবিয়া  
তজ্জিতে গলিয়া, প্রেমে মাতিয়া 'হারিবোল'  
বলিয়া প্রেমিক ভক্ত হইতে না পারিয়াছেন,  
যিনি সাধনা-বলে সিদ্ধির চাপরাশ প্রাপ্ত না  
হইয়াছেন, অপরে তাঁহার কথা শুনিবে কেন?  
যিনি আপনি শুচিসম্পন্ন নহেন, তাঁহার পক্ষে  
অশুচিকে শুচি করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।  
যিনি আপনি কায়মনোপ্রাণে—আচারে-বাব-  
হারে হিন্দু নহেন, ভক্ত নহেন, প্রেমিক নহেন,  
তৎপালনের নামে হাঁহার পবিত্র অঙ্গ-গলা

প্রবাহিত হয় না, 'হরি' বলিতে হাঁহার নয়ন-  
জল বরে না, তিনি অশ্রুকে পাপী, পাবণ,  
পতিতকে—বিজাতীয় বিধর্মীকে 'হরি' বলিয়া  
শুচি-শুদ্ধ ও নিম্পাপ করিতে, অহিন্দুকে হিন্দু-  
ধর্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দু-সমাজের বিশাল-  
ক্রোড়ে স্থান দান করিতে প্রয়াস পাইবেন,  
কি শক্তি প্রভাবে, কাহার বলে—কোন  
সাহসে? তাহার কথা জগৎ শুনিবে কেন?  
অশ্রুকে আপন কথা শুনাইয়া আশ্রমের মতা-  
বলদ্বী করিতে হইলে শক্তি চাই, সাধনা চাই,  
সাধনা বলে ভগবানের নিকট হইতে তাঁহার  
নামের চাপরাশ প্রাপ্ত হওয়া চাই। অন্যথা  
একজন মানুষের কথা জগতের সহস্র সহস্র  
লোক উৎকর্ষ হইয়া শুনিবে কেন? যিনি  
নিজে শুচি-শুদ্ধ, সাত্বিক সিদ্ধ—যিনি নিজে  
'হারিবোল' বলিয়া পাগল হইতে পারিয়াছেন,  
এ বিশ্ব উৎকর্ষ হইয়া তাঁহার কথা শুনে,  
মকরন্দলোভী মধুকরের ন্যায় নিয়ত তাঁহার  
পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, অমূল্য  
শিখার ন্যায় তাঁহার আদেশ প্রতিপালন  
করে। তাই অগ্রে নিজে অধিকারী হওয়া চাই,  
আগে স্বয়ং শুচি-শুদ্ধ, সাত্বিক-সিদ্ধ হও—  
আগে নিজে 'হারিবোল' বলিয়া পবিত্র হও—  
পাগল হও; তবে ত তুমি খ্রীষ্টেতন্যদেবের  
ন্যায় অনেকে 'হরি' বলাইতে, অশুচিকে শুচি  
করিতে, পতিতকে পবিত্র করিতে, অহিন্দুকে  
হিন্দু করিতে সমর্থ হইবে! অধিকার অর্জন  
না করিয়া মহাপুরুষের আদর্শে শিতর ন্যায়  
অনলে হত্যাপূর্ণ করিয়া বুঝা বহন-বহন-ভোগ  
করিয়া ফল কি?

এখানে একটা গল্প মনে পড়িল। এক সিদ্ধপুরুষের বহু শিষ্য ছিল। একদা যোগীবর নিম্মগণ সহ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ পথ পর্যটন অন্তে তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। পথপ্রান্তে এক মুসলমানভবনে ভোজ্য হইতেছিল, শিষ্য সম্যাসী সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া যবনারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। ঘটনাক্রমে পরদিন তাঁহাদের আর অহার্য্য মিলিল না। তৃতীয় দিন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়, খাড়া-ভাবে তাঁহারা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তখন মহাপুরুষ এক কর্মকার-গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে হিন্দুল-রন্ধিম মৌচপিত্ত সমুহ পেটকের মিস্তার ভক্ষণের জায় অতি দ্রুত ভোজন করিতে লাগিলেন, এবং শিষ্যদিগকেও উহা আহ্বারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুরুদেবের এ অমানুষিক কার্য্য দর্শনে শিষ্যগণ মুকের জায় চাহিয়া থাকিল, কেহই সে অলস লৌহগোলা ভক্ষণে সাহসী হইল না। তখন গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, “বৎসগণ! যবনার গ্রহণে তোমরা আমার পক্ষা অবলম্বন করিতে পারিলে, আর এক্ষণ অলস লৌহগোলা ভক্ষণে ভীত হইতেছ কেন?” এই বলিয়াই মহাপুরুষ শিষ্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কলভঃ স্বয়ং সিদ্ধিলাভ না করিয়া—কৃত্তী না হইয়া মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণে গুরু-কার্য্য সম্পাদনে প্রয়াস পাইলে পদে পদেই একরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়া থাকে। হারো হারো! লীলামারুখের আখ্যা-

ন্বিক ভাব ও গূঢ় অর্থ উপলব্ধি না করিয়া স্বকপোলকল্পিত ঘৃণিত বাখ্যা পূর্ব্বক রাস, বস্ত্র-হরণ ও কিশোরীভঞ্জন প্রভৃতির বিকৃত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের কথাটা স্মরণ করিয়া ক্ষুদ্র একটা পাহাড়—পঙ্কত—অন্তর্য্য দশ-বিশ মণ একটা প্রস্তরপিণ্ড মন্তকে ধারণ করিয়া দেখিয়াছেন কি? না, সে যে বড় শক্ত কাজ! উহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জায় মহা-পুরুষেরই কায়া! একটা গ্রাম্য প্রবাদ আছে যে, “যার কাজ তারে সাজে, অজ্ঞের নামে ঢেলা থাকে।” ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যে এ কথাটার মূগা বড় দমন নহে।

যবন হরিনাম প্রতাহ তিন লক্ষ হরিনাম করিয়া ঠাকুর হইয়াছিলেন। হুই দশ বার ‘হরিবোল!’ ‘হরিবোল!’ বলিয়াই তিনি হিন্দু হইতে—ঠাকুর হইতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। হরিনাম কীর্্ত্তন ও ভ্রমণে পুণ্য আছে,—হরিনামে আত্মার তৃপ্ত, মনের শান্তি, প্রাণের ভক্তি এবং দেহের পাবিত্রতা লাভ হয়; তাই তিনি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, বালকদিগকে মিষ্ট দ্রব্যের প্রলোভনে দৃঢ় করিয়া হরিনাম শুনাইতেন। এ হইতেই হরিনামের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া একটা জনশ্রুতি আছে। সাধনার সিদ্ধি; সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। নাম-বজ্জ মহা-বজ্জ—নাম-সাধনা মহা সাধনা। নাম বজ্জ কখনও নিকল হয় না; যে যত নাম করিতে পারে, যোক তাহার তত নিকটবর্ত্তী।

ক্রমশঃ—শ্রীকৃষ্ণকান্ত যোষ কবিরঙ্গ।

## সুখাশ্বেষণে ।

(গল্প)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, এতক্ষণ যে একটা ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া হাবভুগু বাইতেছিলাম, এখানে সে অন্ধকারটা নাই। অমানিশার অবসানে উষার নিম্ন জ্যোতির মত কেমন যেন এক অবাস্তব মধুর আলোকে নয়ন পুলকিত হইল। এইখানে আমার সঙ্গিধর বলিল,—“বুঝতে পাচ্ছ কি, এই আলো কোথা থেকে আসছে?”

আমি বলিলাম—“না।”

১ম সঙ্গী। অদূরেই এক রাজার রাজ্য আছে। রাজার আদেশে সে রাজ্যে কোথাও একটু অন্ধকার থাকিতে পারে না। আজ্ঞা-বহের মত সূর্য্য সেখানে নিত্য নূতন কিরণ বিতরণ করে। সেই দীপ্তিমান দেশের প্রভাষ এ স্থানটা এত প্রভাষিত। তুমি সে রাজ্যে যাবে?

আমি। হাঁ বাব।

সঙ্গিধর এবার একটা নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিল। যতই পথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই আলোর স্পষ্টতা বাড়িতে লাগিল।

অবশেষে আমরা পূর্বকথিত রাজ্যের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, আহা! কি অপূর্ণ কাককাণ্ডার সেই দ্বার! তাহার উপর স্তরে স্তরে কেমন যে এক শুভ্র বিমল জ্যোতি মধুর বিজ্ঞানে নাচিয়া নাচিয়া দিক্‌দিক্‌

ছুটিতেছিল, তাহা আমি এ লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করিতে পারি না।

হা বিধাতা! কেন সেদিন সেই স্বপনের আবরণে ঐ ত্রিদিব প্রতিমাখানি আমাকে দেখাইলে? আর কি আমি এ জীবনে তাহা দেখিতে পাইব না?

তারপর আমি বিশ্বয়পূর্ণ-হৃদয়ে সেই তোরণ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে একজন রক্তবস্ত্র পরিহিত দীর্ঘকায় পুরুষ জলদগন্তীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“হোমারি প্রঞ্ছলিত কর, তবে এ দ্বার উন্মুক্ত হইবে।”

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমার দুই পাশে দুইটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল, আর দেখিলাম, একি! সেই দুইটা অগ্নিকুণ্ডে সহস্র আমার সেই দুইটা সঙ্গী তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিল। যুগপৎ অনলরাশি বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সেই অগ্নির আলোকে এবার আমার সঙ্গিধরকে চিনিতে পারিলাম—ওহো! এরা যে নির্মলা ও ভোলাদাদা!

আমি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে সেই সন্ন্যাসী যেন দেব-বিনিম্বিত-কণ্ঠে উঠেঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

“মৃত জহীহি ধনাগমভুকাং ।

কুরু তম্বুজো মনসি বিভুকাং ।

যন্নভসে নিজ কর্ণোপাত্তং ।

বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং ।

কাতব্য কাত্তা কন্তে পুত্রঃ ।

সংসারোহরমভীষ বিচিত্রঃ ।

কন্তং যং বা কুভঃ আরাভ ।

তবং চিত্তয় তদিতং ভ্রাতঃ ।

বা কুক ধনজন যৌবন সর্বং ।

হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বং ।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ।

ব্রহ্মপদং প্রবিশান্ত বিদিত্বা ॥

নলিনীদলগতজলমতি তরলং ।

তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং ॥

কণমিহ সজ্জন সজ্জিৎ রেকা ।

ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥

সন্ন্যাসীর যুগলিঃস্মৃত কবিতাটি শুনিতে শুনিতে সহসা মনে হইল যেন সে কণ্ঠের আমার পরিচিত । সেই সময়ে আমার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম—সত্য সত্যই আমার দুই পার্শ্বে দুইটি অগ্নিকুণ্ড জলিতেছে, আর সেই অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই সন্ন্যাসী সেই ভাবে সেই সুরে পাঠ করিতেছেন যাবজ্জননং তাবদ্ব্যয়ং ।

তাবজ্জননী অঠরে শরনং ॥

ইতি সংসারে ক্ষুটতর দোষঃ ।

কণমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥”

আমার মনে হইল, বৃক্ষ তখনও আমি স্বপ্ন দেখিতেছি । আমি তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে চক্ষুধর বার বার মুছিলাম, কিন্তু তাহাতেও সেই কুণ্ডলাকার অগ্নিরাশি বা সেই উন্নতশীর্ষ তান-ময় সন্ন্যাসী আমার নয়ন-পথ হইতে কিছুতেই সরিয়া গেল না । শুনিলাম—সন্ন্যাসী তখনও উঠেঃস্বরে বলিতেছেন,

“সুরবর মৃন্দির তরুতলবাসঃ ।

মহা তুলল মলিনং বাসঃ ।

সর্বপরিগ্রহ ভোগত্যাগ ।

কন্তু মুখং ন করোতি বিরামঃ ॥”

সহসা সন্ন্যাসী ধামিরা যাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন । তাঁহার নয়নধর হইতে কেমন যেন এক অন্তর্ভেদিনী কুটী বাহির হইয়া আমার সর্কালের উপর চড়াইয়া পড়িল ।

সন্ন্যাসী বলিলেন—“নয়নানন্দ, চিন্তে পাজ্জ আমি কে ?”

সন্ন্যাসীর এই গম্ভীর প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জানি না, কোন্ গুণ্ডতারে যে আঘাত করিল ;—নিমেষের মধ্যে এক তীক্ষ্ণ বেদনাময় স্মৃতির বাজনা বাজিয়া উঠিয়া আমার দেহের ধমনীতে ধমনীতে উচ্চ রক্তধিনু ছুটাইতে লাগিল । কি সর্বনাশ ! এ যে সেই সন্ন্যাসী ! যাহার স্ত্রী-পুত্রকে অকারণে এক পৈশাচিক লাগসার তৃপ্তির অস্ত্র আমি একদিন হত্যা করেছি । এ সন্ন্যাসী আবার এখানে কেন ? নিশ্চয়ই প্রতিহিংসা সাধনের অস্ত্র ! উপায় কি ? কে আছে, কে আমার বাঁচাবে ? নির্মলা কোথা ? ভোলাদাদা কোথা ?

চারিপাশে চাহিয়া দেখিলাম—নির্মলাকেও দেখিতে পাইলাম না, আর ভোলাদাদাকেও দেখিতে পাইলাম না । তখন, তাহাঙ্গিরের শোচনীয় বৃহাৎ কথা মনে পড়িয়া গেল । ভাবিলাম—এই বিশাল জনহীন প্রান্তরে, তবে ত আর আমার রক্ষা করিবার কেহ নাই ।

বেদনা দিগুণ হইল । আমি তখন দিক্-পার হইয়া সন্ন্যাসীকে আবেগ-কলিত-দ্রবরে বলিয়া উঠিলাম—“সন্ন্যাসী ! সন্ন্যাসী ! আমি তোমার চিন্তে পেরেছি । তুমি সেই ব্রাহ্মণ । আর আমার বাঁচবার সাধ নেই । বাত, আমার বৃদ্ধা তিকা দাও । আমার পিণের



প্ররশিত কর। এ জগতে আর আমার কেহ নাই। এই বলিয়া আমি সন্ন্যাসীর পদতলে সূটাইরা পড়িলাম।

উঠ বৎস! এ জগতে তোমার এখনও আমি আছি। এই বলিয়া সন্ন্যাসী আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ইতিপূর্বে সন্ন্যাসীর প্রতি আমার যে ভয় ছিল, তাহা দূর হইল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—“নয়নানন্দ! শোন, তবে আজ তোমাকে আমি সমস্ত কথা বলি। যে দিন তুমি আমার দ্বী-পুত্রকে বিনাশ করলে, সেইদিন আমি যোগদৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেলুম যে, তুমি স্রুকের লালসায় উন্মাদের মত জীবনের উষাকাল হইতে এক মিশ্রা তামসিক স্রুকের পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছ। তাই সেইদিন আমি প্রতিজ্ঞা করুম যে, ভগবৎ রূপার একদিন না একদিন তোমাকে আমি নূতন মস্ত্র দীক্ষিত করে, মানব-জীবনের প্রকৃত স্রুকের অনন্ত তাণ্ডার দেখিয়ে দেব। সেই অবধি আজ পর্যন্ত আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অলক্ষ্যে ছায়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু বৎস! এতদিন সে শুভযোগ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয় নাই। বিধাতার আশীর্বাদে অতুল বটনার বাত-প্রতিধাতে আজ তাহা উপস্থিত।”

তারপর সন্ন্যাসী আমার দক্ষিণ হস্তের উপর তাঁহার বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জণীর দ্বারা নির্দেশ করিয়া বলিলেন—“নয়নানন্দ! এই যে সমুদ্রে কলনাদিনী তর-ফিরী দেখতে পাচ্ছ, ওর নাম কি জান? ওর

নাম জাহ্নবী। দেখ বৎস! এই পতিতপাবনী জাহ্নবীর পবিত্র সৈকতে কেমন এক মহাবজ্রের অস্তিত্ব রয়েছে।”

কিস্ত কই? আমি ত মহাবজ্র কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি বার বার চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম শুধু সেই দুই অগ্নিকুণ্ড। আর একি! সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ভোলা ও নির্ম্মলার মৃত-দেহ। আমি দারুণ যন্ত্রণায় বলিলাম,—“সন্ন্যাসী! এ যে দেখছি—চিতানল। আর এ চিতানলে যে আমার জীবনের শেষ আশা ও ভরসা, সহায় ও সৰল, বশি ও শান্তি ভস্মীভূত হচ্ছে।”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“না বৎস। এ চিতানল নয়, এ হোমানল। এই পবিত্র হোমানলের হবি পতিততা নির্ম্মল ও প্রভুভক্ত ভোলা; তেজী আমি আর ফলকামী তুমি। যাও বৎস! আর বিলম্ব করো না। জাহ্নবীর এই পূত-মলিলে স্নান করে এস। এখনই আমি তোমার সেই চরম সার্বিক স্রুকের নূতন মস্ত্র দীক্ষিত করব।”

সন্ন্যাসীর এই আদেশবাণী শ্রবণে আমার হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিল। আমি তৎক্ষণাৎ জাহ্নবীর শীতল জলে অবগাহন করিয়া সিক্তবস্ত্রে সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন তিনি আমার নয়নঘর চাপিয়া ধরিয়া অস্পষ্টভাবে যেন কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ আমার দেহের সমস্ত আশা যেন জুড়াইয়া গেল। তিনি বীরে বীরে চকুর উপর হইতে জাহ্নবী স্রুকের দ্বারা বলিলেন—

“বৎস! একবার ঐ অনলরাশির দিকে দৃষ্টিপাত কর।” আমি চাহিয়া দেখিলাম—সেই চিতা নির্ঝলিতপ্রায়, এবং তাহা হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি আকাশমার্গে উথিত হইতেছে। সেই ধূমরাশির মধ্যভাগে ভোলা ও নির্ঝলা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আর তাহাদের মাঝখানে এক রক্তপতাকা দোহলা মান রহিয়াছে এবং সেই রক্তপতাকার উপর অগ্নিস্থ অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—ত্যাগ।

এ অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া আমার মন আবার বিচঞ্চল হইয়া উঠিল; ভাবিলাম,—‘এ কি! কি দেখছি? স্বপ্ন! না প্রহেলিকা! তবে কি এ সন্ন্যাসী ঐন্দ্রজালিক? এ কি তার ইন্দ্রজাল? না—না—তা ত’ নয়। ও মূর্ত্তি যে ভোলা ও নির্ঝলার জীবন্ত মূর্ত্তি। হায়! হায়! ও কি আমার ভুলিবার! ও যে আমার চিরপরিচিত! তবে, হয় ওরাও মরেনি—বঁচে আছে, আর নয় আমিও মরেছি—বঁচে নেই। ওট! ওরা যেন ক্রমশঃ ওপরে উঠছে! আমি যাই হই, আর ওরা যাই হোক, আমি ওদের সঙ্গে যাব।’ এই ভাবিয়া তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিব বলিয়া উদ্ভ্রান্তের মত ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি। এমনতর সময় সন্ন্যাসী আমার দক্ষিণ হস্তটী ধরিয়া বলিলেন,—‘বৎস! মনকে আর বিক্ষিপ্ত করো না। ওই যে লেখা আজ তোমার সম্মুখে দেখিতে পাচ্ছ, ওই সেই মহান নবীন-মহন। যেদিন ভূমি ঐ ভোলা ও নির্ঝলার মত ঐ মহানত্বের সাধনার সিদ্ধিলাভ কর্তে পাবে সেই দিন—বৎস! সেই দিন—ভূমিও ওদের

মত সমস্ত অবরোধ ভেঙ্গে ফেলে সেই অনন্ত-আনন্দধাম বর্ণলোকে যেতে পারবে আর সেই চির-মিলনের ভূমিতে সকলের সঙ্গে মিলিত হ’য়ে অতুল-আনন্দ উপভোগ করবে। সে এক পুণ্যময় মুহূর্ত্ত—বৎস! সে মুহূর্ত্ত এখনও তোমার আসে নি। যাও, নয়নানন্দ! এখন তারই জ্ঞত প্রস্তুত হও। এ নূতন উষার আলোকে, নূতন জীবন ল’য়ে, নূতন শক্তিতে শক্তিমান হ’য়ে, ঐ মূর্ত্তন মস্তের সাধনার আবার জগতের কক্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। এবার পরীতে-পরীতে, নগরে-নগরে, কান্তারে-কান্তারে, রোগ-শোক-জরাগ্রস্ত মৃত্যু-ক্লেশ-প্রপীড়িত কৃশ-ভ্রম-জর্জরিত দীনহীন নর-নারীর সেবায় মনোপ্রাণ নিয়োজিত কর। সুখাধেয়ী-যুবক! শোন—ভাল ক’রে শোন—সুখ ও স্বর্গ ভোগে নয়—ত্যাগে।

“নাস্তি ত্যাগ সমং সুখং।”

সন্ন্যাসীর ঐ শেষ কথাগুলি যামিনীর শেষ যামে মেঘ মস্তকের মত ধ্বনিত হইয়া সেই শব্দ-হীন, জনহীন প্রান্তরের বক্ষে যেন ভীম-রবে প্রসিঞ্চিত হইয়া বাজিয়া উঠিল,—

“নাস্তি ত্যাগ সমং সুখং।”

ঠিক সেই সময় মনে হইল যেন নির্ঝলার সেই নির্ঝল ছায়া মূর্ত্তিও মূহ ওষ্ঠ-সকলনে বলিতেছে,—‘নাস্তি ত্যাগ সমং সুখং।’

আমি কি যেন কেমন হইয়া পেলাম বলিতে পারি না। একবার পাশে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম না। তখন স্থির নয়নে সেই ছায়ামূর্ত্তি হইটার দিকে চাহিলাম। তখন যেন অনেক দূর উঠিয়া

গিয়াছিল। ক্রমশঃ আরও উঠিল—আরও উঠিল—আরও উঠিল—কত দূর উঠিল বলিতে পারি না। শেষে মনে হইল যেন সেই দিগন্ত-প্রসারী চির-স্তম্ভাল স্বচ্ছন্দ্রল নভোমণ্ডলের এক স্থানে যাইয়া পৌঁছিল। সে স্থানের নক্ষত্রগুলি, উষার উজ্জ্বল আলোকে হীনপ্রভা হইয়া গিয়াছিল। তাহারিও তাহাদেরই মাঝে—চিরন্তনে আমার নয়ন-পথ ছাড়িয়া অনন্তের কোন অজানিত পথে চলিয়া গেল।

তারপর কতকক্ষণ যে আমি পলকহীন নেত্রে সেই শূন্য পথপানে চাহিয়া রহিলাম তাহা বলিতে পারি না। মনের মধ্যে যুগপৎ বহুবিধ বিরুদ্ধ ভাব উদ্ভিত হইয়া পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া তুলিল। সে বিবাদের মাঝে পড়িয়া আমি আমাকে হারািয়া ফেলিলাম।

ক্রমে সেই পুণিমা-রজনীর অবসানে অলস অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল—ক্রমে প্রভাত-সমীরণ আবার নব-উদ্যোগ লইয়া—সংসারের কক্ষক্ষেত্রে বহিয়া যাইতে লাগিল—ক্রমে বিহগকুল আবার আনন্দ-সজ্জিত গাহিয়া কণ্ঠ-জগতে আনন্দের ধারা ঢালিতে লাগিল—ক্রমে কক্ষশীল বিশ্ববাসী আবার সকলে ধীরে ধীরে মাগিয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি হৃৎকল্লভ অর্ধ-স্থপ্ত ব্যক্তির মত অবসর প্রাপ্তের ভাবময় অবসাদকে কতকাংশে হেলিয়া ফেলিয়া আবার আমিও যেন জাগিয়া উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে বিশ্বময় কক্ষের সারা পড়িয়া গেল। হায়! অতীতের স্মৃতি হুঁহুয়া ফেলিয়া আবার আমিও নূতন কক্ষের পথে ছুটিয়া চলিলাম।

ওগো! সেই বুঝ আমার প্রকৃত জাগরণের দিন!!

সে ত আজ কত দিনের ঘটনা। তারপর এক এক করিয়া কত দিন, কত রাত্রি, কত মাস, কত বর্ষ, কত গ্রীষ্ম, কত বসন্ত কালশ্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বহুকালে নিষিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি—সেই আমি—একাকী দুর্গাবাসীর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া একঘনো তুখু আপনার কণ্ঠ-

পথ ঘুরিয়া আসিয়াছি। সমুখের লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু হায়! আজ যে তা আর পারি না। এ যে আমার জীবনের সন্ধ্যাকাল! দেখিতে পাইতেছি অদূরেই ঐ সন্ধ্যার অন্তরালে এক বিরাট গভীর রাত্রি যুগ-ব্যাদান করিয়া আমার অন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ভয়ে পিছনে অতীত পথে চাহিয়া দেখি কিন্তু ওগো! কই! এই ধূলার অন্ধ পথপ্রান্ত পথিককে এ মহা নিশার তিমিরময় পথ দেখাইবরে অন্ত সেখানেও যে তেমন আলোক নাই! ওগো! সেখানেও যে এক ঘন কাল ছায়া সমস্ত পথটিকে দ্বন্দ্ব করিয়া রাখিয়াছে! তবে কি—তবে কি আমি এ মহানিশার পরপারে যাইতে পারিব না? না—না, নিশ্চল যে যাইবার সময় আমার আশ্বাস দিয়া গিয়াছে—সন্ধ্যাসৌ যে যাইবার সময় আমার আশ্বাস দিয়া গিয়াছে। হায়! সন্ধ্যাসি! আমার শান্তিদাতা! আমার জীবন-দাতা! তবে এখন কোথায় তুমি? একবার সে দিনের মত আমার নিকটে দাঁড়াও—এক বার তুমি আশ্বাস দিয়া আমার সম্মুখ-দুর্ভাগ্য হৃদয়কে শব্দ করে তোলা—ওগো! একবার তুমি জলদগন্তীর স্বরে বল—কবে আমার এই মহাত্রুতের উদ্ব্যাপন হইবে, কবে আমার এ মহানিশার পর মহা জাগরণের দিন আসিবে, কবে আমার সেই নরহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন শেষ হইবে, কবে আমার সেই আনন্দ-ধামে যাইবার স্তম্ভ অবসর ঘটিয়া উঠিবে?

“ও শান্তি—শান্তি—শান্তি।”

আমরা ঐ উপরোক্ত কাহিনীটা পাঠ শেষ করিয়া কেমন যেন বিষয়-বিবৃত হইয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিলাম। অবশেষে রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া বহুদানে ফিরিলাম। কেহ কোন কথা বলিল না। কেবলমাত্র “দ্যুর্গমিক” বহুটা পথে আসিতে আসিতে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া আপনার মনে বলিয়া উঠিল,—  
“Truths are stranger than fiction.”

[ সমাপ্ত ]

ঐগদাধর সিংহ রায়, এম, এ, বি, এল

## বাণী-বন্দনা ।

( ১ )

পুলকে নৃত্য করিছে তটিনী,  
কুসুমোৎসবে হাসিছে ধরনী,  
সাধনকুঞ্জে এস পো জননী,  
শ্বেত-শতদলবাসিনি ।

( ২ )

পুষ্পিত-পিক-জ্বলিত-বনে,  
এস পো জননী বীরচরণে,  
আধারকুঞ্জ আলোকি' বরণে,  
এস মা শ্বেতবরনী ।

( ৩ )

ভোমার মধুর-মঞ্জু-রাগিনী,  
আবার অবশে পশুক জননী,  
শ্বেত-শতদলে এস বীণাপাণি,  
মঞ্জুল-বীণা-বাদিনি ।

( ৪ )

সুর-সাহানার ভুলোকে-ছালোকে,  
মাতারে এস মা বিপুল পুলকে,  
বিরাজ মানস-কল্পনালোকে,  
লয়ে সজীত-কাহিনী ।

( ৫ )

বিজ্ঞানাজী জননী এস মা,  
প্রকাশি' তোমার অতুল মহিমা,

যুছে দাগ বত কলুষ-কালিমা,  
এস মন্দিরে জননী ।

( ৬ )

এস মা শ্বেত-সরোজ আসনে,  
গীতি-মুখরিত কুঞ্জ-ভবনে,  
শত-ভক্তের পূত আরাধনে,  
এস মা বিভাদারিনি ।

( ৭ )

এস কোকিলের মধু-ময় গীতে,  
শিশির-সিক্ত-কুসুম-রাশিতে,  
এস অজ্ঞান-তিমির নাশিতে,  
অখিল-জ্ঞানের-রাশি ।

( ৮ )

এস মা সুরতি-স্নিগ্ধ-বাতাসে,  
ভ্রাম-হসিত-নীল-আকাশে,  
নবীনানন্দে প্রাণিরা' বিধে,  
এস চন্দ্রক-বরণী ।

( ৯ )

আজি মা তোমার চরণ পরশে,  
সারাটি বক হৃদয়ক হরণে,  
বিভিন্ন শক্তি ভক্ত-মানসে,  
এস মা নিখিল-রাশি ।

( ১০ )

লোপি' দাও তালে স্নেহ-চন্দন,

হৃদক ধস্ত মোদের জীবন,

হৃদয়ে জাগুক নব-স্পন্দন,

তোমার আশীষে জননী ।

( ১১ )

সাধনা মোদের সার্থক কর,

কর্মের পথে বস্ত্রিকা ধর,

সংসার পথে, শিরে আমাদের,

ছড়াও আশীষ বাণী ।

( ১২ )

এস অজ্ঞান-তমোহারিণি,

এস হ্রদি-শতদলবাসিনি,

এস বীণাপাণি বিজ্ঞানারিনি,

এস মা বঙ্গবাণী ।

ঐবিলকান্তি মুখোপাধ্যায় ।

## সভ্যতার ক্রমবিকাশ ।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের কথা বলিবার পূর্বে সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিরূপ তাহা দেখা আবশ্যক । সভ্যতা বলিতে সাধারণতঃ আমরা ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সু-অবস্থা, বৈবাহিক সম্পত্তি, সুশিক্ষা, সুসজ্জিত, যশোবাহিতবর্ণনা, পরোপকার, —এক কথায় মনুষ্যের সর্বদীন বিকাশের অবস্থাকেই বুঝি। মনুষ্যের বিকশিত অবস্থাই সভ্যতা;—আদিম অজ্ঞ অসভ্য মানুষ আপনাকে ক্রমশঃ বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, ক্রমশঃ আপনার অন্তর্নিহিত গুণ মহৎভাবে

সকল জাগরিত করিয়া আপনায় বর্ধাব সভ্য অবস্থাকে ফুটাইয়া তুলিতেছে—তাহার সঙ্গে আনুসঙ্গিক ভাব অস্তিত্ব পারিষদ বিষয়েরও উন্নতি করিতেছে । মানুষ আজ পর্যন্ত জগতে যাহা-কিছু অভিনব বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকর জন্ম নির্মাণ করিয়াছে বা এখনও করিতেছে, সেই সমস্তই মানুষের নিজ স্বরূপকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতে উদ্ভূত । জগতের ধারণা এই যে, মানবজাতি এই বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে মাত্র ; সুতরাং, মানব-সভ্যতার চরম অবস্থা কি, তাহা আমরা এখনও সুস্পষ্টরূপে ধারণায় আনিতে পারি না —সুদূর ভবিষ্যতের অস্পষ্ট পৃথিবীকে কেবল ত্রিকালদর্শী গ্লিম্বাই মানসচক্ষে দেখিতে পারেন । আমাদের মত সাধারণ লোকের ভবিষ্যতে মানব-সভ্যতা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা ভাবা বিতর্কনামাত্র । কাজেই, বিংশ-শতাব্দীর বর্তমান অবস্থার মাপ-কাঠিতেই আমাদের মানব-সভ্যতার আলোচনা করিতে হইবে ।

এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানব-সভ্যতা কিরূপভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে দেখিতে পাই যে, মানব-সভ্যতা বর্তমানে অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা সহসা প্রাপ্ত হয় নাই । বর্তমান মানব-সভ্যতা বহুযুগের যত্নবাত সহ করিয়া জলধিতলে প্রবালঘূর্ণের মত একটু একটু করিয়া সভয়ে অগ্রসর হইয়াছে । মানবসভ্যতার পশ্চাতে এক অতীত কৌতুকাবহ দৃষ্টবিকল্পিত ইতিহাস লুপ্তহীন আছে । সেই আশ্চর্য ইতিহাসের দ্বারা হই

মানবের অটুট ঐর্ষ্যের—মানব-সত্যতার মহা-  
সিদ্ধির জ্ঞান ঐর্ষ্যের—অনন্ত পরিচয় পাওয়া  
যায়। সেই মানব-সত্যতা সাগরাভিমুখী  
কল্লোলিনীর জ্ঞান নানা ভাবে, নানা ছন্দে,  
কখনও বা উপলব্ধত হইয়া সবেগে, আবার  
কখনও বা অবাধ গতিতে ললিত ভঙ্গিমায় যুহু  
যুহু কল্লোলে চলিয়াছে—সেই বেণবতী নদী  
কখনও বা গভীর অন্ধকারময় গহ্বরে পতিত  
হইয়া, যতবৎ স্থির ধীর হইয়া পড়িয়াছে—  
আবার পরেই দিগন্তভেজে কুল প্রাবিত করিয়া  
মহাবেগে ছুটিয়াছে! এই মানব-সত্যতা কোন  
স্রবণাতীত যুগ হইতে ছুটিয়াছে এবং কোপায়  
গিয়া থাকিবে, অথবা ইহার কখনও বিরাম  
হইবে কি না তাহা একমাত্র ভবিষ্যতাই  
জানেন। মানুষ, মানব-সত্যতার এই সুগভীর  
রহস্যপূর্ণ ইতিহাস পড়িতে আসিয়া, বিস্ময়ে  
স্তম্ভিত হইয়া যায়। মানুষ, সুপ্রাচীন মানব-  
সত্যতার সুগভীরতা দেখিয়া পাষাণবৎ মুক  
হইয়া পড়ে। মানব-সত্যতার বহু শতাব্দীর  
ইতিহাস—অদৃশ্য! কিরূপভাবে এই সত্যতা  
ধীরে ধীরে বিকৃশের পথে চলিয়াছে, তাহা  
ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মানব-সত্যতার ক্রমবিকাশের কোনও ধারা-  
বাহিক বিবরণী দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য  
নয়। তথাপি এই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা  
দরকার। এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস এক্রপ  
কৌতুকাবহ ও ঘটনাবল্লব যেন, দুই-এক কথার  
তাহার বিবরণ দেওয়া কঠিন।

অনুনাশ্রুত জন্তুবিজ্ঞা ও প্রাগৈতিহাসিক  
প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে মানব-সত্যতার

বিকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অংশ পরে  
আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে দেখা বাউক, মানুষ  
কিভাবে শিশুর জ্ঞান ক্রমশঃ আপনাকে বিক-  
শিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, এবং  
সেই স্থির-ধীর চেষ্টার ফলে তাহার অবস্থা  
বর্তমানকালে কেমনই বা দাঁড়াইয়াছে।

মানব-সত্যতার ক্রমবিকাশের আলোচনা  
করিতে গেলে প্রথমেই আমাদেরকে বিংশ-  
শতাব্দীর উন্নত যুগ হইতে সেই আদিম-যুগে  
যাইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে,  
বিংশশতাব্দীর সত্যতার মাপ-কাটি সঙ্গে লইয়াই  
আমরা আদিম জগতে যাইতেছি। কিন্তু  
আমরা যেন না ভুলি যে, আমরাই এককালে  
আদিম যুগের মানুষ ছিলাম। এই ধারণা  
বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইলে বৈজ্ঞানিক যুগের  
মানুষ বলিয়া আমাদের গর্ক মাথা তুলিতে  
পারিবে না। আদিম যুগে উপনীত হইয়া  
প্রথমেই আমাদের সেই সময়ের বর্করতা চক্ষে  
পড়ে; আমরা আদিম মানুষ ও অরণ্যের জন্তুর  
মধ্যে কোনও বিশিষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাই না;  
সেই মানুষকে আপনার খাওয়ার জন্ত কোন  
প্রকারও পশুবৎ আচরণ করিতে বিরত দেখি  
না; সেই মানুষ গৃহহীন, উলঙ্গ, কদম্বা; ঘোট  
কদ্বা, সেই মানুষে ও পশুতে খুব অল্প বিভিন্ন-  
তাই দেখিতে পাই।

সেই আদিম যুগ হইতে পরবর্তী প্রান্তরযুগে  
উপনীত হইয়া, সেই অনন্ত মানুষের উন্নতি  
লক্ষ্য করিলাম। সেই মানুষ এক্ষণে প্রত্যয়ের  
মানাধিব উপকরণ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে,  
যদিও সেই সমস্ত জিনিস দেখিয়া আধুনিক

উন্নত যুগের লোক নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। তারপর সেই মানুষকে উন্নত প্রান্তরযুগে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের প্রস্তর জব্য ব্যবহার করিতে দেখিলাম। এই পর্যন্ত আসিয়াই একবার তাবিয়া লইলে দেখিতে পাইব, সেই আদিম মানুষে ও প্রান্তর যুগের মানুষে অনেক পার্থক্য; এ যুগের লোক অনেকটা পশুতাব ভ্যাগ করিয়াছে। আরও দেখিবার বিষয় এই যে, মানুষের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তি কিরূপভাবে ক্রমশঃ আগ্রসিত হইয়া উঠিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ বিকাশের পথে লইয়া চলিয়াছে।

প্রান্তরযুগ হইতে ষাপর বা তাম্রযুগ এবং তারপর লৌহ যুগে উপস্থিত হইয়া আদিম মানুষের আশ্চর্য্য উন্নতি দেখিতে পাইলাম। এই দুই যুগে মানুষ নিজবুদ্ধি-বৃত্তি-প্রভাবে নানাবিধ দ্রব্য জব্য নির্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। এই দুই যুগের মানুষ আপনার কাজের জন্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় জব্যের উদ্ভাবন ও নির্মাণ করিয়া আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা লাভ করিয়াছে। এই দুই যুগেই প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান বৈবয়িক বৈজ্ঞানিক যুগের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

এতদূর পর্যন্ত আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, এক্ষণে মানব-সমাজ ক্রমশঃ বিকাশের পথে চলিয়াছে। অজ্ঞাত বিষয়ের উন্নতির জায় নানাবিধ উন্নতিরও আরম্ভ হইয়াছে।

এই পর্যন্ত আমরা বর্তমান আসিয়াছি, তাহার কোনও প্রকৃত ইতিহাস নাই। আনু-মানিক একশত সত্তর বৎসর ধরিয়া এই যুগগুলি বর্তমান ছিল। তাহার পর হইতে একপ্রকার

ঐতিহাসিক বিবরণী পাওয়া যায়।

তারপর আমরা বর্তমানে বিশেষজ্ঞদের দিকে ফিরিয়া আসি, ততই মানব-সভ্যতার অভিনব ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া বিম্বিত হই। ক্রমশঃ আমরা বহু মন্তকের মানুষকে অভিনব উপায়ে নির্মিত গৃহে বাস করিতে দেখি; তারপর দেখি সেই মানুষ অনেক পরিমাণে বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতধরনের চিত্রবিদ্যা ও সাহিত্য জন্মলাভ করিয়া মানুষের মধ্যে নবচেতনার সৃষ্টি করিয়াছে; আরও দেখিতে পাই, রাজশাসন অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলতা-যুক্ত ও উচ্চধরনের হইয়াছে। এতদূর আসিয়া এইরূপে আমরা মানব-সভ্যতার সর্বমুখীন বিকাশের চেষ্টা লক্ষ্য করি। এই সময়ে যেন আমরা মানব-সভ্যতার চেতনার পরিচয় পাই।

সেই আদিম মানুষের সহিত এই ইতি-হাসের প্রারম্ভিক যুগের তুলনা করিলে, মানুষ কিরূপভাবে উন্নতির পথে চলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। এই মানুষ, সেই আদিম মানুষের জায় মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম নহে; এক্ষণে সে বাকশক্তি লাভ করিয়া ক্রমশঃ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া কথা কহিতে শিখিয়াছে এবং সাহিত্য ও কলাবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই মানুষ অগ্নির ব্যবহার, তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ, নানাবিধ পাত্র ও শিল্প-জব্য প্রস্তুত, লৌহকে নিজ কাজে ব্যবহার এবং ক্রমশঃ লিখন ও লিপির আবিষ্কার ও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। আদিম মানুষের জায় এই মানুষ নিজ উন্নয়ন করিয়াই কালকেপূ করে না, এক্ষণে সে নানাবিধ সুখসাধন

অন্তরও তরুণপোষণ করে।

ঐতিহাসিকের মতে অধিকাংশ উন্নত জাতিই খ্রীস্টীয় ছয় হাজার বৎসরের কমে লিখন-প্রণালী সম্পাদন করিতে পারে নাই। আমাদের অরণ রাধা উচিত যে, সত্যতা অনেকদূর অগ্র-সর না হইলে, মানুষ তারপূর্বে লিখন-প্রণালী জানিতে ও ব্যবহার করিতে পারে না। তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি যে, মধ্যযুগের পূর্বে মানব-সত্যতা অপেক্ষাকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

তারপর মধ্যযুগের মানুষকে নানাবিধ অদ্বুত অদ্বুত আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা করিতে দেখি। সেই সময়ের মধ্যে (১) জ্যোতিষিক আবিষ্কার যে, আমাদের গ্রহজগতের কেন্দ্র সূর্য—পৃথিবী নহে, (২) বারুদ, (৩) দিগ্दर्শন-যন্ত্র, (৪) কাগজ ও ছাপিবার কাগজ, ও (৫) বাষ্প-যন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারপর দেখিতে পাই মানব-সত্যতা নানাতাবে বিকাশের দিকে ছুটিয়াছে—শতাব্দীর পর শতাব্দী কালের স্রোতে ভাসিয়া বাইতেছে ও মানব-সত্যতা যুগে যুগে নবভাবে প্রস্ফুটিত হইতেছে।

আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব যে প্রাচীন মানবসত্যতার অবস্থা এই বিংশ-শতাব্দীতে কিরূপ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সত্য-তার ভাল-মন্দ আলোচনার পূর্বে আমাদের সত্যতার প্রকৃত নিদর্শন কি তাহা বুঝিতে হইবে। কারণ, কোনও জিনিসের পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার কি দিয়া পরীক্ষা করিব— তাহা জানা আবশ্যক।

সত্যতার প্রকৃত নিদর্শন কি, তাহািলে

প্রথমেই আমাদের চরিত্রবল্লের কথা মনে হয়; বাস্তবিকই, জাতির চরিত্রবল্লই সকল জাতির সত্যতার মাপ-কাটি। মানব-চরিত্রই মানব-সত্যতার কষ্টিপাথর। কোনও দেশ সত্য কি অসত্য, তাহা সেই দেশবাসিগণের ব্যবহার হইতে বুঝিতে পারা যায়। কোন সত্যতা কত খাঁটি তাহা দেখিতে হইলে, সত্যতার ব্যবহার জাঁকজমকে বাঁধিয়া গেলে চলিবে না, আমা-দিগকে দেশবাসীর চরিত্রের প্রতি, তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আরও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সত্যদেশের লোক বদেশপ্রেমিক, সাহসী, সরল ও তাহারা পরহিতার্থে সদাসর্বদা মিয়ো-জিত থাকিতে পারে; সত্য মানুষের পর-স্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও প্রেম বিরাজ করে;—যে, মানব-সত্যতা, মানবেরই বিকাশ; যে, মানব-সত্যতা বলিতে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা উঠিলেও, প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশকেই বুঝায়।

আজকাল আমরা জাতীয়তা, জাতিগত-সংস্কারবর্জিত সার্বভৌমিকত্ব বা বিশ্বজনীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি কতকগুলি উচ্চতাব আধি-কাংশ মানব-জাতির মধ্যেই লক্ষ্য করি। মানস, বহুশতাব্দীর দম্ব-কোলাহল, হীনতা, ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া বিশ্বপ্রায়ে মাতিয়া উঠিতে চারি-তেছে। অব্যাহতরাজ্যে সমস্ত জীবেরই যে স্বাস আছে—সকলের অন্তরে অন্তরে যে নিগূঢ় মিলন-সুত্র আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া মানুষ পৃথিবীতে বিশ্বপ্রেম বিলাইতে আগ্রহান্বিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনায় নৈতিক



বিকাশের দিকেও মনোযোগ দিয়াছে। এক কথায়, এই জ্ঞান-পরিমার বিংশশতাব্দীর মানুষ আপনায় অবস্থানদ্বয়কম করিয়া, আপনায় সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই বিংশশতাব্দীর মানুষ, প্ৰতি শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতালব্ধ করিয়া এখন অতি বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইয়াছে। নিজ বুদ্ধি-বৃত্তি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অসাধ্য সাধন করিয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে।

এই বিংশশতাব্দীতে প্রবল রম্ভোত্তরণশালী পাশ্চাত্য জগতের নেতারূপে যেন কি এক অপূর্ণ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া মহোদয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার আত্মা বহির্মুখী। স্থূল জগতের তুচ্ছ জিনিস দইয়াই ইহার আদর্শ গঠিত। ইহার মূল, অর্থ; ঐহিক সুখ-বাচ্ছন্দ্যই ইহার চরম লক্ষ্য। এই জন্যই ইয়ুরোপে বস্ত্র-কোলাহল, জীবন-বুদ্ধির এতপ্রভাব এবং শিল্প-বাণিজ্য, কলকার-ধানার এত আধিপত্য। যাহাই হউক পাশ্চাত্যের এই প্রবল কর্মের ফলে পার্থিব বহু বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে। শ্রমী ও আত্মত্যাগী মানুষ জগদ্বরেণ্য হইয়াছে। শ্রমের আদর বাড়িয়াছে।

ঐহিক উন্নতিকামী পাশ্চাত্যের মতে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সেইখানে, যেখানে মানুষের চেতনার ব্যক্তিগত সুখের পরাকাষ্ঠা—সেই জন্যই বড় বড় আবিষ্কার বা উদ্ভাবনগুলি তাঁহাদের মতে মানুষের জাতীয় উন্নতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সেই জন্যই, ব্যক্তিগত স্বার্থী সর্বত্রই মানব সভ্যতার হিতসাধক ধুব-

ধর পাশ্চাত্য মতে উন্নতি বলিতে সাধারণের কর্মসুখলভা বুঝায়। জড়বাদী ইয়ুরোপ চায়—পারিত্রিক সফলতা। পাশ্চাত্যের এই অদম্য কর্মের ফলে, জগতে বাস্তবিকই অদ্বুত সৃষ্টি হইয়াছে,—মানুষ যাহা কখনও সম্ভব বলিয়া ভাবে নাই, তাহাই পাশ্চাত্য ধুরন্ধরগণ ঘটাইয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিতেছে। সেই আদিম যুগের অসহায় মানুষ যদি আজ আসিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী দর্শন করে, তবে সে বুঝিতে পারিবে না যে, সে জাগরিত অবস্থায় আছে, না কোমল স্বপ্ন-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে—তাঁহার চক্ষে এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল জালিক মায়াবাজ্য বলিয়া মনে হইবে; সে যেরূপ সুখ কখনও কল্পনায়ও আনিতে পারিত না, আধুনিক যুগের মানুষকে সেই সুখ ভোগ করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইবে, সে পৃথিবীর পথ ভুলিয়া নন্দনকাননে উপস্থিত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর গৌরবোজ্জ্বল প্রথম তেজরশ্মিতে তাঁহার চক্ষু বলসিয়া যাইবে।

আধুনিক সভ্যজগতের মূলমন্ত্রের মধ্যে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য, যথা, (১) বিচক্ষণতার সহিত উত্তরাধিকারী হইবার নিয়ম প্রয়োগ করিয়া জাতির শৃঙ্খলা-বিধানরূপ মকল করণ, (২) জাতিগত হিংসা ও সামরিক ব্যাপারে সশ্রদ্ধাগত কতি অল্পকরণ, এবং (৩) শিল্প ও আর্থিক উন্নতির জন্য চিরন্তন আন্দোলন ও এই উপায়ে পৃথিবীকে একত্র করা।

খোঁকার করি, বিংশ শতাব্দী সুখ-সম্বন্ধে,

ধনে, বিজ্ঞানে ও বিস্তার মানবের গৌরবের বিষয় হইয়াছে এবং জগতে বিশ্বশ্রম, সাম্য, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সুমহান্ ভাবরাজি প্রচার করিয়া মানব-জাতিকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যদি বলিতে হয়, বিংশ-শতাব্দীতে মানব-সভ্যতা কিরূপ বিকশিত হইয়াছে—সভ্যতার পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে,—তবে বলিব, যুগযুগান্তরে এই উত্থান-পতনশীল স্রোতধিনী মানব-সভ্যতা বৈজ্ঞানিক বিংশ-শতাব্দীতে এক কঠিন পরীক্ষা-গহবরে পড়িয়াছে ;—শতাব্দীর পর শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ বোধ হয়, এই বিংশ শতাব্দীতে সাধিত হইতে চলিয়াছে,—অন্ততঃ, এ কথা বেশ জোরের সহিত বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক বা পার্যত্রিক উন্নতির জন্ত বস্তুমতীকে আর বহু যুগের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ; এবং বিংশ শতাব্দী এই বিষয়ে গৌরব করিতে পারে যে, পৃথিবীতে সে ঐরূপ উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইহা বিরাট মানব-সভ্যতার এক অংশ মাত্র এবং আঁত অল্প মাত্র ; সভ্যতার যে চরম ফল—যে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা, তাহার জন্ত মানুষকে এখনও কোটি কোটি জন্ম ধারণা তপস্বী করিতে হইবে এবং সেই দিনই মানব, সভ্যতার—যথার্থ সভ্যতার—সেই চরম অবস্থায় উপনীত হইবে ; সে দিন মানব আর মরজগতের আশাহত, শোকাহুল মানুষ থাকিবে না—যে দিন মানুষ উচ্চতর কোনও প্লেবলোকের প্রাণী হইবে। অপূর্ণ জ্যোতি-রালোকিত সেই বহামহিম দিন কখনও

আসিবে কি ! কিন্তু সেদিন অধিকা ভো আর জয়-পরাজয়ের, উন্নতি-অবনতির, সুখ-দুঃখের মাহু্য থাকিবে না ! তবে কে আমাদের এই অনন্ত কালের চিরতুয়ারাচ্ছন্ন হিমালয়ের সুগভীর ধৈর্যের, মহাসিদ্ধির গুরুগভীর অশাসবানীর, অনন্ত নীলাকাশের প্রশান্ত আশার, বজা-বাড-বিফুক বিপুল মানব-সভ্যতা-কল্লোলিনীর সেই দিনের সেই চির-আকাশজিত সুবিশাল জলধি-কেদ্রে বিশ্রাম লাভের মহা গান গাহিবে ! •

শ্রীমোহন রায়।

## সাধক কমলাকান্ত।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অধিকা-কালনা একখান বহুজনাখোঁর্ণ সুন্দর গ্রাম। উৎকলে নগর বলিলেও অহুঙ্কি হয় না। পতিত-পাবনী সুরধনীর পাঁচমতীরে কালনা অবস্থিত। এখানকার বাজার, বন্দর, দেবালয়, বর্দ্ধমানেয় সমাজবাটী প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। অধিকা-কালনা বৈক্যসম্প্রদায়ের অন্ততম ভীৰ্হস্থান হইলেও এই অধিকা-কালনায় কোন রাঢ়ি-শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে শক্তিসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের জন্ম হয়। ঐ অধিকা-কালনা তাঁহার আদি বাসস্থান। ১২১৬ বঙ্গাব্দে ঐ জেলার অন্তর্গত কোটালহাট গ্রামে মহারাজ তেজচন্দ্র ইহাকে একখানি বাসভবন নির্মাণ করিয়া

• ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২০, গোহাটী 'হাত্যসমিলনী' সাপ্তাহিক অধিবেশনে গঠিত।

Encyclopædia Britannica হইতে সাহায্য গৃহীত।

—সেখা

দেন। পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অধিকা কালনা হইতে তিনি বর্জমান গমন করেন। কমলাকান্তের শৈশব অবস্থাতেই তাঁহার মাতা বর্গ লাভ করেন। বরপ্রাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপ-নয়ন হয় এবং তিনি যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া মনোযোগ সহকারে বিদ্যা-ভ্যাস করেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও নানা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্রবিচারে প্রাচীন বহুদর্শী ব্যক্তিবৃন্দও তাঁহার নিকট পরাজিত হইতেন। গুরুগৃহে শিক্ষার পর তিনি নিজ আলায়ে গমন করেন এবং তাঁহার পিতাঠাকুর আশ্রয় স্বল্পনের উপ-দেশে তাঁহার বিবাহ দেন। বিবাহ করিয়া তিনি বহুকাল বেশ সংসারান্তরে লিপ্ত ছিলেন। এই সময় হঠাৎ তাঁহার পিতা পরলোক গমন করিলে সংসারের অনিত্যতা দেখিয়া তাহাতে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিল। অল্প কালের মধ্যেই তিনি প্রেম পিপাসু হইয়া কুল-গুরুর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে তিনি বীরভূম জেলার বিখ্যাত সাধু বামা কৈপার সাধনস্থান ভায়াপীঠে উপস্থিত হন। তখন তথায় তন্ত্র-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত জনৈক সিদ্ধ কোল অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ ও সাধন সম্বন্ধীয় কথোপকথনে কমলাকান্ত জানিতে পারিলেন, তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ সিদ্ধ কোল। তিনি তখনই লক্ষ্যান্তরপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। কমলাকান্ত সাধন-রহস্য অবগত হইয়া মুগ্ধলেন, সংসার ছাড়িবার কোনও

প্রয়োজন নাই বরং তন্ত্রোক্ত সাধনার সুখ ও গৃহস্থীর আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি কিছুকাল ভায়াপীঠে অবস্থান করিয়া গৃহ-গমন করেন এবং সঙ্গীক অভিব্যক্তি ও ক্রমদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কমলা-কান্তের ভক্ত বাসভবন ও পঞ্চবটী নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তথায় সাধক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং পঞ্চমুখীর আসন স্থাপন করিয়া সাধনা করিতেন। তিনি প্রত্যহ জপ করিতেন, পার্শ্বদিনে সঙ্গীক কুলাচার পদ্ধতিতে পূজা-হোমাদি সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছন্দ না হইলেও যখন বাহা পাইতেন নিজের জ্ঞানসাধন বাদে অবশিষ্ট সমস্তই দীন হুঃখী ও বিত্যাধিপণকে দান করিতেন। এই সময় বর্জমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র সাধকের প্রগাঢ় পার্শ্বতা ও বিবিধ গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে সভাপাণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। উক্ত মহারাজ বাহাদুর ডট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রকৃত পরিচয় ও জনশ্রুতি অবগত হইয়া বরং তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য হইয়াছিলেন। মহারাজ ব্যতিত তাঁহার অনেক ভক্ত ও শিষ্য ছিল। গুরুদেবের সাধন ভঞ্জে প্রগাঢ় ভক্তি প্রজ্জ্বা দেখিয়া মহারাজ পূজাদির ব্যয় বরূপ একটা মালিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্বারা তিনি ৬ মাস পূজার দিন গুরুদেবের বাড়ীতে বহু অর্থব্যয়ে মায়ের পূজাদি ও দীন হুঃখীদের সেবা এবং আরও নানা সংকার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করাইতেন। বর্জমানের মহারাজ প্রতাপচাঁদও কমলাকান্তের সুবিশেষণ অহুয়ানী ছিলেন। কমলাকান্ত অবকাশকালে

নিজেই কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়িনী, বিজয়া, আগমনী, শ্রামা ও শিব প্রভৃতি নানা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া যার নিকট গাহিতেন। গান লিখিয়া লইবার জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত ছিল না। দক্ষিণেশ্বরের প্রভু রামকৃষ্ণ কমলাকান্তের রচিত সঙ্গীতের অমুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার রচিত গান গাহিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। স্বর্গীয় মহারাজ মহাতাপটাদ বাহাদুর ১২৬৪ সালে প্রথমতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাহা অনেক সাহিত্যিকের দ্বারা খণ্ড ও অখণ্ড প্রভৃতি নানা আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি “সাধন-পঞ্চক” (ষট্চক্র নিক্রপণ) নামে একখানি গ্রন্থ বাংলা পয়ারে লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আরও দুই একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়, তবে সে সমস্ত গ্রন্থ বহু প্রাচীন, সেইজন্য সে সমস্ত পুস্তক ও পাতুলিপি অতীতের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ বা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত কিংবদন্তী বঙ্গদেশের মধ্যে অতি অল্প জন বোধ হয় অবগত আছেন। “আলোচনার” সহৃদয় পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়ার অবগতির জন্য আমরা তাঁহার দুই একটি প্রবাদ উল্লেখ করিতেছি। প্রবাদগুলি বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়।

“একদা কোন ব্যক্তি কমলাকান্তকে ত্রিপুর প্রতি অত্যন্ত অশ্রুজ্ঞানিরা রহস্তক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আপনি কামিনী-কাকনে অশ্রু-রক্ত থাকিয়া কিরূপে সাধন ভজন করেন?”

তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, রমণী-জনন শরলতা, কোমলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ধর্মভীরুতা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণের আধার। রমণী সংসারের মঙ্গলসাধন করিতে যত্নবতী। রমণী শিষ্ট প্রেমময়ী ও কমনীয়রূপে বিভূষিত। এক মাত্র রমণীগণই পুরুষের উগ্র ও কঠোর প্রকৃতি সংযমিত করিতে পারে। শাস্ত্রে লিখিত আছে “স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু” অর্থাৎ সাধ্বী রমণীমাত্রেই সেই মহাশক্তি স্বরূপিনী জগৎদ্বার অংশোদ্ভূতা। সুতরাং সতীসাধ্বী স্ত্রী সংসারে সাধন ও ভজন পথের সমধিক সহায় স্বরূপিনী— অশ্রুজলাকারিণী কদাচ বিষদায়িনী নহেন। এরূপ সাধন ভক্তনের সহায়স্বরূপিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী রমণী কখনও “কামিনী-কাকনের” কামিনী হইতে পারে না। সে “কামিনী” স্বতন্ত্র।”

অন্য প্রবাদটা এইরূপ।—

“একদা কমলাকান্ত নিরুদ্বৈত পদ্ধতিতে বলিয়া জপ করিতে করিতে দেখিলেন,—তিমিরা-বৃত বনভূমি সহসা আনোক্ত হইল এবং সেই জোড়িতর ভিতরে তাঁহার ইষ্টমূর্তি অবস্থিত। তিনি আনন্দে “মা” “মা” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মূহুর্তে জ্যোতিরাশি অন্ত-হিত হইল। পূর্ণবৎ অন্ধকারে বনভূমি আবৃত হইল। এইরূপ ঘটনা একাদিক্রমে তিন চারি দিন হইয়াছিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে জপকালে তিনি বাহুজান হারাইলেন। পরে অন্তরের মধ্যে চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলেন, যেন তিনি বহু উচ্চে এক পর্বতের শীর্ষদেশে উপনীত হইয়াছেন। সে স্থান অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ, পার্শ্ববৎ জগৎস্তর

বহির্দেশে কোনও নিষৃত শাস্তিময় প্রদেশে অবস্থিত। পাখীর কাকলী, ক্রমবর্ধমান গুণ গুণ, এবং নিখিলীকৃত অবিরত স্বর্ স্ব শব্দে এবং গিল্লীর অবিরত “ঝি” “ঝি” শব্দে কমলা-কান্তের মন-প্রাণ উধাও হইয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোনও অজানিত অথচ চিত্রাকাঙ্ক্ষিত দেশে উপনীত হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন—সম্মুখে কারুকাঁচাখচিত হৃৎ-ধবল খেত মর্ম্মর প্রস্তরের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরাস্তম্ভের রক্তসিংহাসনে শিব-মূর্তি, তাঁহার পার্শ্বে রক্ত-কাঞ্চনকাণ্ডি দেবী গৌরী অদ্বিত্য, তাঁহাদের অপকৃপ রূপে মন্দির উদ্ভাসিত। তিনি আশ্চর্য্যভাবে যুগলমূর্তি দেখিতে-ছেন, সহসা সেইখানে তারাপীঠের সেই অদ্বিত্য—কমলাকান্তের কোলজরু যেন আবিভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন “বৎস! এই তোমার ইষ্ট দেব-দেবী বসিয়া আছেন, প্রাণ ভরিয়া দর্শন স্পর্শন করিয়া জীবন সার্বক করিয়া লও।” অনন্তর তিনি মুহূর্ত্তে উক্ত যুগল মূর্তির সহিত মিশাইয়া গেলেন। কমলাকান্ত “মা” “মা” বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া সিংহাসন তলে লুটাইয়া পড়িলেন। অগজজননী যেন আদরে ও স্নেহে তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। শ্বে শ্বশ্বস্পর্শে কমলা-কান্ত জ্ঞান হারাইলেন। যখন তাঁহার বাহু-জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন রাজি প্রায় শেব হইয়া গিয়াছে। প্রভাতের তরুণতা দেখা দিয়াছে। কমলাকান্তের সহধর্ম্মিনী স্বামীর পা দুখানি বীর ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু

বাধা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। পরে তাঁহার ক্রীকে ভর করিয়া মাভালের স্তার টলিতে টলিতে হস্তমুখে বাতীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।” অতঃপর এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তাঁহার সহধর্ম্মিনী কাল-কবলিত হন। তিনি দামোদর নদের বেলাভূমিতে স্বীয় পত্নীর দেহ দাহ করিয়া এক গীত রচনা করেন। রচনা শেষ হইলে ‘কালী সব ঘুচালি লেটা’—এই গীতটী নৃত্য করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পত্নীর ঐ আশানন্দে নিরুৎসাহ করা যায় না। একদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোনও কার্য্যবশতঃ “ওড়-গাঁয়ের ভাঙ্গা” দিয়া স্তন্যজ্ঞের যাইতেছিলেন। পথে দম্ভ্য কষ্টক লুটিত ও প্রহারিত হইয়া নির্ভীক চিত্তে নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়াছিলেন।

“আর কিছু নেই নেই মা স্ত্রীয়া

তোমার কেবল চরণ দুটী রাক্ষা।

তুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি

দেখে হলেন সাহস-ভাঙ্গা ॥

জাও বন্ধু দারাসুত

স্বপ্নের সময় সবাই তারা

বিপদ কালে কেউ কোথা নাই

যড়নাড়ী “ওড়গাঁয়ের ভাঙ্গা”।

নিরুৎসাহে যদি রাখ করুণা নয়নে,

(টেনলে) জপ করে যে তোমায় পাওয়া

সে সব কথা ভূতের সঙ্গ।

কমলাকান্তের কথা মাকে বলি মনের বাধা,  
আমার অপের মালা বুলি কাঁথা

অপের বরে রইল টাঙ্গা” ॥

দম্ভ্যদল এই সঙ্গীত শুনিয়া তাঁহাকে দেবত

জ্ঞানে কমা প্রার্থনা করত স্বহানে প্রস্থান করিল।  
উপরোক্ত “ওড়গাঁয়ের ডাক্তার” একটা বিশাল  
লোকালয়শূন্য প্রান্তর। ডিক্টর বোর্ডের যে  
রাস্তা শুকরা হইতে বাহির হইয়া বর্ধমান-  
কাটোয়ার রাস্তার সহিত আসিয়া মিলিত  
হইয়াছে, সেই রাস্তা এই “ওড়গাঁয়ের ডাক্তার”  
উপর দিয়া আসিয়াছে। এখানে উপস্থিত বেশ  
চাষ আবাদ কার্য চলিতেছে। ভট্টাচার্য্য  
মহাশয় মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলে মহারাজ  
তাহাকে গলাতীরস্থ করিবার প্রস্তাব করিয়া-  
ছিলেন। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি  
বলিলেন, মহারাজ!

“কি গরজ কেন গলা-তীরে যাব।

আমি কলে মাংয়ের ছেলে হয়ে

বিমাতার কি স্বরণ লব।” ইত্যাদি।

কমলাকান্ত বলিয়াছেন—

“এবার কালী বলে, বাচতুলে যাব স্ত্রীমা মাংয়ের  
কাছে।

কালী নাম সারাৎসার,

নিঃসরে বদনে যাব,

সেজন ভক্ত জীবমুক্ত, দোহাই দিয়ে শিব

করেছে।”

এবার নাম জেনেছি, ধাম জেনেছি, পথ বড়

সুগম হয়েছে।

সাধকের কি দৃঢ় বিশ্বাস! তাঁহারা একপ  
বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হইয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ  
জান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মুক্তির  
পূর্ণ উদ্ধৃতি থাকে।

কমলাকান্ত আরও বলিয়াছেন—

“স্বপ্নের বাসনা কর আর কদিন।

তাজি অস্ত্র বোল কালী কালী বল,

মানব জনম যদি।”

আগমনীতে বলিয়াছেন—

“ওনেছিমা! মতিমা হোমার, ওগো প্রাণ গোরি!

তুমি ত্রিভুবন জননী।”

আবার বিজয়ায় গাহিয়াছিলেন—

“কিরে চাও, গো! শোমার নিধুম্বন হেরি।

অভাগিনী মাংয়ের বধিষে, কোণা বাও, গো!”

ভক্তের এ করুণ গানে পাষণ্ডও অব হইয়া যায়।

তিনি শেষ শিব-সঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন—

“যোগী শঙ্কর আদি মহেশ।

পুরুষ পুরুষ-প্রধান, ত্রিলোকের বাস।”

সাধকের এই বিশ্বাসই মুক্তির প্রাপ্ত

সোপান। বাহা হউক মহারাজ তেজশ্রদ্ধে

গুরুর সেই “কি গরজ কেন গলাতীরে

যাব”—এই গান ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া

অশিশয় ক্ষুদ্র হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়

তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মহারাজকে

তৎপর দিবস মধ্যাহ্নে তাঁহার নিকটে আসিতে

বলিলেন। মধ্যাহ্নে মহারাজ তেজশ্রদ্ধে

তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে কুশলবা। প্রস্তুত

করিবার জন্ত আদেশ করিলেন। সেই শয্যা

প্রস্তুত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাতে শয়ন

করিয়া গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করিলেন। অবনি

ভূগর্ভভেদ করিয়া সেইখানে ভোগবতী গঙ্গার

আবির্ভাব হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই জল

পান করিয়া বলিলেন—“মহারাজ, এক্ষণে

বোধ হয় আপনার কোভ বিদূষিত হইয়াছে;

বাহা হউক এক্ষণে আমি চলিলাম।” এই বলিয়া

তিনি কৈলাস যাওয়া করিলেন। তাঁহার নখর দেহ কুশ-শযায় পড়িয়া রহিল। তদনন্তর মহারাজ তেজশ্চক্রে সাধকের ব্রাহ্মণ-শিক্ষা ও ছাত্রমণ্ডলীর সাহায্যে সেই পুত্র দেহ বাগান-বাড়ীর সেই পঞ্চাশটিতে আনয়ন করিলেন। তথায় চন্দন কাঠ ও ঘৃত দ্বারা তাঁহার দেহের সংস্কার হইল। অনেকে ভক্তিতরে তাঁহার পবিত্র চিত্তাত্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিল। তাঁহার সাধন ভজনের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই ঐশ্বর্যময়ী পূর্ণাঙ্গের সাধক কমলাকান্তের ভদ্রোচিত ভাব-ভক্তিশ্রুচক মূল-লিত সঙ্গীতগুলি শুধু তাহার গ্রামবাসী জন-সাধারণের নিকট নহে, বঙ্গদেশের নিকট তাঁহাকে চির-অমর করিয়া রাখিয়াছে। কমলাকান্ত তট্টাচার্য্য মহাশয় ভক্ত, শিক্ষা ও দেশ-বাসীর নিকট “ঠাকুর” এই মহৎ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর, কমলাকান্তের পবিত্র জীবনী ও তাঁহার কাব্যাবলীর আলোচনা বিস্তৃতভাবে করিবার ইচ্ছা রহিল। সাধক প্রথম কমলাকান্ত শক্তি সাধনায় বড় কম শক্তি সঞ্চয় করেন নাই; রামপ্রসাদের পরই সাধক-শক্তি ভক্ত কমলাকান্তের আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে; তাহার সঙ্গীতও রামপ্রসাদের ন্যায় প্রাণম্পর্শী, এত মধুম্পর্শী ছিল, যে গাহিলে শরীর রোমাকিত হইয়া উঠে, জ্ঞানের মধো-মাতৃশক্তির কি একটা অজানা আবেগ-উৎকর্ষ আগুনাপনি জাগিয়া উঠিয়া হৃদয় আন্দোলিত করে। তিনি জগজ্জমনীকে কেমন দৃঢ়রূপে ধরয় ধর্যে বাঁধিয়া আদৃত করিতে পারিয়া-ছিলেন, নিরলিখিত সঙ্গীতটী তাহার প্রমাণ—

আদর করে হৃদে রাখি আমার আদরিনী  
ভাষা থাকে ।  
(ও মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি আর  
যেন কেউ না দেখে,  
কামাদিরে দিয়ে ফাকি, তোমার আমার  
জুড়াই রাখি,  
(কেবল) রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে  
ডাকে ।

অজ্ঞান কুসঙ্গী যত, নিকট হতে দিও না কো  
জ্ঞানেরে প্রেরণী রাখ সে যেন সাবধানে থাকে।  
কমলাকান্তের মন, তাই আমার এই নিবেদন,  
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অস্ত্রের কাছে রাখে ।  
এমন আত্মনিবেদন, মায়ের অকৃতি পুত্রের  
এমন মাধামাধি ভাব, মনের প্রতি এমন  
ঐকান্তিক প্রার্থনা, মন আর আমি, মন আমার  
আমি মনের—যাচা করিব—আমরা দুইজনেই  
কাদে, মনকে লইয়া এমন উৎকর্ষিতভাবে গাতৃ  
চরণে উৎসর্গ না করিলে কি সাধক হওয়া যায়  
কমলাকান্ত যে খুব বড় একজন সাধক ছিলেন  
—তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই—তবে তিনি  
এত গুপ্ত ছিলেন যে বহু অনুসন্ধান করিয়া  
তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।  
“আলোচনা” পাঠকগণ যদি এই মহাত্মা  
“স্বপ্নে কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন,  
তাহা হইলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা “আলোচনা”র  
প্রকাশ করিব।

ঐবলাইলাল মুনসী ।

## আবাহন-সঙ্গীত।

(জগদগুরুর আবির্ভাবকাল সন্নিহিত, এত-  
দূপলক্ষে কোন ভক্ত তাঁহার আগমন বিশেষ সহ  
করিতে না পারিয়া, এই সঙ্গীতটীতে তাঁহাকে  
আহ্বান করিতেছেন।)

এস গুরুদেব! এস হে,

আঁধারে আলোকে কিরিয়া এ লোকে,

এস দয়াময় এস হে ॥

গহনে গহনে, বিপিনে বিজনে,

দাঁড়াও তুমি আসিয়া হে।

এস এস গুরুদেব, এস হে ॥

মন্দরে কন্দরে, ভূ-স্তরে ভূধরে,

বিহঙ্গ মধুর হাসি হে।

এস এস গুরুদেব, এস হে ॥

চন্দনে অর্জনে জীবনে জীবনে

ছড়িয়ে চরণ আলোক হে।

পত্রোতে পুষ্পোতে অর্ঘ্যোতে পূজোতে

শোভিত কর এ লোক হে।

এস এস গুরুদেব, এস হে ॥

শক্তিতে ভক্তিতে জ্যোতিতে জ্যোতিতে

প্রকাশ করি করুণা হে;

শয়নে স্বপনে নয়নে নয়নে

শিখাও জীবে সাধনা হে।

এস এস গুরুদেব, এস হে ॥

সোহাগে সম্পদে আপদে বিপদে

ভক্তেরই পূজা লও হে।

এস এস গুরুদেব, এস হে ॥

দূঃখেতে তাপেতে রোগেতে শোকেতে

অন্তর আসি দেও হে।

এস এস গুরুদেব, এস হে ॥

## শ্মশান।

কে হে তুমি তব গুরু ভীষণ ব্রূতি,  
অঙ্গে শব-ভয়-লেপ নর-হাড়মাণী—  
নীরবে দিতেছ শিক্ষা, সংসারে বিরক্তি;  
তাই বুঝি হোম কর অগ্নিকুণ্ড জালি?

২

পরিধান প্রেত-বাস দিকপালধারী,  
পূর্ণকুন্ত জলে তুমি হও অভিষেক;  
তব সহচর মুহূ, সক্ষ গন্ধহারী,  
প্রচারিছে এ জগতে তোমার বিবেক।

৩

জগতের যত সপ যোগী-ঔষ্জ্ঞানী,  
বড় ভালবাসে তাঁরা তব সহবাস;  
তাইত তোমার নাম পবিত্র শ্মশান,  
কবে হবে দরশন করি অভিলাষ।

৪

শিবের তুষাররাশি হয়ে বিগলিত,  
অবশেষে হয় যথা সাগরে মিলিত;  
দেহ হ'তে প্রাণবায়ু হ'লে বাহির্গত,  
তব সঙ্গ বিনা আর নাহি অস্ত গতি।

৫

রাজা, প্রজা, সদস্য কাল-সহকারে,  
লকলেই ল'য়ে থাকে তোমার আশ্রয়;  
তথাপি বলিয়া থাকে ভীষণ তোমার,  
জগতের রীতি-নীতি বোকা নাহি যায়।

৬

মানবে কুহুটি করি দেখাইছ ক্রীতি,  
সাপুলনে কর তুমি তবজান দান;



ধনময় গর্ভিতেরে শিখাইছ নীতি,  
উদাসীন, বরণীয় তুমি হে “অশান” ।

ঐব্রহ্মকুমার সিংহ রায় ।

## নাম গান ।

১

করি এস তাঁরি নাম গান ।

রচিত বাঁহার ধরা,

ফল-পুষ্প-বৃক্ষে ভরা,

অপার আনন্দধারা করিতে প্রদান ।

করি এস তাঁরি নাম গান ॥

২

করি এস তাঁরি নাম গান ।

কোটা এত উপগহ,

হুবিশাল তারাবাহ,

বাঁহার আদেশে শূন্য ভ্রমে অবিরাম ।

করি এস তাঁরি নাম গান ॥

৩

করি এস তাঁরি নাম গান ।

জীবের মঙ্গল তরে,

যিনি দূর শূন্যপরে,

সমুদ্রলবণি পানী করেছে নিষ্কাশন ।

করি এস তাঁরি নাম গান ॥

৪

করি এস তাঁরি নাম গান ।

সলিল অমিল বাঁহ,

লাধিতেছে অনিবার,

সমভাবে সর্বকাল জীবের কল্যাণ ।

করি এস তাঁরি নাম গান ॥

৫

করি এস তাঁরি নাম গান ।

পয়োধরে পয়োধার,

দিয়াছেন যিনি মা'র,

বাঁচাইতে জ্ঞানহীন শিশুর পরাণ ।

করি এস তাঁরি নাম গান ॥

৬

করি এস তাঁরি নাম গান ।

বাঁহ প্রেমে মত্ত হয়ে,

উর্ধ্বমালা বৃক্ষে লয়ে

বারিধি অনন্তকাল বহে অবিরাম ।

করি এস তাঁরি নাম গান ॥

৭

করি এস তাঁরি নাম গান ।

বাঁহার স্তম্ভিত গিরি,

মহারণ্য শিরে পড়ি,

উঠিয়াছে মহাগর্ভে তেদিয়া নিমান ।

করি এস তাঁরি নাম গান ॥

৮

করি এস তাঁরি নাম গান ।

গার বৃকে মেহরাশি,

যিনি দয়া পরকাশি,

জীবের মঙ্গলতরে করেছেন দান ।

করি এস তাঁরি নাম গান ॥

৯

করি এস তাঁরি নাম গান ।

সবে মিলি ভক্তিতরে,

করষোড়ে নতশিরে,

তাঁহার চরণে সবে করহ প্রণাম ।

করি এস তাঁরি নাম গান ॥

ঐশিতিক রায় ।

## নৈষধ-চরিত ।

প্রথম সর্গ ।

প্রদীপ্ত তপন ভূলা উৎসব-ভংগর,  
নল নামে ছিল রাজা খাত চরাচর ।  
আবাদিয়ে বাক্য-সুধা যার বৃথগণ (১)  
অমৃতও সমাদর করে না তেমন ॥

পৌষ-হইতে রমা বাক্যরস যার,  
পুণ্যলোক ছিল সেই ভূপাল সংলারে ।  
অর্ঘদণ্ড সম দীপ্ত প্রতাপ বাঁহার,  
ব্যাঘ্র কীর্তি সুবিসল ভুবন ঘাঝারে ॥

কলিযুগে যার কথা করিলে শ্রবণ,  
পবিত্রতা লভে যেন সলিল সেচন ।  
আবিল বচন মম তবু সুনিশ্চয়,  
নলের কীর্তন পাহি হবে পুতায় ॥

সেই নল চতুর্দশ বিজ্ঞার যাকারে (২)  
অধারন, অবগতি, আচার, প্রচারে—  
বিতাণ, করিল চতুর্দশ (৩) সাধন,  
জানি না কি ভাবে হবে বিরোধযোচন ।

সুপ-বিজ্ঞা পারদর্শী ছিল সেই নল,  
অজ্ঞানে (৪) রসে করে বিজ্ঞতি সাধন ।  
বেদ-ভূলা সেই রস অষ্টাদশ হয়ে,  
অষ্টাদশ-বীপ-লক্ষী আনিল হরিয়ে ॥

আশা-পঙ্ক্তি-অশ্রুত সর্ব দিগ্বিদ্য,

কামবৃত্তি (৫) রোদিবারে নিরুত ভংগর ।

তৃতীয় নয়ন ভূগা শাস্ত্র অভ্যাসিবে,  
দেবতা-সমস্ত সব লইল পুরিয়ে ॥

চতুর্দশে ধর্মদেবে করিলে স্থাপন,  
কোন জন নাহি করে তপ আচরণ ?  
অধর্মও পদাঙ্গুলে পৃথিবী পরাশিয়ে,—  
লাড়িয়ে রয়েছে নিতা তপস্বী (৬) হইয়ে ॥

বিজয়-প্রয়াণে তার বনোদ্ধৃত ধূলি,  
প্রতাপ-বাহুর যেন ধূমের পাটলী ।  
পড়িয়ে সাগর-জলে হইয়ে পলিল,  
করেছিল সুধাকরে কলকে আবিল ॥

ক্রমশঃ

ক্রিয়োতিরিক্তনাথ কাব্যাকরণতীর্থ ।

## প্রেমের স্মৃতি ।

গোপনে প্রাক্কণ্ডা ললিতার পানিগ্রহণ  
করা অপরাধে, মহিম যখন তাহার পিতা  
কর্তৃক গৃহে বিতাড়িত হইয়া অকুল সমুদ্রে  
ভাসিতেছিল, তখন মাধবপুরে তাহার দুই

(১) বৃথগণ—পণ্ডিতবৃন্দ ও স্তম্ভবৃন্দ ।

(২) চতুর্দশবিজ্ঞা—বড় সহিত চতুর্দশ, মীমাংসা,  
স্তার, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র ।

(৩) চতুর্দশ সাধন—যতপঞ্চাশৎ সাধন, ১০ কে ৪  
বার আবৃত্তি করিলে ৪০ সংখ্যা হয় । অথবা চারটি অবস্থা  
প্রাপ্ত করা ।

(৪) ঐশাদি ত্রিবিধ ধর্মে—বেদপক্ষে অদ্বৈত  
নিকটাদির প্রপঞ্চে ।

(৫) কামবৃত্তি—বৈজ্ঞানিকবৃত্তি ও সম্বন্ধ-বিকার ।

(৬) তপস্বী—সীল ও তপস্কারী ।

আত্মীয়া ভগিনী কমলাদেবী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন; এবং যত্নাকালে তাহার কেশখাষার আদি যাবতীয় স্বাবর সম্পত্তি মহিমকে 'উইল' করিয়া দিলেন। মহিমের আর বি, এ পড়া হইল না। সে মাদবপুরে সংসার পাতিবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল; পর্ণকূটারটা ললিতার বাসোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ললিতাকে আর এখানে আনিতে পারিল না। সে চাষ করিত, ক্ষেত-খামার দেখিত, আগার সময় পাইলে, পানি মারিয়া, খরগোস শীকার করিয়া দিন কাটা-ইত। সে বড় একটা কাহার সহিত মিশিত না, অবসর সময়ে আপনার মাঠের মাঝখানে ছোট মাচানটির উপর বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে কত কি যে ভাবিত, কত লোক সে বিষয় লইয়া কত আন্দোলন করিয়াছে, কিস্তি কিছুতেই কিছু হইয় করিয়া উঠিতে পারে নাই।

একদিন সে তার ছোট মাচানটির উপর বসিয়া আছে। তার দৃষ্টি উদাস, দূর ক্ষেতের উপর নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে যেন কেমন এক অপ্রাবিষ্ট-ভাব, কেমন এক আকুলতা মাখান ছিল। এমন ভাবে চাহিয়া থাকিয়া সে আপনার মনে বলিতে লাগিল "আমার ইচ্ছে ছিল যে, সে এর আগেই মরেন, যখন বানগুলি বেশ সবুজ থাকে আর বোধ হয়" - মহিম বাধ হইয়া আরও কি বলিতে বাইতোছিল কিন্তু হঠাৎ কি এক আবেগে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চাকরটি মাচানের নিকট তইয়াছিল। তাবিল, মনিব বোধ হয় কোন শীকার দেখিয়াছেন। কাজেই সেও তখন

নিজের বৌতুল লইয়া আসিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং তাহার মনিব মৈদিকে চাহিয়াছিল, সেই দিকে দেখিতে লাগিল। কিন্তু শীকার কোথায়! মহিম তখন যে তার কল্পনা রান্ধে শীকার খেলিতেছে। সুতরাং চাকরটি বিফলমনোরথ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তার ঐ ক্ষুদ্র কুটিরটির চারিদিক খালি পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও বা শুকনা গাছের পাতা জমির চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জমি ও ঘাসগুলো প্রথর রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া গিয়াছে। মাঠের ধূলা ও শুক পাতা গুলো বাতাসের আঘাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে তার ঘরের চারিদিকে তাদের নিজের দাঁব করিয়া লইয়াছে। ছোট ছোট লতানে গাছ গুলি জনান্তাবে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, আর তার খোড়ো ঘরের চাল দূরন্ত হাওয়ার সঙ্গে ক্রমাগত ঘুরিয়া যেন ক্রক ও জীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

মহিম দাঁড়াইয়া একমনে কত কি কল্পনা করিতেছে। ভাবে বিভোর। 'মেঘদূতের' যকের স্থায় "আষাঢ়মা প্রথম দিবসে" ক্রিয়ার স্বতি তার মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল। কত কথা তাহার চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে বলিল, যদি সে একবার বর্ষার সময় আসে। কিন্তু তার ঐ ভয়প্রায় কুটিরটি! যদি দূরন্ত বড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে? তাহার উপর সর্বস্বৎসকারী ম্যালেরিয়া যদি প্রায়ের কোন অনিষ্ট করে! নাঃ—সর্বাপেক্ষা গরমকালে আসাই ভাল। কিন্তু তখন যে এতদু প্রান্তর। সে যে সব

ধানের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বেড়াইতে বড়ই ভালবাসি। কোথাও জলে বাঁধ দিয়া কোথাও মাছ ধরিয়া বেড়ানিতে যে তার কত আমোদ। সে যে বলেছিল দুই বৎসর পরে আসবে। তাকে কি বলিতে পারি এস না। দিন যত কাছে আসছে, ততই যে আমার মন একটা অব্যক্ত আনন্দে নেচে উঠছে। এই দুই বৎসরের পরিশ্রম, এই রাতদিন হাড়তাক্কা খাটুনির মধ্য দিয়েও যে আমি প্রিয়ার কোমল আহ্বান শুন্তে পাই। ঐ সেই অঙ্গন। ঐ ষানেই যে আমাদের প্রথম হৃদয়ের বিনিময়। যখন আমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা ললিতাকে আনিজন পাশে বদ্ধ করে, কপোলে তার শেষ চুবনের রেখাটা অঙ্কিত করে বলেছিলাম “লাল, এ নির্জন কুটির গোপ হয় তোমার ভাল লাগবে না, তুমি এ গরীবকে কেন তোমার হৃদয়ের মদ্যে বরণ করে নিয়েছ। তুমি কি আর এখানে আসবে?” তখন সে তার রক্তপুষ্প পুটুলি গুঁঠু জমৎ উন্টাইয়া ও হাসিতে একটা পল্লবাকোর সৃষ্টি করিয়া আমার কানের কাছে চুপে চুপে বলেছিল “তোমার সঙ্গে যদি বনেও থাকতে হয়, সেই যে আমার কাছে রাজধানী”

মহিম মনে করিয়াছিল যে, এই তই বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানের ত্রিতর সে তার ঘণ্ডালি ভাল করিয়া তুলিবে, কিছু নূতন জিনিষ দিয়া তার ঘরের শোভাবর্দ্ধন করিবে। কিন্তু হায়! নূতন নূতন অভাব আজ যে তার সমস্ত টাকাতুলি টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন যে এ কল্পনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব। সন্ধ্যা

হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে সন্ধ্যা, সে যে প্রাণপণে খাটিয়াছে, আর তারপর যখন সে নিজের লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিতে গিয়াছে,—দেখিয়াছে, লোকসানের ভাগই বেশী। এ সমস্তই না তার প্রিয়াকে বলিয়াছিল। এর উত্তরে সে শুধু জানিয়েছিল “আমি তোমায় ভালবাসি”। যে দিন একখানি ক্ষুদ্র পত্র তাহার আসিবার বার্তা বহন করিয়া লইয়া আগিন তখন সে কতই না আনন্দিত হইয়াছিল। আহা! তার সঙ্গে এই নির্জন কুটিরে বাস কত সুখের। তার সেই মিষ্ট কণ্ঠস্বর, তার সেই প্রেমপূর্ণ চাহনি, আজ মহিমের মনে অথও তালে অথও ছন্দে বাজিয়া ফিরিতেছিল এবং তাহা ললিতাকে তাহার অজ্ঞাতসারে যেন স্মৃতির সরমে রাঙাইয়া তুলিতেছিল। মহিম দেই সময়কার মত স্থান কাল সবই ভুলিয়া গিয়াছিল। পার্শ্বে চাকরটিকে দেখিয়া তার সেই কণিক বিহবল ভাবের জগৎ কিছু লজ্জিত হইল। কোনও প্রকারে প্রকৃত হইয়া কহিল “মধু, সন্ধ্যা হ’য়ে এল, চল বাড়ী যাও। আজ আমার স্ত্রী আসবে, আমাকে এখনই হেসেনে বেতে হবে।” তারপর সে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া সাবান দিয়া মুখ, হাত, পা বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া লইল। একখানি ক্রস দিয়া অসংযত চুলগুলি যথাস্থানে ছাঁপিত করিয়া দিল। নিজের তোরঙ্গটি খুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া একখানি কাপড়, একটি জামা বাহির করিল ও সে গুলি ক্ষীণ পরিয়া বাড়ীর বাতির তইয়া পড়িল। সন্ধ্যান্তের পর গোষ্ঠীর মান আশোড়িত সন্ধ্যার স্তায়াক্ষর তখনও

নিঃশেষে মিলাইয়া যায় নাই। এবার মহিমের চিন্তাশ্রোত অন্তরিকে ধাবিত হইল। সে একবার চারিদিকে চাহিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, হায়! আজ পুত্র ইউরোপে কি ভীষণ সংগ্রামই চলিতেছে। কতলোক না খাইতে পাইয়া অন্ন হাহাকার করিতেছে। কিন্তু তাহার এই গোলাবাড়ী ঐ ধাত্তের ক্ষেত তাহাদের কি কিছু সাহায্য করিতে পারে না? আজ কাল কত লোক সৈন্ত-বিভাগে ভর্তি হইয়া অকাতরে দেশের জন্ত প্রাণ-দিতেছে তাহার দ্বারা কি কিছুই হইতে পারে না? সে কি কেবল উদরারের সংস্থানের জন্তই এ জগতে আসিয়াছিল।

(২)

মহিম হেসেনে আসিয়া পৌঁছবার অল্পকাল পরেই দেখিতে পাইল, দূরে গাড়ী আসিতেছে। তখন কেমন একটা ভাব তার মনের মধ্যে উড়িৎ-প্রবাহের মত সঞ্চারিত হইয়া জদয় স্পন্দিত করিল। ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইলে সে দেখিতে পাইল, সেই লনসল্‌য়ের মধ্যে দুটি শাস্ত্রীর চক্রে দুটি তাহার উপরই শুধু স্থাপিত রহিয়াছে। সে ছুটিয়া গিয়া ললিতাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইল। সজে সজে এই দীর্ঘ-কালব্যাপী বিরহের অগ্নিস্রাবী দহন সেই কুসুমভূলা পেলব হস্তের স্পর্শে যেন জুড়াইয়া গেল।

মহিম বলিল “আজ রাজেই কি আমরা বাড়ী করিয়া যাইব, না এখানে কোন বাসা লইয়া থাকিব।”

যেখানে দাঁড়াইয়া তাহারা কথা কহিতে-

ছিল, তাহা একটি সরাইয়ের অংশ, তাহার উপরকার ছাতটা টিন দিয়া ছাওয়া।

ললিতা বলিল “আজকে এখানে যাত-কাটাবার চেয়েও একদিন রাত্তার তোমার কোন বন্ধুর বাড়ী থাকিয়া কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী পৌঁছান ভাল। এমন সুন্দর জ্যোৎস্নার আলোকে আমরা বেশ ধীরে ধীরে যাইতে পারিব। আমার এ ক্ষুদ্র বর অপেক্ষা জ্যোৎস্নার আলোকে উন্মুক্ত প্রান্তর বেশ লাগে”।

মহিম তাহাকে একবার আলিঙ্গন পাশে বন্ধ করিয়া তাহার নির্ভীক চক্রে দুটির উপর নিজের দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া ছাড়িয়া দিল, এই হঠাৎ আলিঙ্গনে ললিতার কিস্ত কণ্ঠ হইতে মুখ পর্যন্ত সব লাল হইয়া গেল। সে বলিল “আমাদের এই দুই বৎসরের বাবধান যেন কত যুগ বলিয়া মনে হইয়াছে। ইচ্ছা হইতেছে, এখনি যেন সমস্ত আমি দেখিয়া লই।” তারপর তাহারা যাত্রা করিল। নির্জন প্রান্তরের মধ্যে আঁকা বাঁকা পথ দিয়া যখন তাহারা যাইতে-ছিল, তখন তাহাদের মনে হইতেছিল, আজ এ পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই যেন একমাত্র দুটি জীব—অন্ততঃ এক রাজির জন্তও। এ বিশাল ধরিত্রী যেন তাহাদেরই।

পরদিন তাহারা আঁধার-তরল সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে দিয়া বহুদিনের স্মৃতি জড়িত সেই নির্জন কুটিরে আসিয়া আবার মিলিত হইল। প্রভাতের আলো যখন ধীরে ধীরে বন্ধরাজির উপর দিয়া নামিয়া আসিল, সেই সময় ললিতা ঘরের বাহিরে আসিয়া সেই

পূরণ প্রাণ-মাতান মিষ্ট-স্বরে বলিল, “মহিম ভূমি কি এসব ঘর নিজের হাতে তৈরী ক’রেছ? এ বে বড়ই স্নেহের হ’য়েছে।” মহিম বলিল “আমাকে আর উপহাস কোরোনা ললি, আমি অনেক যত্নে এসব তৈরী ক’রেছি, আমিও পূর্বেই তোমার বলেছিলাম, আমার হাতে এখন টাকা নেই, তবে আমি শীঘ্রই—” ললিতা আর বলিতে দিল না, সে বাধা দিয়া বলিল “এ আমি চির-দিনই ভাল বাসি। ভবিষ্যত যে আমাদের উজ্জ্বল তা আমি দেখতে পাচ্ছি। সহরে অটালিকা শৈলীর ভিতর বাস করা যে কত কষ্টকর তাও তুমি জান। আর তোমা ছাড়া.....তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, যে আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটিরটির চারিদিকে স্বর্গীয় পুণ্যের ছবি ফুটে র’য়েছে। আর তুমি যেখানে সে যাওয়া যে আনার কাছে স্বর্গ।” মহিম আর থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয়-বোণায় বড় করুণ সুরে আবার প্রেমের রাগিনী বাজিয়া উঠিল। অতীত ও বর্তমান যেন সব এক হইয়া মিশিয়া গেল। সে তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। সে সময় তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তখন তাহার হৃদয় যে পূর্ণ, কেবল ললিতাময়।

(৩)

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল, এই সময়ের মধ্যে কত বর্ষার বড়, গ্রীষ্মের গরম, শীতের ঠাণ্ডা সমস্তই তাহাদের ঐ কুটিরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত অশ্রু, মনস্তাপ সাংসারিক কষ্ট তাহারা মাথার উপর পাতিয়া

লইয়াছে—কিন্তু কিছুতেই তাহাদের এ পবিত্র প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই। এক-দিন হঠাৎ মাতৃস্বের ভার ললিতার মূখে চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। তাহাদের প্রেমের গাড়ে এক-দিন স্নেহের বস্তা ডাকিয়া কানে কানে আশায় বাণী কহিয়া গেল। তাহারা প্রায়ই দুজনে সন্ধ্যা বেলা বসিয়া বঙ্গনার তুলিকাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন নানা রংগে রঞ্জিত করিয়া তুলিত। কখন ললিতা একেলা বসিয়া বসিয়া আপনার স্নেহের স্বপ্ন দেখিত। তখন তাহার চক্ষুতে আনন্দ, আশা, ভয় ও আশ্চর্য্য একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিত। যখন সে কাজ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িত, তখন নিজের মনে স্মৃতি আনিবার জন্য গান গাহিত, বলিত, “আমি যদি রাতদিন আনন্দিতা থাকি তাহা হইলে আমার যে পুত্র হইবে—সে দুঃখে কখন অবসন্ন হ’য়ে পড়বে না।”

যতই তাহাদের স্নেহের দিন বনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহারা আর এক ভাবনার অভিভূত হইয়া পড়িল। এই সময় তা ললিতাকে সহরে লইয়া যাইতে হইবে, কোন ডাক্তার তা এখানে পাওয়া যাইবে না। মহিমের হাঁসপাতালের একজন ডাক্তারের সহিত আলাপ ছিল। তাহাকে পত্র লিখিয়া সে সমস্ত ঠিক করিল। কিন্তু আর একজন তাহার হস্তে এই যুগল দম্পতির স্নেহের করুণা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দুঃখে পরিণত করিতেছিল। সহরের হাঁসপাতালে বাইবার জন্য ইহারা প্রেত হইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় ললিতা পীড়িতা হইয়া পড়িল। মহিম এককাল

বত দুঃখ-কষ্ট সমস্ত নিজের কঠিন বন্ধের উপর চাপাইয়া লইয়াছিল কিন্তু এই ঘটনা যেন তাহার সবল হৃৎপিণ্ডটাকে একেবারে নিষ্ক্রীণ, দুর্বল করিয়া ফেলিল। তাহার দেহের কঠিন মাংসপেশীগুলি যেন কোন যাত্রকের গোপন ঈর্জিতে শিথিল হইয়া পড়িল। ললিতা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাকে এবার এ জগত হইতে শেষ বিদায় লইতে হইবে, কিন্তু সে বহু কষ্টে মুখে আনন্দের হাসি টানিয়া আনিয়া মতিমকে সাধুনা দিতে লাগিল। সে যে তাহার জ্ঞাত এত কষ্ট করিতেছে, দিনরাত অনাহারে বিনিদ্র অবস্থায় তাহার সেবা করিতেছে, এই যে তাহার নিকট অনুল্য।

( ৪ )

রাজে ললিতা তাহার ক্ষুদ্র জানালাটির ভিতর দিয়া দূর গগনের দিকে চাহিয়া থাকিত ও চক্ষু সজ্জ মেঘখণ্ডগুলি আকাশের একপাশ হইতে অপর প্রান্তে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, শুইয়া শুইয়া তাহাই দেখিত। একদিন সেই দূর গগন ভেদ করিয়া যুহার করাল শীর্ণ হস্তের ঈর্জিতে ললিতা কাঁপিয়া উঠিল। রাজি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। উষার ধূসর ছায়া ভেদ করিয়া সূর্য্যোদয় ধীরে ধীরে পৃথিবীর গায়ে সবেমাত্র উঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহিম সমস্ত রাজির পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া প্রান্তের শীতল বায়ুতে একটু অবসাদ দূর করিবার জন্ত বাহির হইয়াছে। সেই সময় ললিতা ধীরে ধীরে তাহার শীর্ণ হস্ত দুখানি উর্ধ্বে তুলিয়া বলিল “হে প্রভু, তুমি বরাদ্দ সাগর, আমার স্বামীকে এ বিরহ সহ

করিবার শক্তি দাও, প্রভু! তাহা না হইলে আমার মরণেও শাস্তি নাই দয়াময়।”

ধীরে ধীরে ললিতার জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। বরে চুকিয়া মহিম তাহা লক্ষ্য করিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া ললিতার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইল। ললিতার চক্ষের সম্মুখে তখন কে যেন একখানি কাল যবনিকা টানিয়া দিতেছিল, এখনি যেন তাহার জীবন-নাট্যের অবসান হইবে। একবার তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। যেন প্রাণপণে লুপ্ত-প্রায় শক্তিকে একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছে। মহিম আশ্বে আশ্বে ললিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। শুনিতে পাইল, তাহার ক্ষীণ মৃদু কণ্ঠস্বর যেন সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করিতেছে, আর তাহা যেন কোন দূর নদী-তীর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে—“স্বামিন্!—আমি চক্ষু—জগতের—কাজ—করো। কষ্ট—ভুল—না।” স্বর আর বাহির হইল না, যেন উন্নত হাওয়া তাহা দূর দিগন্তে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া অতল-সাগর গর্ভে ডুবাইয়া দিল। এই সেই মৃত্যু-পথ-বাক্যের মর্ম্মস্পর্শা আদেশ। আর সে চক্ষু মেলিল না। যেন সে তাহার স্বামী কিছু বলিবার ছিল বলিয়া সর্বসম্ভাপহারী ভগবানের চরণে নিজের স্বামী কিছু ছিল গচ্ছিত রাখিয়া, সোয়ান্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া জাগরণোন্মুখ কর্কশকোলাহল পৃথিবীর বকে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া তখন ললিতার ডুবান-শীতল মুখখানির উপর জীড়া করিতেছিল। চক্ষু পবন তাহার

পশম-ভূলা কেশগুচ্ছ হুলাইয়া খেলিতেছিল, যেন বিরহ-বিধুরা যুবতী সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—এখনি জাগিবে। মুখখানি যেন স্বর্গীয় জ্যোতিতে ছাইয়া রহিয়াছে। মহিমের যেন এ সকল সেই নিয়তির কঠোর বিজ্ঞপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সেইরূপ তাবেই হাঁটু ভাঙিয়া মৃত মুকের মত বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যারানী সবেমাত্র তাহার নীল অঞ্চলখানি উড়াইয়া পৃথিবীর উপর নামিয়া আসিতেছেন। 'পাকীরা' স্ব স্ব কুলায় বসিয়া জগদীশ্বরের স্তুতি-গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এই হির শাস্ত প্রকৃতির কিছুই একজনের ভাল লাগিতে-ছিল না; সে দূরে দাঁড়াইয়া শ্মশানে অগ্নির তাণ্ডব নৃত্য দেখিতেছিল। আর এক একবার ছুই হাতে বুক চাপিয়া পৃথিবীর উপর শুইয়া পড়িতেছিল। যেন এই অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সমস্ত জিনিসগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। কখন বা ছুই হাতে পঙ্কর টিপিরা ধরিতেছিল—যেন এখনি এক একটি করিয়া খসিয়া পড়িবে। ক্রমে অগ্নির তেজ কমিয়া আসিতে লাগিল। মতিম দীরে দীরে আসিয়া চিতার নিকট দাঁড়াইল ও যেন কিছু খুঁজিতে লাগিল।

রাত্রি নিশ্চল। কেবল চঞ্চল-পবন তৃণ-গুচ্ছের উপর দিয়া ভাগীরথীর বীচমালায় উপর তরঙ্গ ভুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সপ্তমীর চন্দ্র কেবল পৃথিবীর উপর হাসিতেছে। কিন্তু সে হাসি যেন স্নান। মহিম চিতার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া আছে, হাতে তাহার

সেই পবিত্র তথ্য। ভগবান তাহার সমস্ত কাঁড়িয়া লইয়াছেন, কিন্তু শেষ চিহ্নটুকু যেন সে জোর করিয়া তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিতেছে না। আকাশে চন্দ্র এক করুণ-দৃষ্ট পাছে দোঁবতে হয় বলিয়া ছিন্ন শুভ্র মেঘ-খণ্ডের ভিতর মুগ লুকাইয়া দৌড়াইতে লাগিল, আর সেই মূঢ়াপন যাত্রীর করুণ-স্বর “হামিন্—আমি চন্দ্রম—জগতের—কাজ—করো,—কর্তব্য—ভুল না—” দূর নদীতীর হইতে সেই শব্দ যেন দীরে দীরে তাহার কানের কাছে ভাসিয়া আসিতেছিল।

বসরায় ঘাইবার জন্য বোঝাই-বন্দরে এক-খানি জাহাজ প্রস্তুত। বাঙ্গালী সৈন্যদল বীর-রসে গাহিতে গাহিতে, বীরদর্পে তালে তালে ‘মার্চ’ করিতেছে,—

“চল চল চল সবে মাতি রণরঙ্গে,

শুভদিন এত দিনে উদিত এ বন্ধে।

ত্রাটনের অরিকুল, করি গিয়ে নিশ্চুল,

যে যাহারে পার তারে লয়ে চল সঙ্গে।”

মতিম ও ইত্যাদের সহিত, তাহার প্রেয়ার সেই শেষস্মৃতিটুকু বন্ধে দারপ করিয়া ‘মার্চ’ করিতে-ছিল। সেই ‘মার্চ’ সঙ্গীতের মধ্য দিয়াও তাহার কাণে যেন তখনও বাজিতেছিল,—  
“হামিন্—আমি চন্দ্রম—জগতের কাজ  
করো—কর্তব্য ভুল না—”।

ঐশ্বরীকুমার রায়।



## কবিকুঞ্জ ।

### মিনতি ।

দীনের দয়াল প্রভু হে মোর দেবতা,  
এসেছি জানাতে তোমা হৃদয়ের বাধা ।  
বুঁজেছি কতই ওগো গহন কাননে  
বারেক দাঁড়নি দেখা দীন অকিঞ্চনে !  
সহেছি কাতর হয়ে দৈন্ত-দুঃখ কত  
ভাকিয়াছি উচ্চৈঃস্বরে তোমা অবিরত !  
কিন্তু প্রভু একবার নিমেষের তরে  
সাম্বনা করে নি আসি দক্ষহৃদ'পরে !  
নাহি আছে ধূপ, দীপ, বিষপত্র, মোর  
কি দিয়া পূজিব তোমা কিবা উপচার ?  
দয়া করে এস প্রভু এ'দীন কুটীরে,  
ভক্তি-পুষ্পাজলি দিয়া পূজিব তোমায়ে ।  
মরনের বারি আর হৃদয়ের আলা  
এই দিয়া সিক্ত মোর সাধের এ' মালা ।  
আজ মোর আরোজন অভিসার যত,  
এ' অর্ঘ্য প্রদানে যেন হয় না বিরত ।

শ্রীকৃষ্ণদানন্দ বিশ্বাস ।

### নির্ভরতা ।

( গীত )

( আমি ) ভাসিয়েছি ভব-সাগর জলে  
দেহতরঙ্গী ।

হাল ধরে তার আছেন ব'সে  
প্রেমিক শিরোমণি ।

বিশ্বাস গাছে শ্রদ্ধাভরে,  
বৈধেছি পাল ভক্তিডোরে ;

চ'লছে কৃপা-পবন ঘোরে বাধা না মানি,—  
আমি ব'সে কেবল দেখছি তাঁরই চরণ ছ'খানি  
দাঁড়ি রিপু ছয় জনে,  
মেতেছে তাঁর গুণগানে ;  
ল'য়ে সব ইন্দ্రిয়গণে তুলছে জয়ধ্বনি,—  
আমার হৃদযাকারে কি আনন্দ ব'লুতে পারিনি ।  
কে তোমরা যাবে এসো,  
এই বেলা নায়েতে ব'সো  
মাকির চরণ লক্ষ্য ক'রে ঠিক সময় জানি,—  
ঐ দেখা যায় অপর পারে আনন্দের খনি ॥  
“ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দ”

### দাম্পত্য-প্রেম ।

একমাত্র গতি পতি সতীর আশ্রয়,  
পতিসঙ্গে স্বর্গস্থখ চিতে সদা রয় ।  
ছাড়িয়া পতির মঙ্গ, অন্তরে যাইতে,  
সতীর অন্তর দহে, যেন চিতাগ্নিতে ;  
স্বামী-নিষ্ঠাকারী পিতা, তাই অভিযানে  
তঁাহার স্বজিত দেহ তাজিতে সেখানে  
চলিলেন দক্ষসতী ; বিবাদিত অতি,  
না দিল আদেশ ভাবী ভাবি পত্নপতি ।  
না মানি নিষেধ গিয়ে পিতৃ-যজ্ঞস্থলে,  
সমাধিতে মনোব্যাপি নাশিলেন ছলে,  
সতীগত প্রাণ পতি জানিয়া সকল,  
আশুগতি আশুতোষ যান যজ্ঞস্থল ;  
অর্দ্ধাঙ্গিনী শব দেহ তুলিয়া মাধার,  
মাতিলা বিভোলা ভোলা বহা তপস্কার ।  
সে মোর তাণ্ডবনৃত্য ভাবিলেও মনে,  
প্রেমের মলয়া বহে হৃদয়-গহনে ;

যত হ'ল ধরা, তাই সেই দিন হ'তে ;  
দাম্পত্য প্রেমের বৃষ্টি পারিল চিনিতে ।

“হুল্লভ”

## সন্ধ্যা-তারার ।

ওই ক্ষুদ্র তারকাটি অনন্ত আকাশ-গায় ।  
ছুটিয়াছে অবিরত দিবারাত্রি ভেদ নাই ।  
নদীবক্ষে বালুকণা ছুটিয়াছে স্রোতজলে,  
নাহি জানে কত যুগে প্রবেশিবে সে অতলে ।  
নাহি ভয় জন্ম মৃত্যু, খেদ নাই ক্ষুদ্র বলি,  
চলিয়াছে ধীরে ধীরে সুখ দুঃখ সব দলি' ।  
চাহে কিনা বিশ্ব তার অতি ক্ষীণ জ্যোতিকণা,  
যশ কিংবা নিন্দা ঘোষে নাহি তার সে ভাবনা ।  
সে চাহে বিশ্বের মাঝে বিলাইতে নিজ প্রাণ,  
হোক ক্ষুদ্র নহে তুচ্ছ সে যে বিধাতার দান ।  
কাটি ভব-মায়াপাশ অনন্ত গগন-পথে,  
ছুটিয়াছে নিরন্তর মিশিতে অনন্ত সাথে ।  
তেমতি ভাঙিয়া এই ভব-মায়া-স্নেহ-সুখ,  
সাধিয়া বন্ধের হিত পায়ে দলি মৃত্যু-দুঃখ ।  
যশোনিন্দা নাহি উনি অনন্ত জীবন-পথে,  
সতত ব্রহ্মের পানে ছুটে যেতে সাধ চিতে ।  
পূর্ণ কি হবেনা আশা ? সন্দিগ্ধ আমার প্রাণ  
ভুলে যাই তুমি প্রভু কর্তৃক ভগবান ।

ঐদয়ানন্দ চৌধুরী ।

## কই তুমি ।

সমস্ত বিশ্বজুড়িয়া মানব তোমাকে খুঁজি-  
তেছে ; কিন্তু কই নাথ কোথায় তুমি ! কোথা

কোন দেশে গেলে তোমায় পাইব ! কোথায়  
যাইলে তোমায় দর্শন পাইয়া এ দম্ভপ্রাণ শীতল  
করিব ! নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে ক্রমেই যে  
ডুবিয়া যাইতেছি নাথ ! তোমায় পাবার ক্ষীণ-  
রাশি যে ক্রমশঃই ক্ষীণতর হইতেছে প্রভু !  
হৃদয়ের আশাপূর্ণ করিবার সময় কি এখনও  
হয় নাই ! বেশ ; ডোবাও, কিন্তু প্রভু ডুবিয়া  
গিয়াও তোমায় ডাকিব ; তোমায় ভাবিব,  
তা হ'লেও কি আশা পূর্ণ করিবে না ? তা  
হ'লেও কি তোমার মধুর স্বরার আমার কর্ণ-  
কুহরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ-মন শীতল করিবে  
না ! তাও যদি না পাই, তবে কোথায় তোমায়  
দেখা পাইব !

“অতল জনাধ-নীরে, অথবা পর্বত-শিরে ;  
কোথা অঘোষণে প্রভু পাবগো তোমায় !  
কোথায় রয়েছে তুমি কোথায় কোথায়”—

কোন দেশে কোন স্থানে তোমায় পাইব ?  
না-না-ভুল-মহাভুল কোথাও তো তোমায়  
খুঁজিতে যাইতে হইবে না—“তুমি যে সর্বত্র  
প্রভো আছ এতদমান”—সর্বস্থানেই তুমি আছ ;  
সর্ব বস্তুতেই তুমি জড়িত, রহিয়াছ । ওই ধান  
হইতেই তোমায় পাইব ! তাই প্রজ্ঞাদ যখন  
কত কষ্টে তোমায় দেখা পাইয়া কাদিতে  
কাদিতে তোমায় বলিয়াছিল—ঠাকুর এত দেবী  
ক'রে এলে—এত কষ্ট দিয়া তবে এলে, তখন  
তুমি গলেছিলে—“প্রজ্ঞাদ, তুমি বৈকুণ্ঠনাথ ব'লে  
ডেকেছিলে কেন ? তাই আমার সেই বৈকুণ্ঠ  
হইতে আসিতে হইতেছে, আমি তো সর্বত্রই  
আছি, যদি তুমি হৃদয়নাথ বলিয়া ডাকিতে  
তা'হলে আমি তখনই দেখা দিতাম।”—প্রভু !

এ তোমারই বাণী হইলেও ডাকবার সে বল কোথায় হরি! দাও বল দাও; দাও বিশ্বাস দাও! অন্তরের দেবতা অন্তরে আপনা হইতেই যদি আলো করিয়া প্রকাশ হও। তোমায় দেখিতে চক্ষু দাও। তোমার অন্ততাপম বাণী শুনিতে কর্ণ দাও—আমি সার্থক হইয়া যাই। সংসারে জড়াইয়া রাখিয়াছ; ইহার ভীষণ দাত-প্রতিঘাত হইতে মাথা তুলিবার সাধ্য দাও—সংসারে জড়িত থাকিয়া ক্রমেই হৃদয়ের বল হারাইতেছি, তাহার মধ্য হইতে তোমাকে ডাকিতে শক্তি দাও দয়াময়! দিবানিশি সংসারের তীব্র জ্বালায় প্রাণ যখন দিকিদিগি জ্বলিতে থাকে; যখন সংসারের কোন পদার্থই প্রাণকে শীতল করিতে পারে না—তখন, হে নাথ!—তোমার মোহন মুরতি ধানি আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া প্রাণে বিমগনন্দ দান কর প্রভু! অক আমি! কোথায় তোমায় পাইব! কে তোমাকে দিয়া দিবে! কে তোমাকে দেখাইয়া দিবে! তুমি স্বপ্রকাশ না হইলে, তুমি নিজে সাধিয়া দেবা না দিলে, তোমায় কি করিয়া ধরি হরি! তাই তোমার ভাবুক ভক্তের ভাষাতেই ডাকি—“তুমি ধরা না দিলে ধরিতে পারি কি হরি—দাও দাও প্রভু, ধরা দাও! বিষয়ে নিবিষ্ট মন তোমার প্রতি ধাবিত করিয়া দাও। যদি দেবা নাই দাও, তবে তোমার দোষবার পক্ষে অব্যোধ্য মনটাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দাও। এই পুতিগন্ধপূর্ণ হৃদয়টাকে তোমার আসনের উপ-স্থাপন করিয়া দাও প্রভু! পরীক্ষা করিও না হরি তোমার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পার—

সে ক্ষমতা আমার নাই। তুমিই দয়া করিয়া উত্তীর্ণ করাইয়া দাও। তোমার পরীক্ষা কত জয় ধরিয়া দিব হরি, ততদিন কি তোমাহারা হইয়া থাকিব! তুমি দয়া করিয়া আমার তোমার দিকে টানিয়া নাও। আমার জ্ঞান নাই; জ্ঞানের দ্বারা তোমায় পাইব না। কর্ণ কিছুই করি নাই; জ্ঞানি না—তা হাতেও তোমায় পাব না; আর ভক্তিও নাই যে, প্রাণ খুলিয়া কেবল তোমায় ডাকিব। হায়! তবে কি আছে! কি শুণে তোমায় পাইব। তবে কি তোমায় পাবনা! তবে কি এ হৃদয়ের হাহাকার চির দিনই বৃকে করিয়া থাকিতে হইবে! না—না; ওগো তা করিও না। তোমায় একবার ডাকিলেই তো তুমি ছুটে এস; কোপায় আছ নিঃশব্দে ছুটে এসে ধরা দাও! প্রাণ খুলে তোমায় ডাকতে দাও! প্রাণে তোমার ভাব জাগয়ে দাও। “তোমার ভাবে মেতে যাই”—ভাব দাও, ভাব দাও। তোমায় ডাকতে তুমিই শিখাও। প্রাণ-মন মাতায়ে দাও। তোমায় ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ তোমায় হইয়া যাক—জগৎ নয়ন হাতে অন্তরাল হোক; শূন্য মাঝে থাকি কেবল তুমি আর আমি এক হইয়া।

তখন—“তোমাতে আমাতে এক হইয়ে যাব নাহি রব আমি আমার।”

শ্রীশশাক।

## যতো ধর্মন্ততো জয়ঃ

মানুষ বাহিরে দেখে, ভিতরে দেখে না—  
কেন বল দেখি? ছাড়াইজন একত্র হইলেই  
পরচর্চা করিলে, একা থাকিলেই বিষয় চিন্তা  
করিলে, প্রাণান্তেও পরচর্চা ও বিষয় চিন্তা  
ছাড়িয়া ভগবানের নাম করিলে না বা ধর্মের  
আলোচনা করিলে না। বিষয়ের ভাবনা এত  
ভাল লাগে কেন? হরি কথায় এত প্রিয়তা  
কেন?

কেন শুনিবে? বলি শুন—

অল্পকু ইন্দ্রিয়ার দ্বারগুলি বহির্দৃষ্টি করিয়া  
রাখিয়াছেন, অন্তর্দৃষ্টি করিয়া দেন নাই। সেই  
জন্ত মনুষ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে, অস্ত-  
রাশ্মিকে দেখে না। স্রুতি বলিয়াছেন—

“পরাক্ষিণানি বাতৃণংস্বস্তুত্মানং পরাং  
পশ্যন্তিনাস্তরাশ্মন।”

যাহারা সাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের  
দৃষ্টি অন্তর্মুখী। তাহারা বাহিরের বিষয় হইতে  
চক্ষুকে প্রত্যাহৃত করিয়া মোক্ষ লাভের  
আশাতে আত্মাকেই দর্শন করিয়া থাকেন :—

কশিক্কারঃ প্রভাগাশ্মানমৈকদাবস্তচক্ষু  
রমুত্রহমিচ্ছন।”

যাহারা অল্পবুদ্ধি কেবল তাহারাই কাম্য  
বিষয়ের অগ্রসরণ করিয়া থাকে, এইজন্ত তাহারা  
মূঢ়ার অনীন হয়।—

“পর্যটঃ কানানুন্নয়ন্তি বালাস্তে মৃতো-  
গাশ্চি বিততসা পাশমা।”

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও বিনা মাগুলে—“আলোচনার কয়েকটি শব্দ আরম্ভ হউল। ইংরোপীয় মহাসমরে কাগজের

দাক্ষণ দুর্দ্ব্যুতীর জন্য আমরা বিগত ৫ বৎসর বিঘ্ন কঠিনতর হইয়াও পত্রিকাখানিকে জীবিত রাখিয়াছি; ৫  
বৎসর আমরা ইহার বার্ষিক মূল্য ২৭ টাকা করিয়া—কিন্তু গাভেরগণের তুলি সম্পাদকের ভ্রাতৃ আমরা ৫ খানি উপা-  
দের পুস্তক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও বিনা মাগুলে প্রদান করিব। এই দাক্ষণ বাজারে বাতা কেহ ভরসা করিতে পারে  
নাই—আমরা তাহাই করিব। বৈশাখ মাসে আমরা ৫ খানি পুস্তক সপ্তকের নামে ২/০ খানা মূল্য দিঃ দিঃ করিয়া  
মূল্য গ্রহণ করিব; পরে প্রতি মাসে পত্রিকা সপ্তকের নিকট যেমন প্রেরিত হয় তেমনি হইবে। বাহারা নূতন লেখক,  
বাহাদের প্রবন্ধ আমাদের সংশোধন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়—এই মহার্ঘ্যতার দিনে “আলোচনা”র দ্বারিখ কামনা  
করিয়া তাঁহাদেরও সাহায্য করা উচিত। তাহাদের নিকট এবার হইতে বার্ষিক ৩৭ টাকা সাহায্য আর্শনা করিতেছি।  
পত্রিকা ও উপহারের জন্ত তাহাদের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে না। পুস্তক ৫ খানির নাম।—(১) আমার অগ্রবাণী—  
সচিত্র ও মূল্যিত প্রকাণ্ড কবিতা পুস্তক। (২) হোমিওপ্যাথি—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার উপাধের পুস্তক।  
(৩) প্রাক-পরীক্ষা—পাঠে বিশেষজ্ঞেই বোধিত হইবে। (৪) চন্দ্র সংহিতা—স্বাভাবিক গণনার নানাবিধ জ্যোতিষ ফলা-  
ফল ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। (৫) জাল বোট—ডিটেবলিট উপক্ৰাস। ১০শ বৈশাখ উপহার বিতরণের শেষ দিন।

জ্ঞানেন্দ্রার।

আমরা দেখিতে পাই যে আপামর সাধারণ লোক সংসার স্রুখে নিমগ্ন, বিষয়ভোগে আসক্ত, ইহলোকের সমৃদ্ধির জন্য লালসায়িত। এমন কি তারারা দুঃখসাগরে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইয়াও সংসারের মায়া কাটাইতে অক্ষম। বল দেখি আমাদের মধ্যে কয়জন লোক পারমার্থিক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কয় জনেরই বা গভীর তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করিবার শক্তি আছে। আমরা দেখিতে পাই অধিকাংশ লোকই আপনাপন ক্ষুদ্র পরিবারের চিন্তা লইয়াই বাস্ত। বিষয় চিন্তা অহোরাত্র আমাদের দেহ ও মনকে পেষণ করিতেছে। দিনের পর দিন বসতি অতিবাহিত হইতেছে তত আমাদের চুঃখের বোঝা বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা এত যে কষ্ট পাইতেছি, ততটুকু আমরা সংসারের মায়াতে ভুলিয়া আছি। এত দুঃখ পাইয়াও আমরা বিষয় স্রুখের লালসা ত্যাগ করিতেছি কৈ? ধর্মকর্মের মন দিতেছি কৈ? আমাদের কষ্টের হেতু আমাদের অদৃষ্ট ও কর্মফল, আমাদের পুণ্যের ক্ষয়তা—আমাদের ধর্মবল নাই; না আছে সাধন বল, না আছে তপোবল। তবে থাকিবার মধ্যে আছে বাক্য বল। অসার বাহ্যিক আড়ম্বর পরিপূর্ণ জীবনে বাক্যবলে কিছুই হইবে না; শুধু বাক্যবলে জীবনের ব্রত উদযাপন হয় না, কখনকালেও হয় নাই। এ ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে বাহুবলও চাই না, বাক্যবলও চাই না, —চাই ধর্মবল, তপোবল, সাধনাবল। সনাতন ধর্ম আমাদের আস্থা কমিয়া গিয়াছে। বাহ্যতে আমাদের ধর্ম আস্থা বৃদ্ধি হয়, তারি

বিহিত চেষ্টা। আমাদেরকে করিতে হইবে। ধর্ম আস্থা বাড়িলে ধর্মের বিশিষ্ট আলোচনা হইবে, তাহা হইতে ধর্মবলের সঞ্চয় হইবে, ও কর্মফল ক্ষয় হইবে। ধর্ম শিক্ষা ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোন্নতির বিধান কল্পিত হইয়া থাকে। এই স্থলে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টান্তটি কথা বলা আবশ্যিক, আত্মোন্নতির মূলে শক্তির উদ্ভবোদয়। আত্মাতে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি নির্বিষ্ট আছে। এই শক্তির উদ্ভবোদিত না হইলে আত্মার উন্নতি হয় না। ইচ্ছাশক্তি উদ্ভব হইলে ক্রিয়াশক্তির বারম্বার উৎসর্গের কার্য আরম্ভ হয়। অতএব ধর্মবল সঞ্চয় করিতে হইলে, তোমাকে কর্ম করিতে হইবে। একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ধর্মবল সঞ্চয় করাই আমাদের জীবনে প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমে কর্মরহস্যের মধ্যে আমরা আসিয়া পড়িলাম। কি ভাবে আমাদেরকে কর্ম করিতে হইবে? নিকামভাবে? নিকামকর্মের পরিণাম কি? কর্মফলক্ষয়। তার পরিণাম কি? চুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এবং পরমশান্তি লাভ। কর্মদ্বারা কর্মক্ষয় হয়, সে কেমন? “কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বুঝি হীরে দিয়ে হীরে কাটা যেমন; ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির কথা বুঝি গেল কিন্তু ইহা দ্বারা কি জ্ঞান লাভ হইল? জ্ঞানশক্তির কাঁটা এই সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। আমরা শিখিলাম বাহুজগৎ মায়ের বজাপার আর আমাদের শরীরটা ও বাহুজগৎের মধ্যে, সুতরাং আমাদের দেহটা ও বজাপার। এই বজাপারে বন্ধ হইতেছে।

মাই কর্তা, আমরা কর্তা নহি ; মা করাইতে-  
ছেন, আমরা করিতেছি। ফলকামনা রহিত  
হইয়া কর্ম করিতেছি কারণ কর্মেই আমাদের  
অধিকার আছে, কর্মফলে ত অধিকার নাই।  
আমরা কর্মরহস্তের মূলমন্ত্রটা শিক্ষা করিলাম  
যে নিকারভাবে কর্ম করিলে পূর্বজন্মার্জিত  
কর্মরাশি ক্ষয় হইয়া যায়। নিয়তির নিগড়  
অচ্ছেদ্য ও অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়” একথা বলিয়া  
কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন। অদৃষ্ট  
অখণ্ডনীয় হইলে কি প্রকারে জীবের  
মুক্তিলাভ হইত ? এই তর্কযুক্তিদ্বারা পূর্বোক্ত  
আপত্তির খণ্ডন করা যায়। আমাদের কর্মরাশি  
গর্ভাকাল সৃষ্টি করিয়া আমাদেরিগকে তাহার  
পরিধি মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং আমা-  
দের প্রতিকূলাচরণ করে। বীহার সাধন বলে  
ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি নিকশিত হইয়াছে,  
তিনি মায়া রচিত গর্ভাকালকে অপমৃত কায়ে  
আপন ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তি বলে জ্ঞান করত  
নূতন গর্ভাকাল নির্মাণ করিয়া লন এবং প্রতি-  
কূল অবস্থা পরস্পরকে বিধ্বস্ত করিয়া সান্ত্বকূল  
অবস্থার মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। এইরূপে কর্ম-  
ফল নিকাম কর্মের দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে।  
উপরে শক্তির কথা বলা হইল ; শক্তির ক্রিয়া  
সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলা হইল। এখন বিচার  
করিতে হইবে এ শক্তি কাহার ? যে শক্তি  
বলে গ্রহভারা, চন্দ্র সূর্য্য নিজ নিজ চক্রে পরি-  
ভ্রমণ করিতেছে, যে শক্তি বলে ইঞ্জিরগণ  
আপন আপন কার্য্য করিতেছে, যে শক্তি বলে  
সৃষ্টিহিত লয় সংঘটিত হইতেছে, সে শক্তি  
কাহার ? তিনি পুরুষ না নারী ?

উপনিষদ্ বলেন—

কেনেবিতং পততি প্রেবিতং মনঃ ।

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ॥

কেনেবিতাং বাচমিমাং বদন্তি ।

চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবো যুগ্মতি ॥

শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো

যদাচোহবাচং সউ প্রাণস্ত

প্রাণশ্চক্ষুষ্চক্ষু রতিযুচা দীরা

প্রোথাম্মল্লোকাদমুতা ভবন্তি ।

অণোরণীয়ামহতো মথীয়ানামস্ত

জন্তোনিহিতো গুণায়ান্ ।

সর্দে বেদা যৎপদমামনন্তি

তপাসি সর্বাণিচ যদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যধরন্তি তন্তে

পদং সংগ্রহেণ ত্রণীমোমিতোতৎ ॥

এতদ্বো বাকং হং ব্রহ্ম

এতদেবাক্ষরম্পদম ইত্যাদি ।

সপথাপাচ্চ কমকায়মব্রণম স্রাবিৎ

শুদ্ধম পাপবিন্দম্ ।

কনিষ্ঠনীযা পরিভূঃ স্বয়মুর্গাখাতথা

তোহর্বাণ্ণবাদবীচ্ছাধীতাঃ সমাভাঃ

কিমেতদ যক্ষমিতি ?—ব্রহ্মোতিহোবাচ ।

যাঁর শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে উপনি-  
ষদ্ তাঁর নাম দিলেন ব্রহ্ম। তিনি কেমন ?  
তিনি প্রোথের প্রোথ, মনের মন, বাক্যের  
বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। তিনি যক্ষ  
হইতে যক্ষ, মহৎ হইতে মহৎ, প্রাণিসমূহের  
জন্মের অব্যক্ত। তিনি ঐ—সমুদায় বেদ তাঁর  
কীর্তন করে, সমুদায় তপস্তা তাঁকে বাক্য করে,  
তাঁকে লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

করিতে হয়। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ। তিনি সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময়, অশরীরী, শিরাত ব্রহ্মরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু, সর্বকালে ভোগ্য বস্তু সকল বিধান করিতেছেন। যখন তাঁর শক্তিতে চালিত হইয়া বিষয়ে গমন করে, প্রাণ তাঁরই শক্তিতে নিযুক্ত হইয়া আপন বিষয় গ্রহণ করে, রসনা তাঁরই শক্তিতে বাক্য উচ্চারণ করে, চক্ষু ও কর্ণ তাঁরই শক্তিতে দর্শন ও শ্রবণ করে। তিনি শক্তিধর পুরুষ, তাঁর নাম ব্রহ্ম।

বেদান্ত বলেন—তিনি অবাঙ্মনস গোচরঃ অখণ্ডঃ সচ্চিদানন্দঃ অখিলাধারঃ অর্থাৎ আত্মা বা পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অখিলাধার বাক্য ও মনের অগোচর।

গীতা বলেন সেই শক্তি ঈশ্বরগানে আছে। গীতা সেই শক্তিমানসে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। তিনি অজ নিত্য শাস্ত পুরাণ।

ঈশ্বরগান বলিতেছেন—

“ভূমিরাপোহনলোবাহুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।

অহংকারইতীযং মে ভিন্নঃ প্রকৃতি রূপেণ।

অপরেরমিত শুভ্রাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম।

জীবত্বাং বাহাবাহো যয়েদং ধার্ম্যতে জগৎ ॥

কিতি অপ তেজঃ মরুৎ বোম, মন বুদ্ধি এবং অহংকার আমার প্রকৃতি এই আটরূপে বিভক্ত। ইহা নিকট। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর একটা জীবধরূপ চেতনাময়ী আমার প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।

“নরি সর্বমিদং প্রোতং শূদ্রে মণিগণাইব”

—শূদ্রে মণিগণের জার আঘাতে এই সমস্ত জগৎ গাঁথা আছে।

ঈশ্বরগান আর এক স্থলে বলিতেছেন—

কবিং পুরাণ যদ্বশাসিতার মনোরমীয়াংসমমু

করেদৃ যঃ।

সর্বত্র ধাতারমচিস্তারূপ মাদিত্যবর্ণং তমনঃ

পরন্তাৎ।

আমি সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ অনাদি নিয়ন্তা শূদ্র হইতেও শূদ্রতম, সকলের পালনকর্তা মলিনমনোবুদ্ধির অগোচর, প্রকৃতির পরপারে বর্তমান, সূর্য্যাসম ভাস্কর ইত্যাদি।

গতিউর্ভতাঃ প্রভুঃ সাক্ষী নিরাসঃ শরণং শূদ্রং।

প্রভবঃ প্রসন্নঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

আমি জগতে গতি, পোষণকর্তা, নিয়ন্তা, জট্টা, ভোগস্থান, ব্রহ্মক, হিতকর্তা, স্রষ্টা সংহর্তা, আধার লয়স্থান এবং বীজ অবিনাশী কারণ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েশ্বর্জন তিষ্ঠতি।

ব্রাহ্মণ্যং সর্বভূতানি যদ্বাক্তাণি মায়য়া। বিভূতি-

যোগে তিনি বলিয়াছেন—জগতে যাহা কিছু

সুন্দর, মধুর, মহান সে সমস্তই আমি, সংক্ষে-

পতঃ এই ব্যক্তচরিত্র আমার এক পাদ বাজ্র,

অপর তিন পাদ আমার অব্যক্ত আছে—বিষ্ট-

ভ্যাহমিদং কুংস্মৈকাংশেন হিতোজগৎ। এই

অসীম শক্তির কথা চণ্ডীতেও আছে। যাঁর

শক্তিতে এই বিশ্ব চালিত, যাঁর আলোক

শক্তিতে এই ভূমণ্ডল প্রকাশিত, যাঁর শক্তিতে

জীব শক্তিমান, তিনি নারী, তিনি প্রকৃতি, তাঁর

নাম দুর্গা, তিনি আত্মশক্তি মহামায়া। তিনি

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারিণী শক্তি। সমস্ত জীলোক

তাঁহার সৃষ্টি, সমস্ত বিভা তাঁরই কদা অংশ।

চণ্ডীতে আছে—

ত্বয়ৈব ধার্ম্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ।

ত্বয়ৈতৎ পালাতে দেবি ! ত্বমংস্তস্তে চ সর্বদা ॥

যচ্চকিঞ্চিৎ কচহস্ত সদসদাধিলাস্তিকে ।

তস্ত সর্বস্ত যা শক্তিঃ সাত্যং ইত্যাদি ॥

দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি !... সর্বোপকারকরণায়

সদাশ্রিত্তা । যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ

সংস্থিতা । নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ।

চিত্তিরূপেণ যা কুৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতাজগৎ ।

নমস্তস্মৈ ইত্যাদি ॥

একৈবাহং জগতাত্মা দ্বিতীয়া কা মমাপরা !

আধারভূতা জগতন্তমেকা মহাধরূপেণ যতঃ

স্থিতাসি ।

অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপায়াতে কুৎস্ন-

মলজ্বাবীর্যো ।

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীৰ্যা বিম্বস্তবীজঃ

পরমাসি মায়াম্ ।

সম্প্রোক্তিতং দেবিসমস্তমেতৎ । বিভাসমস্তান্তব

দেবি ! ভেদা । জিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সমাতনি ।

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্ততে ॥

শরণাগত দীনান্তপরিত্রাণপরায়ণে

সর্বকর্ত্তাধিরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

মা জগদম্বে ! তুমি জগৎ ধারণ করিয়া

আছ, তুমি এই লগৎকে সৃষ্টি করিয়াছ । তুমি

ইহাকে পালন করিতেছ, তুমিই ইহাকে অন্তে

গ্রাস করিবে । সং ও অসং যাহা কিছু আছে

তুমিই সে সমুদয়ের আত্মা । তাহাদের ভিতরে

যে শক্তি আছে সে তোমারই শক্তি । বা !

তোমার নাম করিলে দারিদ্র্য দুঃখ ভয়ে পলায় ।

তুমি সদা দয়াদ্র চিত্ত, সকলের উপকার তুমি

করিয়া থাক । যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে

বিদ্যমান, তাঁকে বার বার নমস্কার করি । যে

দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে বিদ্যমান, তাঁকে বার

বার নমস্কার করি । চৈতন্তরূপে যিনি সমস্ত

জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁকে বার বার নম-

স্কার করি । আমি একাই আছি, একপণ্ডে

দ্বিতীয়া কেহ নাই । আমি কিত্তি অপ রূপে

বিদ্যমান । আমি বৈষ্ণবী শক্তি । তাই চণ্ডী

তাঁকে মা বলিতেছেন ।

তিনি আমাদের মাই হউন আর বাপই

হউন, তিনি আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি

আমাদের উপাস্তা । তাঁহাকে আমরা ভক্তি,

সহকারে পূজা করিয়া থাকি । তিনি আমা-

দের প্রাণশক্তি, তিনি প্রাণরূপে আমাদের অন্তরে

আছেন বলিয়া আমরা জীবিত আছি । এই বিশ্ব

সংসারকে শঙ্করাচার্য্য মায়ার রচনা বলিয়া গিয়া-

ছেন । আমরা সন্ন্যাসী নহি, মায়াবাদে আমাদের

কাজ কি ? মায়ার না বলিয়া তাঁকে মহামায়ার

বলিলে ক্ষতি কি ? আর বৃক্ষলতা পাহাড়

পর্বত, জীবজন্তু রবিশলীকে তাঁহারই সৃষ্টি

বলায় দোষ কি ? যাহা কিছু আমরা এবিধ-

মাক্কে দেখি, তাই মার রূপ—মহামায়ার জগদম্বে

মা আমার নানারূপ ধরিয়া আমাদের মনকে

তার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন । ক্ষিত্তি,

অপ, তেজ, মরুৎ, ঘোষ—মার রূপ ; জ্ঞান

মূৰ্খা তারার গ্রহ উপগ্রহ—মার সৃষ্টি । চিত্তা

করুনা, সংকর ; দয়া ক্রমা শক্তি ; রাগ যোষ

হিংসা ; আহার মিত্রা সূৰ্য্য তুলা ; রেণা কাদ

শ্রুতি, লক্ষ্য লজ্জা ; এসমস্তই আমার মার সৃষ্টি ।



চারিদিকে থাকে দেখিতেছি; অষ্টপ্রহর যা দর্শন দিতেছেন। আমরা এমনই নরাধম, এতই অধিখাসী যে আমরা অন্তরে বাহিরে থাকে দেখিয়াও বলিয়া থাকি যা নিরা-কাশী। সূর্য্যর কান্তর হইয়াছে, নররূপে যা অন্ন ব্যঞ্জনের খালা আনিয়া তোমার সম্মুখে ধরিলেন; তুষ্কার তোমার কণ্ঠ শুক হইয়াছে যা নারীরূপে তোমাকে শীতল জল আনিয়া দিলেন; বহু ভ্রমণ করিয়া গর্গাক্ত কলেবর হইয়াছে, পবন রূপে যা তোমাকে বাতাস করিতেছেন। তথাপি বল, যা নিরাকার! তোর পক্ষীর কলরবে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয়; সে পক্ষী নয়, সে যা। শক্তি কি তাহা জানি-রাছি। শক্তির নাম, রূপ ও কার্য্য কি তাহাও নিখিরাছি। শক্তি কাহার তাহাও বুঝিয়াছি; যাঁর শক্তি তাঁর সহিত একটা নিকট সম্পর্ক পাতাইয়াছি—তাকে আমরা যা বলিয়া ডাকি-রাছি। তিনি করুণাময়ী যা, আমরা তাঁর অর্ধাধ সন্তান। তিনি আমাদেরকে ফ্রোড়ে করিবেন বলিয়া নিজ কর প্রসারণ করিয়া আছেন। কৈ আমরা মার কোলে যাই কই! আমরা তাঁর নিকট হইতে তফাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেই ভালবাসি, তাঁর কোলে যেতে চাই না। আমাদের কর্তব্য কি? মার কাছে বাঁড়া, মার কোলে উঠা। এস তাই। আমরা মার হেলে মার কাছে বাই। ভক্তিতরে মার পূজা করি এস; তাঁর রাজ্য চরণে বেলপাতা ও কদম্বাঙ্গুল দিবে প্রত্যেকে বলি এস “মা! আনি তোমায়।” পূজা শেষ হইলে ধান ও উপাদান করিতে হইবে। সেই সন্ময়ে নিমি-

লিত নেত্রে তাঁর রূপধাম করিয়া যেন যেন তাঁর পদে তুলসী চন্দন দিয়া প্রেমে গদগদ হইয়া প্রত্যেকে তাঁকে বলি এস “মা! তুমি আমার।” শেষে যখন সামীপ্য অতিক্রম করিয়া নির্দিধ্যাসনের দ্বারা সাযুজ্য উপস্থিত হইবে, যখন আমাদের প্রত্যেককে যা আপনার কোলে তুলিয়া লইবেন, তখন প্রত্যেকে মার কোলে বসিয়া তাঁকে বলিব “মা! তুমি আমি এক সোহং। এইবার সেই করুণাময়ী মার সেবার কথা কিছু বলিব। ঘোর সাংসারিক-লোকে মার সেবার কথা শুনিয়া হরত বলিবেন “আমরা সংসার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আছি; জী পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী পিতামাতা লইয়া মায়াবশে পড়িয়া রহিয়াছি। অগ্রে এ গণ্ডীর নীমা পার হই, এ মায়াবশ হইতে উদ্ধার পাই তাঁর পরে ভগবানের সাধন ভজন করিব। যত দিন তাহা না পারি, ততদিন মার সহিত সাক্ষাৎ ও হইবে না মার সেবা করাও হইবে না।” এটা তাদের মহাভ্রম। মার সেবা করে বসেই হইতে পারে, সংসার পরিত্যাগ করিয়া বসে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। গৃহে বসি-য়াই মার সেবা ও সাধনা করা বাইতে পারে, পক্ষী ও গৃহায় যাইবার কি আবশ্যক? তবে কথা এই যে, আমাদেরকে অনাসক্তভাবে সংসারে থাকিতে হইবে, লিপ্ত হইয়া থাকিলেই গেল। যাঁহারা বলেন সংসারে থাকিয়া, গৃহে বসিয়া মার সেবা বা সাধনা করা অসম্ভব, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি পরিবারের মধ্যে বা গৃহহাজিরে থাকিয়া কি মার সেবা করা যায় না? এ সংসারকে মারার আগার বল কেন?

এ সংসারকে অবিস্তার আগার না বলিয়া বরং  
 যার লীলাচক্র বল না কেন ? বল না কেন—  
 জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, তরুলতা, চন্দ্রসূর্য্য জল  
 রস অনল অনিল আকাশ—এ সমস্তই মহা-  
 যারার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ; তাঁর অনন্ত বিভূতি,  
 অনন্তরূপ, অনন্ত নাম ; তিনি নানারূপে, নানা  
 মূর্ত্তিতে, নানা নামে, বিরাজিত ও পরিচিত ।  
 একথা ভাবিতে পার না কি যে তোমার সন্তান-  
 গণ তোমার নহে, মার ? তাঁহারই পুত্র কন্তারা  
 তোমার পুত্র কন্তারূপে তোমার কাছে আছে ?  
 আর তাদের ভার মা তোমার উপর কৃত  
 করিয়াছেন ! তুমি তাদের স্নান করাইতেছ,  
 খাওয়াইতেছ, শোয়াইতেছ, রক্ষণাবেক্ষণ  
 করিতেছ, কত যত্ন করিতেছ, স্নেহ করিতেছ,  
 ভালবাসিতেছ । এই সকল কাজ কে সেবা  
 কাজ মনে কর ; তোমার পুত্রকন্তারা মারই  
 প্রতিমূর্ত্তি এই কথা মনে কর । তাহা হইলেই  
 বুঝিবে তুমি তোমার মারই সেবা করিতেছ  
 তুমি কি কেবল এই কথা শিখিয়াছ—মন্দিরের  
 লগ্নে যে বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, শাক  
 ঘণ্টা বাজাইয়া, কাঁশর বড়ি পিটিয়া দুল বেগ-  
 পাতা, ধূপ-ধূনা নৈবেদ্য দিয়া তাঁকে পূজা করি-  
 লেই মার সেবা করা হয় ? আর পুর, কন্ডা, তাঁট  
 ভগিনী, বাপ, মা, স্বামী, দেবর, ভাসুর, স্বস্তর,  
 স্বাণ্ডীর, বাড়ীর অপর লোকজনের সেবা  
 করিলে মার সেবা করা হয় না ? যদি এ  
 ধারণা মনে আনিয়া থাক, ভুলে যাও, কারণ  
 এটা ভ্রান্ত ধারণা । মার কথা জানিয়া রাখ—  
 'জীবসেবামতৌ ভগবৎসেবা' হইয়া থাকে ।  
 পরীষ ভগবীরা নারায়ণের মূর্ত্তি । তাদের অর

বস্ত্রদান কর, তাহের প্রতি দয়া কর, তা হলেই  
 নারায়ণের সেবা করা হবে । মার কাছে  
 তোমার সেবা পৌছিব । তেজ জ্ঞান ভুলিতে  
 না পারিলে সমদর্শন আসে না ; সমদর্শন না  
 এলে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হয় না । তুমি মানুষ  
 হয়ে মানুষেরই কেবল সেবা করিয়া থাক, জীব  
 জন্তুর ত সেবা কর না, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের  
 ত সেবা কর না । জীবজন্তু পশুপক্ষী কীট  
 পতঙ্গও জ্ঞানিও সেই মারই মূর্ত্তি । জীবজন্তুকেও  
 সেবা কর—কৃপার সময় খেতে দেও, তৃষ্ণার  
 সময় জল দেও ; সে সেবাও মার সেবা । আর  
 একটু উঠ । তরুলতা এরাও মার মূর্ত্তি । এদের  
 সেবাতেও মার সেবা হইয়া থাকে । আরও  
 একটু উপরে উঠ । পাহাড় পর্ব্বত এরাও মার  
 মূর্ত্তি । এদেরও তোমায় সেবা করিতে হবে ;  
 আর সেই সেবা তোমার মার নিকট পৌছিব ।  
 সকলই জীব, অরাজকপদার্থ সকলই জীব ।  
 জীব দয়া করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় ;  
 জীবের সেবা করিলে ভগবানেরই সেবা করা  
 হয় । এটা সেবার মন্ত্র । বৃন্দাবনে গিরি  
 গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বিজয়মান আছেন । ব্রজবাসীরা  
 গোবর্দ্ধনকে পর্ব্বত বলেন না, ঐক্যের মূর্ত্তি  
 বলেন ; গোবর্দ্ধনের পূজা হয়, উৎসব হয় ।  
 পল্লীগ্রামে ঘণ্টা ও পকানন্দ ঠাকুর লীলা বা  
 প্রস্তর খণ্ড, কাশীতে বিবেকানন্দ, রাঢ়ে তারক-  
 ষণ্ড, নেপালে পশুপতি, চুঁচুড়ায় বগেশ্বর প্রভৃ  
 মূর্ত্তি—এ সব সেই মার বিশ্রহমূর্ত্তি, তরুলতা  
 পূজা করেন । অশ্বপ, বিঘ, তুলসী, বট, নিম্ব  
 এই সকল বৃক্ষের তলার জলদানের ব্যবস্থা  
 আছে । 'এত স্নেহা, সেই মারই সেবা' । পিতা,

ভগবতী। গোপার্কণ বৎসর বৎসর হইয়া থাকে, গোপেবা অর্থে ভগবতীর সেবা। কুচুর, বিড়াল, পক্ষী আমরা পুদিয়া থাকি—তাহাদের কৃপায় খাবার দিই, তৃণায় জল দিই। এও সেই মাতৃসেবা জানিবে।

ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি ও কশ্মীর বলে। ভারতবর্ষ ও মা একময়ীর মূর্তি, শাক্তর আশ্রয়, ভক্তি ও শক্তি। স্বর্গীয় বাক্য বাণ “বন্দেমা তরং” মন্ত্রে এই মূর্তির পূজা করিয়া গিয়াছেন। কেত কেব আগা গোড়া তাহাদের সমস্ত জীবনটা মা জগদ্ধাত্রীর সেবায় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। একান্ত মনে সেই দেবীর সাধনা করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সেই সিদ্ধি আর কিছুই নহে—ইহলোকে সুখসমৃদ্ধি এবং পরলোকে সমৃদ্ধি। উপাসনার ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে যোগদ্বারা ষট্কাপ ছাড়িয়া চিত্তাকাশে উঠিয়া মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়।

আত্মশক্তি মা আমার একাদ্বারেই মগ্ন—সাকার ও নিসাকার, সত্ত্ব ও নিস্তব্ধ। মার সহিত তাঁর সম্বন্ধে মিলন-সম্ভোগ, ভুক্তিতে ও হয় আবার মুক্তিতে ও হয়; প্রভেদ এতমাত্র যে—একটি স্থল রকমের, বিপরীত। স্বাধীন রকমের। সাধারণ লোকে সৃষ্টিকর্তাদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। যে সকল মানুষ বাস্তবিক বিদ্যার বাসনার বীজ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাহারাই কেবল নিরাকারের উপাসনা করিয়া থাকেন। সত্ত্ব হইতে নিস্তব্ধ হইতে পারা যায়, সাকার হইতে নিরাকারে যাওয়া যায়। ভূমি যদিই উপা-

সনা কর না কেন, ফলতঃ সেই একই মার পূজা হয় বুদ্ধিতে হইবে। সেইদেবী আমাদের পূজা গ্রহণ করেন ও আমাদের পূজার ফল দান করিয়া থাকেন। যাঁহারা সৃষ্টিকর্তা দেবীর পূজা করেন, তাঁহারা জন্ম-জন্মান্তর সংসারের নান প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া অবশেষে মুক্তি লাভ করেন। আর যাঁহারা নিরাকার নিস্তব্ধের উপাসনা করেন, তাঁরা এক জন্মেই সাধনালব্ধ মুক্তি চান ও মুক্তি পান। মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার প্রভৃতি যুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন না বটে কিন্তু পক্ষেপ্রকারে স্বীকার করিতেন এক অনির্দিষ্টময় শক্তিদ্বারা এই জগতের তাৎকালিক পরিচালিত হইতেছে। তাহাদিগকে শক্তি মন্ত্রের উপাসক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় একস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন—“কোম্বুতের প্রত্যক্ষবাদকে রাখাতত্ত্ব বলা যাইতে পারে।” ইহার অর্থ অগস্ত্য কোম্ব শাক্তর উপাসক ছিলেন।

এই বার প্রবন্ধের উপসংহার করিয়া শেষ কথা সমাজ সংস্কার আবশ্যক এবং ধর্ম-বলই তাহার প্রধান উপাদান। বাহুবল অপেক্ষা ধর্মবল যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ একথা বলা বাহুল্য! বাহুবলের দ্বারা ধনমান, প্রতাপ প্রভৃৎ, টাকা দেশ, লাভ করা যায়; ধর্ম বলেও অন্যায়াদি সে সমস্ত সম্পদ লাভ হইতে পারে। তবে ধর্মবীরগণ সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও প্রত্যাখ্যান করেন। বাহুবলে গ্রহণ আর ধর্মবলে ত্যাগ হয়, এই নিয়ম।

অনেক সমাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, পাক্ষাত্য সভ্যতা অসার ও ভিত্তিশূন্য । ইহার বাহ্যিক চাকচিক্য সহজেই মন আকৃষ্ট হয় বটে কিন্তু জিনিষটা অন্তঃসার শূন্য । আমাদের অশ্রুমান হয়—ইহার প্রধান কারণ ধর্মবলের অভাব । এই ধর্মবলের অভাবে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হয় না ; অথবা সামাজিক ও রাজনৈতিক যে কিছু উন্নতি দেখা যায়, সে সব প্রাণশূন্য কলের ছবির মত অস্থায়ী ও বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র । ধর্মবলের ভিত্তির উপরে সমাজ সংগঠিত না হইলে, উহা কখনও স্থায়ী ভাব ধারণ করে না, সামাজ্য কটিকাতে ভূতলশায়ী হইতে পারে । সংস্কারের মূলে ধর্মবল পাকা আবশ্যক । যতকাল ধর্মবল প্রবল থাকে, ততকাল সমাজ অক্ষয় থাকে ! ধর্মবল ক্ষীণ হইলে দুর্লভতা আসে ও জাতীয় পতন সংঘটিত হয় । যুরোপে ফরাস দেশে এক সময়ে একরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল । ধর্মবল প্রবল থাকিলে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে না । যদি বা কোন দুর্দৈব কারণে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, শীঘ্রই সে অনল নিষ্পীণিত হইয়া যায় ।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে যাহাতে জগতে ধর্মবল জাগ্রত হয়, পৃথিবীর সমগ্রজাতির তদ্বিষয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য । দাবদফ প্রাণে নীতন শাস্তিবার-বরিষণ নিত্য আশঙ্ক হইয়া পড়িয়াছে । একমাত্র ধর্মবলই সেই সুনীতল শাস্তিবারি বর্ষণ করিতে সক্ষম । যতো ধর্মন্ততো জয়ঃ ।

ঐঙ্গিমানচন্দ্র ঘোষ এম, এ ।

## কাকা বাবু ।

( গল্প )

১

হরেনের বয়স যখন একুশ বৎসর, তখন তাহার পিতা মারা যান,—বীরেন শেষের সন্তান, তাহার বয়স তখন তের বৎসর । হরেনের পিতা নারান বাবু বনিয়াদি ঘরের সন্তান,—কলিকাতায় তাঁহাদের কয়েকখানি বাড়ী ছিল,—কাপড়ের দোকান ছিল, কিন্তু নারান বাবুর পিতার দোষে সে সব গিয়াছিল । যখন নারান বাবুর পিতা মারা যান, তখন ছ'খানি বাড়ী ছাড়া, আর কোন সম্পত্তিই নারান বাবু পাইলেন না । পিতার মৃত্যুর কিছু দিন পরে, গ্রীর পরামর্শে নারান বাবু কলিকাতার বাড়ী ছ'খানি বিক্রয় করিয়া, উত্তরপাড়ায় আসিয়া একখানি ছোট বাড়ী খরিদ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন, এটা বাড়ী বিক্রয় লব্ধ বক্ত্রি অর্থদ্বারা, নিত্যানুয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকান করিলেন । দোকানের আয় হইতে, তাহার সংসার বেশ সজ্জলভাবেই চলিত । হরেন যে বৎসর আইম কাননে উপস্থিত হইল, সেই বৎসর নারান বাবু মারা গেলেন, হরেন কিন্তু পড়া ছাড়িল না । যথা সময়ে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সে শামলাশারী উকিলদের দলভুক্ত হইয়া, প্রত্যহ হাওড়া কোর্টে বাতায়িত করিতে লাগিল । তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী হরেন, অল্পদিনেই বেশ পণ্ডার করিয়া লইল । বীরেন তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ করিয়া, ফাইন ইয়ারে ভর্তি হইয়াছে । এইবার হরেন-জননী পুত্রের বিবাহের, লক্ষ্য

পাত্রী অহুস্কাহন করিতে লাগিলেন। সু-  
শিক্ষিত কুলিন-ব্রাহ্মণ-সন্তানের পাত্রীর অতাব  
হয় না, নানাস্থান হইতে পাত্রীর সন্ধান  
আসিতে লাগিল, কস্তাদায়গ্রস্ত পিতার দল,  
শক্তিহীন নারান বাবুর বাড়ীতে বাতায়াত  
করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা নানাস্থানে পাত্রী  
দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে  
কুম্বপুরের বনবিহারি বন্দোপাধ্যায়ের এক-  
মাত্র কস্তা শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবীর সহিত,  
হরেন্দ্রের স্ত্রুত পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। রাঙা  
টুকটুকে বৌদেখিয়া স্বামীর কথা মনে পড়িল,  
সুই বিলু অশ্রু মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা একটা  
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বধু লইয়া তিনি  
কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন,—ধনীর কস্তা  
মন্দার কথার উপর কেহ কথা কহিলে, সে  
তাঁহাকে দশ কথা শুনাইয়া দেয়। হরেন  
স্বন্দরী স্ত্রীর বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, স্ত্রীকে  
লাসন করিবার ক্ষমতা কাহার ঘোটে ছিল না।  
এই কারণে বৃদ্ধা নিজের পূজা অর্চনাদি লইয়া  
ধাকিভেন, বধুর সহিত বড় একটা কথা কহি-  
ভেন না, বীরেনই মাতার অভাব অভিযোগ  
ভুক্ত, তাঁহার খোজখবর লইত, এটা কিন্তু  
মন্দার চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইত। কেন!  
স্বামীর উপার্জনে সংসার চলিতেছে, তাঁহাকে  
ছোট করিয়া, মন্দাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা  
না করিয়া, সে সকল বিষয়ে প্রভুত্ব দেখাইবার  
কেন? এই কথা লইয়া মন্দা বীরেনের সহিত  
সহবার কলহ করিয়াছে। বিবাহের দেক  
বৎসর পরে মন্দা একদিন প্রব্রুত করিল, আর  
স্বামীর তিন দিন পরে পৌত্রের বদনে

চুষন আঁকিয়া, সকলকে আশীর্বাদ করিয়া,  
হরেন-জননী পরলোকে স্বামী সদনে প্রস্থান  
করিলেন। এখন সংসারের কর্তা—হরেন,  
গৃহিনী—মন্দা। ধীরে ধীরে এই ক্ষুদ্র সংসারের  
দিনগুলি অভিযাহিত হইতে লাগিল।

২

বৌদিদি ও বীরেনের সম্পর্ক অনেকটা ধূনা  
ও মনসার মত দাঁড়াইয়াছিল। যদি ও সেটা এক  
তরফা,—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, পণ্ড-  
প্রেমিক হরেন সমস্ত অপরাধ বীরেনের স্বন্ধে  
চাপাইয়া, পাত্রীর দিক হইতে, ভ্রাতাকে বেশ  
হুকথা শুনাইয়া দিতেন। পিতৃ মাতৃহীন,  
ভ্রাতৃভক্ত বীরেন, ভবভাবে অশ্রুপূর্ণ চোখ দুটি  
নিচু করিয়া, ভ্রাতার অবস্থা তিরস্কার, নীরবে  
সহ্য করিত, কয়েক দিন হইতে হরেনের পাঁচ  
বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রের সামান্য জ্বর হইতেছে,  
স্রীতিমত চিকিৎসাও চলিতেছে, কিন্তু মাতার  
রূপায় শিশুর রোগমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, দিন  
দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল।

সে দিন শনিবার। কলেজ ফেরত বীরেন  
বাটীপ্রবেশ করিয়া দেখে, খোকা তাহার পড়ি-  
বার ঘরে বসিয়া, পাঠ্যপুস্তকগুলির সহিত  
আলাপ যুড়িয়া দিয়াছে। বীরেন তাড়াতাড়ি  
ঘরে প্রবেশ করিয়া, পকেট হইতে একটা  
কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া, খুলিয়া খোকার  
সম্মুখে ধরিল। শুভ্র-সুগোল আঙ্গুর দেখিয়া  
খোকা, “কাকাবাবু” “কাকাবাবু” শব্দে  
গৃহধানি মুখরিত করিয়া ছুটিল। কাকাবাবু  
আঙ্গুরগুলি খোকার হাতে দিয়া অবস্রিয়ান্ত  
পুস্তকগুলি বখাহানে স্থাপন করিতে লাগিলেন।

আহাণ্ডা পাইয়া ক্ষুদ্ৰ শিশু,—“কাকাবাবু আজুল দিলে, কাকাবাবু আজুল দিলে” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। বীরেন পুস্তক সাজাইতে লাগিল।

মন্দাকিনী তখন একখানি রেশমী ক্রমালের উপর ফুল তুলিতেছিল,—এমন সময় আজুল হস্তে নৃত্যরত খোকা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। ক্রমালের উপর হইতে চোখ তুলিয়া মাতা পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতি করিলেন, করিলেন,—“কি খাচ্ছিস রে খোকা ?”

আনন্দে অধীর খোকা উত্তর করিল,—“আজুল —কাকাবাবু দিলে !”

কাকাবাবুর নামে মন্দার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। রাগত্বরে কহিল,—“পেয়ে মর্বি না কি !—ফেলে দে বলছি—শিগ্গীর !”

আয়ত চক্ষুটি জননীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া, খোকা কহিল,—“বাবো না ? বাপে ! ফেলে দেবো !! পয়সা লাগে না !!”

“তোরা পয়সার কপালে আগুন, ফেল বলছি, নহিলে মেরে হাড় ভেঙে দেবো !” ক্রোধে মন্দার মুখ লাল হইয়া উঠিল। খোকা কোন কথা কহিল না, তরুভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পুত্রের এই অব্যাহতায় জননীর ক্রোধ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। মন্দা উঠিয়া খোকার হস্ত হইতে কাগজ সমেত আজুল লইয়া ছাড়িয়া ফেলিয়া খোকার পৃষ্ঠে কয়েকটা কিল বসাইয়া দিল। প্রকৃত শিশু নগ্ননভেদী চীৎকারে সমস্ত বাড়ীখানি মুখরিত করিয়া তুলিল।

“খোকার ক্রন্দনে বীরেন ত্রস্তপদে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রোষন্তা বৌদিদি

দাঁড়াইয়া আছেন, খোকা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাদিতেছে, আর রোগাক্রান্ত শিশুর জন্ত বড় সাধ করিয়া বীরেন যে আজুলগুলি আনিয়াছিল সেগুলি উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে। মন্দার প্রাতি চাহিয়া কঠোর অথচ বিনীত স্বরে বীরেন কহিল,—“ছা বৌদিদি, আজুলগুলো কি এতই খারাপ জিনিষ যে ছেলেমানুষকে লুট কাদা'লেই চলছিল না ?”

“পাঠয়ে খাইয়ে ত ছেলেটাকে মর্বাংগুপুখে এগিয়ে দিচ্ছ, আর কেন, মা'র বাছাকে মা'র কোল ঘোড়া কোরে থাকতে দাও ! ও না ম'লে কি তোমার বুক ঠাণ্ডা হ'বে না !” তীব্র কঠোর স্বরে মন্দা কহিল।

তুমি কি জানবে বৌদি, কে ম'লে কা'র বুক ঠাণ্ডা হয়, তা' হ'লে বুঝি তুমি অমন কোরে বোলতে পারতে না। বংশের জ্বলাল, জাঁপার দলের মানিক খোকা আমার চিরজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুক, এই প্রার্থনাই জীবনের কাছে—”

অন্ধার দিয়া মন্দা কহিল,—“কে ম'লে কা'র বুক ঠাণ্ডা হয় !—তার মানে আমি বলেই সকলের বুক ঠাণ্ডা হয়,—তা' স্পষ্ট কোরেই বল না, আমি বাপের বাড়ী চলে যাই। বাপ ! এত কোরে লেগেছ সব ! তবু কার লাভে নেই, পাঁচে নেই।”

“তুমি আমার বাতহানীর পৌদি ! বাটী ইচ্ছে তা'ই বলতে পার। কিন্তু মঙ্গল ছাড়া কা'রো অমঙ্গল চিন্তা বেশ কষ্টের দিন না করিতে হয়।” এই বলিয়া বীরেন সে স্থান ত্যাগ করিল। মন্দা বকিতে লাগিল, আর খোকা

কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

(৩)

সে দিন হরেন যথা সময়ে আদালত হইতে আসিয়া মন্দাকে দেখিতে পাইল না। বেশ পরিবর্তনান্তর, তোয়ালে না পাইয়া, রাগত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল,—“বাড়ীতে কেহ আছে, না সব ঘরেছে।” স্বামীর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণে ত্রিতলের ছাদ হইতে মন্দা নামিয়া আসিল, ক্রুদ্ধিত করিয়া কহিল,—“কি হয়েছে কি, অত চোঁচাচ্ছ কেন?” হরেন কহিল,—“তুমি বাড়ীতেই আছ, আমি মনে করি গেছ কোথাও।” ছলছল চক্ষে অভিমানের স্বরে মন্দা কহিল;—“যা'ব কোন চুলোয়, যা'বার জায়গা আমার থাকলে কি আর বাড়ীর ফুরুর বেড়ালের লাথী খেয়ে এ বাড়ীতে পড়ে থাকি?”

একটা ভাবী আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া হরেন কণ্ঠাটা ঘুরাইয়া কহিল,—“খোকা কোথায়? তাকে দেখতে পাচ্ছ না যে?”

কণ্ঠাটা চাপা পড়া দূরে থাকুক তাহার মূল স্ত্রী বাহির হইয়া পড়িল। মন্দা কহিল,—“তার অজুই ত এত হ'ল গো। ছেলেটা অজুখে সারা হয়ে গেল,—সেই ছেলেকে কি মা যা'তা' এনে খাওয়ান হয়, তাই বলেছিলুম ম'লে,—উঃ বড় বড় মুখ তত বড় কথা। যা' মুখে এলো তাই বলে, কেন,—আমি কা'র কি করেছি? তুমি আঁড়ার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমরা মায়ে পোয়ে বিদেশ হই, তুমি তাই নিজে মুখে সংসার করি।”

“কি হয়েছে কি তাই বল না, মাথামুণ্ড কতকগুলো বকে গেলে, আমি ত কিছুই বুঝতে পারলুম না।”

মন্দা তখন মূল ঘটনা চাপা দিয়া বীরেনের একখানি নূতন রকমের দোষাবহ চিত্র স্বামীর সম্মুখে ধরিল। সমস্ত গুনিয়া হরেন কহিল,—“তোমাদের যখন এক জায়গার থাকলেই এই রকম হবে, তখন, বীরু যতদিন পড়া শেষ না করে, ততদিন কোলকাতার কোন মেসে গিয়েই থাকুক।” তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—“বীরু একবার এদিকে এস।” বীরু পদক্ষেপে নতমস্তকে বীরেন দাদার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—“কি বলছেন?”

হরেন কহিল,—“তোমার বৌদিদির সঙ্গে তোমার যখন বনিবনাও হচ্ছে না, তা সে স্থলে একটা কাজ করলে ভাল হয় না? তা আমি বলছিলাম কি, যতদিন তোমার পড়া শেষ না হয়, ততদিন তুমি কোলকাতার কোন মেসে গিয়ে থাক, আমি তোমার খরচ দেব। এখানে থেকে অহেতুক একটা ঝগড়া, মনোমালিঙ্গ হওয়া আমি ভাল বিবেচনা করি না।”

অবনতমস্তকে বীরেন কহিল,—“তা বেশ! আপনার যদি অনুবিধা হয়, আমি না হয় অজুজ থাকব। তবে দুঃখ এই যে বিনা কারণে আপনি আমার নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন।” কাকার গাঢ়রুদ্ধনজড়িত কণ্ঠধ্বরে খোকার নিত্ৰা ভাজিয়া গেল, সে বীরে বীরে আসিয়া কাকার নিকট দাঁড়াইল। কণ্ঠাটা অজু দিকে ঘুরাইয়া লইয়া হরেন কহিল,—“তোমাদের এগজামিন্ বুঝি যে মাসে?”

“—হাঁ।—”

হরেন ধীরে ধীরে বহির্কাটির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল,—“তা’ হ’লে কালই তুমি যাচ্ছ ত ?”

গম্ভীরভাবে বীরেন উত্তর করিল,—“হাঁ।।”

যাইতে যাইতে হরেন কহিল,—“খরচের জ্ঞান তুমি ভেবো না, মাসে তোমার যা’ লাগবে, সব আমি দোব।”

ঘুণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্রোধে বীরেন তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, কঠিন কণ্ঠে কহিল,—“আপনার খরচে আমার প্রয়োজন নাই, আপনি আমায় যে কয় বৎসর প্রতিপালন করেছেন, সেই কয় বৎসরের সুদ সমেত খরচ আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারুলে, তবে আপনার সঙ্গে আমার হিসাব শেষ হয়।” বীরেনের সমস্ত শরীর তখন কাঁপিতেছিল, সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। থোকা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পিতামাতাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বীরেনের নিকট আসিয়া সাধরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে বলিল,—“তলে দাবে কাকাবাবু ?—আমিও তোমাল খঙ্গে দাব !—তুমি কোথায় দাবে ?”

থোকা উপস্থাপরি প্রস্থ করিয়া গেল। বীরেন স্নেহে থোকায় মুখচুষন করিয়া কহিল, “আমি কাল যা’বেরে থোকা,—সে অনেক দূর—তুই আমার সঙ্গে কোথায় যাবি!” এক ক্ষণে থোকা একসূত্রে বলিয়া যাইতে লাগিল, “না, আমি তোমাল খঙ্গে দাব।” বীরেন অনেক বুঝাইল, কিন্তু থোকা নিরন্তর হইল না। শিশু অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিল। উপস্থিত

শাস্ত্রনা দিব্যর জ্ঞান বীরেন কহিল, “আচ্ছা যাসু। কিন্তু ইটুতে পারবি ?”

দেবশিশুর মত হাসিয়া অশ্রুশূন্য মুখখানি তুলিয়া থোকা কহিল, “যুব পালব! এখন ইপিং দাব, তখন তোমাল কোলে তলব।”

( ৪ )

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও পাঠ্যপুস্তকগুলি ওছাইয়া লইয়া, বীরেন পড়িবার ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল,—হরেন নিজের অফিস-রুমে বসিয়া মামলাসংক্রান্ত কতকগুলি কাঁপজ দেখিতেছে। বীরেনকে দেখিয়া কহিল,—“তা’ হ’লে তুমি কি এখনই যাচ্ছ ?”

“আজ্ঞে—হাঁ।”, বলিয়া বীরেন প্রান্ত-কৃত্য সমাপন মানসে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইতিমধ্যে কোট প্যাণ্ট সজ্জিত থোকা কাকাবাবুর সহিত যাইবার জ্ঞানপ্রস্তুত হইয়া আসিল। বাটার ভূতা বনমাণী গাড়ী ডাকিয়া নির্দেশ-মত দ্রব্যাদি তাহাতে বোঝাই করিতে লাগিল। বালক আনন্দে অশ্রীর হইয়া অখণানে গিয়া বসিল। বেশ পরিবর্তনাস্থর দালা ও বৌদিদিকে প্রণাম করিয়া বীরেন আসিয়া দেখে, থোকা গাড়ীতে বসিয়া চালকের সহিত মহানন্দে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। মানাপ্রকারে বুঝাইয়াও বীরেন থোকাকে নামাইতে পারিল না—পিতা-হরেন বাবু আসিয়া অনেক প্রলোভন দেখাইলেন,—থোকা কোন কথাই তুলিল না। “আমি কাকাবাবুর খঙ্গে দাব য়ে” বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাণের কণ্ঠ হইতেছে দেখিয়া হরেন থোকাকে টানিয়া গাড়ী হইতে নামাইল। পথের ধূনি রাশির উপর লুটাইয়া



পড়িয়া,—“কাকাবাবু! আমি তোমাল খেদে দাব, আমার নিয়ে তলগো” বলিয়া খোকা কাঁদিতে লাগিল। শুভিত্তহুদয়ে, রুদ্ধ নিশ্বাসে, বীরেন গাড়ীর দরজা খরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দা ধারণার্থে থাকিয়া সব দেখিতে-ছিল, সে আর থাকিতে পারিল না, মাথার কাপড় টানিয়া, বাহিরে আসিয়া, খোকাকে টানিয়া গাড়ীর মধ্যে আনিয়া সিমেন্ট করা বেকের ফেলিয়া কয়েকটা মুঠোঘাত করিল। হরেন বাটার ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। প্রহৃত বালক কুকারিয়া কাঁদয়া উঠিল, কাকার নিকট বাইবার লজ্জা ব্যাপ্তিমুখে ছুটিল,—বন্ধদরজার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শিশুর ক্রান্তদেহ তৎক্ষণাৎ সশব্দে ভূমি চুবন করিল। দরজার আঘাত লাগিয়া তাহার মস্তকের এক-তুল কাটিয়া প্রবলবেগে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, শিশুর ক্রন্দনশক্তি তখন লোপ-পাইয়াছিল,—কণ হৃদয়বিদারক স্বরে খোকা কেবল, “কাকাগো! কাকাগো!” বলিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতোছিল। বহির্দেশে দণ্ডায়মান বীরেনের প্রাণের ভিতরটা তখন জ্বলিয়া বাইতেছিল, কোন বসে নিকেকে সাম-লাইয়া চকের জল মুছিতে মুছিতে গাড়িতে উঠিয়া ভ্রমকণ্ঠে কহিল,—“হঁকাও।” গাড়ী ক্রতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীরেনের হৃদয়ে শব্দটের ভীষণ বর্ষা শব্দভেদ করিয়া খোকার কী ককণ আর্তনাদ ঘুরিয়া কিরিয়া বেড়াইতেছিল,—“কাকাগো! কাকাগো!”

(৫)

বীরেনের সহপাঠী বিজয় একাই একটা

সত্তর বাসায় থাকিত, তাহার বাসাটি কলেজ-স্ট্রীটে। বীরেনের গাড়ী গিয়া বিজয়ের বাসার সম্মুখে দাঁড়াইল। বিজয় তখন সবেমাত্র চা-পান শেষ করিয়াছে, গাড়ীর শব্দে সে বাহিরে আসিয়া বীরেনকে দেখিয়াই, প্রফুল্ল মুখে কহিল,—“কিরে আজ এত সকাল সকাল গাড়ী কোরে একেবারে যে এখানে, বাপার কি?”

“বাপার পরে বলব।—আপাততঃ কিছু দিন তোমার বাসাতেই আমার থাকতে হ’বে।”

“তা বেশ ত, একলা মন লাগে না, ছুজনে বেশ পাকা বা’বে। চেহারা এমন বিপড়ে গেল কেন? অস্থির করেছে নাকি?”

“টেক—না।”

“দেখি—” বলিয়া বিজয় বীরেনের কপালে হস্তস্পর্শ করাইয়া কহিল, “টুপিট!—১০৩ ডিক্রী হয়েছে, তবু বলবে, না!”

বিজয় বি. এ. পাশ করিয়া ডাক্তারী পড়িতেছিল।

জোর করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি আনিয়া বীরেন কহিল,—“সাবাশ ডাক্তার মশায়! কপালে হাত দিয়েই ১০৩ ডিক্রীতে তুলে দিলে—টেম্পারেচার নিলে বোধ হয় বলিবে যে, “বীক তুই মরে গেছিস! কমা করো, ডাক্তারি চালন্তলো দূরে রেখে দাও।”

“যা যা, আর চালাক করতে হ’বে না, আজ আর স্নান করিস নি, একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়গে বা।”

বীরেনের সত্যসত্যই বেশ অর হইয়াছিল, তবু একটু বিক্রম করিয়া বলিল,—“তাই স্পষ্ট বলনা—খেতে দিতে পারব না! অত ভনি-

তার প্রয়োজন কি ?” কথা কহিতে কহিতে দুই বন্ধুতে আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। বিজয় উড়ে ব্রাহ্মণকে এক বাটি দুধ আনিতে বলিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বীরেনের নিকট উপবেশন করিয়া কহিল,—“তারপর, কি খবর ? হঠাৎ যে তল্লা তাল্লা নিয়ে !”

বীরেন আত্মপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিজয়কে বলিল। সমস্ত শুনিয়া রাগত স্বরে বিজয় কহিল,—“আমার ইচ্ছে করে যে, এই নন-সেন্স ভাই গুলোকে কালাপানি চালান দিই।” তারপর কহিল,—“তা হ’লে তুমি একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়, আরাম হয়ে যাবে। ও কিছু নয়, উত্তেজনায় শরীরটা একটু গরম হয়েছে, কোন ভয় নেই। আমি এখন কলেজে চললাম, সকাল সকাল ফিরে চেষ্টা করব।” যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া বিজয় কলেজে চলিয়া গেল।

রানীগঞ্জের এসিষ্ট কোল-কন্ট্রোলার হর-বল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র বিজয় কলিকাতায় থাকিয়া ডাক্তারী পড়িতেছে। তাহার পিতার ইচ্ছা ছিল, তাহাকে ল পড়াইবেন, কিন্তু এই ডাক্তারি পড়াটা বিজয়ের ছেলেবেলাকার লখ,—তাই বি, এ, পাশ করিয়াই বিজয় মেডিকেল কলেজে নাম লেখাইল, আর বীরেন আইনের দুর্ধোধ্য অর্থ বিলম্বণে মনোনিবেশ করিল। দুইজনে বয়সের একসঙ্গে, একই কলেজে পড়িয়া আসিতেছে, উভয়েই উভয়কে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে। সহপাঠী হইতে কুর্খোজের অধ্যাপক অবধি, সকলেই বলিতেন,—“বিজয় আর বীরেন ছোটরা দুটির বন্ধু

আদর্শও অমুকণীয়।

(৬)

আহত বোকা “কাকাবাবু—কাকাবাবু” করিয়া অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িল,—কি তুলিয়া লইয়া গিয়া শয্যাশয়ন করাইয়া দিল। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া হরেন কণ্ঠস্থলে প্রস্থান করিল।

আহার করাইবার জন্য পুত্রের অস্থস্থান আসিয়া মন্দা দেখিল। বোকার সর্ব্বাঙ্গ শব্দ-শিষ্ট—প্রবলবেগে জর হইয়াছে। শীতল জলের আহার সম্পন্ন করিয়া মন্দা পুত্রের নিকট আসিয়া বসিল। রোগাক্রান্ত বোকা সমস্ত দিন শয্যাশয়ন করিয়া, “কাকাগো” করিয়া ছটফট করিতে লাগিল। উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে মন্দা দিনান্তিবাহিত করিল। হরেন আসিয়া পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার আনিয়া, ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চালায়া গেলেন, বোকা নিয়মিত ঔষধ খাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছয়টা দিন কাটিয়া গেল, বোকার রোগ ক্রমশঃ প্রকট পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুর নাম করণ বৃদ্ধি পাইল। প্রথম প্রথম পুত্রের মুখে বীরেনের নামে, মন্দার সমস্ত শরীরে সত্ত্বা রাসিক মংশনের জ্বালা হইত। কিন্তু তিন চারি দিন পরে সে জ্বালা কাটিয়া গেল। এখন অমৃতমুখ মন্দা কেবলই ডাক্তার, “আহা! ঠাকুরপো কেন চলে গেল—বেশ ভাল ছিল।” এখন হইতে বোকা কাকাবাবু নাম করিলে মন্দা নম্রভাবে বলিত,—“তোমার কাকাবাবু আসবে বোকন, তোমার জন্য কত ব্যথা অনুবে। ‘দুর্ধোজ শিষ্ট শয্যাশয়ন উঠিয়া

বসিবার চেঁচা করিত—পারিত না, ক্লিগকণ্ঠে কহিত, “কাকাবাবু কসে আধবে যা।” সাত্ত্ব-নার হয়ে মন্দা কহিত,—“এই আসে ব’লে, ঘনমালা তোমার কাকাবাবুকে আনতে গেছে। কাকাবাবুর আগমন সংগারে খোকা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইত, মন্দা খোকার শিয়রে বসিয়া তপ্ত অশ্রুধারা বর্ষণ করিত। হায়! সেই যে বীথেনকে তাড়াইয়াছে, কোন্ মুখে আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে, সে আসিবেই বা কেন। উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় আরও দু’দিন কাটিয়া গেলু, খোকার রোগের কিছুমাত্র পার্থক্য লক্ষিত হইল না। নবম দিনে ডাক্তার হরেক্ষকে নিজ্জনে ডাকিয়া কহিলেন,— “ব্যাপার বড় ভাল বুঝি না, আপনি আরও দু’জন ভাল ডাক্তার আনুন।” ভীত হরেন কম্পিতকণ্ঠে কহিল, “তবে কি খোকা—” বাধা দিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন,—“সে পরমেশ্বরই জানেন, তবে আপনি চেঁচার ক্রীড়া কেন করেন। সেই দিন হরেন উত্তরপাড়া হাসপাতালের বড় ডাক্তার এবং অমৃত যুন্দীকে লইয়া আসিল। ডাক্তারদ্বয় পরামর্শ করিয়া খোকাকে ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই দু’পে আরও চার দিন কাটিল, পঞ্চম দিনে খোকার আর কমিল, কিছু প্রকৃতিস্থ হইল। বড় ডাক্তার বলিলেন, “আর কোন ভয় নাই। ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহার চলিয়া গেলেন। খোকা জননীর সহিত কথা কহিতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিল,—“মা, কৈ কাকাবাবু কোথায়?” খোকাকে সান্থনা দিয়া বন্দা কহিল,—“এখন আসছে তোমার কাকা

বাবু।” কাকা সন্ধ্যে নানা প্রায় করিতে করিতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িল। মন্দা গিয়া স্নানান্তে স্বামীকে আহার করাইয়া নিজ আহার করিল। খোকা রোগাক্রান্ত হওয়া অব্যাহত হরেন আশ্রয়িত হইত না। “আজ খোকা ভাল আছে” শুনিয়া আহারান্তে দীর্ঘ দিনের পর মন্দা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আসিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। খোকার শিয়রে বসিয়া মন্দা বিনামাত্র রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিল। প্রথম রাত্রে খোকা বেশ ছিল, কিন্তু শেষ রাত্রে হট্‌কট করিতে লাগিল। খোকার পরিবর্তনে শঙ্কিত মন্দা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে নিশা অবসান করিল। বেলা আটটার সময় ডাক্তারগণ আসিলেন, খোকাকে দেখিয়া কহিলেন,— “এ যে দেখছি বিকার হয়েছে।” শয্যাপ্রান্তে ঘোমটা দিয়া মন্দা বসিয়াছিল, ডাক্তারের কথায় তাহার মাতৃহৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আর্ন্ত-কণ্ঠে হরেন কহিল,—“খোকাকে কোন রকমে বাঁচাতে পারবেন না—ডাক্তার বাবু!” বড় ডাক্তার তখন খোকার বক্ষ পরীক্ষা করিতে-ছিলেন, মুখ তুলিয়া কহিলেন,—“সাধ্য মত চেঁচার ক্রীড়া হবে না, ফলাফল ঈশ্বরের হাতে।” সেদিন ডাক্তারদের হরেক্ষনাথের বাড়ীতে থাকিতে হইল,—বন্টার বন্টার ঔষধ পরিবর্তন হইতে লাগিল। বাকশুভ মন্দা স্পন্দিত হৃদয়ে পুত্রের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল।

৭

বিজয় কলেজ হইতে আসিয়া, রোগীহীন পথ্য তুলি বাবুন ঠাহরের হাতে দিয়া বীরে-

নের ককে প্রবেশ করিল। বীরেনকে দেখিয়া সে ভিত্তিত হইয়া গেল, অমের প্রভাব—যে এত দূর অগ্রসর হইবে তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। আর বেশ পরিবর্তন করা হইল না, সে বীরেনের শুষ্কতা করিতে বসিল, আলু-মারি হইতে ছোট বড় নানা প্রকার ঔষধের শিশি লইয়া একটীর পর একটা বীরেনকে সেবন করাইতে লাগিল। দুই বট্টা নিয়মিত ঔষধ সেবনের পর বীরেন সংজ্ঞালাভ করিল। আরও দুই বট্টা অতীত হইল কিন্তু অর কমিল না। সারারাত্রি সমভাবে কাটিল—বিজয় বীরেনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনিদ্রায় উৎকণ্ঠায় সমস্ত রাত্রি কাটাইল। প্রাতঃকালে অরটা কিছু কমিল। বিজয় কহিল,—“কেমন আছিস্ বাকু?”

কৌণকর্থে বীরেন কহিল, “বেশ আছি। কিন্তু বড় দুশ্লব হয়ে পড়েছি, বোধ হয় আনার দিন শেষ হয়ে এসেছে।”

“ছিঃ জাই, অমন অধীর হইও না” বিজয়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, দুই বিন্দু তত্ত অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া বীরেনের মস্তকে পড়িল। বীরেন উন্মিত্তে চেঁচা কহিল, পারিল না, অভিমানমিশ্রিত করুণকর্থে কহিল, “কাদছিঁসু বিজয়। তবু মরে সুখী হ’তে পারুব, এইটে কোনো বে, এ জগতে এমন একজন আছে, যার জন্য এই হতভাগার জন্ম কেঁদে উঠে।” বীরেন বন্ধুর মস্তক টানিয়া নিজের বুকের মধ্যে আনিয়া সে ফুকারিয়া কাদিয়া উঠিল। বহু কণ দুই বিন্দু অশ্রু-বিসর্জন করিল। বিজয় বহু বীরেনের বুক হইতে সুখ ছুলিল, তখন

তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটা গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

বিজয় আবার বীরেনকে ঔষধ দিল। কিন্তু বেলা দশটার পর হইতে অর পুনরায় প্রবল বেগে দেখা দিল, সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি একই ভাবে বাওয়ায় এইবার বিজয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পাড়ল, উড়ে বায়ুনের দ্বারায় তাহার পরিচিত দুই জন ডাক্তারকে ডাকাইল, তাহারা রোগী দোবয়া ঔষধের ব্যবস্থা করলেন! ব্যাকুল কণে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ মতেন বাবু! কোন ভয় নেই ত?” গভীর-কণে মংগ্রে বাবু কহিলেন, “বিশেষ কিছু ত’ দেখাছি না, তবে বড় দুশ্লব, কেনী উত্তেজনার হঠাৎ প্রদাপ্তের কাব্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যদি তা’ না হয় ত’ রোগী এ যাত্রা বেঁচে যাবে।” মংগ্রে বাবু চলিয়া গেলেন।

বীরেনের পাড়ার সংবাদে তাহার সমপাত্রী বন্ধুগণ আগ্রাস্তা আগ্রাস্তা বীরেনের শুষ্কতা করিতে লাগিল, বড় বড় ডাক্তার আনিয়া কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—আরও তিন দিন পরে কণ, নিদ্রাশী, উপেক্ষা, অনাদর, অপমান এতাদৃশ পৃথিবাকে ফিরাইয়া দিয়া,—সংবাদপ্রাপ্ত বন্ধুদের আগ্রাস্তা শুষ্কতা করিয়া, বিজয়কে কাদাইয়া, বীরেন সুহার কোলে শান্তলাভ করিল। শতাব্দি বন্ধু-বেষ্টিত বীরেনের মৃতদেহ অশ্রুতে ভাসিয়া চিতাভস্মে বীরেনের কণভ্রুর দেহ নিদ্রাবে লয় প্রাপ্ত হইল। তরুণের হৃদয় হৃদয়ান্তে দীপক প্রাণিত করিয়া নিজ নিজ আগ্রাস্তে ফিরাইল।

৮

হরেন কখন ঔষধের জন্ত কখন বরফের জন্ত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল; বীরেনের কথা ভাবার মনে পড়িল,—আজ যদি সে থাকিত ত খোকার জন্য একাই এক শ হইত—প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইত, আর সে থাকিলে যোগ হয় খোকার একশ হইতও না। এখন সে কথা মনে করিয়া, হরেনের চক্ষে দুই বিন্দু জঙ্গ দেখা দিল।

দেখিতে দেখিতে স্বর্ষাদেব পশ্চিমাংশে চলিয়া গুড়িলেন—সন্ধ্যারানী নব বধূটির মত উজ্জ্বলি মাঝিতে লাগিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে খোকার কোন পরিবর্তন হইল না। উন্নত শিত প্রলাপ-বোরে কখন “কাকা গো—আমি তোমার খেদে দাব।” বলিয়া কাদিতে লাগিল, কখন “কাকা আমার আঙ্গুল দিলে।” বলিয়া হাসিতে লাগিল। নয়, দশ করিয়া বারটা থাকিল, বড় ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন, বাইবার সময় বলিয়া গেলেন, “যদি বিবেচনা করেন ত আমার খবর জীবন, আমি আসব।” সম্ভাব্যাহারী দুইজনকে ঔষধাদির উপদেশ দিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল,—তোরাবেলা খোকা অসুস্থ অবস্থায় প্রলাপ বকিতে লাগিল। বড় ডাক্তার আসিয়াছিলেন, খোকার ভাব দেখিয়া তিনি হঠাৎ কহিলেন, “হরেন বাবু! ক্রমেই অবস্থা ঝাপসা হয়ে আসছে, একবার ডাক্তার ডেভিকেলস-সার্জনকে আনিয়া দেখান। বা’রবার তা ত’ক’বেই।” হরেন সম্মতি জ্ঞাপন করিল, সহযোগী অন্ততবার ডেভিকেলস সার্জন

সাহেবকে আনিবার জন্য কলিকাতা রওয়া হইলেন। অল্প কণের মধ্যেই মোটর আরোহণে সার্জন সাহেব ও অসুস্থ বাবু আসিলেন। বড় ডাক্তারকে জ্ঞাতব্য প্রমাণাদির পর সাহেব খোকাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মনোনিবেশ সহকারে বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া, বিকৃতমুখে কহিলেন,—The case is most serious and hopeless. I am sorry to say that I can't do anything. তারপর নিজের টুপিটা তুলিয়া লইয়া, “Good day” শব্দে সকলকে আক্কেলান পূর্বক কক্ষ ত্যাগ করিলেন। হরেন ভয়ঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। এই কয়দিন মন্দা বীরেনের কথাই ভাবিতেছিল,—সেই তাহাকে তাড়াইয়াছে, কোন্ মুখে সেই আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু আজ তাহার শোকাচুর অবোধ প্রাণ কোন্ কথায় শুনিল না। মন্দা সব ভুলিল, বর্তমান তাহার চক্ষের সম্মুখে তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল। কক্ষ যে তিনজন পুরুষ রহিয়াছে, মন্দা তাহা ভুলিয়া লজ্জা, শয়ম, সঙ্কোচের বাধা তৈলিয়া আকুল-কণ্ঠে কহিল, “ওগো, ঠাকুর-পোকে একবার নিরে এস, সোণার বাহুকে আমার শেষ দেখা দেখে যাক, খোকা যে তা’র পলার হার ছিল গো।” পত্নীর কথার হতাশ-বদন হরেন বড় ডাক্তারের প্রতি চাহিল, তা’র বুঝিয়া ডাক্তার কহিলেন, “যদি কাকুর সঙ্গে দেখা করা’কে ইচ্ছা করেন ত এই বেলা করিয়ে দিন, বড় জোর দশটা অবধি আছে।” ডাক্তারে ধাবিয়া সম্মতি পাইয়া, খলিত-মুখে হরেন বাটার

বাধি হইয়া গেল। হরেন ডেল প্যাসেঞ্জার ছিল, সমস্ত রেল-কর্মচারী তাহাকে চিনিত, হরেন জানিত বিজয় কুমারই বীরেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, সে একেবারে বিজয়ের বাসাতেই উপস্থিত হইল। বিজয় তখন অনামনস্কভাবে রোয়াকে পদচারণা করিতেছিল।

কোন ভূমিকা না করিয়া আর্ন্তকণ্ঠে হরেন জিজ্ঞাসা করিল,—বীকু-বীকু এসেছে, বিজয় ?” সহসা হরেনকে দেখিয়া ও তাহার প্রশ্নে বিজয় খতমত হইয়া পড়িল, তার পর নিম্নে সানু-লাইয়া সংযত-স্বরে উত্তর দিল,—“হ্যা এসে-ছিল।”

“কোথায় সে, তা’কে ডেকে দাও ত।”—হরেনের কণ্ঠস্বরে আকুল-আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। বিজয় আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। হরেন ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, “কি হয়েছে বিজয় ?”

“হরেন-দা বীকু ত’ নেই, সে আগাদের সকলকে ফাকি দিয়ে চলে গেছে।”

হরেন চক্ষে অশ্রুকার দেখিল, তাহার পদ-ভলে প্রণিরী ঘুরিতেছিল। রোয়াক ধরিয়া হরেন বসিয়া পড়িল।

হরেনের তখন একস্থানে বসিয়া দু’দণ্ড কাঁদিবারও অবসর নাই, গৃহে পুত্রকে হৃৎ-শব্দায় রাখিয়া আসিয়াছে। ঘটনা শুনিয়া বিজয় হরেনকে লইয়া তৎক্ষণাত্ উত্তরপাড়া অভিমুখে রওয়ানা হইল।

ঠিক বিপ্রহরের সময় দুইজনে বাটী পৌছিল। তিতরে প্রবেশ করিয়াই হরেন

দেখিল, বীরেনের পড়িবার ঘরে ডাক্তারজ্বর বিষয় বদনে বসিয়া আছেন,—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, সে নিজ ক কাভিমুখে একপ্রকার ছুটিয়াই চলিল। মন্ডার আর্ন্ত-অশ্রুট কণ্ঠস্বর তখন “খোকন বাপু’রে আমার” শব্দে গৃহপানি যুগ্মিত করিতেছিল। পদশব্দে চমকিত মন্ডা ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—“ঠাকুরপো এলে—” পরে স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল,—“কৈ ঠাকুরপো ?—”

“সে ত আর আসবে না,—সে একেবারে গেছে—ভূমি যে তা’কে তাত্তিরে দিয়েছ!—খোকা কেমন আছে ?”

“সে কি কাকাকে ছেড়ে থাকতে পারে ? কাকাকে সে যে বড় ভালবাসে—তাই কাকার সঙ্গে গেছে!—ওপো সে যে ভা’র সঙ্গে বা’বান্নি জন্ত বড় কঁদেছিল!” মন্ডার জ্ঞানহীন দেহ ধরা তলে লুটাইয়া পড়িল।

পুত্রহারা,—ভ্রাতৃহারা শুষ্কিত হরেন কাঁদিল না, তাহার চক্ষের অশ্রুপ্রাণি বুকি শুকাইয়া জঃপুটী বোধিয়া গিয়াছিল—প্রাণটা বন্ধুত্বনি অপেক্ষা শুক নীরস হইয়া গিয়াছিল। দুই হাতে যুগ ঢাকিয়া সে বসিয়া পড়িল।

ত্রিবিমলকান্ত যুগোপাধ্যায়।

## প্রাণ-শক্তি।

প্রাণ-শক্তিকে চলিত কথায় আমরা জীবনী শক্তি বলিয়া থাকি, ইংরাজিতে ইহার নাম ভাই-ট্যাণ্ডি, vitality. স্বরূপে যেমন অর্থাভিগকে আলোক দিতেছেন, উত্তাপ দিতেছেন, সেইরূপ তিনি অবিরত এই প্রাণ-শক্তিও বিতরণ করিতে

ভেন। এই প্রাণ-শক্তি স্বর্গলোক, পিতৃলোক, প্রেতলোক প্রভৃতি উচ্চতম লোক সকলেও নিস্তরিত চইতেছে। তবে পৃথিবীতে ইহার ক্রিয়া সবচে আশ্রয় আলোচনা করিব।

এই পৃথিবীতে সূর্য্যাদেব কতই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তি দিতেছেন তাহার ইয়ত্তা করা আমাদের সাধ্য নহে, তবে আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে তিন প্রকার শক্তিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়। তলেকটি সিটি বা বৈজ্ঞানিক শক্তি, তাইটালিটি বা প্রাণ-শক্তি এবং কুণ্ডলিনী-শক্তি। পৃথিবীতে এই তিন প্রকার শক্তি পৃথক আকারে বরাবর থাকিয়া যায়, একটিকে অপর একটীতে পরিণত করা যায় না।

বিজ্ঞান-মলে যে প্রকৃতির বিকার উৎপাদন করিয়া এই পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমুদয় পদার্থ জীব-জন্তু গাছ-পাথর আদির দেহ সেই প্রকৃতির বিকারময়, বায়ু জল ও বাষ্পও এরূপ বিকৃতির অন্তর্গত। ঐ প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিত পৃথিবীর যে কোন পদার্থ লইয়া তাহাকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ভাগ করিয়া বাইলে শেষে এত ক্ষুদ্র অংশ হইয়া পড়িলে যে, আমরা চক্ষুর দ্বারা আর সেই বস্তুগুলি দেখিতে পাইব না, তার পর যতখনি অণুবীক্ষণ চক্ষে দিয়া সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল দেখিয়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করিতে থাকি, তবে শেষে এমন এক ক্ষুদ্র অংশ হইবে, যাহার পর সেই অংশকে আর ভাগ করা যাইবে না, এই অণুর এক একটী অংশের নাম পরমাণু, ইংরাজিতে ইহাকে আটম atom

তাহা হইলেই জড়-বিজ্ঞানমতে পৃথিবী সম্বন্ধিত তাৎপ্য পদার্থ, জল, বায়ু, জড় ও প্রাণীর দেহ সমস্তই এই পরমাণু সমষ্টি একত্রিত করিয়া গঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাণ-শক্তি সূর্য্যাদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এইরূপ এক একটা পরমাণু মধ্যে প্রবেশ করে, এইরূপ প্রবেশ হেতু ঐ পরমাণুতে একপ্রকার আকর্ষণ-শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাতে একটা পরমাণু আর ছয়টা পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া দানা বাঁধা মত হইয়া যায়।

এই দানা বাঁধা ও বিশেষ আকারের এক একটা সাতটি পরমাণু ঘটিত অণুকে প্রাণশক্তির অণু বলা যায়। ইহাদের নক্ষদর্শন-শক্তি আছে, তাহারাই এই সকল অণু দেখিতে পান। "ক্রিমডী আনিবেশ্যন্ত ও ক্রিমডী লেডবিটার সাহেব কর্তৃক ওকালট কেমিস্ট্রি (Occult Chemistry) নামক একখানি রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ প্রাণ শক্তির অণুর আকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে।

প্রাণ-শক্তির দানা বা অণু সকল দেখিতে অতি উজ্জ্বল বর্ণ এবং ইহার অতিশয় পতিশীল, এইজন্য অল্প অল্প প্রকার অণুর মধ্যে ইহা-দিগকে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বায়ুমণ্ডলে ইহার তাসিয়া বেড়াইতেছে। কেরোসিন তৈল পূর্ণ করিয়া একটি ডিনা আলিয়া দিলে যেরূপ কৃতবর্ণ বাষ্পাকার ধূম উড়িয়া বাইতে থাকে, সেইরূপ সূর্য্যাদেব হইতে প্রতিনিয়ত এই প্রাণ-শক্তির পরমাণু নির্গত হইতেছে, এবং ইহার ছয়টি অণু সাধারণ পরমাণু মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাদের সহ মিলিত হইয়া

জ্যোতির্গর্ভ অগ্নুরূপে নভোমণ্ডলে ভাসিয়া  
নেড়াইতেছে। রাত্রি এইরূপ অগ্নু সৃষ্টি হয় না,  
মেঘাচ্ছন্ন দিনেও ইহাদের উৎপত্তির সংখ্যা  
অনেক কম হয়। ষট্ ষটে রৌদ্রের দিনে এই  
অগ্নুর সৃষ্টি বেশী হইয়া থাকে।

যাহাদের জীবন আছে পৃথিবীর তানৎ  
প্রাণিগণই সেই অগ্নু নিজ নিজ দেহে পোষণ  
করিয়া থাকে। মানবের দেহে যেখানে প্রীতি  
রহিয়াছে সেই স্থানের চক্রটীর মধ্য দিয়া এই  
অগ্নু মানব দেহে শোষিত হয়। এই চক্রটীর  
ছয়টি দল আছে। জলে যে রূপ এক একটি  
যুগ্মপাক হইয়া থাকে চক্রগুলিও অনেকটা  
সেইরূপ। ইহাদের মধ্যস্থল গর্তমত এবং গর্ত  
হইতে গাড়ীর চাকার যে রূপ মধ্যস্থল হইতে  
বেড় পর্যন্ত কয়েকটা আড়ভাবে বাতা  
দেওয়া থাকে সেইরূপ চক্রের মণোর গর্ত  
হইতে প্রান্ত সীমা পর্যন্ত লম্বা লম্বা কয়েকটা  
উচ্চ উচ্চ রেখার মত পাকা হেতু চক্রটিকে দুই  
দল, চতুর্দল বা কুড়দল মতদেখায় ও শাস্ত্র  
বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

আমাদের কথিত প্রীহার স্থানস্থিত চক্রটীর  
ছয়টি দল, যে পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধ্যস্থলে  
নিরমত, হইয়া আছে সেই ঘুরিবার পথটি  
ভরজায়িত বলিয়াও একস্থান উচ্চ ও পরস্থান  
নিম্ন হইয়া থাকে, এই ভাবেও চক্রমণ্ডে ছয়টি  
উচ্চস্থান থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য  
হটক, অনেকে ঝোড়া দেখিয়াছেন, ঝোড়া  
'ঘুরিবার লম্বা বেতের ছয়টি লম্বা টান দিয়া  
একটীর নিম্ন দিয়া ও পরেরটীর উপর দিয়া  
অপর একটি লম্বা বেত ক্রমাগত ঘুরাইলে

যে রূপ একটি ঝোড়া হইবে চক্রটিকে সেইরূপ  
ভাবিতে হইবে।

আমাদের পূর্বে কথিত প্রাণ-শক্তির অগ্নু  
বাহুতে ভাসমান থাকা কালে উহা জ্যোতির্গর্ভ  
হইলেও উহার বিশেষ কোন বর্ণ থাকে না,  
উহাকে শাদাবর্ণ বলিলেও বলা যাইতে পারে।  
কিন্তু চক্রের পাকে পড়িলেই ইহার বিকৃতি  
হইতে থাকে এই অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়া  
কয়েকটা স্রোতে পরিণত হয়। আমরা দেখি-  
য়াছি, একটি এইরূপ অস্থিতে সাতটা পরমাণু  
থাকে, তন্মধ্যে একটিতে প্রথমে সূর্য্যাদেবের  
শক্তি প্রবেশ করে এবং পরে সেই শক্তি অপর  
ছয়টি পরমাণুকে টানিয়া লইয়া থাকে। যে  
অস্থিকে টানিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহার  
প্রত্যেকে এক একটি স্রোত আকারে পরিণত  
হইয়া এক একটি অপর অর্থাৎ চক্রের ছয়টি লম্বা  
লম্বি রেখাকার পথে চালিত হয়, অবশিষ্ট মূল  
পরমাণু বাহার ভিতর প্রথমে সূর্য্যাদেবের  
তেজ প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেটি অপর  
ছয়টিকে টানিয়াছিল সেইটী অর্থাৎ সেই আদি  
পরমাণুটি চক্রের মধ্যস্থিত গর্তমত স্থানে  
স্রোতাকারে চালিত হইতে থাকে।

এইরূপে ক্রমাগত প্রাণশক্তির অনুসন্ধান  
জীবদেহে শোষিত হইতেছে। যাহাদের  
খোষণ করিবার শক্তি কম হয়, তাহারা দুর্বল  
ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ সুস্থকার  
লোকের মধ্যে যে পরিমাণ শোষিত হয়, তাহা  
তাহাদের দেহেরকার লক্ষ প্রয়োজন অপেক্ষা  
বেশী, এ কারণ একজন সুস্থলোকে অপর এক-  
জন দুর্বল ও প্রাণ-শক্তির অল্পতাহুত লোককে



এই জীবনীশক্তি দান করিতে পারেন, এবং বাস্তবিক ধর্মাত্মসারেও কীণ জীবনীশক্তির লোক, অধিক জীবনীশক্তিশালী লোকের সঙ্গ করিয়া তাহার দেহ হইতে নিজ দেহে টানিয়া লইতে পারে। আমাদের এইরূপ আদান-প্রদানের দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

একদেবে দেখা যাউক, প্রাণশক্তির অগুসকল একরূপে চক্রযথো প্রবেশ করিয়া আমাদের দেহের ভিতর কি ভাবে ক্রিয়া করে। প্রথমতঃ এই অন্ন মধ্য দিয়া ছয়টি পরমাণু যাইয়' যে ৬টি স্রোত সৃষ্টি করে এবং চক্রমধ্যস্থিত গর্ত দিয়া আদি পরমাণু, বাহ্যতে প্রথমে প্রাণ-শক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, সেট পরমাণুর অপর একটি স্রোত হইয়া মোট ৭টি স্রোত হইয়া থাকে। এই স্রোতগুলির বর্ণ পৃথক পৃথক এবং ঠহার। ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া থাকে। উপরোক্ত ৬টি স্রোতের বর্ণ—বেগুনে, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও ঘোর কৃষ্ণাত লাল। আদি পরমাণু-বহিত সপ্তম স্রোতটির বর্ণ গোলাপী লাল। কাজেই আমরা দেখিতে পাউ, প্রাণ-শক্তি শরীরে সাতবর্ণের সাতটি স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। আনুর্ভেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে পঞ্চ-বাহুর কথা আছে, তাহা এই প্রাণ শক্তির স্রোত ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, এই স্রোতসকল চক্রমধ্য দিয়া বাইবার সময় নীল ও বেগুনি স্রোত দুইটি মিলিয়া একটি স্রোত হইয়া প্রবাহিত হয়। সেইরূপ কৃষ্ণাত লাল ও কমলার বর্ণ স্রোত দুইটিও একরূপে মিলিয়া একটি হইয়া থাকে।

নীল বেগুনে মিশ্রিত স্রোতটি আমাদের

গলার দিকে যায়। গলদেশে আমাদের যে চক্রটি আছে তাহাতে যাইয়া পুনরায় ইহা বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং নীল স্রোতটি গলদেশে বিস্তৃত নামক চক্রে সঞ্জীবিত করিবার জন্য থাকিয়া যায়। এই স্রোতটিও তাদিয়া গিয়া গলদেশের চক্রে মাত্র ফিকে নীল একটি স্রোত ক্রিয়া করে ও অবশিষ্ট ঘন নীলবর্ণ অংশ এবং বেগুনে স্রোত মস্তিষ্কে চলিয়া যায়। তথায় যাইয়া মস্তিষ্কের মধ্য ও নিম্নাংশকে শক্তিমান করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের উর্দ্ধদেশে যে সহস্রার গুল আছে, সেই চক্রের বহির্দেশে ২৬০টি দল মধ্যে বেগুনে বর্ণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে।

হলুদবর্ণ স্রোতটি হৃদয়স্থিত চক্রে প্রবাহিত হইয়া এখানকার আবশ্যকীয় কার্য করিয়া মস্তিষ্কে গমন করতঃ সহস্রার চক্রযথো ছাদশ-দলপক্ষে গমন করে এবং তাহাকে শক্তিমান করে।

সবুজবর্ণ স্রোত উদর ও কোষ্ঠদেশে প্রবাহিত হইয়া থাকে। নাভিদেশস্থ চক্র এবং যকৃৎ, মূত্রপিণ্ড ও অন্ত্রসকলের উপর ইহার শক্তি বিস্তৃত হয়। পরিপাক-শক্তি এই স্রোতের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে।

গোলাপী লাল স্রোতটি শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। শ্রাবু বা নার্ভের মধ্যদিয়া এই স্রোত প্রবাহিত হয়, ইহাকে স্নায়ুশক্তি বা 'নার্ভ-পাওয়ার' বলা যায়। এইটাই সাধারণতঃ জীবনী-শক্তি বলিয়া অভিয্যাত হয়, এই অংশই একজন অপরকে দিতে পারে। এই শক্তি কম হইলে লোকের খিটখিটে স্বভাব হইয়া থাকে।

কোন অবস্থায় থাকিয়াই সুস্থবোধ করে না। সামান্য কারণেই চমকিয়া উঠে। এইরূপ অবস্থার লোককে যদি কোন সুস্থদেহী এই শক্তি দান করে, তবে তাহার দেহ সুস্থ হয় এবং দাতারও ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

অতিশয় বৃদ্ধাবস্থায়, ক্রান্তিবশতঃ এবং পীড়িত অবস্থায়—লোকে উপরোক্ত প্রাণ-শক্তি গ্রীহার মধ্যদিয়া চালিত করিতে পারে না, কিন্তু অস্ত্রের শরীর হইতে আপন শরীরে গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে। মানব-শরীর তিন তুলসী, দেবদারু, ইউক্যালিপটস প্রভৃতি গাছেও এরূপ গোলাপী বর্ণের পরমাণু পাওয়া যায়। যাহারা স্নায়ুশক্তিহীন তাহার। এই গাছের নিকটবর্তী হইলেও তাহাদের ক্ষুধার্ত স্নায়ুর জল খাওয়া পাইয়া সুস্থবোধ করিবে।

কমলাবর্ণ ও কৃষ্ণাভ লালবর্ণের স্রোত দুইটা মিলিতভাবে যাইয়া মেরুদেশের মূলে নামিয়া আসে, ইহারা জননেন্দ্রিয়-শক্তি বৃদ্ধ করে, রক্তমধ্যে প্রবেশ করে ও রক্তশোধন ও রক্তস্রুতির সহায়তা করে এবং শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিয়া থাকে। যতপি কেই এই শক্তির পোষণ করিতে পারেন, অর্থাৎ এই শক্তির দ্বারা যে কামশক্তি উদ্বেজিত হয় তাহাকে দমন করিতে পারেন তাহা হইলে এই স্রোতের সেই অংশ চেষ্টা করিলে যন্ত্রকের দিকে উর্দ্ধগতি করায় যায় কিন্তু ইহা বহু কষ্টসাধ্য ও চেষ্টা-সাপেক্ষ। এই স্রোত যন্ত্রকে নীত হইলে ইহার বর্ণ কমলার পরিবর্তে ঘাটী হলুদের বর্ণ হয়। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির সবু উন্নতি হইয়া থাকে। কৃষ্ণাভ লালবর্ণ স্রোত যের লাল

স্রোত হইয়া পড়ে এবং পরাৰ্বে নিবোধভাবে কাজ করিবার শক্তি হইয়া থাকে। এই স্রোতের সহিত ফিকে বেগুনে স্রোত মিশ্রিত থাকে, তাহাতে মানবের মনকে পারমাণবিক উন্নতির দিকে লইয়া যায়। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত লোককে কখনও কামবৃত্তি আক্রমণ ও বশীভূত করিতে পারে না। ইহাকেই উর্দ্ধগতা অবস্থা কহে। কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগরিত করিবার পক্ষে এই অবস্থার আসিতে পারিলে সাধককে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার অল্প চিন্তা করিতে হয় না।

এই স্রোতের প্রবাহ অল্প মানবের দ্বারা ভালমন্দ হইয়া থাকে। যাহার পরিণামশক্তি ক্ষীণ, সূক্ষ্মদর্শী লোক দেখিতে পাইবেন, তাহার দেহে সবুজবর্ণের স্রোতটির শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। হলুদ স্রোতটি ঠিক থাকিলে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া ও বল অকুণ্ণ থাকিবে এবং নীলবর্ণ স্রোত নিয়মমত চালিত হইলে স্মরণ হয় ও গলদেশের পীড়াদির আশঙ্কা থাকে না।

যাহারা পূর্ণপ্রাণে থাকে, অথচ পারমাণবিক তাপাদির এই সকল স্রোত নিয়মিতভাবে চলিয়া থাকে। তামাক, মদ, মাংস প্রভৃতি ভোজনে শরীর তত পবিত্র থাকে না, ইহা হইলেই জীবনী-শক্তির এই স্রোতসকল ঠিকভাবে চলে না। মদ-মাংসভোজী লোক, সাময়িক লোক অপেক্ষা বলবান্ হইতে পারে কিন্তু সে বল তাহাদের অভ্যাসজনিত শারীরিক অবস্থার দ্বারা

চক্রগঠনে লোকের বৈরূপ চক্রসিদ্ধি হয়, তাহাতে সেই চক্রটি যেভাবে ক্রিয়াশীল হয়, তাহা এই প্রাণ-স্রোত প্রবাহিত ক্রিয়া হইতে

ভিন্ন রকমের। জীবনীশক্তির অণু-পরমাণু-সকল পার্শ্বিক, তবে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-বোম এই পাঁচ প্রকার পার্শ্বিক অণু-পরমাণু মধ্যো ক্ষিতি, অপ ও তেজবলি অণুসকল চক্ষু-চক্ষে দেখা যায়। ইহার উপরের অণুসকল অতি সূক্ষ্ম বলিয়া সচরাচর দেখা যায় না। দেখিবার জন্য দৃষ্টিশক্তি-সাধন দ্বারা দিবাদৃষ্টি লক্ষ্য করিতে হয়। এই স্রোত ও চক্রাদি আমাদের স্কুলদেহের মরুৎ ও বোমখণ্ডিত পিণ্ডদেহ নামক অংশে রহিয়াছে। তাণ্ডদেহ নামক ক্ষিতি, অপ, তেজ বলি অংশে নাই, এ কারণ আমরা দেখিতে পাই না।

যাহারা এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত সি, ডব্লিউ লেড-বিটার লাহেব প্রণীত “হিডেন স্যুইড অফ বিংস” নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

ঐকান্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল।

## শঙ্কর মঠ।

বি-এন্-রেলের সাতরাগাছি ষ্টেশনের নিকট সম্ভ্রান্ত শঙ্কর-মঠ নামে একটি বৃহৎ মঠ স্থাপিত হইয়াছে। পাতরাগাছি নিবাসী ঐচরণ দাস শেঠের পুত্র বদান্ধবর শ্রীযুক্ত মনোম নাথ শেঠ মহাশয় আর হই লক্ষ যুগ্মা বায়ে এই মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অনেক আতুর-অনাথ, অনেক লম্বাণী এই মঠে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে। বিলাস-বাসন প্রাণিত, বার্ষ-বিব জর্জরিত বঙ্গ-দেশে আশ্রয় যে এইরূপ লোকহিতকর অনুষ্ঠান

হইতেছে, আজও যে পরহঃখ-কাতর ধর্মপ্রাণ মহাত্মা স্থানে স্থানে বিরাজ করিয়া দরিদ্রের তপ্তাশ্রম মোচনের জন্য অকাতরে অর্থদান করিতেছেন, তাহা মনে করিলে বাস্তবিকই হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। অর্থ অনেকেই আছে, কিন্তু কয়জন সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন? জীবমাত্রেই আত্মসুখের রত, কিন্তু যে মানব আত্মসুখের সীমা ছাড়াইয়া পরের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে, মানব-সম্মুখে তাহার স্থান অতি উচ্চ, আর যে ধনী বিলাসিতার জন্য অর্থব্যয় না করিয়া সংকার্য্যে তাহা নিয়োজিত করেন, তিনিই ভূতলে অতুল্য কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন। তাই কবিবর হেমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন,—

“সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর সজ্ঞন,

বিধাতা তাহের হস্তে দিয়াছেন ধন,

জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,

এ কথা যে বুঝে মর্ত্যে দেবতা সে জন।

\* \* \* \* \*

বিধাতার বরপুত্র ধনী এ ধরিতে,

স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।”

মনোম বাবুর কীর্তি অতুলনীয়। শুধু “শঙ্কর-মঠ” নয়, আশ্রয়শীনের আশ্রয় দানেও তিনি মুক্ত-হস্ত, অভাব অভিযোগে দান করিয়া আরও কত মহৎ কীর্তি করিয়া তিনি যে স্বর্গের দ্বার উন্মোচন করিতেছেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ বারান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল। ভগবান এই পরোপকার পরায়ণ, দরিদ্রের বন্ধ, ধর্মপ্রাণ যুবককে দীর্ঘজীবী করুন—ইহাই প্রার্থনা।

## ব্রহ্মচর্য্য ।

(১)

মানবের চরমলক্ষ্য শান্তি। সবল, সুস্থদেহ ও নির্বিকার প্রশান্তমনই শান্তিলাভের সুবর্ণ সোপান। ব্রহ্মচর্য্য বাতীত মন স্থির ও অক্ষুর বাহ্যলাভ অসম্ভব। এ জগতই এ বিধে প্রযুক্তি অপেক্ষা নিবৃত্তির, ভোগী অপেক্ষা যোগীর, ব্রহ্মচারীর সংযমী শাস্ত্রস্বভাববলীর এত গৌরব। এ যুগের নূতন কবি বর্ণনামহাত্মা বিবেকানন্দ অথও ব্রহ্মচারী-ব্রতে দীক্ষিত ছিলেন, তিনি কাম-বিজয়ী উর্দ্ধরেভা সন্ন্যাসী ছিলেন, তাই তিনি বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ। এই কমিঞ্জর বা শুক্ররক্ষাই যে মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক—শারিরিক, মানসিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সর্বস্বত্বের, পরমশান্তির নিধান, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে সে কথা বলিতে প্রয়াস পাই-রাছি। ক্ষমতার অভাবে এবং অল্পীলতা ও প্রবন্ধবাহুলা ভয়ে সে কথাটি যেমন করিয়া বলা উচিত ছিল, তেমন করিয়া বলিতে সমর্থ হই নাই। কবি বলিয়াছেন—

“হৃদয় এ কুল সুন্দর নর, ধরেছি সবার আগে,

চলিতে চলিতে আঁধার পলকে,

ভুলে কারো ভাল লাগে।”

ইহা ভুলে কাহারও ভাল লাগিলে, ইহা পাঠে একটি লোকও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, আত্ম-মজল চিন্তা করিলে, এ অযোগ্য লেখকের হৃদয় সার্থক হইবে।

(২)

“পরীরমাতং ইন্দ্ৰ বর্ষ-সামনয়।”

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলন সময়ের নাম পরমায়ু। ইহার সাধারণ অর্থ—জীবিতকাল। যতদূরগণ ইচ্ছা করিলে কিয়ৎপরিমাণে পরমায়ুর হাস্যবৃদ্ধি সংসাধন করিতে পারে, কিন্তু কেহই অমর হইতে সমর্থ নহে। আত্মার ধ্বংস নাই, কিন্তু দেহীর দেহ নিত্য ধ্বংসশীল। তবে যতদূর যত্ন করিলে—বাহ্য্যরক্ষাবিধি উন্নতরূপে না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাধি প্রতিপালন করত বর্ষপথে চলিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই সম্মিলনকাল বা পরমায়ু বর্ষেই বর্ধিত করিয়া বাহ্য্যের সুদীর্ঘ জীবন বাপন পূর্বক পরমাত্মাভি উপভোগে সমর্থ হইতে পারে।

মানবদেহ একটি যন্ত্রবস্তু। জ্ঞানবায়ু দ্বারা এ যন্ত্র পরিচালিত হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্য

ই হাঙ্গাইল “বালা-সমিতির” দ্বিতীয় অধিবেশনে  
পঠিত।

ও দাপের অপেক্ষা সত্যযুগের লোক সুদীর্ঘজীবী ছিলেন। চারিযুগ মধ্যে কলির জীবই সর্বোপেক্ষা দুর্বলী। সুতরাং বর্তমানকাল মানব-জাতির অবনতির কাল। উন্নতির যুগে মানব-স্বাস্থ্য উন্নত ছিল বলিয়াই তখনকার লোক দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইত। শরীরের সহিত মনের সবন্ধ অতি নিকটবর্তী; তাই সত্য-যুগের লোকের মানসিক অবস্থা এত উন্নত ছিল। পূর্বকালে যুনিবর্ষিগণ যোগচর্চা ও রসায়ন গুণাবিশিষ্ট খাদ্য ও ভেবজাদি সেবনে স্বাস্থ্যময় সুদীর্ঘ জীবন লাভে সুখী হইতেন। দীর্ঘজীবন ব্যতীত ঐহিক বশঃ ও পরমার্থলাভ সম্ভব হয় না। আধুনিক লোক-সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয়; এ যুগের লোক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম ও ব্রহ্মচর্চাদি প্রতিপালনে আর সেরূপ যত্ন করে না। তাই বঙ্গগৃহে বিলাসিতার শত অভ্যাস এবং দৈনন্দের ঘোর হাহাকার নিত্য বিরাজিত; তাই বঙ্গবাসী আজ ধ্বংসোন্মুখ জাতি, তাই বঙ্গে আজকাল অকালমৃত্যুর এত বাড়িবাড়ি—অকাল বার্কিকোর এত ছড়াছড়ি।

এ জগতে যে জাতি যত সবল, সুস্থকার, সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান্ সে জাতিই তত দীর্ঘ-জীবী—সে জাতিই তত উন্নত ও সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। বাকালী-বধু হুড়ি না হইতেই বুড়ী হইয়া থাকেন, বাকালীর নর-নারী পঞ্চাশ না হইতেই বৃদ্ধার করালগ্রাসে চলিয়া পড়েন! ইহার কারণ কি? কি পাপে—কোন্ দেব-তার অভিযোগে আজ বাকালীর এ দুর্দশা? বাকালীর এ অকালবার্কিকোর ও অকালমৃত্যুর কারণ কি? তাহা কি আমরা কেহ কখনও

অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি?—না, আমাদের অনেকের আজও সে চিন্তার অবসরই হয় নাই। দীর্ঘকাল একরূপ শ্রোতে গা ভাসাইয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিলে এ জাতির অকালধ্বংস অনিবার্য। আমরা জন্মিতে হয় তাই জন্মগ্রহণ করি, বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন তাই কায়ক্লেশে শাকার সংগ্রহ করি ভিক্ষা বা গোলামবৃত্তি অবলম্বনে কিছু অর্থসংগ্রহে যত্ন করি, আর মরিতে হয় তাই নানা অত্যাচারে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া অকালে মরণের কোলে চলিয়া পড়ি। ইহাই হইল আমাদের বর্তমান সমাজের লোকধর্ম। জানি না, এ ধর্মের সচিত পশুধর্মের পার্থক্য কি? পশুরাও ত জন্মগ্রহণ, খাদ্যসংগ্রহ ও বংশবৃদ্ধি করিয়াই অনশেষে মরিয়া যায়। ইহাই কি মনুষ্যধর্ম? তবে আর মানুষে ও পশুতে পার্থক্য রহিল কোথায়?

না, পশুধর্ম কখনই মানবধর্ম নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে জনন, মরণ প্রভৃতি কঠকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মনুষ্য ও পশুধর্ম একরূপ হইতে পারে না। কেন না পশুরা সহজাত বুদ্ধিধারা পরিচালিত, আর মানব জ্ঞান-বিবেক দ্বারা পরিচালিত। জ্ঞান ও বিবেকের নিকট সহজাত বুদ্ধি ও সংস্কার দাঁড়াইতেই পারে না। জীবনপ্রবাহ পন্নপত্রস্থিত জল-বিন্দুর তায় কণহারী। এ অল্পকাল হারী জীবনে শুধু পশুবৎ ভোগহর্ষে নিরত থাকিলে এ হ্রদ ত মনুষ্য জন্ম ধারণে কল কি? জানিগণ জানেন, একমাত্র পরমাত্মাই অবিনশ্বর নিত্য-পদার্থ; তাই তাঁহারই সেই নিত্যপদার্থেরই চির-উপাসক।

এ বিষয়ে যে জাতি মত অজ্ঞান ও অশিক্ষিত, সে জাতিই তত পশুভাবাপন্ন । কিন্তু বহুদিমের আদিম আৰ্য্যজাতি আমরা,—আমরা পশু ভাবাপন্ন হইব কেন ? একদিন শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্রপ্রভাবে আমরা যে মনুষ্যত্বের সীমা-রেখা অভিক্রম করিয়া দেবত্বভাতে প্রায়সী হইয়াছিলাম, সেই আৰ্য্যমস্তান আমরা আজ পশুপ্রকৃতি হইব কোন্‌ পাপে—কাহার অভি-পাape ? যে দেশ হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, দুৰ্জিতির প্রকৃতি মহাপুরুষগণের জন্মভূমি—সে দেশের আজ এ দুর্দশা কেন ?

এ কথার উত্তর অকুটুম্বীরা “কপাল” নহে, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন, ব্রহ্মসংগীত এবং নীতি ও নৈশিক্ষার অভাবই আজ আমাদের এ ঘোর অবনতির মূল । আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাই আজ আমাদের একমাত্র উৎপাদক, যেচ্ছাচারী, অনাচারী, লালসা পরায়ণ ও বিলাসী গড়িয়া তুলিতেছে । বিভ্রান্তয়ে ধর্ম ও নীতিশিক্ষা এবং প্রজ্ঞাচর্চায় অকাবলি আজ আমাদের মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বের দিকে অশিক্ষিত আকর্ষণ করিতেছে । অবশ্য আধুনিক অর্থকরী শিক্ষাই এখনকার দিনে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ; কিন্তু তাহার সহিত প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিগুলির শিক্ষার সম্পূর্ণ অবহেলা করা সম্ভব নহে । সেই অবহেলার ফলেই আজ আমরা এত বিলাসী, এমন জীর্ণ-দীর্ণ, এত অকালবৃদ্ধ ও ঘোর যেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছি । উজ্জ্বল লালসা এবং ঘোর যেচ্ছাচারিতাই আমাদের সকলকার্হিক্য ও অকালবৃদ্ধ

ডাকিয়া আনিয়াছে ।

চিরবৌবন ও বাহ্যিক সুখীর্ষ জীবন মানব যাত্রেরই বাহ্যমৌর । কিন্তু কয়জন লোক সে ক্ষুদ্র যত্ন কারয়া থাকেন ? কয়জন লোক স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধি মানেন করেন,—কয়জন লোক “ন রেতঃ স্কন্ধেৎ কৃচিৎ” এই মহাবাক্যের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন ? কয়জন বাল্যাবস্থা প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্যাবলম্বন, বৌবনে ও প্রৌঢ়ে বিতামত আহার-বিহার ও ইঞ্জির লেখন করিতে যত্ন করেন ? কয়জন বাল্যাবস্থা যুগ, তুষ্ণ, নবনীত, যৎসা, যাস্য প্রকৃতি আহার্য্য, যাত্তিক ভাত কলমুদারি, দমস্তক যুক্ত মলর পবন ভোগ করিতে পাইয়া থাকেন ? দৈত্য, উদাসীন, এবং বাস্তা-তবে অনশিক্ষিতাই তাঁহাদের এ অন্তঃকরণ ও সর্বনাশের কারণ ।

যাত্রাকে কঠোর মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়া দেবত্ব পৌছিতে হয় । শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ হইবার নিমিত্ত কঠোর উপাসনা করিতে হইয়া থাকে । “ভাজানামধারনং তপঃ” অধারনই ছাত্রাদিদের তপস্তা । পূর্বে অরণ্যভাত কালে এখানে অতি শৈশবে উপনীত হইয়া শুক্লগৃহ পূর্ণ স্বাদশ বৎসরের মহা তপস্তার এ লাভদায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইত । কিন্তু উপনীত হইলে—অর্থাৎ শুক্ল গৃহে উপস্থিত হইয়া পাঠ-রত্ন কার্য্যে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলা হইত । এবং পূর্ণ স্বাদশ বর্ষকাল অধ্যয়ন বাক মিন তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইত তত কাল-তাঁহাকে শুক্ল-গৃহে ব্রহ্মচারীত্বের অধুটানে জীবন যাত্রণ করিতে হইত । ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত অর্থ তজ্জ

ধারণ করা। উর্জ্জ্বেরতা সন্ন্যাসীরা চির-ব্রহ্ম-চরী। সাধিক আহার-বিহারে এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও উপদেশে চিত্তবৃত্তিগুলি সংযত হইয়া থাকে—সালসাকুল উদ্যম মনোবৃত্তি আপনি নিবৃত্তির অন্তত্বভূক্তে রান করিয়া শীতল, শিথ ও সুসংযত হয়। তখন ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন বা তজ্জরক্ষা আর তেমন কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। এই তজ্জরক্ষা এবং নীতি-শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনা ধর্ম্মজীবন লাভের—মাত্মব হইয়া দেবদেব পহিছবার একমাত্র উপায়। ইহাই ব্রাহ্মব্যব পুণীর্ঘ জীবন লাভের একমাত্র নিদান। এ দেশের প্রাচীন মুণিঋষিরা এ পন্থা অবলম্বন করিয়াই এ বিধে নয়দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।

নিম্নলিখ জামসঙ্গার মহাপ্রাজ্ঞ প্রাচীন আর্ধ্য-ধর্ম্মগণ জন্ম সংস্কারকেই মামবজ্ঞাতির প্রধান-ভব সংস্কার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রমোদ মন্ত হইয়া উদ্যম মনোবৃত্তির চরিতার্থ করা সন্তান উৎপাদনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। সুসন্তান উৎপাদন, কঠোর সংযম ও ধর্ম্ম-সাধনা সাপেক্ষ। পতি সংযত মনে তজ্জরক্ষারূপে বর্ষোদ্দেশ্য সন্তান লাভের নিমিত্ত স্ত্রী-ভগ-বাসের মধুররূপ ধ্যান ও তাঁহারই পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া তত দিনে ততরূপে শাস্ত্রিত ভাবে—পাণ্ডিত্য ভোগ্য। পবিত্র জ্বর। সংযমীয়া। শুদ্ধ-মতী ইবদতিত্বাৎমিকতা পুষ্কার্জ্বিনী বৃত্তবতী •

১০. বহুধর্ম্ম জন্ম রাতি হইতে ১০ ল রাতি পর্যন্ত বহু-কালঃ তখনো অধম পাঁচ রাতি দ্বাবিংশী সন্মিলন নিমিত্তঃ অবশিষ্ট কর রাতিঃ নিমিত্তঃ তিথি ও পূর্ণদিন (১) জ্যৈষ্ঠ চতুর্দশী পূর্ণিমা ও অশ্বিনীয়া বসন্ত পতি-পত্নীর

পত্নীতে প্রকৃত চিত্তে অপত্য উৎপাদন করিবেন, ইহাই আর্ধ্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ এবং শরীর-বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিধান। সন্তান উৎপাদন কালে জনক জননীর মনের ভাব যেরূপ থাকে, সন্তানের মনের ভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে। তৎকালে দম্পতীর মনে আত্মারিক ভাবের বিকাশ পাইলে—তাঁহারা সুরাপানাত্ত ও আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত হইয়া পত্ন-দম্পতীর স্তায় সন্তান উৎপাদনে প্রয়াস পাইলে—সন্তানের মন-প্রাণও যে অধঃপতিত, নীচগামী এবং পণ্ডতাবাপন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বরং ঐরূপ না হওয়াই অস্বাভাবিক, এরূপ ভাবজাত সন্তানের শারীরিক তাক্তিত প্রবাহ অধোগামী হয়, এবং

মিলন চইতে পায়ঃ। দম্পতীর যুগ্ম রাত্রির সন্মিলনে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রির সন্মিলনে কন্তাসন্তান জন্মিয়া থাকে। বহুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ রাতি পর্যন্ত সময় মধ্যে দেখভাগে উৎপন্ন সন্তান সম্বিক স্ত্রীমান, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হয়।

যশু বলেন, প্রথম ৪ রাতি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাতি নিমিত্তঃ অবশিষ্ট দশ রাতি দম্পতী সন্মিলনে প্রসুত কাল। কিন্তু চরকের মতে ৩র্থ রাতি নিমিত্ত নহে। এমত বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে মাসে দুই দিনের অধিক দাম্পত্য সন্মিলন অসম্ভব। এরূপে একটা প্রবাদ আছে যে,—“মাসে এক, বছরে বাহ, তায় পর বত কন্যাকে পার।” স্ত্রী প্রবাহ রক্ষার্ষ এরূপ বৈধ জিহাদ পুহীর এক্ষণেই নষ্ট হয় না।

দিনে, প্রাতে, সন্ধ্যায়, পর্জ্যাবহাৎ ও বহুকালে দাম্পত্য-মিলন নিমিত্তঃ তাহাতে সন্তান বধিৎ বিকলাৎ ও চির-কর্ম্ম এবং পুণ্য বাতুলোন্মীয়া ও বন্ধা প্রভৃতি বিবিধ কষ্টনি-পীড়ায়ত্ত হয়—এমন কি তাঁহার প্রজা, ভেজ, বল, চক্ষু, স্রোতি ও পরসার পর্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

উহার একরূপ তরুণ বয়সেই যৌবনের বিলাসী, অমিতাচারী ও উজ্জ্বল পরায়ণ হইয়া পড়ে। উহাদের পক্ষে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত প্রতিপালন অসম্ভব।

ঋতুকালে ঋতুমতী যেরূপ মৃতি দর্শন বা চিন্তা করেন, সন্তানের আকৃতি প্রকৃতি ও তদনুরূপ হওয়াই সম্ভব। একজ্ঞ ঋতুকালে বিশেষতঃ ঋতুস্রানান্তে আধামতিলাগন স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের মৃতি দর্শন বা চিন্তা করেন না। এ দেশে ঋতু-স্রানান্তে দেব-মৃতি, আদর্শ মহাপুরুষগণের পবিত্র চিত্র, অথবা স্ত্রী দর্শন এবং তাঁহাদের ধ্যান ( চিন্তা ) করিবার একটি সুন্দর প্রাচীন প্রথা আজও বিদ্যমান আছে। ঋতুকালে জননীর মন সাত্বিকতাব পূর্ণ থাকিলে সন্তানের মনও দেবতাবপূর্ণ হয়, এবং তৎকালে, মাতার মনে আত্মরিক ভাব বিদ্যমান থাকিলে, সন্তানের মনেও পাত্বিক ভাবের প্রাবল্য হয়। যে সকল সমাজে স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা রমণীর পুনঃ পতিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে, তাঁহাদের মধ্যে ঐরূপ নারীর সহিত তাঁহাদের পূর্বে স্বামীর কোনরূপ পারী-রিক-সংস্রব না থাকিলেও প্রসূতির অভিনব পতিজাত সন্তান, পূর্বে পতির অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। অনেক সময় সন্তান যে বহুল পরিমাণে মাতার চিন্তা শক্তির অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বুল। বৃতহাট্টের জম্মাভব এবং পাতু-রাজার পাতুই প্রকৃতি পৌরাণিক সত্যও কি এ কথারই দর্শন করিতেছে না?

নিরন্তর ধর্ম্মশীলতা, মিতাচার, মিতাহার, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, দান-দান, আরাধনা, উপাসনা বা তপস্যা কিংবা দেবতার আশীর্বাদ কখনও নিকল হয় না। সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মশীল না হইলে, কেহ ধার্ম্মিক, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী সন্তান লাভে সমর্থ হইতে পারে না। অসংযমী, অধার্ম্মিক ও উৎশৃঙ্খল প্রকৃতি নরনারীর সন্তান জন্মিলেও সেরূপ পিতামাতার সন্তান ধার্ম্মিক, বলিষ্ঠ, মেধাবী, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইবার আশা খুবই কম। একজ্ঞই ইন্দ্রিয় পরায়ণ বিলাসী বড়লোকেরা প্রায়ই নিঃসন্তান হইয়া থাকেন। এবং প্রায় অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের সন্তানগণও ভেমন বলবান, স্বাস্থ্য-বান, মেধাবী, ধর্ম্মশীল ও দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায় না। উৎকৃষ্ট বীজ ও উৎকৃষ্ট ভূমি এবং অমুকুল জল-বায়ু বাতীত উত্তম শস্ত লাভের আশা করা যায় না। সুসন্তান সুপিতামাতারই অকল্পন।

জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না করিলে ধার্ম্মিক, বলবান ও দীর্ঘজীবী সন্তান জন্মবে কেমন করিয়া? উৎকৃষ্ট বীজের দ্বারা উৎকৃষ্ট শুক্রই সুসন্তান লাভের একমাত্র নিদান। যোগ ও দেবারাধনা প্রভাবে মন নির্মল, সুসংযত, ধর্ম্মতাব পূর্ণ ও বিমল আনন্দ-যুক্ত হয়। বাস্তবের এ অবস্থাই সুসন্তান লাভের প্রকৃষ্ট অবস্থা। বহুতত্ত্ববিদ চিন্তাশীল আধাধাধিরা এসব তত্ত্ব ভালরূপ জানিতেন বলিয়াই হিন্দু-ধর্মে ব্রহ্মচর্য্যের এত প্রশংসা—বীর্ষ্য ও চরিত্র রক্ষার এত আদর।\*

পরীর সর্কারবপূর্ণ ও সুসংগঠিত না হইতে



রোজগার সম্পূর্ণ বিবিধ। পূর্বকালে ব্রহ্ম-চারীগণ ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন এবং অজ্ঞাত রসায়ন বিধানগুলিও সর্বাঙ্গ পালন করা হইত। সে যুগের লোক “ঋতুকালাগামী স্যাৎ” প্রকৃতি বিধান অতিক্রম করা মহাপাপজনক মনে করিতেন। তাহাদের এত অসাধারণ মনোভাৱ, আধ্যাত্মিক বল এবং সবল, সুস্থ ও সুখ-শান্তিপ্রদ দীর্ঘজীবন লাভের ইহাই নিদান। ভোগের কালিমা অপেক্ষা ত্যাগের মহামন্ত্রই—প্রকৃতি অপেক্ষা নিরস্তির পূজাই তাহারা ভাল বুঝিতেন; তাই এ হৃদয়কাল পরে আদ্যও প্রাচীন আর্ধ্য-সমাজকে আদর্শ লোক-সমাজ বলিয়া এ বিশ্ব গৌরবের পুষ্পাঞ্জলি দানে কুণ্ঠিত নহে।

অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা ও বৈজ্ঞানিক আহার-বিহার আধুনিক অধিকাংশ লোকের নিত্যত্রুত হইয়া পড়িয়াছে। তাই নিত্য ব্যাধি—অকাল জরা তাহাদের অঙ্গ-কুণ্ঠণ। যৌবনের পূর্ণ বল, অসাধারণ কর্ম-শক্তি এবং দেবত্বা শরীরকান্তি এ দেশ হইতে বহু দিন অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও অতুক্তি হয় না। আধুনিক বাদ্দানী যুগের মন নিভেজ, মানসিক বৃত্তি অবিশ্লিষ্ট—স্মৃতিশীল, মুখ নিরন্তর স্নান, চক্ষু কোটরগত, বাহু দুর্বল, দেহ সর্বাঙ্গার্থে মহা অলসতাপূর্ণ! তাহারা অনেকেরই প্রায় পূর্ণ যৌবনেই ত্বরূপে ও জীবনব্যাপ্য অকাল মৃত্যু। ঋতু পরিবর্তনের সামান্য পরিবর্তনেই তাহারা পীড়িত হইয়া নদী-কানির তরে চা-চুকটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাদের কল্যাণে সোমরসের দেশ

এখন তীক্ষ্ণ সূর্য-স্রোতে প্রাবিত! আয়ুর্বেদীয় অমৃত কুণ্ডের অমূল্য সুখা চ্যবনপ্রাশের স্থানে এখন বিদেশীয় কড়লিভার অয়েল ও সিরাপে সমাচ্ছাদিত! এতদপ কত দিকে কত আছে, কত দেখাইব? হায়! রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সমূহের জন্মভূমি এখন অকালমৃত্যু ক্রীড় ও বালখিল্যে পরিপূর্ণ!—বগ্নদোষ, শুক্রভারল্যা এবং দাঁস, কাস ও কফ এখন বাদ্দালীর জীবন-সহচর।

“বীর্ধ্যধারণে ব্রহ্মচর্য্যং” বীর্ধ্য (শুক্র) ধারণই ব্রহ্মচর্য্য। নিরামিষ ভোজন এবং শত কঠোর নিষেধ-নিষিদ্ধ নিয়ম প্রতিপালন করিয়াও যদি বীর্ধ্য ধরণে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়, তবে তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত রক্ষা হয় না। আর যদুচ্ছা মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করিয়া শুক্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইলে তাহাতেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু পদ্যাজ, ধূম্র ও মদ্য-মাংসাদি উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ—রাজ-সিক ও তামসিক আহার-বিহার করিয়া নিরন্তর আয়োদ-প্রয়োদ ও বিলাসিতায় ডুবিয়া থাকিয়া বীর্ধ্যরক্ষা করা বড় সহজসাধ্য কর্ম নহে; তাই ব্রহ্মচারীর নিকট সাত্ত্বিক আহার-বিহার ও বিলাসিতা বর্জন প্রভৃতি কঠোর বিধান সমূহের এত আদর।

ব্যায়াম ব্রহ্মচর্য্যের পরম সহায়। ব্যায়ামে মানব শরীর সবল, বাহ্যবান ও যুগ্মিত, মজ্জিক ও মানসিক শক্তি পরিবর্তিত, ইঞ্জির চাকল্য দূর এবং মন স্থির হয়। ব্যায়াম ও ব্রহ্মচর্য্য ঐহিক সুখ-শান্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পরম সহায়।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র  
এই সপ্ত ধাতুতে মানব শরীর গঠিত। ইহারা  
দেহ ধারণ করে বলিয়াই ধাতু নামে অভিহিত।  
“রসাক্রান্তং ততো মাংসো মাংসান্নোদঃ প্রজায়তে।  
মেদসোইস্থি ততো মজ্জা মজ্জাং শুক্রস্ত গন্তব্যঃ॥

(আত্মকৌদ)।

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস  
হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে  
মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হইয়া  
থাকে। বলা বাহুল্য যে রসের সারভাগই  
রক্ত, রক্তের সারভাগই মাংস, মাংসের সার-  
ভাগই মেদ, মেদের সারভাগই অস্থি, অস্থির  
সারভাগই মজ্জা এবং মজ্জার সারভাগই শুক্র।  
ভুক্ত দ্রব্য রসে পরিণত হইতে এক অহো-  
রাত্রের প্রয়োজন; এইরূপে এক মাসে খাদ্য  
পদার্থের এক সপ্তমাংশ শুক্রে পরিণত হয়।  
অর্দ্ধ সের রক্ত হইতে বিন্দু পরিমাণ শুক্র উৎ-  
পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং শুক্র যে অতি মূল্য  
বান সার পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই; শুক্রই  
মাহুবেয় জীবনী শক্তি। এই শুক্র স্রষ্টব্য খেত-  
বর্ণ, স্নিগ্ধ এবং শক্তি ও পুষ্টিজনক। ইহাই  
গর্ভাণী এবং ইহাই জীবনের প্রধানতম সম্পদ  
এই শুক্রসার হইতে “ওজঃ” নামধেয় এক মহা  
তৈজস্বর বস্তুর উদ্ভব হয়; ইহাই জীবনের  
একমাত্র আশ্রয়। ওজঃ ধ্বংসে জীবন ধ্বংস  
হয়। তাই বীর্ষধারণ বা ব্রহ্মচর্যের এত  
গৌরব।

“মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।

ভদ্রাঘতি প্রধরেন মুকুতে বিন্দুধারণাৎ”

(শিব-সংহিতা)।

বিন্দুপাতেই মৃত্যু। বিন্দু ধারণেই জীবন,  
এ জন্য যৌগীশয় সময়ে বিন্দু (শুক্র) ধারণে  
করিয়া থাকেন। একমাত্র অতিরিক্ত বীর্ষ-  
পাত—বিশেষতঃ অনৈসর্গিক বীর্ষাকর হইতে  
মাহুবেয় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক  
সর্ববিধ ক্ষতি সংসাধিত হইতে পারে। অপরি-  
মিত ও অস্বাভাবিক উপায়ে রোহিত্যাত মহা  
অনর্থের নিদান। ইহা হইতে না কল্পিতে  
পারে এমন ব্যাধি নাই। এক কথার বলিতে  
গেলে অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক রোহিত্যজনই  
ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিধ উন্নতির পরিগমী।  
বীর্ষ রক্ষা বাতীত শারীরিক, মানসিক ও  
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ  
জনাই ব্রহ্মচর্যের এত গৌরব।

“লিঙ্গে বিন্দো মহাবস্ত্রে কিং ন সিধাতি কুতলে,  
যন্ত প্রসাদান্নহিমা মমাপোভাদৃশো ভবেৎ ॥”

মহাবস্ত্রে বিন্দুসিদ্ধি লাভ করিলে (উর্দ্ধ-  
রেতাঃ হইলে) এ বিশেষ কোন কাণ্ডাই অসাধ্য  
হয় না; এই বিন্দু সিদ্ধি (শুক্ররক্ষা) প্রত্যাবেই  
আমি (ভগবান শঙ্কর) এইরূপ মহিমা লাভ  
করিয়াছি।

“ন তপস্তপ ইত্যাঁহ ব্রহ্মচর্যাত্তপোত্তমম্।

উর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যন্ত সবেবো নতু মাহুবেৎ ॥”

কোন তপস্যাই তপস্যা নহে, ব্রহ্মচর্যাই  
উত্তম তপস্যা; উর্দ্ধরেতা মাহুয নহেন, তিনি  
দেবতা।

“কল্পিণা মনসা বাচা সর্করাহাঃ সর্করা।

সর্কর মৈথুন ভ্যাগো ব্রহ্মচর্যা প্রচকতে ॥”

মনে, মুখে ও বাক্যে সর্করা সর্কর সকল  
অবহার বীর্ষ রক্ষার নাম ব্রহ্মচর্য।

“আপনার কথিতঃ পহা ইঞ্জিরাণাম্ সংযমঃ ।

ভক্ষয়ঃ সম্পদাং যার্গো বেনেটং তেন গম্যতাম্ ॥

ইঞ্জির উচ্ছলিত। বিপদের এবং ইঞ্জির  
জরই সম্পদের পথ; যে পথ ভাল তাহাই  
অবলম্বন করিতে পার।

“কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণ সমুত্তবঃ ।

মহাশনো মহাপাপা বিজ্ঞানমিহ বৈরিণম্ ॥”

রজোগুণ হইতে কাম ও ক্রোধের উদ্ভব  
হইয়াছে; মহাপাপজনক ভোগেও উত্থানের  
তৃপ্তি হয় না; উহাদিগকে মহাশত্রু মনে  
করিবে।

“শক্লোতীহৈব যঃ সোচুং প্রাক্ষরীর বিমো-

ক্ষণাৎ ।

কামক্লোভোত্তবং বেগং স মুক্তঃ স স্ত্রী নরঃ ॥”

এ শরীর ধ্বংস হইবার আগে যে কাম-  
ক্রোধের বেগ সহ করিতে পারে, সে ব্যক্তিই  
ধীর ও স্ত্রী।

( আগামীবারে সমাপ্য ) ।

কবিরাজ জীবরদাকান্ত কবিরত্ন ।

## চব্বিশুজ ।

### বজ্রাঘাত ।

মিলন আনন্দপূর্ণ প্রথম বোবনে  
নিরাশার ঢাকি’ হৃদি হরি’ প্রিয়জনে  
আজি যে হানিলে শিরে অশনি ভীষণ  
তোমার প্রেমের দান বুঝিছ এখন ।  
আলোকিয়া বজ্রাঘাতে হৃদয়কন্দর  
দেখাইলে হের বিশ্ব বড়ই সুন্দর

মেঘের আড়ালে বধা নক্ষত্র নির্মল  
লুকাইত দীপ্তমান, তেমতি সকল ।  
বিষের ভদ্র তুচ্ছ সৌন্দর্যের পিছে  
শাশ্বত সৌন্দর্য্য তব নিত্য বিকশিছে  
লংসার সম্বন্ধে যোর প্রিয় পরিজন  
সব পর, শুধু তব সম্বন্ধে আপন ।  
বিদ্রোহে চমাক হিয়া দিয়া বজ্রাঘাত  
ভুলভাদি এইরূপে বুঝাইও মাথ ।

ঐদয়ানন্দ চৌধুরী ।

## প্রভাত ।

নিঝুম রাতের কুজন তানে,

ভেঙ্গে গেল ঘোর

জেগে উঠল অমনি সবাই

দিয়ে প্রেম ডোর !

গাইছে বিহগ আপন মনে

যাচ্ছে নদী বয়ে

ফুৎফুত্রে বায়, ফুলের গন্ধ

আনছে কত নিরে !

প্রেমিক আপন প্রিয়ার পেয়ে

হর্ষে মুহু হাসে

ছইটা পরাণ একের লাগি

ধীরে ধীরে মেশে ।

বনের মাঝে “বউ কথা কও”

গাচ্ছে পাখী গান

মিলন মধুর প্রভাত গীতি

ফুলে নব তান ।

ঐকগদানন্দ বিশ্বাস ।

## গয়ার ইতিহাস

(পূর্বপ্রকাশিতাংশের পর)

গয়া জেলার মথো নবাব দাউদখাঁর পৌত্র দাউদনগর নিবাসী আহমদ খাঁ ই কেবল নিজ গাউনগড়ের দুর্গে সুরক্ষিত থাকিয়া মহারাষ্ট্র বীরগণের বিরুদ্ধে লড়াইমান হইলে মহারাষ্ট্রগণ কর্তৃক দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধাবস্থায় কিছুকাল থাকিয়া শেষে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পান। দুই বৎসর পরে রত্নজী ভোঁশলা গয়া লুণ্ঠন করিয়া সাসেরাওর জঙ্গল হইতে মন্তফা খাঁর অনুচরবর্গকে উদ্ধারসাধন করিয়া বলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহার পর গয়া জেলায় কিছুদিন পর্য্যন্ত শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। ১৭৭৭ সালে বিহারের ডেপুটী গভর্নর রামনারায়ণ সিংহ শিরিশকুটুবার জমিদার পাওয়ারী ও মালী-ডালী-রাজ রাজা নিপুন সিংহের বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুরের বন্দোবস্তি রাজকর দিতে অস্বীকৃত হইলে এক অভিযান লইয়া দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ডেপুটী গভর্নর বাহাদুরের পরাক্রান্ত সৈন্ত দেখিয়া নবাব জুজাঙ্গোলার বৃত্তার পর হইতে এ তাবৎ-কালের বাবতীর বকেয়া রাজস্ব সমস্ত আদায় দিয়া ইংরাজরাজের বস্ততা স্বীকার করিলেন। এই সময় নরহট্টের সামন্ত নবাব কামগার খাঁর সাহায্যে সত্ৰাট সাহ আলম বদ, বিহার ও উড়িষ্যার বীর প্রাধাত্য ও বাবীষ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথমে বিহার সুরা আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিলে ইংরাজ এবং মুর্শিদাবাদের নবাব নাজীম তাঁহার অভি-

প্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য একদল প্রবল সৈন্তসহ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। উভয় দলে রাঢ়ে এক ভূমল যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে সত্ৰাটের সৈন্ত পরাজিত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিলে সত্ৰাটের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। অবশেষে সত্ৰাট এবং নবাব কামগার খাঁর সৈন্তদল টিকারী, পাওয়ারী প্রভৃতির রাজাগণের রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া রাঢ় যুদ্ধ-পরাজয়ের পরিশোধ ভুলিতে লাগিলেন। এই লুণ্ঠনকারী সৈন্তদলকে দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য আশ্রয় দমন করা প্রয়োজন হইয়া উঠিলে, একদল ইংরাজ সৈন্ত মেজর কার্ণারের নেতৃত্বে নবাব মীরজাফরের পুত্র মীরগের অধীনে তাঁহার এবং ডেপুটী গভর্নর রাজা রামনারায়ণের যুক্ত সৈন্তের সহিত অগ্রসর হইয়া মানাপুরের যুদ্ধে ১৭৬১ সালে সত্ৰাটপক্ষকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া গয়া জেলাকে শত্রুযুক্ত করিলেন। এই সময়ের পরে গয়া জেলায় নবাব মীরজাফরের অধীনে স্থাপিত হয় কিন্তু মীরগ ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করার পুনশ্চ ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীরগ এবং বাদ-সাহ সৈন্তদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে গয়া, বাদালা, বিহার ও উড়িষ্যার সহিত ইংরাজ অধিকারে নীত হইল।

এ দিকে সহকারী বা ডেপুটী গভর্নর নবাব হেদায়েৎ আলি খাঁ হুসেনাবাদে থাকিয়া সোমপুরার রাজাকে শাসনে আনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি আপনা পরপরি বাহুরনগর-দহ মহালের অন্তর্গত কতকগুলি তালুক ও অন্যান্য কতিপয় লাভজনক মৌজা বাদিসাহদত্ত

পূর্বনির্ধিত কারমান বলে খাসে রাখিয়া বজ্রী-  
তলি সোনপুরারাজ দশরনাথ সাহী সিংহ  
দেওকে ক্রিয়াইয়া দিয়া সোনপুরা রাজকে খীর  
পৈতৃক গদীর উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।  
ইহার কিছুদিন পরে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত নগর  
হোসেনাবাদে খীর জীবনের শেষভাগ যাপন  
করিয়া পরলোকগমন করেন। নবাব হেদায়েৎ  
আলি খাঁ খুব উচ্চ হৃদয়, দয়ালু ও পরোপকার-  
পরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁহার দুই কস্তার  
বংশধরগণ হোসেনাবাদের বর্তমান নবাববংশের  
পূর্বপুরুষ ছিলেন। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর  
তাঁহার পুত্র সাইর মতাকরীণের লেখক নবাব  
গোলাম হোসেন খাঁ নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া  
মুর্শিদাবাদের দরবার হইতে নিজ নামে ফার-  
সাম ও সনন্দপত্র আনিয়া রান। এই সময়ে  
তাঁহার সহিত সোনপুরা রাজার খুবই বিবাদ-  
বিসংবাদ হয় কিন্তু ইংরাজের মধ্যস্থতায় তাহা  
একরূপ মীমাংসা হইয়া যায়। সোনপুরা  
রাজের পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে উচ্ছেদ  
করিয়া, নবাবগণ ইংরাজরাজের নিকট হইতে  
একটী নির্দিষ্ট তারদানী টাকা করস্বরূপ গ্রহণ  
করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোনপুরা রাজগণ  
জাত্যাংশে অকুলীন হইলেও আগী-ডালী ও  
পাওয়ারের রাজবংশের সহিত যৌন সংন্ধে  
আবদ্ধ হইয়া মধ্যাদা ও প্রতিষ্ঠাবান হইয়া  
পড়িয়াছেন। সোনপুরার রাজবংশে বহোরিয়া  
আলমবাগী কুয়ান একজন বিশেষ বুদ্ধিমতী  
এবং তেজস্বিনী রানী ছিলেন। ইনি পাওয়ার  
রাজ-রাজা বিজ্ঞান সিংহের কস্তা এবং সোনপুরা-  
রাজ দশরনাথ সিংহ সাহীদেবের পুত্রবধূ

ছিলেন। জাপলা এবং বিলোজা পরগণার  
সম্রাট মহম্মদ সাহ কর্তৃক নবাব হেদায়েৎ আলি  
খাঁর সহধর্মিণী মুসন্মাৎ আমাতুল জোহরা  
বেগমকে (সাইর মতাকরীণ লেখক গোলাম  
হোসেন খাঁর মাতা) আলতামস স্বরূপ প্রদত্ত  
হইয়াছিল। এই রাজকীয় দানসূত্রে নবাব  
এবং রাজার মধ্যে বহুকালব্যাপী ঝগড়া ও যুদ্ধ-  
বিগ্রহ হয়; অবশেষে ইংরাজের মধ্যস্থতায়  
সেই বিবাদের নিষ্পত্তি হয়।

সোনপুরারাজের এই বিবাদে তাঁহাদের  
পুত্রোহিত বংশ কাজরু-পাঁড়ুর পাঁড়ে, মোতী-  
রাম এবং তাঁহার জ্যতিগণ সৈয়দ আদি দিয়া  
খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। কীতাত, হায়দর-  
নগর, ডালা, মোরবে, কাদল, পাঁড়েপুরা  
প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে এই পাঁড়েবংশ খুব সাহ-  
সিকতা প্রদর্শন করিয়া সোনপুরারাজকে রক্ষা  
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কাজের জন্য  
সোনপুরারাজ উক্ত পাঁড়ে মোতীরামকে  
মোরশী মোকররী ইত্তমবারী পাট্টাসূত্রে কাজরু  
টেটের অগ্রগত চাঁচাবার, ডালা, রতনাগ, কাজরু  
ইত্যাদি মৌজাসমূহ বন্দোবস্ত করিয়া দেন।  
পাঁড়েগণের এই বিশাল টেটে নানাবিধ জমিল  
কাঠ, চূণ, দোহ, তামা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ  
আছে। তাহার অমূল্যমান করা কর্তব্য।  
পাঁড়ে মোতীরামের পৌত্র পাঁড়ে রণজীৱরাম  
এই বিশাল জমিদারী ১৮৬৭ সালে পাঁড়ুর  
পাঁড়ে শিববন্তরাম, গোবর্দ্ধনরাম আদির সহিত  
হকীয়তী, দেওয়ানী মোকদ্দমার ব্যয়ভার  
সম্বলন জন্য সর্বপ্রথমে গয়ার সে কালের  
প্রখ্যাত গভর্ণমেন্ট উকীল দাবু উমেশচন্দ্র সঙ্ক-

কাবের নিকট বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্ত্ত করেন। ক্রমে ক্রমে পাঁড়ে রণজীৎরাম ও তাঁহার চারি পুত্র ও পৌত্রগণ উমেশ বাবুর নিকট হইতে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা ঐ সম্পত্তিসমূহ বন্ধক রাখিয়া কর্ত্ত করেন। ১৮৮৪ সালে শেষ ঋণ হয়। তাহার পর হইতে পাঁড়ে অধমরণ্য ঐ টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় অবশেষে ১৮৯২ সালে গয়ার জজ আদালতে মকদ্দমা রুজু করা হয়। ১৮৯১ হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত বহু আদালতে বিবাদের পর উক্ত সম্পত্তি উমেশ বাবু পরলোক গমন করিলে বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার স্মরণার্থপুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার এই বিশাল জমিদারী খরিদ করিয়া বহু আয়্যাসে খাসদখল করেন। এখন এই “সোনারখাল” বিশাল কাজুর জমিদারিটা সরকার ভূম্যধিকারীগণের বিশাল ষ্টেটভুক্ত।

এই পর্কতসম্বিত দেশের সুন্দর বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। সত্ৰাট অশোক এই পর্কতের উপর অনেকগুলি তুল্প চৈত্যা এবং বিহার নির্মাণ করাইয়া অত্র স্থানে বুদ্ধদেবের আগমনের কথাটি অরণ রাধিবীর পথ উল্কাটন করিয়া দিয়াছেন! চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ গয়ার বহুবৌদ্ধ কীর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া তাহার সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভগবত্তি মঠের ২০ লি দক্ষিণ

পশ্চিম দিকে হইলেন সাঙ, লিখিত শিলাস্তম্ভ মঠ অবস্থিত ছিল।

ইংরাজ যুগের মধ্যে গয়া জেলার যে সকল সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা একপ্রকার পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি। ইংরাজাধিকারের ইতিবৃত্ত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার মনে হয়; সেইজন্য এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমগ্র দেশটিকে জ্বলু করিয়াছিল, তাহার তরঙ্গ গয়া জেলাকে অব্যাহত রাখে নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে মহান তরঙ্গ উখিত হইয়াছিল, সেই তরঙ্গাব্যাহত গয়া জেলায়ও পতিত হইয়া সাধারণ দ্বিঃ অধিবাসিগণের অশেষ প্রকার হুঃখ ও ব্যগ্রাণা আনয়ন করিয়াছিল। মিরাট, কানপুর, বেবেরলী, লক্ষৌ, গোয়ালিয়র, বাল্মী প্রভৃতি স্থানে যে সকল লোমহর্ষণ অভিনয় অভিনীত হইয়াছিল, সেইরূপ দৃশ্য গয়া জেলার অভিনীত না হইলেও আরা জেলার বাবু কুঁটার সিংহ ও অমর সিংহের প্রভাব বশতঃ গয়া জেলাও স্থির থাকিতে পারে নাই। সেই সময় গয়ার বিঃ এ, মোসী সাবেক কালেক্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। সহসা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিদ্রোহীগণ অসহায় ইংরাজ ললনাপণকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া, জেল ভাঙ্গিয়া, খাজানা লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসিগণের সরল হৃদয়ে মহা ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল; ইহার ফলে বিদ্রোহীগণ সাহসী হইল। যেনে অধিকতর অত্যাচার আরম্ভ করায় জনগণ

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। গয়া জেলার অবস্থা ধরাবরই শান্তিযুক্ত ছিল; কিন্তু কানীর অশান্তি ও সিকুরোনে বিদ্রোহ বোধিত হইবার অব্যবহিত পরেই গয়ার অবস্থা অশান্ত হইয়া পড়িল, স্থানীয় ওতা ও বহুমায়েশগণ দুর্ব্বলের ও হীনের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, বদলোকে স্থানীয় নিঃসহায় ইংরাজ কর্মচারী ও তাহাদের স্ত্রী ও বালকদের হত্যা করিবার লঙ্কর করার স্থানীয় ভদ্রলোকগণ ভীত হইয়া উঠিল। বেনে, চৌধুরী ও দোকানী পসারি হাট বাজার বন্ধ করিয়া ফেলিল, বদমাশগণ দিনে লুটপাট আরম্ভ করিল, রাজশক্তি ও কোম্পানি-বাহাদুরের শাসন যেন জেলা হইতে তিরোহিত হইল।

এই সময়ে (১৮৫৭ সালের ১৫ জুলাই) একদল সরকারী সৈন্যকে সহরঘাটা হইয়া গয়ায় আসিবার জন্য কলিকাতা হইতে আদেশ হয়; ঐ আদেশ মতে ৬৪নং দেশীয় পদাতি দল রাণিগঞ্জ হইতে সেরসাহী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা দিয়া কুচ করিয়া আসিতে লাগিল। তাহারা কতকদূর পশ্চিমে আসিয়া বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয় এবং নিজেদের কাপ্তান সাহেবকে হত্যা করিয়া দেশ লুণ্ঠনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে মোসী সাহেব কালেক্টরের স্বন্ধে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজও অর্পিত হয়। কাজেই এই বিপদপূর্ণ সময়ের সময় অসহায় অবস্থায় মোসী সাহেব কয়েকটি যাত্র বহু-কম্বল ও শীথ পদাতিক সৈন্য লইয়া গয়া রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। মোসী সাহেব কলিকাতার বড় লাটের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠা-

ইলেন বটে কিন্তু সাহায্য এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পাইছিল না। গভর্ণমেন্টের কোম্পানীয়ে এসময়ে ৭ লক্ষ টাকা বর্তমান ছিল এবং কানী হইতে ১২ লক্ষ টাকা দুই তিন দিন পূর্বে আসিয়াছিল; ইহার অল্প কালেক্টার আরও অধিকতর ভীত হইলেন যে যদি বিদ্রোহীগণ এই অমূল্যস্বত্ব পায় তাহা হইলে গয়ানগর রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে; সেইজন্য তিনি নগরে শান্তি তদযাত্রাতে না হয় তজ্জন্য একদল ওপচর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা নগরের যাবতীয় বদলোক ও বদমাশদের ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন-টিকে বিনা বিচারে পাছে বুলাইয়া দিয়া কানী দিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদল বিদ্রোহী চাকরীর দিক হইতে আসিয়া গয়ানগর লুণ্ঠন করিয়া জেলের কয়েদীগণকে তালা তালিয়া ছাড়িয়া দিল এবং ঋণাানা লুণ্ঠনে বার্ষমনোরথ হইয়া রেকর্ড করে অগ্নি ধরাইয়া দিয়া উজীর-গঞ্জাতিমুখে ধাবিত হইল। ইহার পূর্বেই মিঃ মোসী সাহেব গয়া ট্রেজারিতে যে টাকা ছিল, তাহা ৬ প্রসন্নকুমার সরকার মহাশয়ের সাহায্যে নগরের যাবতীয় গোলকট ধরিয়া আনাইয়া স্থানীয় ইংরাজ সৈনিক পুরুষগণেরও সেখ পার্জগণের তত্ত্বাবধানে ও ৬৪নং ও ৪৫নং পদাতিক দলের সংযোগে রাণীগঞ্জ হইয়া কলিকাতার নিরাপদে পাঠাইয়া দিলেন। টাকা যাইবার সময়ে অর্বলোপ বদমায়েশগণ কিছু গোলযোগ করিবার উপক্রম করিয়াছিল বটে কিন্তু মিঃ মোসী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের পৌরুষ কঠিন আদেশে কতকগুলি বদমায়েশ বিদ্রোহী-

গণকে হতাহত করিলে, ভয়ে সব আশঙ্কা দূর হইল এবং যথা সময়ে টাকা কলিকাতায় পহঁ-  
ছিয়া গিয়াছিল। এই কার্যের জন্ত পরে  
মোসী সাহেব লাটবাহাদুরের নিকট হইতে  
বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছিলেন। এই জেলায়  
বিদ্রোহীগণের নেতা হইয়াছিলেন নরহট  
এবং তে সোটার হায়দার আলি খাঁ। ইঁহার  
প্রধান আজা হাম্ময়গও ছিল। উজীরগজ  
ইলাকায় ডাকাত শ্রেষ্ঠ খুশীয়াল সিংহ, গয়া-  
নগরের কতিপয় লুণ্ঠন প্রিয় গয়ালী,  
অওরঙ্গবাদ থানার ইজ সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহী-  
গণ বিশেষ অশান্তির চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু  
ধন্য ভগবানের মহিমা, এক এক করিয়া  
বিদ্রোহী নেতাগণ ধৃত হইয়া কাছারির কম্পো-  
ণ্ডের নীম, বেল ও অন্যান্য গাছে ঝুলাইয়া  
বিদ্রোহের শাস্তি করা হইল। ২৫শে আগষ্টে  
মোসী সাহেব কলিকাতায় টাকা রাখিয়া আসিয়া  
এবং বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গয়ায়  
পুনশ্চ প্রত্যাবর্তন করিলে এই সময়ে কাপ্তেন  
রাট্টের অধীনে একদল ইংরাজ সৈন্য কাশী  
হইতে গ্রাণ্ড ট্রাক রোড অতিক্রম করিয়া গোহ,  
দাউদনগর কাশনা, ডুমরা প্রভৃতি গ্রামের  
মধ্য দিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে করিতে  
উজ্জেনের সন্নিকট পারাইয়া গ্রামে যোরহর  
নদীর তীরে বিশ্রাম স্থান স্থাপন করিয়া কুচ্-  
করিল। মোসী সাহেব বীর চর মারফৎ  
সংবাদ পাইয়াছিলেন যে টাকারী রাজ মহা-  
রাজা নিজামী সিংহ বিদ্রোহীদেরকে সাহায্য  
করিতেছেন এবং টাকারী দুর্গে কামান সাধা-  
ইয়া ইংরাজ সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা

করিতেছেন। ম্যানিষ্ট্রেট বাহাদুর বনে  
করিয়াছিলেন যে কাপ্তেন রাট্টের অধীনে যে  
পদাতিক সৈন্য ছিল, তাহার সহিত নিজ  
সংগৃহীত দেশী সৈন্য ও নজীর সৈন্য উভয়ে  
সংযোজিত করিয়া টাকারী অবরোধ করিয়া  
সহরটিকে উড়াইয়া দিবেন কিন্তু ইহা সমর  
সাপেক্ষ এবং অবরোধের জন্য তখন যথেষ্ট  
সৈন্যও ছিল না; অবিকৃত সাহেবের ২১৩ জন  
বিষমত চর আসিয়া মহারাজ টাকারীর বিদ্রোহী  
দলের সহিত নিলিপ্ততার পোষকতা করিল।  
মোসী সাহেব রাজাকে তলব করিলেন, রাজা  
করযোড়ে উপঢৌকনাদি সহ আসিয়া কোম্পা-  
নীর বশ্যতা স্বীকার ও যিহুতা তিক্তা করিয়া  
সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে,  
বিদ্রোহীগণ তাহার নগর দুই বার লুণ্ঠন  
করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে, তাহাদিগের  
হস্ত হইতে রক্ষা করুন। মহারাজ ৩০০ বাছাই  
সৈন্য বহেলিয়া বিহার ত্রাঙ্কণ পদাতি হইতে  
মোসী সাহেবকে জেলায় শাস্তি স্থাপন করি-  
বার জন্য দিলেন। এই অসময়ে কাশী ও  
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ৫ নং ইন্ডিয়ান  
পদাতিদল বিদ্রোহী হইয়া বহুসংখ্যক বিদ্রোহী  
দৈর সহিত টাকারী লুণ্ঠন করিতে আসিতে-  
ছিল। তাহারা সংবাদ পাইল যে, নিকটেই  
মেজর রেট্টের দল বৃহৎ সঙ্খ্যক সন্নিকটস্থ গ্রামে  
কুচ্ করিয়া আছে এবং সহর ঘাটীর দিক হইতে  
মেজর ইংলিশ ৫৩ নং পদাতি সৈন্যদল সহ  
শটনঃ শটনঃ রেট্টের সহিত সংযোগ করিবার  
জন্য আসিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া  
বিদ্রোহী দল কিছু ভীত হইয়াছিল। তদ্রূপ



হইয়া একদল পশ্চিম দিকে সোন নদ পার হইয়া সাহাবার অতিমুখে লুটপাট করিতে করিতে পলায়ন করিল, একদল হোসেনাবাদ হইয়া পালানু জেলায় প্রবেশ করিয়া রামগড়া-তিমুখে ধাবিত হইল এবং আর একদল উজেন, চীকারি ও গয়া যত্নে পরিহার করিয়া গরায় ১৪ মাইল পশ্চিমে উজীরগঞ্জে গিয়া লুটপাট, মারপাট করিতে লাগিল। এই সংবাদে চীকারি আক্রমণাশা ত্যাগ করিয়া মেজর ইংলিশ, মেজর রেটর এই বিদ্রোহীদেরকে আক্রমণ করিবার জন্য উজীরগঞ্জাতিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গয়া হইতে কালেক্টর মোসী সাহেবও একদল রক্ষী লইয়া ঐ সৈনিক পুরুষদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে ৩২ নং এবং ৫ নং পদাতিদল বিদ্রোহী হইয়া দেওঘর ও খড়কডীহা এবং নওয়াদা হইয়া উজীরগঞ্জের এই বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মেজর রেটে ও মেজর ইংলিশ বিদ্রোহীগণকে বিষ্ণুপুর টাডোয়ার মাঠে ঘিরিয়া গুলি ও কামান বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অজকালের তীব্র আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহীগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল এবং বহুজন বৃদ্ধে হতাহত হইল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পলাইয়া গিয়া নওয়াদার সন্নিকট বিদ্রোহী নেতা হারদার আলী খাঁর হালুয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইখানে একটা মোট খাট গোছের বেশ বৃদ্ধ হয়। এই বৃদ্ধে পুনঃ বিদ্রোহীদের পরাজিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন

হইয়া উত্তর এবং পূর্বদিকে পলায়ন করিল। রাজমহলের দিক হইতে একদল বিদ্রোহী আসিয়া উত্তরদিকে পলায়মান বিদ্রোহীগণের সহিত মিলিত হইল; ইহারা যে যে পথ গ্রাম দেশ দিয়া যাইল সেই সেই দিক মক্কাফ্রি করিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা পূর্বগামী বিদ্রোহীগণের সহিত মিলিত হইয়া দেশে মহা অশান্তি উপস্থিত করিল এবং জাহানাবাদের নিকট হাঁউনী স্থাপন করিয়া গয়াকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। মেজর ইংলিশ ও কাপ্তেন রেটর দল আসিয়া মুকদ্দমপুর ও জাহানাবাদে উপস্থাপি দুইটি বৃদ্ধ বিদ্রোহীদেরকে এককালীন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া মওয়াদা ও জাহানাবাদ শত্রুমুক্ত করিলেন। এই দুই স্থানে শান্তি স্থাপন ও রক্ষণের ভার মোসী সাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়া সৈনিক পুরুষের উভয়ে দাউদ নগরাতিমুখে অগ্রসর হইলেন। একজন সের সাহী গ্রাও ট্রাঙ্ক রোড হইয়া সহরবাটি দিয়া এবং অপর জন টিকারী, কৌচ, গোহ, বাখানী হইয়া ভুরুক তেলুপা দিয়া দাউদনগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোহ, পরোরেজাবাদ, কাড়া এবং দাউদনগরের বিদ্রোহীগণের সহিত মেজর রেটে ও ইংলিশের সাহসী ও সুশিক্ষিত সৈনিকদলের সহিত বৃদ্ধ হয়; সকল গুলিতেই বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইয়া কুয়ার সিংহের হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আশা আকাশ-কুসুমের মত জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজ-কেশরীর হৃদয় বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। গয়া জিলার শান্তি পুনঃ

স্থাপিত হইল, ইংরাজ পতাকা উড্ডীন হইল, দেশের লোক নিরাপদে ইংরাজ-কেশরীর বল বিক্রমের শাস্তিময়ী ছায়ায় বিদ্রোহের দিনের অত্যাচারের কথা ভুলিয়া স্বখে বাস করিতে লাগিল এবং নিজেদের সাংসারিক কার্যে মনঃ-সংযোগ করিল। গয়ায় ৬গ্রামচরণ লাল পেশ-কার, ৬শ্যামলাল মিত্র, ৬ছোটলাল সিংহয়ার, গয়ালা, ৬প্রমথ কুমার সরকার, ৬গ্রামহরি চৌধুরী গয়ালা, প্রজ্ঞাত এবং সদরবাটিতে ৬ আনন্দ কুমার রায় এবং রত্নব আলী দায়োগা লোকজন সংগ্রহ করিয়া বদমাশ বিদ্রোহী-দলকে লুটপাট হইতে বিয়ত রাখিতে পারিয়া-ছিলেন, তাহাদেরই কার্যদক্ষতার হানীয় ইংরাজগণের ধন-মানাদি অব্যাহত ছিল। এই রূপে গয়ায় বিদ্রোহানল নির্বাপিত হইল।

ঐ প্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল।

## “আমার সই।”

জীবনের প্রভাতে সবেমাত্র সূর্য্য উঠিতেছে, উন্মুক্ত বাতায়ন পথে বসন্তের স্নিগ্ধ সমীপগ সঞ্চালনে আমার নিদ্রা তঙ্গ হইল। আমি স্থপ শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তটিনীর কূলে যাইয়া কত রঙ্গে খেলা করিতেছি—কত রকমের সাধা, কাল, লাল, নীল বর্ণের পাথর ফুড়াই-তেছি—তন্মধ্যে কোনটা রাখিতেছি, কোনটা বা কেলিয়া দিতেছি; এইরূপে আপন খেলায় আমি আপনি বিভোর হইয়া আছি।

সারাদিন ব্যাপিয়া খেলিলাম তথাপি আমার খেলিবার লালসা “কি যেন কেমন” অতৃপ্ত

রহিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন সূর্য্যদেব সমস্ত দিবস আপন কর্তব্য পূর্ণ করিয়া প্রান্তকায় পশ্চিম গগনের নিভৃত অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি কিন্তু আপন মনে পূর্ব্ববৎ খেলিতেছি এবং দিনগণির আলস্ত ভাব দর্শনে তাহাকে বিকার দিতেছি, তাহাকে আমার সহিত খেলিবার জন্য সোহাগ ভয়ে কত ডাকিলাম, কত সাধিলাম, কত মিনতি করিলাম, সে কিছুতে স্বীকৃত হইল না—অধিকন্তু আমার প্রাতি অবজ্ঞাসূচক হাসির কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

তট দিবাচরের অবজ্ঞার ও উপহাসে মর্দ-পীড়িত হইয়া দারুণ মানে অধোবদনে বলিয়া কি যেন কেমন এক বেদনা অন্তরে বোধ করি-তেছি—এমন সময়ে দেখিলাম ঠিক আমারই মত খেলিতে খেলিতে একজন আসিয়া আমার অজ্ঞাতসারে অনতিদূরে আমার সম্মুখে স্থির নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়া-ইয়া আছে। তাহার তুলাবস্ত্র, অর্দ্ধ-বিক-সিত প্রান্তঃশাখির স্নাত গোলাপ-সুসুম-সমৃদ্ধ নিকলজ বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্য আপনহারা হইলাম এবং বিগত ক্রেশ হুলিয়া গিয়া প্রাণে কেমন এক অজানা ভাবের উদয় হইল—আমি তাহাকে ভাল-বাসিয়া কেলিলাম। তাহার কমল-নিম্বিত নয়নের দৃষ্টি যেন দিবা অপেক্ষাও উজ্জ্বল, জ্যোৎস্নালোক অপেক্ষাও প্রসন্ন ও প্রাণ-উদ্গাদ-কারী। তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য আমার প্রাণে অদম্য বাসনার উদ্রেক হইল। বলি বলি বলা হ’লো না, এইরূপ এক তাব

আসিয়া আমার সরম কুহেলিকার নিকেপ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রেমের আকর্ষণ অন্তরঙ্গ, তাহা পরমে বাধে না—বাধে কেবল নয়মে। আমার পিপাসা মিটিল, মেঘ না চাহিতেই দৃষ্টির আনির্ভাব হইল—কারণ, সে বেজ্ঞাপ্রণোদিত হইয়া আমাকে বলিল,—“আমি তোমার সহিত খেলিব।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“তুমি কি আমার সহিত খেলা করিতে পারিবে? আমার কঠিন দেহ, কঠোর প্রাণ—আর তোমার ঐ সুকোমল শৈবালসম নবনীনিম্বিত কোমল দেহখানি, যুগলনিম্বিত সুঠাম সুগোল ভূজলতা কি এই কঠিন জৌড়ার তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে?” বাহা হউক, সে স্বীকৃত হইল। তখন আমরা উভয়ে পৃথক প্রাণে সম আকাঙ্ক্ষা লইয়া বেশ মন দিয়া খেলিতে লাগিলাম।

তখন সুধাকরের স্নিগ্ধ শীতল প্রাণ উদ্ভাদকারী জ্যোৎস্নালোকে জগৎ উদ্ভাসিত, খেলিতে খেলিতে শ্রান্ত কারে আমরা উভয়ে এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলাম—তখন বসন্তের চিরসহচর মলয়ানীল আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে—তখন আমার নয়ন যুগল সঙ্গীর বদনচন্দ্রের সুধাপানে রত; তাহার যৌবন ভারাক্রান্ত দেহ যটি আমার বাম বাহ কর্তৃক বেষ্টিত। আহা! তাহার সকল সুন্দর—কিন্তু তাহার ঐ চণ্ডল বদন-চন্দ্রমা বেন কেমন একটা বিষাদ মাখান—তাহা নিরীকণ করিলে বোধ হয় বেন দারদীর্ঘ পূর্ণশশী একখানি অম্পষ্ট, লক্ষ্য ভ্রষ্ট গ্রহটির অনদারত। কিন্তু ইহাতে

তাহার সৌন্দর্যের লাঘব না হইয়া যেন আরও অধিকতর প্রাণ মাতান ভাব হইয়াছে। এই-রূপে কিছুকাল অবস্থামের পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“তাই, আমি তোমার কে? তোমার আমি কি নামে ডাকিব?” তখন সে বলিল যে নাম ডাই তোমার প্রাণ চায়, তোমার আমি আমার মন প্রাণ দিয়া ফেলিয়াছি—এখন তুমিই আমার নূতন নামে সাজাও; তদপরে ক্ষণকাল নিশ্চিন্তভাবে থাকিয়া তাহার সুঠাম সুগোল ভূজলতা আমার হৃদয় বেষ্টন করিয়া, আমার মুখের প্রতি তাহার যুগ নয়ন বিনিম্বিত লোচনের শক্তিস্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবেগভরে বলিল, “আমি তোমার “সই”! আজ হইতে তুমি আমার সই বলিয়া ডাকিও; আজ হ’তে আমি তোমার “সই” ও জীবন পথের নিত্য সঙ্গিনী।”

তখন আমার প্রাণ এক অজানা ভাবে বিভোর। আমি যেন বাহজ্ঞানশূন্য। তখন কে যেন আমার বীণার কনক হৃদয়-তন্ত্রী সকল বোজনা করিয়া তাহার মোহন অঙ্গুলি-স্পর্শে সন্তোষে বেহাগ, ভৈরবী, ইমণ, পুরবী, সাহানা সিঁদুর করুণ মধুর সুরে আমার হৃদয়-কন্দর নিনাদিত করিয়া সঙ্গীতের লহরী তুলিয়াছে। তখন আমার মনে পড়িল, সেই দূর অতীতে “কালো রূপে আলো করা” বৃন্দাবনের প্রেমের খেলা—সেই কথা, সেই হাসি, সেই লীলারামি সেই কলতানে তেঁসে আসা মুরলী রবে নদী কূলে বেতস বনের সুধরতা। যখন আবেগের প্রথম তরঙ্গ চলিয়া গেল তখন তাহার সুখপানে চাহিয়া দেখি সেই তাহার উভয় গণ্ড

বাহিয়া প্রেমাক্ষ বরিষেছে; সেই অক্ষতে আমার বক্ষ সিক্ত হইয়া গিয়াছে; আমি সোহাগভরে সতননে তাহা যুছাইয়া দিলাম ।

এইরূপে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত তটিনীকূলে শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া জ্যোতির্ধরী রজনীর নৈশ-শোভায় মোহিত হইয়া আমরা আপন খেলা ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের দৃষ্টির বিনিময় করিয়া অক্সমনস্বভাবে বসিয়া আছি, তখন আমার সইয়ের ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত অলক-দামের সুষমা গন্ধে আমার প্রাণ মাতোয়ারা— সেই আলুলারিত-কেশ-পাশ হুই সমীরণ কর্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে । মাঝে মাঝে সে তাহার চম্পক সদৃশ অঙ্গুলি দ্বারা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশজাল বদনশশী হইতে সরাইয়া বধা স্থানে সন্নিবেশ করিতেছে ।

সহসা আমার চক্ষু ভাঙিল; দেখিলাম অদূরে কতকগুলি কিয়া ও কেতকাকুল প্রক্ষুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার সৌগন্ধ স্তারাক্রান্ত সমীরণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া মোহাবিষ্টের জায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । সেই গন্ধে আমাদেরও প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে; পিককুল পঞ্চম তানে সঙ্গীত গাহিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে এবং সেই পরজীকাতর পাণিরা “চোক্ গেন” বলিয়া অন্তর ভেদী তানে দ্বিগন্ত বাণিয়া দৌহার গাহিয়া গভীর রজনীর নিস্তরঙ্গতা ভঙ্গ করিতেছে । আমরা তাহাদের করুণ কৃপা-বর উদ্ভ্রাণ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু অধিকক্ষণ আর স্থির থাকিতে

পারিলাম না—তখন আমি উঠিয়া আমার সইয়ের আলিঙ্গন পাশ উদ্ধৃত্ত করিয়া বলিলাম, “সই! ঐ নরাল-গামিনী বীণাধারিনী কল্লোশিনীর বন্ধের উপর রক্তকিরণ সমুচ্ছাসিত জীবনবন্ধে আমার ভ্রমণ করিতে কেমন ইচ্ছা করিতেছে । তখন আমার জীবন-পথের নিত্য সঙ্গিনী সই পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল এবং নিকটস্থ একটা স্বভাবসুন্দর বিটপীসমাক্ষিপ্ত অরণ্য হইতে কতকগুলি কাঠ সংগ্রহ করিয়া সেগুলি সম্মুখে যৌবন-শ্রী বিকশিত উন্নত বক্ষস্থলে দারণ করিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল; তদুপরে সেগুলি বনলতা দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া ভেলা প্রস্তুত করিল । অবশেষে তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত প্রিয় যুগলনির্মিত বাত দ্বারা আমাকে ইঞ্জিতে আহ্বান করিল । তাহাতে তাহার দ্বৈত কর-কম্পনে হস্তস্থিত কাকনগুলি যুগ্মধুর সুরে ধ্বনিত করিয়া যেন একতন্ত্রে বাজিয়া উঠিল । আহ! সে কি মনোমোহিনী দৃশ্য! যেন প্রণয়-ভাপবাসার স্তম্ভিমতী প্রতিধ্বনি তটিনীতটে দল্লভমানা হইয়া যুক্তপ্রাণে স্বীয় প্রণয়কে প্রণয় জানাইতেছে এবং নরনয়নগল হইতে প্রেমাক্ষ নির্গত হইয়া পদতলস্থ তটিনী বাহিয়া একল ওকুল হুহুল বিধৌত করিয়া জগৎবাসীকে যেন প্রেম কি কিনিব তাহা নীরবে জানাইয়া বাইতেছে ।

আমি ধীরে ধীরে বাইয়া ভেলায় আরোহণ করিলাম এবং সইয়ের হস্তধারণ পূর্বক আমার পার্শ্বে ভুলিয়া গইলাম । ভেলায় আমা-

যেয় বহন করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে  
নদী-বকে ভাসিয়া চলিল। তখন সেই আমার  
কঠালিজনপূর্ণক স্থলগিত বরে আবেগের দ্বার  
উন্মুক্ত করিয়া একটি গান গাহিতে লাগিল :—

“বসেছিল বঁধু তটিনী কূলে।

উদাস পরাণে স্থনীল গগনে

রেখেছিল হুটী নয়ন তুলে।

শাখে শাখে পাখী গাহিছে গান

প্রাণের বঁধুয়া আজ করেছে যান

সমীর লতায় ধীরে চলে যায়

ধর ধর বঁধু পড়িবে চলে।

আমি তখন আমার সেইয়ের সম্পূর্ণ আবেগপূর্ণ  
আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ—আমার হৃদয়  
তটিনীতে কত রকমের সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত  
হইতেছিল। আমি আমার সইকে স্বীয় বাহ-  
পাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার প্রফুল্লিত হৃদয়-  
কমল সম বদনচন্দ্রমায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া  
তাহার অধর সুধা পান করিতে করিতে  
উভরাও হইয়া সজীত শ্রবণ করিতেছিলাম।

“আহা! সে কি মধুসামিনী! মরি, মরি!  
সে কি নয়নানন্দকর প্রেমময় দৃষ্ট!” ভেলা  
আগন মনে উদাস প্রাণে মধুরগতিতে হেলিতে  
হুলিতে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। এইরূপে  
কিয়কুর গমন করিবার পর সহসা দেখিলাম  
সেই জ্যোতির্ময়ী রজনী স্নান ভাব ধারণ  
করিয়াছে। এক খণ্ড ক্লক মেঘ আসিয়া  
সুস্থলবাক্যকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে।  
দেখিতে দেখিতে ধীর মলয়ার পরিবর্তে  
চতুর্ভুজ হইতে ধূলিরাশি উথিত করিয়া বেগে  
দ্রুত গতিতে লাগিল—বাঁশড়ত তরঙ্গের উপর

তরঙ্গ আসিয়া আমাদের উপর পড়িতে  
লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্বে আমার হৃদয়  
তটিনীর উপর দিয়া কত সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত  
হইতেছিল, এখন তাহার পরিবর্তে উত্তাল-  
তরঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে; ইহাতে সইকে  
আমার কিঞ্চিৎ উতলা করিয়া তুলিল এবং  
ভীত হইয়া সে তাহার আলিঙ্গন পাশ দূরতর  
করিয়া রাখিল। আমি তাহার সে ভাব  
দর্শনে তাহাকে স্বীয় বক্ষ মধ্যে আনিয়া আপন  
বাহুদ্বারা বেঁধন করিয়া রহিলাম। তখন  
তাহার বদনকমল যেন সহকার-চ্যুত বিস্কক  
লতিকাসম হইয়াছে; এমন সময় প্রবলবেগে  
কটিকা বহিতে লাগিল এবং উত্তাল তরঙ্গজালে  
আবৃত হইয়া ভীতি বিহ্বল-নেত্রে তাহা  
দেখিতে দেখিতে আমাদের সংজালোপ পাইল।  
আমাদের সুখালিঙ্গন চিরতরে ভাঙিয়া দিবার  
জন্ত নিষ্ঠুর তরঙ্গ প্রবল আঘাত করিল—  
তাহার করাল আঘাতে ভেলা বন্ধনচ্যুত  
হইল এবং আমরা উভয়ে জল মগ্ন হইলাম।

মূহুর্ত মধ্যে আর এক তরঙ্গের আঘাতে  
আমরা উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনচ্যুত হইলাম।  
তখন কাতর প্রাণে সেইয়ের জীবন  
রক্ষার্থ তাহাকে ধরিবার জন্ত পুনঃপুনঃ ডুবিতে  
উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! সেই  
প্রেমপ্রতিমার আর সাক্ষাৎ মিলিল না।  
আমার চেতনা লোপ পাইল—আমি ভাসিতে  
ভাসিতে আসিয়া কূলে লাগিলাম। বন্ধন  
চেতনা হইল তখন দেখিলাম আমি একা!  
সই আমাকে এই গভীর কটিকাময়ী রজনীতে  
একা রাখিয়া জীবনে জীবন ত্যাগ করিয়াছে।

এখানে ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যখন সম্পূর্ণ জ্ঞানোন্নয়ন হইল তখন বুঝিলাম এখন হইতে আমার আমি এই বিশাল অসীম পৃথিবীতে একা, আমারও আর কেহ নাই—“এখন আর কই কেউ তো আমার তেমন করিয়া ভালবাসে না—কেউ তো তেমন করিয়া সোহাগতরে আহ্বান করে নী। কেহ তো আমার আমি তোমারি এ কর্ণা বলে না। তাই তো বলি এ সংসারে আজ আমি একা ! আহা ! সেই বিষাদ-কালিয়া-মাখা বদনকমল আজও আমার হৃদয়পটে পাষণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় দেদীপমান আছে। সেই শেষ জীবনের শেষ মিলনটুকু আর ভুলিব না। হায় ! সকলই “প্রাক্তন !!!”

শ্রীজ্ঞানানন্দ সিংহ রায়

## নীরবে নীরবে ।

(কিবা) নীরব নিশীথে ভাসিছে দিখ  
গাহিছে নীরব গান ।  
নীরবে নিবেদন পরশ স্বপন  
মদিরা বিস্তার প্রাণ ॥  
নীরব বেগানে কোকিল রচিল  
নীরব বিরস কবিতা ।  
কোকিলা তখন নীরবে শুনিল  
অগ্নির বিদূর গাথা ॥  
প্রকৃতি কেন গো নীরবে নীরবে  
গাহিছে ওকার গান ।

নীরব নিম্নে গড়িলা বিধি  
নীরব নিম্নে প্রাণ ॥  
নীরবে দেখে (কে) মিলন স্বপন  
(সপায়) মিলিছে নর-নারায়ণ ।  
নীরবে সাধে (কে) মনের মন্দিরে  
লভিতে রাতুল চরণ ॥  
নীরব তুমি নীরবে নীরবে  
(চির) নীরব প্রভুরে নিবেদন ।  
নীরবে নীরবে বাসিব ভাল  
দাসেরে দিও দরশন ॥  
ঐবলাইলাল মুন্সী ।

## শ্রীধিকৃত্য

[ পুষ্পান্তরিত ]

আমাদের অধুনা যতগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রিয়া-কলাপাদি প্রকাশিত আছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—হোম, পূজা ও শ্রাদ্ধ। অল্পপ্রাশন উপনয়নাদি বিভিন্ন সংস্কার কার্যে অথবা দোল ভূর্গোৎসবাদি বিভিন্ন ব্রত পূজাতে বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকিলেও স্থল হিসাবে দেখিতে গেলে, হোমের সামান্য-কৃশতিকা ও অন্ত্যস্ত বহাদি অথবা পূজার স্তানাদি ও পক্ষো-পচার, দশোপচার, ষোড়শোপচার ক্রিয়াদি, সর্ব্বত্রই প্রায় এক ; কার্য্য বিশেষে কোথাও সংক্ষেপ, কোথাও বা আড়ম্বর, কোথাও ইতর, কোথাও বা কিছু বিশেষ করা কইরিতে বাজি।

আমাদের শ্রাদ্ধকৃত্যও বহুবিধ। বিভিন্ন শ্রাদ্ধকৃত্যে বিভিন্ন যন্ত্র ও ক্রিয়া কলাপাদির ব্যবস্থা থাকিলেও, সকল শ্রাদ্ধের মূলধারা এক। এই শ্রাদ্ধকৃত্যগুলিকেও আবার প্রাণ-নতঃ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, একোদিষ্ট ও পার্শ্বগ। এক পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম একো-দিষ্ট এবং পরদিনে পিতৃ-মাতৃ-পক্ষের তিন তিন পুরুষ এবং বিশ্বদেবতাকে লইয়া যে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম পার্শ্বগ-শ্রাদ্ধ। পরদিন বলিতে দুই ঋতু বৎসরাদির সংযোগ দিহ বুঝায়। এ সম্বন্ধে শ্রাদ্ধকৃত্যের কাল-কাল বিচার প্রসঙ্গে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। একোদিষ্ট ও পার্শ্বগ ব্যতীত আমা-দের ইটি, নান্দ্যযুগ, নৈমিত্তিক, কাম্য প্রভৃতি বহুবিধ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। এগুলি পার্শ্বগ শ্রাদ্ধেরই অঙ্গরূপ। সুতরাং ইহাদিগকে পার্শ্বগ-শ্রাদ্ধেরই শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে।

শ্রাদ্ধকৃত্যে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পিতৃ পূজার অনুষ্ঠান। সুতরাং ইহাতে ভেদবুদ্ধির সত্তাবমাই অধিক। কিন্তু ইহাতে বাষ্টি উপা-সমারম্ভা দিয়া সমষ্টি-জ্ঞানটিকে, এরূপ উচ্চ আদর্শে বিকাশিত করা হইয়াছে, ইহাতে জগদ্বিহিত শক্তিগুলিকে বিশ্বদেবের রূপে পার-কল্পিত করিয়া, পৃথিবীর ধূলিকণাটিকেও পঞ্চাঙ্গ মণ্ডনের রূপে দর্শন করিয়া, এরূপ স্তম্ভররূপে বহুত্বের উপর একত্বের মিশ্রণ অথবা একত্বের উপর বহুত্বের আবরণের ভাবটি পরিষ্কৃত করিয়া তোলা হইয়াছে যে, এরূপ উদার অণুচ মহানতান, হিন্দু বহুত্বের ভাব, হিন্দু-

ত্বের আদর্শ, আমাদের আর কোনও ক্রিয়া-কলাপাদিতে এরূপভাবে দেখান হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে বর্ণনাই সম্ভব লাজে। প্রথমে বিশ্বদেবের কথাই বলি। ইহাদের নাম গুলি হইতেই বুঝা যায় যে, ইহারা জগতের দ্রব্য-শক্তি ও ক্রিয়াক্রান্তি প্রভৃতিরই প্রতিনিধি। বহুগুণ্যো ক্রতুদ কৌ কালকালো ধুরিলোচনো, পুরুষামাত্রাব্যম্, বিশ্বদেবা প্রকীর্তিতাঃ ।

বসু ও সত্য ( ধন ও সত্য ), ক্রতু ও দক্ষ ( যজ্ঞ ও দক্ষতা ); কাম ও কাল ( ইচ্ছা ও সময় ), ধুরি ও লোচন ( ভাগগ্রাহিতা ও পরি-নাম বৃত্তি ) এবং পুরুষ ও মাত্রাবস ( মূলজাত ও জলজাত দ্রব্য মিচর ), ইহাঁরাই বিশ্বদেব নামে পরিচিত। মত্রে শ্রাদ্ধের প্রথমে এই বিশ্বদেব-গণের পূজার আরোজন সম্বন্ধে বলেন,—

তেনামারক্ষতুভুক্ত পূর্ণং দৈবং নিযোজয়েৎ ।

রক্ষাসি হি বিলুপ্তস্তি শ্রাদ্ধমারক্ষাবজিতম্ ॥

দৈবাত্তত্ত্বং তদীহেত পিত্রাত্তত্ত্বং ন তত্ত্ববেৎ ।

পিত্রাত্তত্ত্বং স্বীহমানঃ ক্ষিপ্ৰং নশ্ৰুতি সাবয়ঃ ॥

[ মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায় ২০৪২-০৫ শ্লোক ]

অর্থাৎ শ্রাদ্ধকার্যের রক্ষা কর বলিয়া, অগ্রে বিশ্বদেবগণের আবাহনাদি করা উচিত। শ্রাদ্ধ রক্ষাহীন হইলে রাক্ষসেরা উহা নষ্ট করে। সুতরাং শ্রাদ্ধের আদিতে বিশ্বদেবের আবাহন এবং অন্তে নিরঞ্জনাদি দেবকথা করা উচিত। শ্রাদ্ধের আদি অন্তে পিতৃকথা কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের আদি ও অন্তে দেবকথা না করিয়া পিতৃকথা করে, সে শ্রাদ্ধের বিষয়েত্ব সম্বন্ধে সর্বশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পিতৃযজ্ঞকে নামাকরণ বিষয় হইতে রক্ষা

করিবার জন্য বিশ্বদেবগণের অথবা জনগণিহিত শক্তি নিচয়ের পরিকল্পনা পিতৃবল্লভলি বিক্রিয়, একারণ বজ্ররক্ষাকর শক্তি অথবা বিশ্বদেবত্ব প্রতিপন্ন।

ইতিশ্রাদ্ধে ক্রতুদক্ষং সত্যোন্মানীযুখে বসঃ, বৈমিত্তিকে কামিকালো কামো চ ধুরিলোচনো পুরুষবামাদ্রবাশ্চ পার্শ্বপে সমুদাহৃতৌ।

ইতিশ্রাদ্ধে ক্রতু ও দক্ষ বিশ্বদেব। অভিলষিত ফল কামনার পিতৃবল্লভের অনুষ্ঠান করিতে হইলে উপযুক্ত যজ্ঞ ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। অতথা যজ্ঞ পণ্ড হইবার সম্ভাবনা। একারণ ইতিশ্রাদ্ধে যজ্ঞ ও দক্ষতার অধিষ্ঠাতৃ বিশ্বদেবগণের পূজা সর্বাগ্রে করা হইয়া থাকে। এত-রূপ অন্নপ্রাশন, উপনয়নাদি সংস্কার কার্যে ধন ও সত্য এই দুই শক্তির প্রয়োজন হয়। এই হেতু নান্দীযুখ শ্রাদ্ধে বসু ও সত্য বিশ্বদেবরূপে পূজিত। নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধে ইচ্ছা ও সময় এবং কামাশ্রাদ্ধে তারগ্রাহিতা ও পরিণাম দৃষ্টি বিশ্বদেব নামে পরিকীৰ্ত্তিত। পূর্বেই বলিয়াছি দুই ঋতু, দুই বৎসর, দুই মাস প্রভৃতির সংযোগ দিনকেই পরদিন বলে। পূর্বে বিভিন্ন শস্ত্রাদির উপনয়ের সময়ে বিভিন্ন পার্শ্বপের অনুষ্ঠান করা হইত। এই বিভিন্ন সময় জাত নব শস্ত্রাদি বিভিন্ন পার্শ্বপ শ্রাদ্ধের মূল উপকরণ। সুতরাং মূলজাত ও জলজাত দ্রব্য নিচয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব পুরুষবা ও মাদ্রবস পার্শ্বপ শ্রাদ্ধের বিশ্বদেব।

হিন্দুর সংযম, তীর্থদর্শন, স্নান প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বিষয়ে বিশেষত্ব আছে, যেগুলির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হিন্দুগণ আজও পথ্য হিন্দু

বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সাংস্কৃতিক দান তাহাদের অন্ততম। এই দান শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গ। দান বাতীক শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় না, শ্রাদ্ধ করিতে অধিকারও জন্মে না। এ কারণ শ্রাদ্ধ করিতে বহিষকার পূর্বে আমাদের অবহাচসারে পিতৃ-মাতৃকেই অক্ষয় স্বর্গকামনায় যোড়শ অথবা অন্নজল বস্ত্রাদি উৎসর্গ করা উচিত থাকে। যদি কিছুই ক্ষমতা নাহি, তিনি শ্রাদ্ধের পূর্বে অন্ততঃ সামান্য একটা ভোজ্য ও উৎসর্গ করিতে বাধ্য হন। শ্রাদ্ধের পর দান নিষিদ্ধ।

শ্রাদ্ধকৃত্যটিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে শ্রাদ্ধের অন্তর্গত কার্যাদির সম্যক আলোচনা আবশ্যক। বিভিন্ন শ্রাদ্ধের বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠান থাকিলেও, সকলগুলির মূল দ্বারা অনেকটা পার্শ্বপ শ্রাদ্ধের অনুরূপ। সুতরাং পার্শ্বপ শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, সকল শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হইবে।

শ্রাদ্ধকৃত্যের একপ্রকার বিশেষ রীতি আছে। ইহার নাম পিতৃরীতি। বামজানু পাতিয়া ও দক্ষিণজানু উন্নত রাখিয়া দক্ষিণাঙ্গে উপবেশন করা, যজোপবীতের সহিত উত্তীর্ণ বিপরীত দিকে অর্থাৎ দক্ষিণমুখে স্থাপন করা এবং পিতৃতীর্থ অর্থাৎ অমৃত তীর্থের মধ্য স্থান দ্বারা বধ্যস্ত্র মধ্যে প্রায় সমস্ত কার্য্য করাকে পিতৃরীতি বলে। ইহার বিপরীত রীতির নাম দৈবরীতি। অমৃত্যু সকলের নাম দৈব-তীর্থ। দেবপূজার দৈবরীতি এবং পিতৃপূজার পিতৃরীতি অন্তর্গত। পার্শ্বপের বিশ্বদেবগণ দেবতা; এ কারণ ইহাদের পূজাদি বৈবর্তীয় কার্য্য দৈবরীতি ও দৈবতীর্থ দ্বারা করিতে হয়।



সকল প্রকার প্রাক্কই, যে বাতীতে প্রাক্ক  
হয়—তাহার অধিষ্ঠাতৃদেব অর্বাং বাস্তপুরুষ,  
যজ্ঞমাত্রেই অধিষ্ঠাতৃদেব যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু, গাঙ্ক-  
প্রদেশে গঙ্কা এবং পিতৃগণিতে যে ভূমিতে  
প্রাক্ক হয়, সেই ভূমীর পিতৃগণের সর্বাগ্রে  
পূজা করিয়া, প্রাক্কের অমুজা লওয়া হইয়া  
থাকে। গঙ্গাগর্ভজাত দেশে গঙ্গা পূজা  
করিবার বাবস্থা থাকিলেও যমুনা গর্ভজাত  
দিল্লী প্রদেশের প্রাক্ক গঙ্গা পূজাই চলিয়া আসি-  
তেছে। ব্রাহ্মণকে অপবা আধুনিক কুশময়  
ব্রাহ্মণকে পিতৃপুরুষগণের প্রতিনিদ্রূপে করুনা  
করিবার জন্য ব্রাহ্মণের যে অমুমতি লওয়া হয়,  
তাহাকে অমুজা লওয়া বলে। আজ কাল  
কুশময় ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিয়া প্রাক্ক করা হয়  
বলিয়া, কাম্যকারয়িত্ব পুরোহিত ব্রাহ্মণগণই  
অমুজা প্রদান করিয়া থাকেন। এই অমুজা  
লওয়া হইলেই প্রাক্ক আরম্ভ করা হয়। ইহার  
পর অশৌচাদি কোন প্রকার প্রতিবন্ধক,  
প্রাক্কের বিষয় উৎপাদন করিতে পারে না।

প্রাক্ককৃত্যের প্রত্যেক অমুষ্ঠান এই ক্ষুদ্র  
প্রবন্ধে আলোচনা করা নিম্নপ্রয়োজন; এবং  
সম্ভবপরও নহে। কেবলমাত্র প্রাক্কের প্রধান  
প্রধান মন্ত্রগুলির উল্লেখ করিলে, বোধ হয় এই  
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আংশিক সফল হইতে পারে।

অমুজা লওয়ার পর গায়ত্রী পাঠ পূর্বক  
বলা হইয়া থাকে,—“দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ...  
অর্বাং দেবতাগণ, পিতৃগণ, মহাযোগীগণ, স্বধা  
(পিতৃগণ) অর্বাং পিতৃশক্তি) এবং বাহা (অগ্নি-

গ্নী অর্বাং অগ্নির শক্তি), ইহাদিগকে আবি-  
নন্দ্য করি, যেন নিত্যই এইরূপ-প্রাক্কের অমু-  
ষ্ঠান হয়।

অতঃপর পিতৃপুরুষগণকে আসন দান করা  
হয়। অবশ্য, এখানে বলিয়া রাখি, পার্বণের  
অমুজা লওয়া হইতে বাবস্তীয় কক্ষ্য প্রথমে  
বিশ্বদেব, পরে পিতৃপক্ষ এবং শেষে মাতৃপক্ষের  
উদ্দেশ্য করা হইয়া থাকে।

আসন দানের পর আনাহন। আনাহনে  
বিশ্বদেবগণের প্রভি বলা হয় “বিশ্বদেবান  
আগতঃ ইত্যাদি” হে বিশ্বদেবগণ, আসুন,  
আমার আছান শ্রবণ করুন। এই  
কুশাসনে উপবেশন করুন। “বিশ্বদেবাঃ  
শৃণুভেগং হবং... ইত্যাদি” যে বিশ্বদেবগণ  
আমার পুরিত্রাণকারক এবং অগ্নিহোতা, যাহারা  
দ্যাক্ষে, বর্গে এবং পৃথিবীতে অবস্থান করি-  
তেছেন, তাঁহারা সকলেই আগার আছান  
শ্রবণ করুন এবং এই কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া  
আনন্দিত হউন। “ওষধয়ঃ সমবদন্ত... ইত্যাদি”  
ওষধিগণ (কুশা সকল) আপনাদের অধিষ্ঠান-  
যুক্ত আত্মাকে বহুমত করিয়া নিজ নাথ নিশা-  
করের সাহিত আনন্দিত হইয়াছেন। হে  
রাজন সোম আপনি ব্রাহ্মণ, অতএব যে  
ব্রাহ্মণগণের আসনকে আপনি দর্ভদ্বারা সযত্ন  
করিতেছেন, তাহাদিগকে প্রাক্ক ভোজন কৃত  
পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।

ঔজ্জানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।









